গৌরবদীপ্ত
জিহাদ
লেঃ কর্নেল এম. এম. কোরেশী

লেঃ কর্নেল এম. এম. কোরেশী

গৌরবদীপ্ত জিহাদ

মুহাম্মদ লুতফুল হক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের কথা

ইসলামের ইতিহাসের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে মুসলমানদের জিহাদের ঘটনা। বস্তুত ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে বিকাশকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য জিহাদ সংঘটিত হয়েছে। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি বার বার ঝলসে উঠেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুসলমানরা যতগুলো জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই ঘটেছে ইসলাম ও মুসলিম জনগণ অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য। এ রকমই ১৪টি জিহাদের ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা লেঃ কর্নেল (অবঃ) এম.এম. কোরেশীর 'দি ল্যান্ডমার্কস অব জিহাদ' (The Landmarks of Jihad) গ্রন্থটি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি শুধু জিহাদের বর্ণনা নয়, বরং এতে রয়েছে প্রতিটি যুদ্ধের সামরিক বিশ্লেষণ। লেখক প্রতিটি যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের কারণগুলো একজন সমরবিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও তার যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। সে কারণে এটি নিছক যুদ্ধকাহিনী নয়, বরং একটি বিশ্লেষণাত্মক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। লেখক নিজে সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা ও সমরবিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণেই এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশিষ্ট অনুবাদক জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন 'গৌরবদীপ্ত জিহাদ' নামে। তাঁর সাবলীল অনুবাদ মূল গ্রন্থের স্বাদকে প্রায় অপরিবর্তিত রেখেছে। এ গ্রন্থটি ১৯৮৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষিত মননশীল পাঠকের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। বর্তমানে এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি তা পূর্বের মতই পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করবে।

সুধী পাঠকদের ভাল গ্রন্থ উপহার দেয়ার আমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্ পাক কবুল করুন। আমীন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বিশ্বে যারা শক্তিমান, কোন যুদ্ধের সূচনা করে তারাই। যারা শক্তিহীন, তারা শক্তিমানের কাছে পরাভূত হয়। মানবেতিহাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত এটাই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। তবে এর ভিতরেও ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। আর তা ঘটেছে মুসলমানদের হাতে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মুসলমানেরাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে যে, শক্তি প্রদর্শন বা নিছক আত্মরক্ষার জন্য নয়, আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়। এই যে যুদ্ধ সেটাই হচ্ছে জিহাদ। সাধারণ অর্থে যুদ্ধ বলতে যা বোঝা যায়, জিহাদের সাথে তার রয়েছে বিস্তর ফারাক।

ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকে পরবর্তীকালে অসংখ্য জিহাদ সংঘটিত হয়েছে। সকল জিহাদেই যে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে, তা নয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার লেঃ কর্নেল (অবঃ) এম.এম. কোরেশী এ রকম ১৪টি জিহাদ নিয়ে ইংরেজী ভাষায় রচনা করেছেন 'দি ল্যান্ডমার্কস অব জিহাদ' গ্রন্থটি। তিনি এ গ্রন্থে সেই জিহাদগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেগুলোর কৌশলগত বিষয় বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে এবং যেগুলো জিহাদের দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, ইতিহাসের গতিধারায় যেগুলো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এ গ্রন্থটি 'গৌরবদীপ্ত জিহাদ' নামে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত অনুবাদক জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক। ১৯৮৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর তা সুধীমহলের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। তাদের চাহিদার কারণেই এবার গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো। আশা করি, এ মূল্যবান গ্রন্থটি আগের মতই সুধী পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল্লাহ্ পাককে রাজী করানোর উদ্দেশে
যাঁরা জিহাদের ময়দানে ছুটে গেছেন
আর যাঁরা প্রেরণা যুগিয়েছেন পর্দার অন্তরালে থেকে
জানা-অজানা সে সমস্ত বীর মুজাহিদগণের
কুরবানীকে আল্লাহ্ কবুল করুন।
আমীন॥

অনুবাদকের আরজ

সাধারণ অর্থে যুদ্ধ ও জিহাদ বলতে সশস্ত্র সংগ্রাম বোঝালেও দুটোর মধ্যে প্রচুর প্রভেদ রয়েছে। যুদ্ধের মূলে রয়েছে পররাজ্য গ্রাসের লিপ্সা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অপরদিকে জিহাদের উদ্দেশ্য হল আত্মরক্ষার তাগিদ এবং অন্যায়ের প্রতিকারের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তির প্রতিষ্ঠা। মুসলমানরা যুদ্ধ করে না, তারা জিহাদ করে। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা প্রবল ছিল; জিহাদের চেতনা ও অনুভূতি ছিল তাদের শক্তির উৎস, ততদিন তারাই ছিল বিশ্বের শক্তিমান জাতি।

যুদ্ধ হল বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার শক্তির লড়াই। শক্তি পরীক্ষায় যাদের সৈন্য-শক্তি বেশি, যারা মারণাস্ত্রে অগ্রগামী, তলোয়ার চালাতে যারা সিদ্ধহস্ত- তাদেরই বিজয় ঘটে। সুদূর প্যারিস থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে শক্তিশালী কত জাতির আবির্ভাব ঘটেছে। রোমক, পারসিক, ফরাসী, মোঙ্গল, রাজপুতদের পরাক্রম বিশ্বের ইতিহাসে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তাদের পদভারেই জনপদ থর থর করে কেঁপে উঠত, চলার পথে সৃষ্টি হত ত্রাস ও হাহাকার। তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও অপ্রতিরোধ্য গতির কাছে সবাই মাথা নত করত। বিভিন্ন রণাংগনে মুসলমানদেরকে বারবার এ সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও শক্তি দ্বারা মুসলমানরা বারংবার আক্রান্ত হয়েছে। কখনো কখনো হয়ত তারা বিপর্যস্ত হয়েছে; বিপন্ন হয়েছে তাদের অস্তিত্ব। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তারা নববলে বলীয়ান হয়ে সেসব শক্তিকে রুখে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ সময় প্রতিপক্ষের তুলনায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত, মারণাস্ত্র ছিল নগণ্য। তদুপরি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরা ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি সহজাত অনুভূতির কারণে জাতিগতভাবে এরা ছিল অসংগঠিত ও দুর্বল। আরবের বাইরের লোকগুলো ছিল উৎপীড়িত, অজ্ঞ ও দুর্বল চিত্তের। এত কিছুর পরও তারা রোমক, মোঙ্গল, রাজপুতদের মত শক্তির মুকাবিলায় বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করল কিভাবে? এতবড় দুর্জয় সাহস ও শক্তি তারা কোথায় পেল? ইসলাম তাদেরকে যুদ্ধের এমন কি ফরমূলা বা নিয়ম পদ্ধতি শেখাল যেগুলো দিয়ে তারা শত্রুর মুকাবিলা করল। অথবা এমন কি অস্ত্র দান করল যার কারণে শত্রুপক্ষ হার মানল? আসলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং জিহাদের প্রেরণাই তাঁদেরকে উন্নতমানের যোদ্ধায় পরিণত করেছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় মহাবীর খালিদ (রা) জনমানবহীন সিরীয়

মরুভূমির মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যে দুঃসাহস ও আকস্মিকতার পরিচয় দেন, তা সম্ভব হয়েছিল এই জিহাদী অনুভূতির কারণেই।

এখানে আরো একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। শক্তিমান জাতি হিসেবে রোমান, মংগোল, ফরাসী, রাজপুতরা বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু বিজিত অঞ্চলে তারা কখনো সমাদৃত হয়নি। স্থানীয় অধিবাসীরা চিরটাকাল তাদেরকে শত্রুপক্ষ হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। কিন্তু সে তুলনায় মুসলমানদের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বিজয়ীর বেশে যে অঞ্চলেই মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেখানকার সাধারণ মানুষ তাদের খোশ আমদেদ জানিয়েছে। বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য, ভাষাগত পার্থক্য ও আচরণের ভিন্নতার কথা ভুলে গিয়ে বিজিতেরা তাদের গ্রহণ করেছে অতি আপনজন ও মুক্তির দিশারী হিসেবে। মুসলমানরাও তাদের সঙ্গে একান্তভাবে মিশেছে, তাদের গ্রহণ করেছে আপন ভাইয়ের মর্যাদায়। আর সে কারণেই যেখানেই তারা গেছে, সেখানেই তাদের আসন স্থায়ী হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছে, তাদের হয়ে লড়াই করেছে।

গৌরবদীপ্ত জিহাদের লেখক লেঃ কর্নেল কোরেশী বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনার মধ্য দিয়ে এ কথাগুলোই তুলে ধরেছেন। লেখক তাঁর বক্তব্যের ইতি টেনেছেন এভাবে :

> এক সময়ে মুসলমানদের নামে বিশ্বের যে শক্তিগুলো থর থর করে কাঁপতো, তাদের হাতেই মুসলমানরা উপর্যুপরি মার খায়। যে নিয়ম-পদ্ধতি বা ফরমূলার বদৌলতে তারা সকলের শীর্ষে পৌঁছেছিল, সেই সূত্রগুলো এখন তাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারে না। জিহাদের প্রেরণা পরিত্যাগ করার ফলেই এককালের শাসকরা নেমে এল প্রজাদের স্তরে।

গৌরবদীপ্ত জিহাদ-এ মোট ১৪টি যুদ্ধের বিবরণ স্থান পেয়েছে। যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে ৬২৫ থেকে শুরু করে ১১৫৩ ঈসায়ীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে। রণাঙ্গনগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সুদূর প্যারিস থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। প্রতিটি যুদ্ধকেই বলা যেতে পারে ইসলামের ইতিহাসের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সবগুলো যুদ্ধেই কিন্তু মুসলমানরা বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে পারেনি। কোন কোনটিতে তারা পরাজিতও হয়েছে। বিপর্যস্ত হয়েছে চরমভাবে। গৌরবদীপ্ত জিহাদ-এ জয়-পরাজয়ের বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি লেখক তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে মুসলমানদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন। অন্য কথায়, অতীতের নিরিখে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার উপাদান তুলে ধরেছেন। আর সে কারণেই চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সাধারণ পাঠকের কাছে পুস্তকটি ভাল লাগবে। লেখক পাকিস্তানের সামরিক বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। পেশাগত কারণেই যুদ্ধের কলাকৌশল ও স্ট্রাটেজী সম্পর্কে রয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করেছেন। যুদ্ধের

কলাকৌশলগুলো বর্ণনার পাশাপাশি মুসলমানদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। সামরিক বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সাধারণ পাঠকরা পুস্তকটি পাঠ করে আনন্দ পাবেন। নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও বীরত্বের কাহিনী অধ্যয়ন করে জিহাদী চেতনা উপলব্ধি করতে পারবেন– একান্তভাবে এ আশাই পোষণ করি।

পুস্তকটি অনুবাদ করার কাজে আমাকে প্রথমত এবং প্রধানত উৎসাহ যুগিয়েছেন মাওলানা মোশাররফ হোসাইন ও মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল আউয়াল। তাঁর হাতের পরশ লেগেছে বলেই অনুবাদে গতি এসেছে, ভাষা শ্রুতিমধুর হয়েছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পুস্তকটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বন্ধুবর মুনসুর উদ্‌দৌলাহ পাহলোয়ান ও আবদুস সামাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। পুস্তকটি অনুবাদ ও প্রকাশের প্রচেষ্টায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ্ তাদের এই শ্রমকে ইবাদত হিসেবে কবুল করুন-এ কামনাই করি।

মুহাম্মদ লুতফুল হক

মুখবন্ধ

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আনন্দিত এ জন্য যে, ইংরেজি ভাষায় মুসলিম সামরিক ইতিহাস সম্পর্কে চর্চার সুযোগ খুবই কম। এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী আনন্দের বিষয় এ কারণে যে, আমাদের সামরিক বাহিনীর একজন সৈনিক এই পুস্তকটি রচনা করেছেন। আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা সামরিক ইতিহাস পাঠ করে গর্ববোধ করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা যা পড়ি তা মূলত পাশ্চাত্যের যুদ্ধকে ভিত্তি করে রচিত। অবশ্য এসব যুদ্ধের শিক্ষা অন্যান্য যুদ্ধের মতই মূল্যবান। তবে মুসলমানদের যুদ্ধের বিবরণী পাঠে যে সত্যিকার আবেগ ও গৌরবের অনুভূতি পাওয়া যায়, অন্যান্য যুদ্ধের ইতিহাসে তা স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত । সে কারণেই দেশবাসী এবং বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে মুসলমানদের যুদ্ধ নিয়ে পুস্তক রচনার প্রয়াসে উৎসাহ প্রদান করা সব সময় কল্যাণকর বলেই বিবেচিত হবে।

এই কথাগুলো লেখার সময় আমার মনে হয়েছে যে, এই বই পাঠ করে শুধু সেনাবাহিনীর সদস্যই নয়, সাধারণ পাঠকও উপকৃত হবেন। এই পুস্তকে উপস্থাপিত কোন কোন বক্তব্যের সঙ্গে কারো কারো দ্বিমত থাকতে পারে। তবু পুস্তকটিকে হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যবহুল করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম সেনানায়করা অংশগ্রহণ করেছেন এমন অনেক যুদ্ধের বিবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে লেখকের পরিশ্রম ও গবেষণা কৃতিত্বের দাবী রাখে।

আমি এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

গভর্নর হাউস
লাহোর
২৮ জুন, ১৯৭০

এম. আতিকুর রহমান
লেঃ জেনারেল
এইচ. কিউ. এ. এম. পি. কে. এম. সি

আরজ

আদম (আ)-এর পাপের শাস্তিস্বরূপ মানবজাতির জন্মগত নীতিভ্রষ্টতা সম্পর্কিত মত এবং পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন মানুষের ধর্মীয় ও ধর্ম সম্পর্কিত নয়, এমন কার্যাবলীর বন্টনের ধারণা সমর্থন করে না। বরং আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে-ইসলাম এই মতবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পার্থিব কাজসহ মানুষের সব কাজেরই এই আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানবীয় আচরণ পরিচালনার জন্যে কতকগুলো সাধারণ বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ১৪ শতাব্দী ধরে ইসলাম মুসলমানদের জীবনধারাকে যেভাবে রূপায়িত করেছে অন্য কোন ধর্ম তার অনুসারীদের অনুরূপভাবে তৈরী করতে পারেনি। ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস যেখানে প্রবল, ইসলামী জিন্দেগীকে যখন তারা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে, তখন মানুষে মানুষে ভৌগোলিক অবস্থান, বর্ণগত পার্থক্য, অর্থনৈতিক ব্যবধান, সামাজিক দূরত্ব তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন ইসলাম সকলকে একই সুতায় গ্রথিত করে, ইসলামই হয়ে দাঁড়ায় তাদের জীবনের চালিকাশক্তি।

ইসলাম একটি আন্দোলন, একটি বিপ্লব। ধর্মীয় এবং পার্থিব, উভয় জগতই এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সমস্ত জীবনবিধানকে পরিত্যাগ করে ইসলামী মূল্যবোধ এবং বিধি-বিধানের সফল বাস্তবায়নই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন নিরলস প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যবসায়ের। ইসলামী পরিভাষায় এই চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের নাম জিহাদ। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জিহাদ কখনও শান্তিপূর্ণভাবে কখনও আবার অস্ত্রের মাধ্যমে হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে অস্ত্রের জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম.। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলাম বিরোধীরা সব সময় এর অপব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছে। এমনকি মুসলমানরাও জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য এবং অর্থ সম্পর্কে ভুলে গেছে। তারা ভুলে গেছে জিহাদের ব্যাপারে তাদের ঐতিহ্যের কথা। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই পুস্তকের শুরুতে সহজ-সরলভাবে জিহাদের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ঘটনার যথাযথ বিবরণের মধ্য দিয়েই লিপিবদ্ধ হয় ইতিহাস। এই বিবরণ যেমনি কেউ খেয়ালখুশিমত তৈরী করতে পারে না, তেমনিভাবে কোন জাতির অতীত কেবলমাত্র সাফল্য এবং চমৎকারিত্ব নিয়েই গড়ে উঠে না। অনুরূপভাবে মুসলমানদের

গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাশাপাশি রয়েছে ব্যর্থতা এবং দুর্যোগের কাহিনী। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মুসলমানদের কতকগুলো যুদ্ধকেই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কতকগুলো যুদ্ধে তারা জয়লাভ করেছে, আবার কতকগুলো যুদ্ধে তারা পরাস্ত হয়েছে। তেজোদীপ্ত এই বিজয় এবং সংকটপূর্ণ বিপর্যয়গুলো আমাদের অতীতকে যথাযথভাবে জানতে এবং উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

অতীতের উপর ভিত্তি করেই মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গড়ে উঠে। সে কারণেই আমাদের অতীত সম্পর্কে জানতে হবে এবং অতীত থেকেই নিতে হবে ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা। বস্তুতপক্ষে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই পুস্তকটি রচিত হল। অবশ্য এই পুস্তকের অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে। তবু বিশ্বাস, আমার এই সীমিত প্রয়াস অন্যদেরকেও ইসলামের সামরিক ইতিহাস সম্পর্কে আরো ব্যাপক ও গভীর আলোচনায় উৎসাহ যোগাবে।

প্রধানত, সাধারণ পাঠকের জন্যই পুস্তকটি রচিত। এই কারণে আমি অ-সামরিক শব্দ ব্যবহার করেছি। তবে পেশাগত সৈনিকরাও এই পুস্তকটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। ইতিহাসের জ্ঞাত তথ্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করা হয়নি। বিপক্ষের সেনানায়ক বা সামরিক পদ্ধতিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও প্রশংসা করেছি। যুদ্ধে কৌশলগত বিষয়ে সাধারণ পাঠকের তেমন একটা আগ্রহ না থাকারই কথা। তাই কৌশলগত বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ বাদ দেয়া হয়েছে। একজন পেশাদার যোদ্ধা 'যুদ্ধ নীতির' মাধ্যমে একটি যুদ্ধকে পরিমাপ বা মূল্যায়ন করে থাকেন। এই যুদ্ধ রীতিগুলো খুবই সূক্ষ্ম এবং সুনির্দিষ্ট; বলা যেতে পারে বেশ টেকনিক্যাল। একজন সাধারণ পাঠক টেকনিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের আচরণ বিচার করেন না। এ ব্যাপারে তার সময় ও আগ্রহ বা প্রশিক্ষণ না থাকারই কথা। তবু যে উপাদানগুলো যুদ্ধের ফলাফলকে অনেকখানি প্রভাবিত করে থাকে, সে বিষয়গুলো 'যুদ্ধে যা ঘটে' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তা সাধারণ পাঠককে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

এই পুস্তকে ১৪টি যুদ্ধ স্থান পেয়েছে। যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম আট শতাব্দীর মধ্যে। এই সময়ে যেমন বিভিন্ন জনপদে এবং সামরিক ঘাঁটিতে মুসলমানদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে, তেমনিভাবে স্পেন এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে আরব শক্তির পতন ঘটেছে। আট শতাব্দীর মধ্যে দীর্ঘ তিন শতাব্দী কেটেছে খ্রিস্টান জগত এবং মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধটি চিহ্নিত হয়েছে 'ক্রুসেড' হিসেবে। এই সময়ের শেষের দিকে একান্ত আকস্মিকভাবেই ধর্মান্তরিত আরেকটি জাতির উদ্ভব ঘটে। পশ্চিমে

আরব মুসলমানদের যখন পতন ঘটে, সদ্য ধর্মান্তরিত এই মুসলমান জনগোষ্ঠী তখন পূর্ব ইউরোপ এবং ভারতে ইসলামের ঝাণ্ডাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মুসলমানদের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় অধ্যায় যা এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনেক যুদ্ধ বা অভিযানের কাহিনী এই পুস্তকে স্থান পায়নি। ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় তন্মধ্যে অন্যতম। এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যে যুদ্ধগুলো সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, যে যুদ্ধগুলোর কৌশলগত বিষয় বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে-কেবলমাত্র সেই যুদ্ধগুলোই এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, এই পুস্তককে কোনক্রমেই মুসলমানদের যুদ্ধের ইতিহাস বলা যাবে না। বরং যে যুদ্ধগুলো জিহাদের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইতিহাসের গতিধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, কেবল সে যুদ্ধগুলোই এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৫২ সাল থেকেই এ ধরনের একটি পুস্তক রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করি। কিন্তু মৌলিক এবং গবেষণাধর্মী পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে কাজের গতি ছিল ধীর-মন্থর। অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, অন্যান্য ঐতিহাসিকের ন্যায় মুসলিম ঐতিহাসিকগণও যুদ্ধকে মোটামুটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বলতে গেলে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি আগাগোড়া অবহেলিত রয়ে গেছে। বিদেশে অবশ্য এসব বিষয়ের উপর গবেষণামূলক এবং তথ্যসমৃদ্ধ বেশ কিছু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও রয়েছে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে জানতে হলে এই বইগুলো ভাষান্তরের মাধ্যমে সহজলভ্য করা আবশ্যক। অন্তত গবেষক এবং আগ্রহী পাঠকগণের জন্য ইসলামের ইতিহাস, বিশেষ করে মুসলমানদের সামরিক ইতিহাস সম্পর্কিত বইগুলো রেফারেন্স লাইব্রেরীতে মজুদ রাখা উচিত।

এই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে মেজর জেনারেল নওজিশ আলী এইচ. জে. এম. সি. বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধ প্রান্তর, ওয়াকুসার ম্যাপটি তাঁর নিকট থেকেই পেয়েছি। আমি তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কাদিসিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য এবং একটি ম্যাপ সরবরাহ করার জন্যে পাকিস্তানস্থ ইরাকী রাষ্ট্রদূতকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার পুত্র দশম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপটেন শহীদ কোরেশীকে। তাঁর অবিরাম উৎসাহ অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে সাহায্য করেছে।

লাহোর — **এম. এম. কোরেশী**

১ জুন, ১৯৭০ — লেঃ কর্নেল (অবঃ)

সূচিপত্র

মানচিত্র ও নকশা

যুদ্ধে যা ঘটে

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো দিয়েই যুদ্ধ চলে। বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে এই আবিষ্কারগুলো ব্যবহার করে। প্রয়োগ করে নানা পদ্ধতিতে। দিনে দিনে উন্নততর হচ্ছে যুদ্ধের মান এবং কলা কৌশলগুলো। তবু যুদ্ধকে কোন ক্রমেই একটি বিজ্ঞান অথবা কলা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। বরং বলা যেতে পারে, যুদ্ধ হল চরম প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির মধ্যে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ। যুদ্ধের ফলাফল মূলত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত বিবদমান শক্তিসমূহের অস্ত্রসম্ভার এবং সংগঠন, দ্বিতীয়ত সৈন্যসংখ্যা এবং তাদের গুণগত মান অথবা প্রশিক্ষণ, তৃতীয়ত বিবদমান বাহিনীর অধিনায়কগণের নেতৃত্বশৈলী, চতুর্থত যুদ্ধে লিপ্ত বাহিনীর অদৃষ্ট বা তকদীর।

উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র যে কোন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর কারণও স্পষ্ট। উন্নতমানের অস্ত্র দিয়ে যে কোন বাহিনী বিরোধী পক্ষের উপর সহজেই বড় রকমের আঘাত হানতে পারে। আরবদের কনস্টানটিনোপল অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার পশ্চাতেও ছিল এই একই কারণ। এই সময় প্রতিপক্ষ রোমান বাহিনীর হাতে ছিল মারাত্মক সব মারণাস্ত্র এবং গোলা বারুদ। আরবদের কাছে এ সব অস্ত্রের ব্যবহার বা নির্মাণশৈলী ছিল সম্পূর্ণরূপে অজানা। অবশ্য একথা সত্য যে, উন্নতমানের গোলাবারুদ থাকলেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। সেনাবাহিনীর সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গটিও এখানে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একটি বাহিনীর সংগঠন যত মজবুত ও সুসংহত হবে, সে বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যসামন্ত পরিচালনা করার ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা থাকবে তত বেশী। পক্ষান্তরে একটি বাহিনী সুসংগঠিত না হলে তার রসদ সম্ভার যথাযথ এবং পুরোপুরিভাবে ব্যবহারের সম্ভাবনাও থাকবে সীমিত।

যুদ্ধের ময়দানে গোলা বারুদ এবং অস্ত্র-শস্ত্রের যতটুকু প্রয়োজন, সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী। এর গুরুত্ব ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। রক্তক্ষয়ী কোন যুদ্ধে একটি বাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অথবা বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হলেই তার পরাজয় ঘটে না। বরং একটি বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে যখন এ ধারণার জন্ম নেয় যে, তার প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, যুদ্ধের উপলক্ষ নিয়ে তাদের মনে জেগে উঠে প্রশ্ন অথবা চরম আত্মত্যাগের ব্যাপারে দেখা দেয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তখনই তাদের প্রকৃত পরাজয় ঘটে। বিবদমান দুটি শক্তির অস্ত্র-শস্ত্র এবং অত্যাবশ্যকীয়

আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো সমমানের থাকলে যুদ্ধের ফলাফল প্রধানত বাহিনীর গুণগত মানের উপর নির্ভর করে। দেখা যায় যে, একটি বাহিনীর গুণগত মানের মুকাবিলায় বিরোধী পক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্য হয়ে পড়ে একান্ত নিষ্প্রভ এবং বিপর্যস্ত। প্রথম যুগের মুসলমানগণের ইতিহাস থেকেই তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর মেলে। তৎকালীন সময়ে বিশাল বাহিনীর মুকাবিলায় ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর বিজয় ছিল একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। একজন সৈনিকের গুণগত মান মূলত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে।

(ক) যে জন্য যুদ্ধের আয়োজন তার অন্তর্নিহিত উপলক্ষের প্রতি তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা;

(খ) অধিনায়কগণের দক্ষতা এবং আন্তরিকতার উপর তার বিশ্বাস ও আস্থা;

(গ) তার শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি; এবং

(ঘ) প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও অবস্থা।

এর পরেই আসে যুদ্ধে লিপ্ত বাহিনীর যিনি প্রধান তার অধিনায়কত্বের কথা। বিজয় লাভের জন্য অন্যান্য সমস্ত সহায়ক উপকরণের মধ্যে সম্ভবত অধিনায়কের ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভবন তৈরীর জন্য প্রয়োজন সুরকি, বালু ও মাটি। কিন্তু এগুলোর যথাযথ মিশ্রণ এবং প্রয়োগের জন্য চাই একজন অভিজ্ঞ নির্মাতা। নির্মাতার অভাবে এসব কিছুই অকেজো এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত অথবা বিপুল রসদ সম্ভার থাকলেই বিজয় নিশ্চিত হয় না। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সেনানায়কের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। যোগ্য অধিনায়কের অভাবে যেমন একটি বাহিনীর বিপর্যস্ত এবং পরাভূত হওয়ার সমূহ আশংকা থাকে, তেমনি একজন সফল অধিনায়কের নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনীও সীমিত রসদ নিয়ে অভাবিত বিজয় অর্জন করতে পারে। একজন উত্তম অধিনায়ক তাঁর সৈন্য ও অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু সাধারণ গুণ সম্পন্ন একজন অধিনায়ক তাঁর সম্পদকে অসংগতভাবে ব্যবহার করেন অথবা তিনি তা অন্যায়ভাবে ব্যবহারের জন্যও দোষী বিবেচিত হতে পারেন। ক্ষিপ্রতা এবং বলিষ্ঠতা একজন যোগ্য সেনানায়কের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের কলা কৌশল এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি থাকবে তার নখদর্পণে। অটল বিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রস্তুতি নিয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়নে তিনি থাকবেন সচেষ্ট। ভয়ভীতি অথবা বিপদের আশংকা কখনও তাঁকে সন্ত্রস্ত করে না। সুচিন্তিত ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে তার মনোবল থাকে অটল ও অনড়। শত্রুপক্ষকে তিনি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে দেখেন। কিন্তু সেনাপতি কখনও কোন ব্যাপারে অনমনীয় থাকতে পারে না। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে হতে হয় সচেতন এবং পারদর্শী। তাঁর উদ্যম এবং উদ্যোগে কখনও ভাটা পড়ে না। আক্রমণ পরিচালনার

ব্যাপারে তিনি থাকেন কঠোর এবং আক্রমণ প্রতিহত করার সময় থাকেন দুর্দমনীয়। সাধারণ সৈন্যরা তাকে ভাল না বাসলেও তাঁর অধিনায়কত্বে তাদের অবিচল আস্থা থাকে।

কেবল অগণিত সৈন্য-সামন্ত, বিপুল পরিমাণ রসদ সম্ভার এবং যোগ্য অধিনায়ক থাকলেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। তকদীর বা অদৃষ্টের উপর যুদ্ধের ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে। কখনও কখনও যুদ্ধের ময়দানে চরম সংকট মুহূর্তে এমন সব অপ্রত্যাশিত এবং নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে যায়, যা যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেয়। এক পক্ষকে দারুণ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় এবং অপর পক্ষ লাভ করে বিজয়ের গৌরব। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে ঘটেছিল এমনি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কোরেশদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের উপর বড় রকমের চাপ সৃষ্টি করে। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত মুহাম্মদ (সা) তখন এক মুঠো পাথর কণা শত্রুপক্ষের দিকে ছুঁড়ে মারেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ধূলি ঝড়। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। তারা কিছু দেখতে পায় না। চোখ মেলে তাকাতেও পারে না। তারা ঢাল-তলোয়ার বর্শা চালাতে ব্যর্থ হয়। ফলে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের হাতে বিপর্যস্ত হয় শক্তিশালী কোরেশ বাহিনী। তওহীদবাদী মুসলমানদের কাছে এই সুপরিচালিত ধূলি ঝড় ছিল একটি মুজিজা। যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে তকদীর যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামরিক ইতিহাসে তার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। বদর প্রান্তরের এই কাহিনী একক এবং বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। পারসিকদের বিরুদ্ধে কাদেসিয়ার যুদ্ধেও ঘটেছিল এমনি ঘটনা। একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর এসে লাগল আবদুর রহমান বালাত আল শুহাদা-এর গায়ে। সেই তীরের আঘাতেই তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। তার পরই পশ্চাদপসরণ করল মুসলিম বাহিনী। অথচ আগে পরে কখনই শত্রুপক্ষ মুসলমানদের উপর অপ্রতিরোধ্য কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য একথা সত্য যে, অধিনায়কত্বের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সুযোগের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যোগ্য অধিনায়কত্ব যেমনিভাবে অপ্রত্যাশিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে, তেমনিভাবে অদৃষ্টের নির্মমতাকে মুকাবিলা করতে পারে সাহসিকতার সঙ্গে। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধের ময়দানে অধিনায়কের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে যুদ্ধের জয়-পরাজয়, সফলতা ও ব্যর্থতা।

জিহাদের আইন

ইসলাম ও বহু দেববাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের প্রয়াস হল জিহাদ। এর আক্ষরিক অর্থ হল "সাধ্যানুসারে চেষ্টা"। জিহাদ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

ক. অন্তরের জিহাদ ঃ অন্তরের সংশোধন বা আত্মশুদ্ধির জিহাদ। এ ধরনের জিহাদকেই বলা হয় শ্রেষ্ঠ জিহাদ অথবা জিহাদে আকবর।

খ. মুখের জিহাদ ঃ যুক্তিনির্ভর বক্তব্য এর অন্তর্ভুক্ত। এই জিহাদের ধারা মোটামুটি দুটি। প্রথমত, জনগণকে সত্য পথ ও মত গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা। দ্বিতীয়ত, মিথ্যা অথবা বাতিল পথ বা কাজ থেকে লোকজনকে বিরত রাখা। রসূল (সা) এ ধরনের জিহাদের ব্যাপারেই ছিলেন বেশী আগ্রহী। বল প্রয়োগ অথবা সংঘর্ষের চেয়ে তিনি এ ধরনের জিহাদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতেন।

গ. হাতের জিহাদ ঃ হাতের জিহাদ বলতে বল প্রয়োগ বা জোর করে কাউকে কিছু করতে বাধ্য করা বোঝায়। এই জিহাদের মূল কথা হল সত্যের সমর্থনে এবং মিথ্যার প্রতিরোধে উৎপীড়ন না করে প্রয়োজনবোধে শারীরিক শক্তিপ্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. অস্ত্রের জিহাদ ঃ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যুদ্ধই হল মানুষের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার চূড়ান্ত উপায়। এমন কতকগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে অস্ত্র ধারণ ব্যতীত অসৎশক্তির মুকাবিলা অথবা মিথ্যার প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বাস্তববাদী ধর্ম ইসলামে অনুমোদন রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বর্তমান পুস্তকে প্রধানত অস্ত্রের জিহাদ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

জিহাদ ছাড়া ইসলাম সব ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহকে বাতিল করে দিয়েছে। কোন যুদ্ধের মূলে যখন থাকে ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি এবং এই যুদ্ধ যদি ইসলাম অনুমোদিত বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, কেবল তখনই সেই যুদ্ধকে জিহাদ বলা যাবে। এর বাইরে অন্য কোন প্রকার মারামারি বা যুদ্ধের অনুমোদন ইসলামে নেই। ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত জিহাদকেই ইসলাম অনুমোদন করে এবং একটি যুদ্ধকে তখনই জিহাদ বলা যাবে যখন তা দুটি শর্ত পূরণ করে।

ক. যুদ্ধের মূল লক্ষ্য হবে ফিতনার অপনোদন। 'ফিতনা' বলতে এমন একটি অরাজক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে বোঝাবে যেখানে মানুষ উৎপীড়িত, নিগৃহীত।

তারা বঞ্চিত তাদের মৌলিক অধিকার থেকে, বিশেষ করে মুসলমানরা ধর্ম প্রচার করতে পারছে না, এমন কি তারা পারছে না ইসলামী জিন্দেগী পরিচালনার অবাধ অধিকার।

খ. আত্মপ্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতা দখল, শত্রুর এলাকা দখল, শত্রুর সম্পত্তি লাভ, পার্থিব কোন সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশা অথবা প্রতিশোধ স্পৃহার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না। এমন কি অমুসলিমদের মুসলমান বানানোর মনোবাঞ্ছা নিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না।

যে কোন জিহাদই অবিশ্বাস্য রকমের ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে জিহাদীকে নিদারুণ কায়ক্লেশ, দুঃসহ অনটন, এমন কি জীবনের হুমকিকে সাদরে গ্রহণ করতে হয়। এবং সে কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মরতবা এবং মর্যাদা খুবই উঁচুতে। রাসূল (সা) বলেন, জিহাদ হল ঈমানের সর্বোচ্চ ধারা। তিনি আরও বলেন, 'তলোয়ারের ছায়ার তলে রয়েছে বেহেশত।' জিহাদ যেহেতু একান্তই ফি সাবিলিল্লাহর দ্বারা পরিচালিত হয়, সে জন্য ইসলাম জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের কঠোর আত্মসংযম এবং আত্মত্যাগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই ত্যাগ এবং সংযম হবে শারীরিক এবং আত্মিক। জিহাদের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে রাসূল (সা) বলেন "প্রত্যেক জাতির সন্ন্যাস ধর্ম আছে, মুসলমান জাতির সন্ন্যাস ধর্ম হল জিহাদ।"

সুন্নী বিধান মতে জিহাদ ফরযে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত। এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর রয়েছে জিহাদের দায়িত্ব। অধিক সংখ্যক মুসলমান যদি এই পবিত্র দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করে, তাহলে অন্যরা জিহাদের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। অপর দিকে জিহাদের দায়িত্ব মোটেই প্রতিপালিত না হলে গোটা সম্প্রদায় সমষ্টিগতভাবে অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধ পরিচালনার সাথে যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার জড়িত, সেইহেতু জাগতিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিই যুদ্ধের আহবান জানাতে পারে। সুন্নী বিধান মতে খলিফা হলেন ইমাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান। কেবল তিনিই মুসলমানদের জিহাদের ডাক দিবেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অংশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অবস্থা দাঁড়াবে অন্য রকম। তখন সকল মুসলমানদের সম্মিলিত এবং তাৎক্ষণিকভাবে আগ্রাসী শক্তির মুকাবিলা করতে হবে। আরবী পরিভাষায় এ ধরনের জিহাদকে বলা হয় 'রিবাত'। খিলাফতের অবসানের সাথে সাথে জিহাদের আহবান জানানোর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নেই- এমন কথাও বলা যাবে না। বরং খিলাফতের অনুপস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তার উপর এসে গেছে এই পবিত্র দায়িত্ব। তিনি মুসলমানদের জিহাদের জন্য আহবান জানাবেন। একটি রাষ্ট্র যখন ইসলামী বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে তখনই সে রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেয়া যাবে।

জিহাদের ব্যাপারে শিয়া এবং সুন্নী আইন মোটামুটি একই ধরনের। তবু জিহাদের ব্যাপারে শিয়াদের খানিকটা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তারা জিহাদে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতাকে ইমামের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফেলেছেন। অর্থাৎ শিয়া বিধান মতে, ইমামের প্রতি যে সব মুসলমানের আনুগত্য নেই তাদের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ অর্থহীন। কারণ, এই বিধানমতে ইমামের প্রতি আনুগত্যহীন জিহাদ দ্বারা ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না। কখন জিহাদের ডাক দিতে হবে অথবা জিহাদ বন্ধ করতে হবে তা বিচার-বিবেচনার অধিকার এবং ক্ষমতা একমাত্র ইমামের আছে, অন্য কারো নয়। শিয়া মতবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জিহাদের ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরাজ করছে চরম শূন্যতা। ৮৭৪ সালে দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ ইবনে হাসান আলী আসকারীর ইন্তেকালের পর থেকেই শুরু হয়েছে এই অবস্থার। খিলাফতের অবসানের পর সুন্নী মুসলমানগণ যে অবস্থায় নিপতিত হলেন, শিয়া মুসলমানগণের অবস্থাও দাঁড়ালো ঠিক তাই। ইমামের অনুপস্থিতিতে ইমামের প্রতিনিধি হিসাবে মুজতাহিদগণ অবশ্য জিহাদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের যোগ্যতার ব্যাপারেও রয়েছে বিস্তর মতপার্থক্য। তবে অধিকাংশের ধারণা যেহেতু জিহাদের আহবান গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে মস্তবড় একটা ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়, সে কারণেই জিহাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার এককভাবে ইমামের জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত। কারণ শিয়া মতানুসারে ইমামের অভ্রান্ত এবং অকাট্য সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তাছাড়া শিয়াদের মধ্যে এমন একটি ধারণাও বদ্ধমূল রয়েছে যে, ইমামের অনুপস্থিতিতে সফলতার সঙ্গে অন্যায়ের মুকাবিলা করা একটি অসম্ভব ব্যাপার এবং শেষ ইমামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত জিহাদের ডাক দেয়া তাই একান্তই অর্থহীন এবং অযৌক্তিক। অবশ্য জায়েদী শিয়াদের মতানুসারে জিহাদ একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান। তাদের মতে ইমামও চলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং নির্বাচনের মাধ্যমে যিনি ইমাম হবেন তিনি জিহাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার রাখেন। কিন্তু শিয়া অধ্যুষিত ইয়েমেনকে ইমামত হিসাবে প্রতিষ্ঠা না করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয়ায় এখানেও বিরাজ করছে মস্তবড় শূন্যতা। সুন্নী মুসলমানগণ যে অবস্থায় আছেন, জায়েদী শিয়াগণও দাঁড়িয়েছেন ঠিক সে অবস্থায়।

খারিজীদের মতে জিহাদ ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যক্তি এবং সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য ইহা ফরয। নামায-রোযা প্রতিপালনের ব্যাপারে যেমন মুসলমানদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তেমনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে। তাদের মধ্যে খলিফা অথবা ইমাম আছেন কি নেই, অথবা কতজন আছেন সে প্রসঙ্গ একান্তই অবান্তর। জিহাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং জিহাদের গুরুত্ব এবং আবশ্যকীয়তা আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি

আছে। খারিজীগণ অবশ্য মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং বিধিবিধান প্রতিপালনের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে খিলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে খিলাফতের তেমন কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই।

কুরআন এবং হাদীসে জিহাদ সম্পর্কে বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সেই বর্ণনাগুলো প্রধানত জিহাদের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সুন্নী শাস্ত্রবিদগণ জিহাদের বিস্তারিত নিয়মনীতি এবং বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। রসূলের (সা) আমলে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইসলামের ইতিহাসের সুমহান চার খলিফা, উমাইয়্যা এবং আব্বাসীয় খলিফাগণের আমলে সংঘটিত যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে সামনে রেখেই তাঁরা এই নিয়ম-নীতিগুলো তৈরী করেন। অনুরূপভাবে শিয়া-খারিজী এবং অন্যান্য মতাবলম্বীও নিজেদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জিহাদ সম্পর্কিত আইন-কানুনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ মুসলমান শাস্ত্রবিদগণ জনবসতিকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। দারুল ইসলাম, দারুল হরব এবং দারুল আহাদ। যে অঞ্চলে ইসলামী আইন-কানুন ও বিধিবিধান কার্যকর রয়েছে সেটা দারুল ইসলাম। দারুল হরব এর ঠিক উল্টো। এখানে ইসলামী আইন-কানুন এবং বিধিবিধান পালিত হয় না। দারুল আহাদ বলতে এমন অঞ্চলকে বোঝায় যা সামগ্রিকভাবে দারুল হরব-এর মত নয়। কিন্তু দারুল হরবের অনেক বৈশিষ্ট্য সেখানে বিরাজমান। একটি অঞ্চলকে তখনই দারুল আহাদ বলে চিহ্নিত করা যায় যখন সে অঞ্চলের সঙ্গে দারুল ইসলামের শর্তসাপেক্ষে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া যে অঞ্চল ফিতনা থেকে মুক্ত এবং দারুল ইসলামের প্রতি যার আচরণ খুবই বন্ধুসুলভ সেই অঞ্চলই দারুল আহাদ বলে চিহ্নিত।

জিহাদের মূল কথা হল সকল প্রকার ফিতনার অপনোদন। এবং সে কারণেই যে কোন ফিতনা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যায়।

ক. সে কোন অঞ্চলের বাসিন্দা অথবা কোন ধর্মে বিশ্বাস করে সে প্রশ্ন এখানে একেবারেই গৌণ। দারুল হরবে যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার চলে এবং উৎপীড়িত মুসলমান জনগোষ্ঠী দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অবকাশ না পায় তখন তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জিহাদ ঘোষণা করা যায়।

খ. এমনকি দারুল আহাদ বলে চিহ্নিত অঞ্চলগুলোতে উৎপীড়ন অবস্থা বিরাজ করলে তার বিরুদ্ধেও জিহাদ করা ইসলামী শরীয়ত মতে বৈধ। কিন্তু দারুল আহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার পূর্বে দারুল ইসলামের সঙ্গে তার সম্পাদিত সমুদয় চুক্তি বাতিল করার কথা জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে।

গ. তাছাড়া দারুল হরব অথবা দারুল আহাদ-এর লোকেরা দারুল ইসলাম অবরোধের পাঁয়তারা করলে তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করার হুকুম রয়েছে।

ঘ. কখনও কখনও এমন হতে পারে যে, দারুল ইসলামের কোন জনগোষ্ঠী স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অথবা বিরাট কোন মতপার্থক্যের কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অস্বীকার করল, বিদ্রোহ ঘোষণা করল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা কোন জনগোষ্ঠী দেশময় সৃষ্টি করল বড় রকমের কোন অরাজকতা তখন তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ ঘোষণা করা যাবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র দারুল হরব নয়, 'দারুল ইসলামে'ও চলতে পারে জিহাদী তৎপরতা।

ঙ. অন্যান্য যে সব ধর্মাবলম্বী[১] জিম্মী[২] হিসাবে দারুল ইসলামে বসবাস করছে, জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, অথবা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না। কিন্তু তারা যদি সমষ্টিগতভাবে চুক্তিবদ্ধ দায়দায়িত্বগুলো প্রত্যাখ্যান করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে অস্বীকার করে তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা বৈধ।

অত্যাচারী অমুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে মুসলমানদের নীতি ও বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। হয় তাদের ইসলাম ধর্ম কবুল করে মুসলমানদের কাতারে শামিল হতে হবে নতুবা খোলা তলোয়ার হাতে নামতে হবে যুদ্ধের ময়দানে এবং সেখানেই হবে তাদের বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত ফয়সালা। কিন্তু কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসীদের জন্য একটি অতিরিক্ত বিকল্প রয়েছে। তারা জিযিয়া প্রদান করে নিশ্চিন্তে আপোস রফায় পৌঁছাতে পারে। এই জিযিয়া হল এক ধরনের খাজনা বা কর, যা মূলত আত্মসমর্পণের প্রতীক। কিন্তু তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে অথবা জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে উভয় শ্রেণীর লোকেরাই মুসলিম বাহিনীর শত্রু বলে চিহ্নিত হবে এবং তারা গনীমত আইনের আওতায় এসে যাবে।

দারুল ইসলাম বলে চিহ্নিত অঞ্চলেও এমন কিছু লোক থাকতে পারে যারা ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান এই যে তওবা করে আবার তাদের ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে। নতুবা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু তাদের যুদ্ধবন্দী করা যাবে না। অথবা তাদের বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বিধানও ইসলামে নেই। অবশ্য যারা যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ করবে তাদের সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। ধর্মত্যাগীদের মধ্যে যারা বন্দী হবে ইচ্ছে করলে তারা নতুন করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে। অন্যথায় ইসলামী বিধানমতে তাদের বিচার ও শাস্তি হবে।

যদি দেখা যায় যে, দারুল ইসলামের মধ্যে স্বধর্মত্যাগীদের সংখ্যা খুবই কম এবং বড় রকমের কোন ঝুঁকি ছাড়াই তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা কোন বিদ্রোহ এবং বিসংবাদ সৃষ্টি করছে না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক না দেয়াই সমীচীন। বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা যাবে না।

অথবা যুদ্ধ-সম্পদ হিসাবে তাদের বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা অনুচিত। আত্মসমর্পণের পর তাদের অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুই ফিরিয়ে দিতে হবে। জিহাদ সম্পর্কে এই বিধানগুলো মূলত ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর সংযোজন। খারিজী বিদ্রোহ প্রতিরোধের সময় তিনি তাদের প্রতি ঠিক এ ধরনের আচরণ করেছিলেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের যেসব দস্যু, স্বধর্মত্যাগী ও দুষ্কৃতিকারী দারুল ইসলামে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের কঠোর হস্তে প্রতিরোধ এবং কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে। অবশ্য সরকার প্রধান ইচ্ছা করলে দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি অতটা কঠোর নাও হতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকারীদের জীবন বৃত্তান্ত, ব্যক্তি জীবন এবং অপরাধের গুরুত্বকে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

জিহাদে অংশগ্রহণকারীর যোগ্যতা- সকল মুসলমানের পক্ষে সক্রিয়ভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বস্তুতপক্ষে এমনটি আশাও করা যায় না। তাছাড়া একটি জনগোষ্ঠীর সকলেই জিহাদে অংশ নিলে তাদের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকভাবেই নেমে আসবে চরম অচলাবস্থা। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিই জিহাদে অংশগ্রহণ করার যোগ্য।

ক. জিহাদে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ এবং মিত্র হিসাবে অমুসলিমদেরকেও জিহাদে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তারা জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবে এবং গনীমতের মালে পাবে ন্যায্য অংশ।

খ. জিহাদীকে হতে হবে পূর্ণ বয়স্ক, শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মনের দিক থেকে সতেজ ও সবল পুরুষ। যারা শিশু এবং উন্মাদ, যারা শারীরিকভাবে দুর্বল ও পঙ্গু, যারা রুগ্ন ও অসুস্থ তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের অবশ্য জিহাদে যোগ দেয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ হবে পরোক্ষ এবং জিহাদী ব্যক্তিদের সাহায্যকারী হিসাবে। তারা প্রধানত রুগ্ন এবং আহতদের সেবা যত্ন করবে।

গ. আর্থিক দিক থেকে জিহাদী ব্যক্তিকে হতে হবে সচ্ছল। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিহাদে যাওয়ার অনুমতি নেই। বস্তুতপক্ষে সে কারণেই একজন দাস অথবা কেনা গোলাম জিহাদে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত।

ঘ. ফি সাবিলিল্লাহর মনোভাব এবং একটি মহৎ চিন্তা নিয়ে একজন মুসলমানকে জিহাদে অংশ নিতে হবে। মনের কোন ক্ষুদ্রতম দুরভিসন্ধি বা অসৎ চিন্তা থাকতে পারবে না। কেউ যদি এই নীতির প্রতি অটল থাকতে ব্যর্থ হয় এবং কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে মনের কোণে জেগে উঠে অসৎ চিন্তা তখন তার এই অংশগ্রহণকে জিহাদ বলা যাবে না।

৬. জিহাদী ব্যক্তিকে আরও কতগুলো দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে থাকতে হবে খুবই সচেতন এবং যত্নবান। অধিনায়কের প্রতি তার আনুগত্য থাকবে পূর্ণমাত্রায়। গনীমতের মাল বন্টন এবং যুদ্ধের ব্যাপারে সকল সিদ্ধান্তকে সে মেনে নিবে নিঃসংকোচে। ইচ্ছে হল আর কর্মে বিরতি টানল এমন আচরণ জিহাদীর জন্য একান্তই বেমানান। তাকে হতে হবে সৎ এবং স্পষ্টবাদী। যে কোন রকম নির্দয় আচরণ এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, জিহাদী ব্যক্তি যদি বিপক্ষের কাউকে আশ্রয় অথবা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় তাহলে তাকে অবশ্যই তা যথাসাধ্য পালন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সে কাউকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ করতে পারবে না। এমনকি জিহাদী ব্যক্তি যদি শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয় এবং পালিয়ে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে প্যারোলে[৩] ছাড়া পায় তাহলে তাকে অবশ্যই তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে অক্ষরে অক্ষরে।

আদেশ পদ্ধতি ঃ সামরিক আদেশ দুই ধরনের-বিশেষ এবং সাধারণ। যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ একান্তই সামরিক বিষয় সম্পর্কিত সেগুলোকে বলে বিশেষ আদেশ। কিন্তু বিপক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা প্রভৃতি বিষয় সাধারণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত। চুক্তি পত্রগুলো অবশ্যই খলিফার অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদন করতে হবে।

জিহাদের রীতি ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম মানুষের একটি অনিবার্য কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং জিহাদের আইনকে একটা ব্যাপক কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে যুদ্ধকে আইনসিদ্ধ ও মানবধর্মী করার প্রয়াস পেয়েছে। ইসলাম এমন এক সময়ে এই নিয়ম নীতিগুলো তৈরী করে, যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিয়ন্ত্রণহীন অন্যায় ও নৃশংসতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধ কোন একক এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক দল, অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাছাড়া যুদ্ধ সংক্রান্ত নিয়ম কানুনগুলোর সফল বাস্তবায়ন মূলত বিবদমান দলগুলোর পারস্পরিক সম্মতির উপর নির্ভর করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবদমান দলগুলোকে কখনও একটি সমঝোতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সর্বপ্রথম ইসলামই এই সমস্যাকে বিবেচনায় এনে অসহায়ের মত নিশ্চুপ থাকেনি এবং এটাই ইসলামের কৃতিত্ব। অমুসলিম শত্রুর নৃশংস যুদ্ধনীতি[৪] নির্বিশেষে মুসলমানদের মানবধর্মী যুদ্ধের আইন মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানবতা ও ন্যায্য ব্যবহারের স্বার্থে জিহাদের আইনে ইসলাম শুধু একক সুবিধাই প্রদান করেছে।

শত্রুর উপর চড়াও হওয়ার ব্যাপারেও ইসলামে রয়েছে কতগুলো স্পষ্ট নিয়ম পদ্ধতি। আক্রমণ পরিচালনার পূর্বে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। কোন রকম রক্তপাত বা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই বিবাদের সহজ সমাধান বের করার জন্য

সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আলোচনা এবং আপোস রফার উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বিবদমান পক্ষকে চরম পত্র দিতে হবে। ইসলামের বিধান মতে চরম পত্র[৫] প্রদানের পরও শত্রুপক্ষ আনুপূর্বিক বিষয় বিবেচনা করে দেখার জন্য কমপক্ষে তিন দিন সময় পাবে। এর পরও সন্তোষজনক সাড়া না পেলেই আসবে প্রত্যক্ষ আক্রমণের পালা।

স্মরণ রাখতে হবে যে, ফিতনা এবং অত্যাচারীর উৎপীড়ন বন্ধ করাই হল জিহাদের উদ্দেশ্য। এর অর্থ হল, শত্রুর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার মত মনোবল ও শক্তি বা পুনরায় অত্যাচার নির্যাতন শুরু করার প্রয়াসকে নস্যাৎ করে দেওয়া। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান এই যে ঃ

ক. যে মুহূর্তে শত্রুসেনারা মুসলিম বাহিনীর দেয়া শর্তগুলো গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করবে, মেনে নেবে মুসলমানদের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে-ঠিক তখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। হতে পারে যে সুযোগ পেলেই শত্রুপক্ষ আবারো হাতে তুলে নেবে হাতিয়ার, নতুন করে শুরু করবে নির্যাতন-নিষ্পেষণ। এমনও হতে পারে যে মুসলমানদের দেয়া শর্তগুলো মেনে নেওয়ার ব্যাপারটিও একটি ভাওতাবাজি মাত্র। তবুও এই সন্দেহের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে রীতি সিদ্ধ নয়। এমন কি শত্রুপক্ষের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্য পীড়াপীড়ি করাটাও ইসলাম সমর্থন করে না।

খ. যুদ্ধকে উপলক্ষ করে অকারণে মানুষজন অথবা বিষয়-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ইসলাম অনুমোদন করে না। অবশ্য বিজয় লাভের জন্য যতটুকু না করলেই নয়, কেবলমাত্র ততটুকু ক্ষয়ক্ষতি করার অনুমোদন রয়েছে। তাই বলে অবলা নারী, নিষ্পাপ শিশু, অসমর্থ বৃদ্ধ যাজক বা সন্ন্যাসী, নিরীহ কৃষক-শ্রমিক জনতাকে কোনভাবেই অপমান বা উৎপীড়ন করা যাবে না। প্রতিহিংসা অথবা ঈর্ষার[৬] কারণে শত্রুপক্ষের বাগ-বাগিচা বিনষ্ট করা অথবা গৃহপালিত পশু-পাখী হত্যা করা নিষিদ্ধ। এমনকি শত্রুর মৃতদেহের কোঁন রকম অবমাননা বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারেও রয়েছে কঠোর বিধি-নিষেধ।

গ. শত্রুর উপর প্রতিষ্ঠা এবং বিজয় লাভের জন্য অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন ধরনের রণকৌশল এবং চাতুরীর আশ্রয় নেয়া যায়। কিন্তু এই রণকৌশল কোন ক্রমেই বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে নেমে আসতে পারবে না।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ঃ ইসলামের প্রথম যুগে যেসব মুসলমান জিহাদে অংশ নিতেন তাঁরা নিজেরাই ঢাল-তলোয়ার এবং অস্ত্র-শস্ত্রের যোগান দিতেন। এমন কি যুদ্ধকালে সমুদয় খরচাদির দায়দায়িত্ব ছিল অংশগ্রহণকারী মুসলমান সৈনিকের উপর। বিনিময়ে তাঁরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অথবা গনীমতের মালে ন্যায্য হিস্যা পেতেন। শত্রুর উপর নিরংকুশ বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিকভাবে যা কিছু অর্জন করতেন সেটাকেই বলা হত গনীমত। গনীমত শব্দের অর্থ অবশ্য খুবই

ব্যাপক। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে যে সব নারী অথবা শিশু-কিশোর বন্দী হয় তারাও এই গনীমতের অন্তর্ভুক্ত। কোন সম্পদকে গনীমতের মাল হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য রয়েছে দুটি শর্ত।

প্রথমত এই সম্পদ যুদ্ধ বা জিহাদের মাধ্যমে অর্জন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত বাজেয়াপ্ত সম্পদকে গনীমতের মাল হিসাবে ঘোষণা দেয়ার জন্য রাষ্ট্র প্রধান অথবা ইমামের অনুমোদন লাগবে। বিনাযুদ্ধে অর্জিত শত্রু সম্পদকে গনীমত বলা যাবে না। ইসলামী পরিভাষায় তার নাম হবে 'ফাই'। তাছাড়া গনীমতের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারেও ইসলাম কখনও উৎসাহ দেয় না। বরং এই লিপ্সা নিবৃত্ত এবং সংযত করার লক্ষ্যে ইসলাম এই বিধান জারি করেছে যে, শত্রুসম্পদ দখল করার ব্যাপারে ইমামের অনুমোদন থাকতে হবে। অন্যথায় এই সম্পদ ডাকাতি অথবা চোরাই মাল হিসাবে বিবেচিত হবে।

জিহাদে বিজয় লাভের মধ্য দিয়েই শত্রুসৈন্যের বিষয়-সম্পদের উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জিহাদে যাঁরা অংশ নেবেন, যাঁদের শ্রম এবং ঝুঁকির বিনিময়ে অর্জিত হয় এই বিজয়, তাঁরাই হবেন এই গনীমত সম্পদের যোগ্য অংশীদার। যুদ্ধে বিজয় লাভের পরই গনীমত সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করতে হয়, তার পূর্বে নয়। কখনও কখনও এমন হতে পারে যে, যুদ্ধে মুসলিম শক্তি জিতে গেছে। শত্রু সম্পদ এসে গেছে মুসলমানদের হাতে। কিন্তু তখনও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে দামামা, পরস্পরের মধ্যে চলছে হামলা-প্রতিহামলা। এমনি পরিস্থিতিতে গনীমতের মালামাল বিলি বন্টন করা যাবে না। যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ভাগ-বাটোয়ারা স্থগিত থাকবে। বস্তুতপক্ষে মুসলিম বাহিনী যাতে যুদ্ধের ব্যাপারে অন্যমনস্ক হয়ে না পড়ে তাদের মধ্যে সম্পদ লাভের লালসা সৃষ্টি না হয় সেই জন্যই ইসলাম প্রবর্তন করেছে এই বিধান।

গনীমতের বিষয় সম্পদ বিলি বন্টনের ব্যাপারেও ইসলামে রয়েছে কতগুলো স্পষ্ট বিধি-বিধান। জিহাদে যাঁরা অংশ নেবেন, তাঁরা পাবেন গনীমত সম্পদের ৫ ভাগের ৪ ভাগ অর্থাৎ ৮০ শতাংশ। তদানীন্তন সময়ে যোদ্ধাদের মধ্যে ছিল দুটি দল- পদাতিক বাহিনী ও ঘোড় সওয়ার। তন্মধ্যে ঘোড় সওয়ারদের অধিকার এবং প্রাধান্য ছিল বেশী। ঘোড় সওয়ারদের তিন ভাগ দিয়ে পদাতিক বাহিনীকে এক ভাগ দেওয়া হত। অবশ্য ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে ঘোড় সওয়ারদের দুভাগ দেওয়ার নিয়ম। কুরআনের বিধান অনুসারে অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত ছিল আল্লাহ্, রাসূল (সা) এবং তাঁর নিকটাত্মীয়, দরিদ্র ও সফরকারীর জন্য। অবশ্য এই পঞ্চমাংশের বিলি বন্টনের চুলচেরা বিশ্লেষণে শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিশেষ করে রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর অংশ কে পাবেন, আল্লাহ্ পাকের নামে

বরাদ্দকৃত অংশ কিভাবে খরচ করা হবে, নিকটাত্মীয়ের মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত প্রভৃতি বিষয়ে এই মতানৈক্য বেশী।

অস্থাবর সম্পত্তি সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় স্থাবর সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর আমলেই ভূমি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট এবং সুচিন্তিত নীতিমালা প্রণীত হয়। খলিফা ওমর (রা)-এর পূর্বে ভূমি প্রশাসন সম্পর্কে তেমন কোন চিন্তা-ভাবনা হয়নি।

অবশ্য এরও একটা কারণ আছে। খলিফা ওমরের আমলে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং মিসর পর্যন্ত মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এসব এলাকার ভূখণ্ড ছিল খুবই উর্বর এবং আবাদযোগ্য। কৃষি ফসল ফলত প্রচুর পরিমাণে। জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলমান যোদ্ধাগণ অধিকৃত ভূখণ্ডকে গনীমতের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার এবং প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিলি বন্টন করে দেয়ার জন্য খলিফার নিকট সবিনয়ে অনুরোধ জানান। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর ধারণা ছিল অন্যরকম। বিষয়টি নিয়ে তিনি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং দখলকৃত জমি ভাগ-বাটোয়ারা করার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, দখলকৃত ভূখণ্ডের মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে না। জমিজমা এতদিন যাদের অধিকারে ছিল, এখনও তাদেরই অধিকারে থাকবে এবং তারাই চাষাবাদ করবে। বিনিময়ে তাদেরকে খারাজ অথবা ভূমিকর এবং জিযিয়া দিতে হবে। কেউ যাতে এই নিয়মের হেরফের করতে না পারে সেজন্য তিনি আরও একটি আইন জারি করলেন। বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান সৈন্য অধিকৃত অঞ্চলে বসতি শুরু করবে তারা নিজেদেরকে চাষাবাদের কাজে ব্যাপৃত রাখতে পারবে না।

ভূমি সংক্রান্ত এই আইন দুটি প্রবর্তন করার ফলে প্রথমত বর্তমান ও ভবিষ্যতে মুসলমানদের ভরণ-পোষণের জন্য রাষ্ট্রের আয় বেড়ে যায়। এই আয় ছিল নিয়মিত এবং স্থায়ী। দ্বিতীয়ত অধিকৃত অঞ্চলে মুসলমানদের একটি স্থায়ী রিজার্ভ বাহিনী গড়ে উঠে। স্বল্প সময়ের নোটিশে এই বাহিনীকে যুদ্ধে নিয়োগ করা যেত।

যুদ্ধবন্দী ঃ সেই প্রাচীন কাল থেকেই যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করার রীতি চলে আসছে। তারই সূত্র ধরে পারসিক, ইহুদী, খ্রিস্টান সকলেই যুদ্ধবন্দীদের উপর চালিয়েছে নিষ্ঠুর নির্যাতন ও উৎপীড়ন। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দিনের চলে আসা এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটে। ইসলাম প্রচলিত এই নিয়মের বিপক্ষে ঘোষণা করেছে নতুন নিয়ম। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বিধান এই যে-

"অতএব যখন তোমরা কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে

পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে। অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধে ইহারা অস্ত্র নামাইয়া ফেলে।" (৪৭:৪)

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুসারে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে যাদের গ্রেফতার করা হবে, কেবল তারাই যুদ্ধবন্দী[৭] হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু শত্রুপক্ষের সাধারণ জনগণ, যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শত্রু সেনাদের পরবর্তী সময়ে অকারণে বন্দী করে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বেশ কতগুলো পদক্ষেপ নিতে পারেন। অবশ্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা বর্জন করার বিষয়টি নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যুদ্ধবন্দীদের অপরাধ কতটুকু মারাত্মক তার উপর। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে–

ক. **প্রাণদণ্ড ঃ** যারা যুদ্ধাপরাধী, যাদের নামে বড় রকমের কোন অভিযোগ আছে তাদের জন্য রয়েছে প্রাণদণ্ড।

খ. **সাধারণ ক্ষমা অথবা মুক্তিপণের মাধ্যমে ক্ষমা ঃ** সাধারণ ক্ষমার আওতায় ইমাম বা সরকার প্রধান যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে তিনি মুক্তিপণ আদায়ের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পারেন। খলিফা আবূ বকর (রা) অবশ্য যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে না দিয়ে সাধারণ ক্ষমার আওতায় ছেড়ে দেওয়াকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন।

গ. **বন্দী বিনিময় ঃ** শত্রুর হাতে কোন মুসলমান বন্দী হিসাবে থাকলে খলিফা ওমর (রা) বন্দী বিনিময় কর্মসূচীর ব্যাপারে ছিলেন বেশী আগ্রহী। এই প্রচেষ্টায় শত্রুপক্ষের কাছ থেকে মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করা সম্ভব না হলে তিনি মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন। মুক্তিপণ পরিশোধ করা হত সরকারী রাজকোষ অথবা গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে।

ঘ **দাস জীবনের জন্য দণ্ড বিধান ঃ** সর্বশেষ পন্থা হিসাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। খলিফা ওমর (রা) ছিলেন আরববাসী বন্দীদের দাস করার বিরোধী। তিনি অনারব যুদ্ধবন্দীকে দাস করারও বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ইসলামের সুমহান শিক্ষা এবং জিহাদের উন্নত আদর্শের প্রেক্ষিতে বিজিত এলাকার জনগণকে জমিতে কাজ করা উচিত এবং তাদের দাস করার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে খারাজ গ্রহণ করা শ্রেয়।

যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানোর ব্যাপারে ইসলামে অনুমোদন থাকলেও এটা নির্দেশ হিসাবে আসেনি। বরং অন্য কোন উপায়ে যখন যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা মীমাংসা করা সম্ভব হয়ে উঠে না, কেবল তখনই যুদ্ধবন্দীদের দাসত্ব গ্রহণের জন্য দণ্ডাদেশ দেয়া

যায়। ইসলাম কাউকে দাস বানানোর ব্যবস্থা একান্তই অপ্রীতিকর এবং জিহাদের আদর্শের পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করে। বস্তুতপক্ষে দাস জীবনের জন্য দণ্ডাদেশের সঙ্গে তালাক ব্যবস্থার তুলনা করা চলে। ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। কিন্তু অন্য কোন উপায় না থাকায় ইসলাম তালাক ব্যবস্থাকে অনুমোদন দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারেও যদি অন্য কোন পথ উন্মুক্ত না থাকে কেবল তখনই এই ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য। অন্য কোন উপায়ে কাউকে দাস করার অনুমতি নেই।[৮] অবশ্য একথা সত্য যে মুসলমানদের সঙ্গে বিরুদ্ধ শক্তির যোগাযোগ সহজতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবন্দী সমস্যা মীমাংসার পথও সহজতর হয়েছে। দাস বানানোর প্রয়োজনীয়তা গেছে কমে। তারই ফলে মুসলিম বিশ্বের কোথাও এখন আর দাসপ্রথার চিহ্নমাত্র নেই।

উল্লেখ্য যে, মুসলমান সমাজেও দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু অন্যান্য জনগোষ্ঠীর দাসপ্রথার সঙ্গে মুসলমান সমাজের দাসপ্রথার ছিল বিস্তর ব্যবধান। বস্তুতপক্ষে একজন দাস যাতে অনায়াসেই দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে উঠে ইসলামের দাস ব্যবস্থা। কুরআন ও হাদীসের ভাষা থেকেই তার স্বাক্ষর মেলে। দাসকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে জোর তাগিদ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, হাজার রকমের পাপ এবং অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অন্যতম উপায় হল দাসকে মুক্তি দেয়া। ইসলামী বিধান মতে একজন দাস গৃহকর্তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে স্বাধীনতা লাভ করতে পারত। মুক্তিপণ হিসাবে কি পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তা নির্ধারণ করা হত দাসের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে। এমন কি দাস জীবন পরিচালনা করেও সে স্বাধীনভাবে অন্যত্র কাজ করার সুযোগ পেত। বিনিময়ে সে যে অর্থ উপার্জন করত তাই দিয়ে সে পরিশোধ করত মুক্তিপণ। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মত দাসকেও সমদৃষ্টিতে দেখার, তাকে সমভাবে খেতে-পরতে এবং থাকতে দেয়ার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সা) একবার বলেছিলেন যে, তোমরা ইবাদতের প্রতি যেমন যত্ন নেবে তেমনি যত্ন নেবে দাসদের প্রতি। বস্তুতপক্ষে ইসলামের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এক সময়ের দাসদের অনেকেই অধিষ্ঠিত হন খিলাফতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে।

নিরপেক্ষতা ঃ বর্তমান কালে যুদ্ধের ব্যাপকতা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে কোন জাতি ইচ্ছা করলেই নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতে পারে না। কোন না কোনভাবে সে বিবদমান দলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য বিবদমান জাতিসমূহ যদি অন্য কোন জাতিকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে এবং ভাবে যে তাকে ঘাটাতে গেলেই বিপদ বাড়বে কেবল তখনই একটি জাতির পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলা সম্ভব। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়াম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইরানের

ঘটনার মধ্য দিয়েই দুর্বল জাতিসমূহের নিরপেক্ষতা যে কিভাবে অবজ্ঞা করা হয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। জিহাদের আইনে নিরপেক্ষতার একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি জাতি মুসলমানদের প্রতি তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছে এবং যে দেশ মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত, তাকে কোনভাবেই সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছে না, তখন সে জাতিকে নিরপেক্ষ বলে আখ্যা দেয়া যাবে। ইসলামী পরিভাষায় নিরপেক্ষ এই দেশটিকে বলা হয় 'দার-উল-সুলহ'। বলা আবশ্যক যে, 'দার-উল-আহাদ'-এর সঙ্গে 'দার-উল-সুলহ'-এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 'দার-উল-ইসলামের' সঙ্গে অন্য কোন জাতির অনাক্রমণ চুক্তি থাকলে সে দেশকে বলে 'দার-উল-আহাদ'। 'দার-উল-সুলহ'-এর সঙ্গে 'দার-উল-ইসলাম'-এর এ ধরনের কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তি থাকে না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে থাকে পারস্পরিক হৃদ্যতা এবং একে অপরকে আক্রমণ না করার ব্যাপারে সমঝোতা। এই বোঝাপড়া এবং বন্ধুত্ব অলিখিতভাবে হলেও আনুষ্ঠানিক চুক্তির মতই তা কার্যকর। যতদিন পর্যন্ত 'দার-উল-সুলহ' বলে বিবেচিত একটি দেশ এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে ততদিন পর্যন্ত তারা মুসলমান বাহিনীর আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে। এমন কি শত্রুপক্ষের লোকেরা 'দার-উল-সুলহ'-এ আশ্রয় নিলেও মুসলিম বাহিনী সেখানে তাদের তল্লাশী চালাতে পারবে না।

আধুনিক যুদ্ধরীতি

ওপেনহেইম যুদ্ধের চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধ হলো দুই বা ততোধিক শক্তির মধ্যকার পারস্পরিক বিবাদ। এখানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরাভূত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। ঘটনাচক্রে বিজয় পতাকা যার হাতে আসে, শান্তি এবং সহযোগিতার নামে সে তখন বিজেতার উপর চাপিয়ে দেয় মনগড়া কতগুলো শর্ত। বিজয়ীর দেয়া এই শর্তসমূহের মধ্যে থাকে বাধ্যবাধকতা, এমনকি নিষ্ঠুরতার সুস্পষ্ট ছাপ। অবশ্য বর্বরোচিত এই যুদ্ধ রীতির পরিবর্তন এবং সংস্কার অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বড় রকমের উদ্যোগ। আশার কথা এই যে, এই উদ্যোগকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে যুদ্ধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সমাজ এবং সভ্যতা, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে যাঁরা অভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁরাই হলেন এই সম্মেলনের সদস্য। খ্রিস্টান জাতিসমূহ প্রথমে যুদ্ধ পরিচালনার যে নীতিমালা প্রণয়ন করে তাতে প্রাচ্যের দেশগুলোকে স্বাক্ষরের সুযোগ দেয়া হয়নি। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ১৮৫৬ সালে তুরস্ক সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনে স্বাক্ষর করার সুযোগ পায় এবং তাও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে। অবশ্য এর পর অন্যান্য অখ্রিস্টীয় দেশগুলোকে এই আইনের আওতায় আনা হয়। বস্তুতপক্ষে অন্যদের প্রতি ইউরোপবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য রকম। কিছুকাল পূর্বেও তারা ভাবত, ইউরোপের বাইরে যারা বসবাস করে তারা সবাই বর্বর ও অসভ্য। পরিকল্পিতভাবেই তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে রাখা হত। উপনিবেশগুলো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত থাকত। কিন্তু যুদ্ধের মানবিক নিয়ম-কানুনগুলোর সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। আসলে পরিকল্পিতভাবেই তাদের এ অবস্থায় রাখা হত এবং এ ব্যাপারে ঔপনিবেশিক শক্তির চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। বৈশিষ্ট্যগতভাবে ইসলামের জিহাদ সম্পর্কিত নীতিগুলো মেনে না চললেও মুসলমানদের এই নিয়মগুলো পালন করতে হয় অক্ষরে অক্ষরে। অর্থাৎ ইসলাম জিহাদ সম্পর্কিত নিয়ম-নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে শত্রুপক্ষকে একতরফাভাবে কতগুলো বিশেষ সুযোগ বা কনসেশন দিয়ে থাকে এবং বিপক্ষ কোন জাতির কোন ধর্মের এবং কোথাকার অধিবাসী এ সবের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করে না।

যুদ্ধের ব্যাপারে খ্রিস্টান জগত ছিল যেমন নির্দয় তেমনি বর্বর। অবশ্য শিক্ষার প্রসার এবং সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ধীরগতিতে হলেও তাদের বর্বরতার

ভয়াবহতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালীন ক্রিয়াকলাপ এবং পরবর্তী পরিস্থিতিকে বিচার করতে শুরু করে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। বর্বরতা থেকে মানসিকতার এই উত্তরণ এবং আধুনিক যুদ্ধের নিয়মাবলী প্রণয়নের উৎসাহ ইউরোপবাসীরা ইসলাম থেকেই লাভ করে। বিশেষ করে জিহাদ সংক্রান্ত রীতিনীতির আলোকেই তারা আধুনিক যুদ্ধের নিয়মকানুনগুলো তৈরী করে। ১৮৬৮ সালে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুদ্ধরীতি প্রণয়নের জন্য একটা বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে তিনটি চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। বড় রকমের পরিবর্তন আসে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আচরণ সম্পর্কিত নিয়মনীতির ক্ষেত্রে। অবশ্য খুব কম সংখ্যক দেশই যুদ্ধের আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই তার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠে। এমনকি আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ফ্রান্সের মত ঔপনিবেশিক শক্তি যুদ্ধের সর্বসম্মত নিয়ম-কানুনগুলো যত নগ্নভাবে লংঘন করে, তা প্রকৃত অর্থেই নজীর- বিহীন। তবু এ কথা সত্য যে, মানব সভ্যতার বিকাশে এই আইন প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যুদ্ধের নিময়কানুন এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন এবং ইসলাম প্রবর্তিত জিহাদের আইনের সঙ্গে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সংক্ষেপে এই পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. জিহাদের আইনের তুলনায় আধুনিক আইনের পরিসর খুবই সীমিত। আধুনিক যুদ্ধ আইনে কেবল যুদ্ধের প্রকৃত আচরণবিধির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ অবস্থায় এবং পরিস্থিতিতে একটি জাতির বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে, এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন জাতি বা রাষ্ট্র যখন পরস্পরেরের মধ্যে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয় কেবল তখনই আধুনিক যুদ্ধ আইন প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ব্যাপারে আধুনিক যুদ্ধ আইন একেবারেই নিশ্চুপ। এদিক থেকে বিবেচনা করলে জিহাদ আইনের পরিসর খুবই ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। কোন্ পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে যুদ্ধের আয়োজন করা যাবে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আচরণবিধি কেমন হবে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তিই বা হবে কিভাবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিবাদ বিসংবাদের গতি-প্রকৃতি কেমন হবে প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ইসলামের জিহাদ সম্পর্কিত আইনে।

খ. আধুনিক যুদ্ধ আইনে নৈতিকতা প্রসঙ্গটিকে বলতে গেলে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং সে কারণেই কোন্ অবস্থায় যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধ পরিহার করা সঙ্গত সে বিষয়ে আধুনিক আইনে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। কিন্তু জিহাদের আইন সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে রচিত। আধুনিক আইনের

আওতায় নৈতিকতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় নগ্ন আগ্রাসনকে সে ঘৃণা করতে পারে না বা বিপক্ষ দলের বা পূর্বেকার বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাকেও ঘৃণা করতে পারে না। কিন্তু ইসলামের জিহাদের আইন এদিক থেকে খুবই পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট। কখন কোন্ পরিস্থিতিতে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে অথবা যাবে না তা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ রয়েছে জিহাদের আইনে। ইসলাম বিশ্বাসঘাতকতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়নি। ভবিষ্যতে যে শক্তি বা রাষ্ট্র বিবাদে লিপ্ত হতে পারে তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার অনুমোদনও ইসলামে নেই। এমনকি যদি দেখা যায় যে নামমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করলেই অভূতপূর্ব বিজয় অথবা বড় রকমের সামরিক সুবিধা অর্জনের সম্ভাবনা আছে, তবু ইসলাম বিশ্বাসঘাতকতা করার অনুমোদন দেয় না।

গ. আধুনিক যুদ্ধ আইনের তুলনায় ইসলামের জিহাদ সংক্রান্ত আইন যুদ্ধ-বিগ্রহকে অধিকতর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ সরাসরি আক্রমণের পূর্বে বিরোধী পক্ষকে সাধারণত তিন দিনের নোটিশ বা চরম পত্র বা আলটিমেটাম দিত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার শেষ মুহূর্তেও যাতে রক্তপাত এড়ানো যায় সেজন্যই ইসলামের জিহাদ সংক্রান্ত আইনে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া বিবদমান পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্য ইসলাম কখনও চাপাচাপি করে না। যে সমস্ত অস্ত্র, গোলাবারুদ অকারণে জনজীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সে সমস্ত অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করাটা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। অসামরিক এলাকা এবং শহর-বন্দরে আনবিক বোমাবাজির অনুমোদন ইসলামে নেই। এসব এলাকায় যারা বোমা ফেলে, জনপদ এবং বিষয়-সম্পদের ক্ষতি করে, ইসলাম তাদেরকে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

নীতিগতভাবে আধুনিক যুদ্ধ আইন সকলের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করেছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশই এই আইন মেনে চলার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তারা এতে স্বাক্ষর করেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে, ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে নয়। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে সর্বসম্মত এই আইনগুলো আরও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে। এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন করে ইসলামী যুদ্ধ আইন প্রণয়ন করাও জরুরী হয়ে পড়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হল। এগুলো থেকেই ইসলামের যুদ্ধ আইনের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে। রাসূল (সা) যুদ্ধ উপলক্ষে অকারণে কোন কিছু নষ্ট বা ধ্বংস না করার জন্য নিবেদিত সহচরগণকে বার বার উপদেশ দিয়েছেন (বুখারী)। তিনি বলেছেন যে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। কিন্তু তার প্রতি তোমার ব্যবহার হবে মার্জিত এবং সংযমপূর্ণ। অকারণে কখনও তার প্রতি কর্কশ অথবা কঠোর হবে না। শত্রুতাকে

স্থায়ী এবং দীর্ঘায়িত না করে শত্রুর সঙ্গে আপোস করার, নতুন করে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবে (বুখারী, মুসলিম)। রাসূল (সা) এমন কথাও বলেছেন যে, পরাজিত শত্রুর প্রতি যথাসম্ভব সদয় এবং সহানুভূতিশীল হওয়ার চেষ্টা করবে (বুখারী)। খায়বরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ইহুদীদের দুর্গের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং এ সময়ে মুসলিম বাহিনী এমন কিছু আচরণে লিপ্ত হয় যেগুলো ইসলামের জিহাদ সম্পর্কিত আইনে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়নি। তবু সাধারণ দৃষ্টিতে তাদের আচরণগুলো অপ্রীতিকর হওয়ার কারণে রাসূল (সা) খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, "তোমরা কি মনে কর যে- কুরআনে যে কাজগুলো সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া আর কোন বিধি-নিষেধ তোমাদের জন্য নেই?"

ওহুদের যুদ্ধ

(১৫ এপ্রিল ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ)

বর্তমানে যে অঞ্চলটি মক্কা বলে পরিচিত, এক সময়ে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডটি ছিল নির্জন, অনুর্বর এবং জনমানবের বসবাসের অযোগ্য। ইহার চারদিকে ছিল পাহাড় আর পর্বত। আদি পিতা ইবরাহীম (আ) এই অঞ্চলের কেন্দ্রভূমিতে নির্মাণ করেছিলেন পবিত্র কাবাঘর। যুবক পুত্র ইসমাঈল (আ) ছিলেন এই নির্মাণ কাজের প্রধান সহযোগী। ধীরে ধীরে পবিত্র কাবাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ক্রমবর্ধমান জনবসতি। এরা ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। ইতিহাসের পাতায় এরা কুরাইশ গোত্র হিসাবে পরিচিত। কাবাঘরের নেতৃত্ব ছিল কুরাইশ গোত্রের নিয়ন্ত্রণে। কালক্রমে সেখানে শক্তিশালী আরও অনেক গোত্রের আবির্ভাব ঘটে। পবিত্র কাবাঘরের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব চলে যায় তাদের হাতে। প্রথমে জুরহুম এবং পরে খুজাই গোত্র এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অধস্তন সন্তান কুশাই খণ্ড-বিখণ্ড কুরাইশ এবং আরও কতগুলো গোত্রকে সংঘবদ্ধ করে পবিত্র কাবাঘরের নিয়ন্ত্রণভার পুনরায় লাভ করেন। আস্তে আস্তে গোটা এলাকার নেতৃত্ব আসে তার হাতে। ঐতিহাসিকগণের মতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে। কুশাই-এর ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সর্বোত্তম এবং শীর্ষস্থানীয় গোত্র হিসাবে কুরাইশরা আবার সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করে। বস্তুতপক্ষে সৌদী রাজবংশের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অন্য কোন শক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই কুরাইশ বংশের নিরংকুশ নেতৃত্ব অব্যাহত থাকে।

এই সময়ে পারস্য এবং বাইজানটাইন ৯ 'সম্রাটদ্বয়ের মধ্যে প্রায় সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। ফলে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে লোকে বড় একটা যাতায়াত বা ব্যবসা বাণিজ্য করত না। লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে নৌযাতায়াত ছিল খানিকটা বিপদসংকুল। ফলে পূর্ব-ভারত উপমহাদেশে এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত পশ্চিম আরবের মধ্য দিয়ে। উপরন্তু কাবাঘরের আশেপাশে বিরাট এলাকা জুড়ে রক্তপাত ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। সে কারণেই গোটা পশ্চিম আরবের মধ্যে মক্কা একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মক্কার ভৌগোলিক অবস্থানটাও ছিল বড় চমৎকার। দক্ষিণে ইয়েমেন এবং উত্তরে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের সঙ্গে যোগাযোগ চলত মক্কার মধ্য দিয়ে। ফলে মক্কা সহজেই আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পায়। এবং মক্কাবাসীরা বাণিজ্যে বেশ জেঁকে বসে।

অবশ্য এই বাণিজ্য সুবিধাটুকু রাতারাতি কুরাইশদের দোরগোড়ায় এসে হাযির হয়নি। এজন্য তাদের দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে আবিসিনিয়াবাসীরা পারস্যের নিকট থেকে ইয়েমেন দখল করে নেয়। এ সময়ে মিসর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং উত্তর আরব ছিল বাইজান্টাইন শাসনাধীন। ইয়েমেনের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্য পথ দখলের চেষ্টা ছিল আবিসিনিয়াবাসীদের জন্য স্বাভাবিক। তাছাড়া পশ্চিম আরবদের অধিবাসীদের খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার স্বপ্ন খ্রিস্টানদের কাছে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। এই খ্রিস্টানরা ছিল ধর্মোন্মাদ। ছোট-খাট ব্যাপারে তারা একে অপরকে হত্যা করত।

বাণিজ্য সুবিধা এবং পশ্চিম আরবাসীদের ধর্মান্তরকরণের প্রত্যাশায় ৫৭০ সালে ইয়েমেনের আবিসিনীয় গভর্নর আবরাহা কুরাইশদের ধর্মীয় প্রতিপত্তির স্থলভূমি কাবা ধ্বংসের জন্য মক্কা যাত্রা করে। কিন্তু খুবই হৃদয়বিদারক পরিণতির মধ্য দিয়ে এই আক্রমণের যবনিকাপাত ঘটে। হঠাৎ করেই আবরাহার বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মহামারী। পাহাড়ের যে উপত্যকায় আবিসিনীয় সৈন্যরা ছাউনী ফেলেছিল, সেখান দিয়ে বয়ে যায় ঘূর্ণিঝড়। শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। নিমেষে নিঃশেষ হয় যায় গোটা আক্রমণকারী বাহিনী। এর অল্পকাল পরেই পারস্যবাসীরা নৌ-অভিযান চালিয়ে ইয়েমেন দখল করে নেয়। কিন্তু পারস্যের সঙ্গে ইয়েমেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। ফলে ইয়েমেন দখলে রাখা পারস্যের জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তবু তারা কুরাইশদের নিকট থেকে জোর করে তায়েফের পথে ইরাক ও ইয়েমেনের মধ্যকার বাণিজ্য পথকে দখল করার চেষ্টা করে। এসব এলাকায় তারা নিজেদের বাণিজ্য বহর পাঠাতে শুরু করে। কিন্তু সুযোগ বুঝে কুরাইশরা তাদের আক্রমণ করে। তারই ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘটিত হয় ফুজ্জার যুদ্ধ (৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে)। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে পারসিয়ানরা হেরে যায়। এর পর থেকে ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং আবিসিনিয়ার বাণিজ্য পথের উপর কুরাইশদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরব সমাজে বংশমর্যাদা ও বংশ কৌলীন্য ছিল সামরিক শক্তির প্রধান উৎস। যে গোত্র তার সদস্য এবং অনুসারীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারত, প্রতিশোধ নিতে পারত সকল প্রকার অপমান এবং হত্যাকাণ্ডের, সে গোত্রের প্রাধান্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত। একথা সত্য যে, গোটা আরব জাহানে কুরাইশদের বংশমর্যাদাকে সর্বোত্তম বলে চিহ্নিত করার মধ্যে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। অবশ্য ইসলামের আবির্ভাবের পর এই অতিরঞ্জনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে কুরাইশরা আরব এবং মধ্য আরবের যতগুলো গোত্রের সংস্পর্শে এসেছে তন্মধ্যে তাদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। কুরাইশদের এই বংশমর্যাদার মূলে শুধু তাদের একক সামরিক শক্তিই ছিল না, বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে তাদের ছিল সম্মিলিত

শক্তি। এই শক্তি এত প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে, যে কোন সময় অন্য যে কোন শক্তির মুকাবিলা করার মত দুঃসাহস তাদের ছিল। কুরাইশদের বাণিজ্য বহর ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ইরাকের পথে যাতায়াতকালে বিভিন্ন যাযাবর গোত্রের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হত। এই সাহায্য আসত বিভিন্ন ভাবে। কখনও যাযাবররা পথ প্রদর্শক, কখনও বাণিজ্য বহরের নিরাপত্তার জন্য প্রহরার ব্যবস্থা, কখনও আবার মালামাল পরিবহনের কাজ করত। কখনও কখনও আবার এমন হত যে, কোন গোত্রের মধ্য দিয়ে কোন বাণিজ্য বহর যাতায়াতকালে গোত্রের প্রধান তাদের পানীয় ও খাদ্য-খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করত। এসব কাজের জন্য কুরাইশরা গোত্র প্রধানকে অর্থ প্রদান করত। এভাবেই মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর যাযাবর গোত্রগুলোর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তারা মক্কার ক্ষয়ক্ষতিকে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি বলে মনে করতে শুরু করে। মক্কার উচ্চ বংশীয় বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন গোত্রের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। বিশেষ করে মক্কাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা যৌথ কারবার এবং বাণিজ্যে গোত্র প্রধানদের নির্দিষ্ট একটি অংশ বরাদ্দ থাকার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে মক্কার স্বার্থকে এক করে দেখতে শুরু করে।

স্বভাবগতভাবেই আরবে বসবাসকারী যাযাবর গোত্রগুলো ছিল স্বাধীনচেতা। আচার-আচরণের দিক থেকে তারা ছিল ভীষণ রকমের স্পর্শকাতর এবং অনমনীয়। কোন রকম বশ্যতা স্বীকার অথবা অনুগত হয়ে নয় বরং কুরাইশদের সমকক্ষ হয়ে এবং সমান মর্যাদা নিয়েই তারা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এই যাযাবর গোত্রগুলো ছিল একেবারেই আনাড়ী। এবং তাদের বিন্দুমাত্র ব্যবসা বুদ্ধি ছিল না। বিভিন্ন গোত্র এবং সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে কুরাইশরা যে মৈত্রী সংঘ গড়ে তুলেছিল তা টিকিয়ে রাখার জন্য অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই যাযাবর শ্রেণীর আচরণ এবং বৈশিষ্ট্য এমনই অদ্ভুত ছিল যে, শুধুমাত্র অর্থকড়ি দিয়ে তা সম্ভব ছিল না। কুটনীতি এবং কুটকৌশলের মাধ্যমে এই যাযাবর শ্রেণীকে মৈত্রী সংঘে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এজন্য কুরাইশদের কঠোরভাবে সংযত রাখতে হয়েছে তাদের সকল প্রকার আবেগ-অনুভূতির, কাজ করতে হয়েছে অত্যন্ত সংযমী এবং ধৈর্যশীল রাষ্ট্রনায়কের দুরদৃষ্টি নিয়ে। কুরাইশদের এই রাজনৈতিক দুরদর্শিতা এবং জ্ঞানই শক্তিশালী মৈত্রী সংঘকে সচল রাখে। ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং প্রতিবেশীদের উপর মক্কার প্রাধান্য এবং আধিপত্য স্থায়ী হয়। বস্তুতপক্ষে কুরাইশদের এই প্রাচুর্য, সফল ব্যবসায়ী হিসাবে তাদের প্রসিদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাই রাসূল (সা)-এর চলার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক কিছু থাকতেও কুরাইশদের মধ্যে দুটো জিনিসের বড় অভাব ছিল। তাদের না ছিল কোন ধর্মীয় নিয়ম-নীতি, না ছিল কোন নৈতিক ও মানবিক আইন-

কানুন। তারই ফলে কুরাইশদের এই প্রাচুর্য এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা অল্প সময়ের মধ্যেই অন্তঃসারশূন্য পুঁজিবাদের রূপ নেয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও তা মূলত শক্তিশালী কয়েকটি গোত্রের নেতৃস্থানীয় ও জনকয়েক লোকের হাতের মুঠোয় এসে যায়। এদের মধ্যে আবদ শাম্‌স এবং বনু মাখজুম ছিলেন সবার শীর্ষে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আবদ শাম্‌স ছিলেন আবূ সুফিয়ান এবং মাখজুম ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ ও দুর্ধর্ষ আবূ জেহেলের পূর্বপুরুষ। শহুরে পরিবেশে বসবাস করে এসব ধনী লোক মরু আরবের বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য এবং গুণকে অর্থাৎ 'মুরউয়া'কে[১০] এক সময়ে বেমালুম ভুলে যায়। তাদের স্বভাব-চরিত্র এবং আচরণ থেকে এগুলো একেবারে ঝরে পড়ে। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তে এর চাইতে উন্নত অথবা অনুরূপ কোন বৈশিষ্ট্যকে তারা গ্রহণ করেনি। অর্থ-সম্পদকে তারা বড় করে দেখতে শুরু করে। টাকা-পয়সা হয়ে দাঁড়ায় পূজার উপলক্ষ, দেবতা তুল্য।[১১] ব্যবসাকেই গ্রহণ করে জীবনের একমাত্র সাধনা হিসাবে। এই অসম অবস্থার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা গঠন করে বিরোধী দল। এই দল হিলফ-উল-ফজল নামে পরিচিত। রাসূল আকরাম (সা) যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বনু হাশিম গোত্রও ছিল এই দলে।

স্বদেশে সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি অভিন্ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তৈরী করতে কুরাইশরা সক্ষম হয়েছিল। তারা পরস্পরের মধ্যকার বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারত। কুরাইশ-এর মত একটি সুবৃহৎ গোত্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত হলেও দলের পরিবর্তে গোত্রকে তারা গ্রহণ করেছিল সামাজিক অধীনতার মূল কেন্দ্র হিসাবে। কুরাইশদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই দুর্বলদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা হিলফ-উল-ফজল-এর সঙ্গে ধনী বা পুঁজিবাদী শ্রেণীর আজন্ম বিরোধিতা থাকলেও কখনও তা সংঘর্ষের রূপ নেয়নি। অথচ উভয়ের মধ্যকার উদ্দেশ্য এবং স্বার্থগত সংঘাত ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এমনকি দুই শ্রেণীর লোকের আনুগত্য পরস্পর বিরোধী দুটি সংগঠনের নিকট অব্যাহত ছিল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র দেশ জুড়ে যখন বিরাজ করছে এমনি ধরনের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ঠিক তখনই রাসূল (সা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রতিপালিত হন এমনি ধরনের একটি বিক্ষুব্ধ পরিবেশে।

হযরত মুহম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে কুরাইশদের মধ্যেই ইসলামের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ফলে তারা অসত্যকে বাদ দিয়ে সত্য পথ গ্রহণের জন্য যেমন মস্তবড় একটা সুযোগ পেয়ে যায়, তেমনিভাবে ইসলামকে প্রতিহত করার প্রশ্নটিও তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। পুঁজিবাদের প্রতিভূ হিসাবে তারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণের প্রত্যাশায় মরিয়া হয়ে নতুন ধর্মের বিরোধিতা করল। কিন্তু এই বিরোধিতার পরিণতি তাদের জন্য কোন ভাবেই সুখকর হয়নি। তারা ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হল। তবু নিজেদের

মেধা এবং দক্ষতাগুণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও নিজেদের উচ্চাসন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হল।

নতুন মত এবং পথের কথা বলার কারণে রাসূল (সা)-এর সঙ্গে মুশরিকদের সংঘাত বাঁধে। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিক্ষুব্ধ এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বলা বাহুল্য, রাসূল (সা)-এর আহ্বান ছিল প্রধানত ধর্ম সংক্রান্ত। কিন্তু অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপরও তাঁর ধর্মীয় বক্তব্যের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ এবং অত্যন্ত স্পষ্ট। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভৃতি বিষয় ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে কুরাইশদের নিকট থেকে তিনি যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন তার গতি-প্রকৃতিও ছিল বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়।

প্রথমত, ইসলাম প্রচারের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই প্রবল। মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে নিলেই তাঁকে ক্ষমতার উচ্চাসনে বসাতে হয়। এবং রসূল (সা) -এর শিক্ষা অনুসারে জীবন ও সমাজ পরিচালিত হলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে গ্রহণ করতে হয় নতুন সমাজের প্রধান হিসাবে। মক্কার ধনী শ্রেণী এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী কোনভাবেই এ ধরনের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, সুচতুর কুরাইশরা ছিল খুবই দুরদৃষ্টিসম্পন্ন। শুরুতেই তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, যে পুঁজিবাদী ব্যবসার উপর ভিত্তি করে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে কুরআনী শিক্ষার রয়েছে মৌলিক সংঘাত। তদানীন্তন সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পুঁজিবাদ ছিল এর ভিত্তি। ইসলামের আবির্ভাবের গোড়ার দিকেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করা হত। তারা যথার্থভাবেই অনুমান করতে পেরেছিল যে এই সমালোচনার ধারা যদি অব্যাহত থাকে, সমালোচনার জোয়ার যদি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়, তাহলে সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিণামে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তৃতীয়, স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যও ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় অনেক কুরাইশ বেশ ভীত হয়ে পড়ে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের স্থানীয় ব্যবসার সঙ্গে তেমন সংযোগ না থাকলেও কুরাইশদের একটি বিশেষ শ্রেণী এই ব্যবসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তারা ছিল বেশ সরব। সংখ্যার দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী, কাজের দিক থেকে যথেষ্ট তৎপর। বিভিন্ন দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে তায়েফে অবস্থিত দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কেন্দ্রের কুরাইশ ব্যবসায়ীর একাংশের কাছ থেকেই প্রচণ্ডভাবে দৈহিক বিরোধিতা শুরু হয়।

চতুর্থত, ইসলামকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসকারী হিসাবে মনে করা হয়। শহরে বসবাসকারী আত্মকেন্দ্রিক ও মুনাফামুখী কুরাইশদের মন থেকে দলীয় আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়লেও তাদের গোত্রীয় চেতনা প্রবল ছিল। ধনী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীসহ সব গোত্রের যুবকেরা যখন গোত্রীয় আনুগত্যকে অস্বীকার

করে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হতে শুরু করে তখন তাদের এই ধারণা ও প্রতিক্রিয়া আরও প্রবল হয়।

পঞ্চমত, প্রাচীন এবং শক্তিশালী গোত্র প্রধানদের সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নতুন ধর্মের বিপক্ষে। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর দাদা আল মুগিরার মত গোত্রপ্রধানও ইসলামের ঘোর বিরোধিতা করেন। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এই চিন্তা থেকে নয় বরং তার বিরোধিতার মূলে ছিল সংরক্ষণশীল মানসিকতা। একথা ভেবে তারা খুবই আহত এবং বিব্রত বোধ করত যে ইসলাম ধর্মকে মেনে নিলে প্রকৃত অর্থে পূর্বপুরুষগণকে ভ্রান্ত পথের অনুসারী এবং অবিশ্বাসী বলে চিহ্নিত করা হবে। তাদের কাছে ধন-সম্পদ অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টায় ঐতিহ্য চিন্তা এবং ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতিগুলো বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না পেলেও ঐতিহ্যপ্রীতির কারণেই তারা যে কোন রকম পরিবর্তনে চরম বিরোধিতা করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা আবূ তালিব ছিলেন বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিব বংশের প্রধান। ভাইপোর প্রচার কাজের শুরুতেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন। রাসূল (সা)-এর বিরোধী পক্ষ ছিল খুবই বাস্তববাদী। তারা সহজে অনুমান করতে পেরেছিল যে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে গেলেই রাসূল (সা)-এর গোত্র এবং সম্ভবত হিলফ-উল-ফজল মৈত্রীর সদস্যদের সাথে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর আবূ লাহাব নিজ বংশের তরফ থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রত্যাখ্যান করলে কুরাইশরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে নবীজীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে রাসূল (সা) হিজরত করে চলে যান মদীনায়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি মদীনা পৌঁছেন। এই দিন থেকেই হিজরী সাল গণনা করা হয়। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমলে দিন তারিখ গণনার জন্য হিজরী সন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মদীনায় তখন আউস, খাজরাজ, কুরাইজা এবং নাদির গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। তন্মধ্যে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকেরা ছিল মূর্তিপূজারী। অপর দুটি গোত্রের লোকেরা ছিল ইহুদী ধর্মাবলম্বী। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের জাতিগত বিবাদ দীর্ঘদিনের। কালক্রমে এই বিবাদ রীতিমত স্থায়ী যুদ্ধে রূপ নেয়। এই যুদ্ধ কখনও একটি অথবা দুটি দলের মধ্যে আবার কখনও বা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত বহুসংখ্যক দলের মধ্যে। কিন্তু হাতির যুদ্ধের সময় জাতিগত এই বিদ্বেষ খুবই ব্যাপকতা লাভ করে। বলতে গেলে গোটা আউস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই যুদ্ধ। এমনকি ইহুদী গোত্রগুলো এতে জড়িয়ে পড়ে। ৬১৭ সালে 'বুয়াত' যুদ্ধের সময় এই বিবাদের ভয়াবহতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। বিবদমান সবগুলো পক্ষই ভীষণ রকম ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং নিতান্ত অস্বস্তিকর অবস্থাতেই তারা

যুদ্ধবিরতিকে মেনে নেয়।

আবদুল্লাহ বিন উবাই নামের একজন স্থানীয় সর্দার এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকে। অনুমান করা হয় যে, ক্রমাগত জাতিগত বিবাদের কারণে সে এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তার পক্ষে বৃহত্তর এই যুদ্ধে অংশ নেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, নিরপেক্ষতা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে চেয়েছিল। সম্ভবত এই কারণটি অধিকতর গ্রহণ যোগ্য। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দাঁড়ায় অন্যরকম। দীর্ঘদিনের বিবাদের কারণে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে স্থানীয় কোন সরদারকে তারা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তৈরী ছিল না।

মদীনার লোকেরা যখন এমনিভাবে পারস্পরিক কলহে লিপ্ত, ঠিক তখন মক্কার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ হিসাবে মুহাম্মদ (সা)-এর অবস্থান এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মক্কাবাসীরা মুহাম্মদ (সা)-এর ঘোর বিরোধিতা করে। মদীনার লোকেরা আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও মক্কার ঘটনা-প্রবাহ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে তারা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তাদের মন মুকুরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, যার সঙ্গে মদীনাবাসীদের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই অথচ ধর্মগত কারণে যিনি সবার শ্রদ্ধেয়, একমাত্র তার পক্ষেই বিবদমান দলগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করা সম্ভব। বস্তুতপক্ষে এতসব কারণেই তারা মুহম্মদ (সা)-এর নিকট থেকে একটি গ্রহণযোগ্য এবং যথার্থ শান্তি পরিকল্পনার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে।

বিশ্বের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রর্থম একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র কায়েম করেন। এই সংবিধানের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে যে, তোমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তোল যা বিশ্বের অন্যান্য সমাজ থেকে অনন্য এবং স্বতন্ত্র। তার পরেই বলা হয়েছে "আল্লাহ্ পাক প্রতিটি মানুষের হিফাজতকারী। একজন মুমিনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিটি মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। এক আল্লাহ্ এবং শেষ নবী (সা)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা সমস্ত বিশ্বের মুকাবিলায় একে অপরকে রক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" রাসূল (সা) এমন এক সময়ে এই বিধানগুলো জারি করলেন যখন পরিবার এবং গোত্রই ছিল একজন আরববাসীর একমাত্র জিম্মাদার। এক ঘোষণাতেই তিনি আরবদের এই পারিবারিক এবং গোত্রীয় বন্ধনকে বাতিল করে দিলেন। নিঃশেষ করে দিলেন দীর্ঘদিনের আনুগত্যের ধারাকে। ভেঙ্গে দিলেন সনাতন সমস্ত কুসংস্কার এবং প্রতিবন্ধকতাকে। আত্মকেন্দ্রিকতা, অরাজক পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতার প্রতি যে আরবদের ছিল দুর্বার ভালবাসা, মুহাম্মদ (সা) এক ঘোষণাতেই তাদের এই ভালবাসাকে ভিন্ন একটি খাতে বইয়ে দিলেন। বস্তুতপক্ষে সংবিধানের এই ধারা জারি হওয়ার পর থেকে একজন মুসলমান চলে গেল মুসলিম উম্মার তত্ত্বাবধানে এবং

হিফাজতে। মুসলিম উম্মার এই হিফাজতের ভিত্তি এতই দৃঢ় এবং বিস্তৃত যে প্রয়োজন বোধে এখানে রক্তপাত করার তাগিদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কোন রক্তপাত হলে, স্মরণ রাখতে হবে যে একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের রক্তে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান মতে কাজ করার কারণে কেউ কোন মুসলমানকে আঘাত করলে অন্যান্য মুসলমান তার প্রতিশোধ নেবে।

হিজরতের ছয় মাসের মধ্যে মদীনার মুসলমানরা একটি সুসংঘবদ্ধ সমাজে পরিণত হয়। চোখের পলকে তাদের বিশ্বাস বিপ্লবী চেতনায় জ্বলে উঠে। রাসূল (সা)-কে অনুসরণ করতে থাকে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে। এমনিতেই মুসলমানদের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। যখন তারা দেখল যে মুসলমানরা ক্রমবর্ধমান শক্তি হিসাবে মদীনার একটি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করছে। যে কোন মুহূর্তে তারা সিরিয়া ও মিসরের মধ্যকার বাণিজ্য বহরের উপরে অনায়াসে হামলা চালাতে পারে-তখন মক্কাবাসীদের দুশ্চিন্তা শতগুণে বেড়ে যায়। তারা পড়ে যায় এক চরম সংকটাবস্থায়। বাণিজ্যবহরকে বিপদমুক্ত করার প্রত্যাশায় তারা মুসলমানদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠে।

এ সময়ে মদীনায় এমন কিছু গোত্র-প্রধান ছিল যারা ইসলাম কবুল করলেও ভেতরে ইসলামের প্রতি ছিল খুবই ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট। মূর্তিপূজারী মক্কাবাসীরা প্রথমে এসব গোত্র-প্রধানের কাঁধে ভর করে। একথা সেকথা বলে তারা তাদেরকে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। একই সময়ে কুরাইশরা মদীনার শক্তিশালী ইহুদী গোত্রগুলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী মদীনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য উত্তেজিত করতে থাকে। এভাবেই অমুসলিম সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জোর পাঁয়তারা চালায়। দিনে দিনে রাসূল (সা)-এর নিকটও এ সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে-পশ্চিম আরবের এই ক্ষুদ্র পরিসরে ক্রমবর্ধমান ইসলাম এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাবাপন্ন মূর্তিপূজারীদের সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে হোবলের অনুসারীদের এই ঘৃণ্য প্রয়াস এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণের উপলব্ধির প্রেক্ষাপটেই উভয়ের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ভিত্তি রচিত হয়।

বদরের ঘটনাপ্রবাহ ছিল খুবই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। ঘটনাটি ঘটেছিল ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে, হিজরতের মাত্র দু'বছর পরে। আবূ সুফিয়ানের বিরাট বাণিজ্যবহর সিরিয়া থেকে মক্কায় ফেরত যাচ্ছিল। আবূ সুফিয়ানের বিরাট বাণিজ্যবহরকে হুমকি প্রদর্শন করে ভীত-সন্ত্রস্ত, কুরাইশ বাহিনীকে রাসূল (সা) বাণিজ্যবহর রক্ষার জন্য বদর-এর দিকে তাদের চলে যেতে বাধ্য করেন। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ছিল খুবই নিম্নমানের। কিন্তু তাঁদের চমৎকার কৌশলগত বিন্যাস, উন্নত মনোবল এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার জন্য তাঁরা প্রথম

যুদ্ধেই কুরাইশদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে। উপায়ান্তর না দেখে তারা অগণিত মৃতদেহ ফেলে রেখে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে কাফেরদের বড় বড় বেশ কয়েকটি গোত্রের নামজাদা অনেক নেতা মারা যায়। আবূ জেহেলের মত শক্তিশালী এবং দুর্ধর্ষ নেতাও এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। অনেকে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। মক্কার প্রতিটি পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। লজ্জাজনক এই পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার জন্য মক্কাবাসীরা সম্মিলিতভাবে এবং প্রকাশ্যে শপথ নেয়। ক্ষোভ এবং যন্ত্রণায় পুরুষেরা ভুলে যায় আনন্দ-ফুর্তি ও আরাম-আয়েশের কথা। মেয়েরা স্বেচ্ছায় বিক্রি করে দেয় তাদের সমস্ত গয়না-গাটি। প্রতিশোধ নেয়ার দুর্বার বাসনা কবিদের রীতিমত উন্মত্ত করে তোলে। সম্ভবত কুরাইশদের জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তারা এমন এক ঐতিহ্যবাহী পূর্বপুরুষের বংশধর যারা একটি ঘোড়ার জন্য একাধারে ৭০ বছর যুদ্ধ করেছে। যারা একটি কুয়ার পানি ব্যবহারের অগ্রাধিকার নিয়ে যুদ্ধ করেছে ৩৫ বছর। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ স্পৃহার অদম্য উৎসাহ নিয়ে কুরাইশ এবং তার মিত্ররা মুসলমানদের চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার নেশায় ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মক্কার উত্তরে দু'শ মাইলের মাথায় মদীনা শহর। জনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলটুকু কঠিন প্রস্তরময় ও কঙ্করপূর্ণ। এখানে সেখানে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পর্বতরাজি। মদীনার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের মাইলের পর মাইল ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এরকমই। কিন্তু মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এ দিকটায় দেখা যাবে নিবিড় কৃষিভূমি, ছায়াঘেরা বাগান এবং চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো জনবসতি। এতসব বিষয় বিবেচনা করেই মক্কার মুশরিক বাহিনী উত্তর-পশ্চিম বরাবর এগিয়ে যায়। মদীনা থেকে মাত্র মাইল সাতেক দূরে মরুভূমির মাঝখানে রয়েছে একটি উর্বর অঞ্চল। এই মরূদ্যানেই তারা সেনা ছাউনী ফেলে।

বদরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মক্কাবাসীদের প্রস্তুতির খবরাখবর রাসূল (সা) যথাসময়ে পেয়ে গেলেন। কুরাইশরা তখন আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। ক্লান্ত-শ্রান্ত উট-ঘোড়াগুলোকে রেখে দেয়া হয়েছে বিশ্রামের অপেক্ষায়। অন্যদিকে রাসূল (সা) সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ সভায় বসেছেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই মদীনার সন্নিকটে থেকেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। তিনি যুক্তি দেন যে এতে করে পশ্চাদ্দিক থেকে মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না। তাছাড়া এতে করে মদীনাকে রক্ষা করাও সহজতর হবে। রাসূল (সা) এই যুক্তির সাথে একমত হলেন।

কিন্তু বয়সে যারা তরুণ তারা বললেন অন্য কথা। আসলে বদর প্রান্তরের সহজ বিজয় তখনও তাদের দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারা কুরাইশদের কোনভাবেই একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তারা

ভাবতেও পারেন নি যে কুরাইশরা কখনও মদীনা অথবা মুসলিম বাহিনীর জন্য কোন রকম ভীতির কারণ হতে পারে। সে কারণেই পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তার সাথে তারা তাদের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এবং মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার দাবী জানান। তাদের দাবী এতটা আন্তরিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাসূল (সা) তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন। মদীনার অনতিদূরেই ছিল 'শায়খাইন' নামের ছোট একটি পাহাড়। অমিততেজা মুসলিম বাহিনী সেদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈরী হলেন। যারা অসুস্থ, বয়সের ভারে নূয়ে পড়েছেন অথবা বয়সে একেবারেই ছোট রাসূল (সা) তাদের মদীনায় থাকায় নির্দেশ দিলেন।

মুসলিম বাহিনীর যাত্রার প্রাক্কালে দেখা দেয় আরেক সমস্যা। যে সমস্ত নবীন যোদ্ধা রাসূল (সা)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন এবার তাঁরা খুবই বিব্রতবোধ করতে থাকেন। পুনরায় মদীনার কাছাকাছি থেকেই যুদ্ধ করার জন্য তাঁরা রাসূল (সা)-কে অনুরোধ জানান। এ সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও স্বীয় প্রস্তাবের স্বপক্ষে রাসূল (সা)-এর গৃহীত সিদ্ধান্তকে রহিত করার জন্য প্রয়াস চালায়। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁর সিদ্ধান্তে একেবারেই অটল। যে সিদ্ধান্ত একবার নেয়া হয়েছে সে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। রাসূল (সা)-এর এই সিদ্ধান্তে আবদুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ সঙ্গী নিয়ে মুসলমানদের মূল বাহিনী থেকে সরে পড়ে। শায়খাইন পাহাড়ের পাদদেশে যা ঘটেছিল ইতিহাসের ধারায় তার ব্যাখ্যা বিবরণ হয়ে এসেছে। বলে রাখা আবশ্যক যে, সম্ভবত এই বিবরণের মধ্য দিয়ে মূল ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেনি।

আসলে রাসূল করীম (সা) তাঁর নবীন অনুসারীদের দৃঢ় মনোবলকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে এমন একজন নেতা আছেন যিনি তাদের নির্ভুল নেতৃত্ব দেয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন। রাসূল (সা)-এর মন্তব্য থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেছিলেন যে, যুদ্ধের জন্য একবার অস্ত্র হাতে নিয়ে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পুনরায় রেখে দেয়া একজন নবীর পক্ষে একান্তই বেমানান।

ইসলামের এমনি একটি সংকটময় মুহূর্তে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই-এর এভাবে প্রকাশ্যে দল ত্যাগের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের পর থেকে আবদুল্লাহ্ বিন উবাইর সঙ্গে রাসূল (সা)-এর আন্তরিকতাপূর্ণ না হলেও বন্ধুসুলভ আচরণ এই ঘটনাপ্রবাহকে রহস্যময় করে তুলেছে। অবশ্য দু'টি অনুমানকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে বিষয়টি খানিকটা স্পষ্ট হতে পারে।

প্রথমত, হযরত রাসূল (সা) আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তিনি যে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি কোন

উঃ

ওহুদ পাহাড়

গুহা

রুমা পাহাড়
(আইনাইন)

কোরেশ বাহিনী

কোরেশদের অগ্রাভিযান

১/২ ০ ১ মাইল

স্কেল: ১ ইঞ্চি = ২ মাইল

মুসলমান পদাতিক কোরেশ
—"— অশ্বারোহী —"—
ঝরণা + • গুহা
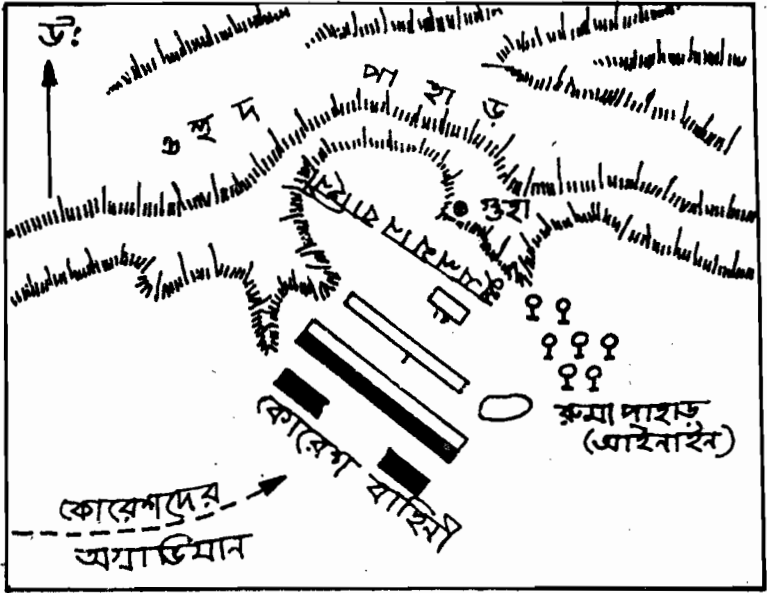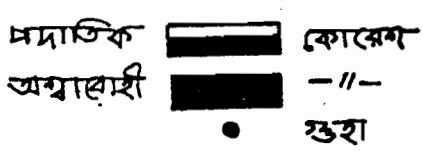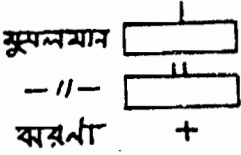
এক সঙ্গীর সঙ্গে তাঁর অস্ত্র অদল-বদল করেন এবং নিজের অস্ত্র-সম্ভারকে দ্বিগুণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আরও অনেক যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিলেও কোন যুদ্ধেই এতটা সতর্কতা গ্রহণ করেননি।

দ্বিতীয়ত, তিনি যথার্থভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, মুসলিম বাহিনী কোন রকম প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হলে তা মদীনা থেকে যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে হওয়া আবশ্যক। এতে করে উন্মত্ত কুরাইশরা যুদ্ধে জিতে গেলেও পাইকারীভাবে মদীনায় লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চালানোর সুযোগ পাবে না। তাছাড়া তারা যখন জানতে পারবে যে মোটামুটি শক্তিশালী আর একটি বাহিনী মদীনায় অবস্থান করছে, তখন হয়ত মক্কাবাসীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই মদীনা আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সহযোগীদের প্রকাশ্যে দল ত্যাগের ফলে মুসলমানদের জন্য খুব বেশী একটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। কপটতা এবং ভণ্ডামীর কারণে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই হযরত রাসূল (সা)-এর একনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারেনি। কিন্তু কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে সে হয়তবা মস্ত বড় একটা উপকারও করতে পারত। মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ না করলে কৌশলগতভাবে মুসলমানরা খানিকটা অসুবিধায় পড়তেন। অবশ্য এই অসুবিধাটুকু অন্যভাবে পুষিয়ে নেয়া যেত। সে ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-কে গড়ে তুলতে হত মজবুত আত্মরক্ষামূলক একটি অবস্থান এবং এ বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত করতে হত যে কুরাইশ বাহিনী অন্য কোথাও আক্রমণ না করে এই ঘাঁটি বা অবস্থানের উপরই আক্রমণ করবে।

মদীনার উত্তরে মাত্র তিন মাইলের মাথায় রয়েছে আইনাইন বা রুমা নামের ছোট একটি পাহাড়। পাহাড়টি ৫০০ ফুট লম্বা এবং ৪০ ফুট উঁচু। আইনাইন থেকে 'ওয়াদী কালাত' নামের নহরটির দূরত্ব মাত্র ১০০ গজ। নহরটি অগভীর এবং শুষ্ক। এটি পূর্ব থেকে চলে গেছে পশ্চিমের দিকে। রুমা পাহাড়ের প্রায় ৬০০ গজ উত্তরেই রয়েছে ওহুদ পর্বতের খাড়া উঁচু অংশের দক্ষিণ প্রান্ত, যা মূলত একটি দীর্ঘ প্রাচীরের মত এলাকাটিকে ঘিরে আছে। পাহাড়ের বৃহদাকার অংশটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় আট মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পর্বতের পশ্চিমাংশের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে খানিকটা সমতল ভূমি। ভূমিটি বেশ প্রশস্ত এবং দেখতে অনেকটা বৃত্তের মত। পর্বতশ্রেণীর মধ্য থেকে খাড়া হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যাওয়া অংশটি যেন পূর্ব ও পশ্চিমের সীমানা হিসেবে বিরাজ করছে। পশ্চিম দিকের পর্বতশ্রেণীর প্রায় ৭০০ গজ পশ্চিম থেকে একটি অংশ খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। এই অংশটুকু তেমন চওড়া না হলেও বেশ লম্বা এবং ওহুদের খোলা প্রান্তরকে ঘিরে রয়েছে। খোলা প্রান্তরের ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আইনাইন অবস্থিত। এমনও হতে পারে যে, হয়ত আইনাইন-এর এ অঞ্চলটুকু ছিল একটি বাগান এবং কালাতের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা পর্যন্ত এটা বিস্তৃত

ছিল। মদীনা থেকে ওহুদের এই খোলা প্রান্তরে যাতায়াতের জন্য পায়ে চলার পথটি রুমা পাহাড় এবং বাগানের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে।

"শায়খাইন" থেকে শুরু করে আইনাইনের খানিকটা উত্তরে ওহুদের সমতল ভূমিতে মুসলিম বাহিনী ছাউনি ফেলে। রাতের আঁধারে শত্রুপক্ষ যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। পরের দিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলমানরাও যুদ্ধের কৌশল ঠিক করে তৈরী হলেন। এখানে যে কোন সমরবিশারদের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন বেশ বড় হয়ে দেখা দেবে- কুরাইশরা কোন্ দিকে অগ্রসর হবে? কোথায় তারা আক্রমণ করবে? তারা কি ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হবে? না সরাসরি মদীনার উপর চড়াও হবে?

সম্ভবত রাসূল (সা) এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন যে, ওহুদের প্রান্তরই হবে কুরাইশ বাহিনীর লক্ষ্যস্থল এবং রাসূল (সা) যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যুদ্ধকে স্থানান্তর করতে পারেন। কারণ রাসূলই ছিলেন মক্কাবাসীদের উন্মত্ততা এবং প্রতিহিংসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। উন্মত্ত কুরাইশরা মদীনায় যাওয়ার পথকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গেল পূর্ব দিকে। তাই দেখে মুসলমানরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

পঞ্চাশজন অশ্বারোহী এবং ৬৫০ জন পদাতিক সৈন্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল মুসলিম বাহিনী। অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান অস্ত্র ছিল বর্শা। পদাতিক বাহিনীর সৈন্যদের কারও হাতে ছিল তীর, ধনুক, কারও হাতে ঢাল-তলোয়ার। মাত্র একশত মুসলমান সৈন্যের হাতে বর্ম জাতীয় অস্ত্র ছিল। পদাতিক বাহিনী কেবল একটি সারিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কৌশল রচনা করে। তাদের এই লাইনটি ছিল ৬০০ গজের বেশী লম্বা। এই লাইনের এক প্রান্তে ছিল রুমা পাহাড়ের পাদদেশ, অপরদিকে ওহুদের সমতল প্রান্তের ডানদিকে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। রাসূল (সা) বাছাই করা ৫০ জন তীরন্দাজকে পাঠিয়ে দিলেন রুমা পাহাড়ের চূড়ায়। তাঁরা মুসলিম বাহিনীর বাম দিকের অংশকে রক্ষা করবে। বিশেষ করে রুমা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনীর ওহুদের সমতল প্রান্তরে আসার একটি সম্ভাবনা ছিল। এ ধরনের কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করাও ছিল তীরন্দাজ বাহিনীর একটি প্রধান দায়িত্ব। আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের (রা) হলেন এই তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক। সংখ্যায় সামান্য হলেও রাসূল করীম (সা) অশ্বারোহী বাহিনীকে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে রেখে দিলেন। বিশেষ করে প্রয়োজনের মুহূর্তে তীরন্দাজ বাহিনীকে সাহায্য করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

কুরাইশ বাহিনীতে ছিল ৩০০০ সৈন্য। তন্মধ্যে ২৮০০ জন পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী। পাশাপাশি দাঁড়ানোর ফলে মুসলমানদের বাহিনী যতখানি লম্বা হয়েছিল

কুরাইশ পদাতিক সেনারাও ততখানি লম্বা লাইনে আগে-পিছে সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়। তাদের অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিল দু'টি দল। তাদের স্থান ছিল পদাতিক সেনাদের পিছনে। একটি দল খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ডান দিকে এবং অপরটি ইকরামা বিন আবূ জেহেলের নেতৃত্বে বাম দিকে অবস্থান নেয়। এই যুদ্ধে আবূ সুফিয়ান ছিল কুরাইশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

মুসলিম বাহিনীর পক্ষে কিছু সংখ্যক মহিলাও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা), সায়বা (উম্মে আসারা), উম্মে সালীত, উম্মে সালীম এবং আরও অনেকে। আহতদের সেবাযত্ন করা এবং তৃষ্ণার্ত মুজাহিদগণকে পানি প্রদান করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। কুরাইশদের পক্ষে ২৫ জন মহিলা যুদ্ধে অংশ নেয়। সংকটময় এবং ঝুঁকিপূর্ণ কোন দায়িত্ব পালন না করলেও এই যুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল হিংস্রতা এবং নিষ্ঠুরতায় ভরা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারা সেনাবৃন্দকে নানাভাবে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত করতে থাকে। তাঁরা গানের সুরে বলতে থাকে যে, হয় তোমরা ফিরে এস বিজয়ীর বেশে নয় তো মৃত্যুকে মাথা পেতে নাও। কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী এবং উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুআবিয়ার মাতা হিন্দা ছিল মহিলাদের সর্দার। অন্যান্য মহিলা সঙ্গে নিয়ে সে কুরাইশ বাহিনীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। বাদ্যযন্ত্র বাজায় আর উত্তেজনাপূর্ণ গান গায়। মহিলাদের গানের মূল সুর ছিল, "যদি তোমরা বীরের মত যুদ্ধ কর, তোমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আলিংগন করব আর যদি রণে ক্ষান্ত দিয়ে পশ্চাদপসরণ কর তাহলে চরম অবহেলা এবং ঘৃণায় ত্যাগ করব।"

মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে হামজা এবং আলীর স্থান ছিল সবার শীর্ষে। সম্পর্কের দিকে হামজা (রা) রাসূল (সা)-এর চাচা। বদরের যুদ্ধে তিনি কুরাইশ বাহিনীর জন্য ছিলেন মস্তবড় একটা আতংক। এই যুদ্ধে তিনি বহুসংখ্যাক মূর্তিপূজারীকে হত্যা করেন। দুর্ধর্ষ কুরাইশ নারী হিন্দার পিতা এবং তার দু'ভাই হামজার হাতে নিহত হয়। রাসূল (সা)-এর ভাই'র ছেলে এবং জামাতা আলী যুদ্ধে খুবই চমৎকারিত্বের পরিচয় দেন। বদরের যুদ্ধে সর্বমোট ৭৩ জন মূর্তিপূজারী নিহত হয়। তন্মধ্যে ১৬ জন মারা যায় আলীর তলোয়ারের আঘাতে। শয়তানের শিরোমণি আবূ জেহেলও ছিল এই দলে।

কুরাইশ বাহিনীতেও ছিল দু'জন খ্যাতিমান যোদ্ধা–একজন আবূ জেহেলের পুত্র ইকরামা, অপর জন খালিদ । ইকরামা ছিল একজন দুঃসাহসী ঘোড় সওয়ার। স্বভাবের দিক থেকে সে ছিল একরোখা এবং অপরিণামদর্শী । বদর যুদ্ধে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার উদগ্র বাসনা যেন তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। খালিদও ছিল অসম সাহসী যোদ্ধা। কিন্তু তার স্বভাব এবং আচরণে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল, যা কেবল খ্যাতিমান এবং সফল অধিনায়কগণের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতপক্ষে

এই বৈশিষ্ট্যগুলোই খালিদকে অন্যান্য যোদ্ধাদের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করে।

ওয়াহশি নামে পরিচিত আবিসিনীয় একজন দাস ছিল কুরাইশদের দলে। স্বভাবগতভাবে সে ছিল একটা বদ মাতাল, ঘৃণ্য মদখোর। একজন সফল বর্শা নিক্ষেপকারী হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম-সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু সে আমলের লোকেরা যুদ্ধ-বিগ্রহে বর্শা ব্যবহার করত না। ওহুদের যুদ্ধে সে এমন একটা জিনিসি অর্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে যার জন্য কারও কোন প্রকার আগ্রহ ছিল না। হিন্দা মনমাতানো পাগল-পারা গান গাইতে গাইতে এক সময় ওয়াহশির সামনে এসে হাযির হয়। তখন হিন্দার গলায় ছিল একটি মূল্যবান হার। ওয়াহশি লোভাতুর দৃষ্টিতে হারের দিকে তাকায়। ব্যাপারটা হিন্দার নজর এড়ায় না। সে ওয়াহশির মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ায় এবং লোভ দেখিয়ে বলে, যদি তুমি হামজাকে হত্যা করতে পার এ হার তুমি পাবে।

আরবের প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রথমে শুরু হল দ্বৈত যুদ্ধ। কিন্তু বীর হামজার পরাক্রম এবং আলীর নৈপুণ্যের মুকাবিলায় কুরাইশ বাহিনী খুব সুবিধা করতে পারল না। উপায়ান্তর না দেখে তারা এ বার সদলবলে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানেও মুসলিম বাহিনী তাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখল। সন্মুখ সমরে সুবিধা করতে না পেরে খালিদ এবার ভিন্ন পথ ধরে। মুসলিম বাহিনীর বাম অংশ এবং রুমাগিরি পথের মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশের আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে খালিদের চেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে দু'পক্ষে চলতে থাকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। অবশেষে মুসলমানদের চাপের মুখে কুরাইশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে কুরাইশ মহিলারা দ্রুত গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করে। যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই তাদের অনুসরণ করে।

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তীরন্দাজ বাহিনী কাফেরদের এই দুর্গতি লক্ষ্য করে। এবং মুসলমান বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রত্যক্ষ করে তারা ধরে নেয় যে বিজয় তাদের আসন্ন এবং অবধারিত। সম্ভাব্য বিজয়ের কথা মনে আসতেই তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। তারা ভুলে যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূল (সা) স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে -যদি দেখ যে বিজয় আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে তবু তোমরা গনীমত মালের পেছনে ছুটবে না। এমনকি যদি দেখ যে, শত্রুসৈন্য আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করছে, তবু তোমরা আমাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে না-অথবা স্থান ত্যাগ করবে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দাঁড়াল এর ঠিক উল্টো। শত্রু সম্পদ আহরণের উদগ্র কামনার কাছে দায়িত্ববোধ হার মানল। ছয়-সাত জন ব্যতীত সকলেই পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এল। এলোপাতাড়ি ছুটে চলল পশ্চাদপসরমান কুরাইশদের পেছনে।

মুসলিম বাহিনী মূল লাইন ছেড়ে সামনে এগিয়ে গেলেও তাদের ডান দিকের অংশ ওহুদ পাহাড়ের সুউচ্চ অংশ দ্বারা মোটামুটি নিরাপদ রয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল বাম প্রান্ত নিয়ে। সেনাবাহিনী সামনে এগিয়ে যাওয়ার ফলে বাম দিকে রুমা পাহাড়ের কাছে বড় রকমের একটি অরক্ষিত ফাঁক তৈরী হল। যে কয়জন তীরন্দাজ তখনও পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করছিলেন তাঁরা বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং অরক্ষিত অংশটুকু প্রহরার ব্যবস্থা নেন। কিন্তু রুমা পাহাড়ের পূর্বাংশের পথটি অরক্ষিত থেকে যায়। খালিদ শুরুতে এই পথ দিয়ে মুসলিম বাহিনীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এই অবসরে সে আবার তৎপর হয়ে উঠল এবং এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করতে চাইল না। মুষ্টিমেয় তীরন্দাজের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এবার সে রুমা পাহাড়ের অরক্ষিত স্থানের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করল। দুর্বল মুসলিম ঘোড় সওয়ার বাহিনীকে খালিদ অল্পতেই বিপর্যস্ত করে দিল। শত্রুসৈন্যের অগ্রযাত্রা লক্ষ্য করে মুসলিম বাহিনী সচল হয়ে উঠে। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলিম সেনাদের অভিজ্ঞতা ছিল কম। সৈন্য সংখ্যাও ছিল সীমিত। তারা এমন দুর্যোগময় পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হল। বিফলে গেল তাদের প্রতিরোধ প্রয়াস। খালিদের দেখাদেখি ইকরামার ঘোড় সওয়ার বাহিনী নতুন করে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছত্রভঙ্গ পদাতিক বাহিনীও ততক্ষণে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে। তারাও সদলবলে মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করল। মুসলিম বাহিনী তখন পড়ে গেল এক চরম সংকটাবস্থায়।

ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী তবু হাল ছাড়ল না। জীবনকে বাজি রেখে তারা যুদ্ধ করতে লাগল। আমীর হামজা বীরবিক্রমে শত্রুসৈন্যের মুকাবিলা করলেন। আহত বা হত্যা করলেন অনেককে। ওয়াহশি আমীর হামজাকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ করেই সে দূর থেকে আমীর হামজাকে দেখতে পায়। পেছন থেকে সে একটি বিষাক্ত বর্শা আমীর হামজার দিকে ছুঁড়ে মারে। সিদ্ধহস্ত ওয়াহশির বর্শা বিফলে গেল না। আমীর হামজার পেট ভেদ করে বর্শা বেরিয়ে গেল। চোখের পলকে আমীর হামজা ঘুরে দাঁড়ালেন। বুঝতে বাকী রইল না যে এটা ওয়াহশির কাজ। তিনি দ্রুত ওয়াহশির দিকে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু বিষাক্ত বর্শা ততক্ষণে তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধের ময়দানেই শহীদ হলেন।

আমীর হামজার ইন্তেকালের পর পরই ওহুদের প্রান্তরে ঘটে যায় অনেক ঘটনা। হঠাৎ করেই সর্বত্র একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সবাই বলাবলি শুরু করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) শহীদ হয়েছেন। এই সংবাদে হতোদ্যম মুসলিম বাহিনী একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়েন। অনেকেই আবার যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। অবশ্য বেশ কয়েকটি দল তাঁদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা অব্যাহত

রাখে। রাসূল (সা)-কে ঘিরে একটি দল তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং পরিকল্পিতভাবেই তাঁরা সরে আসছিলেন তাঁদের নিরাপদ ছাউনির দিকে। আলী, আবূ উবায়দা এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের মত বীরপুরুষ ছিলেন এই দলে। শত্রুপক্ষের পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা এই দলটিকে একেবারে ঘিরে ধরেছিল। যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাহার করার সময় রাসূল (সা) আহত হলেন। তবে এ কথা সত্য যে শত্রুবাহিনীর আঘাতের ভয়াবহতার তুলনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। সম্ভবত এর পশ্চাতে দু'টি কারণ রয়েছে।

প্রথমত রাসূল (সা) এই দলে অবস্থান করলেও তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত গুজবের কারণে এই দলের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং কুরাইশ বাহিনী বড় রকমের কোন আক্রমণ পরিচালনার প্রয়োজন মনে করেনি।

দ্বিতীয়ত এই দলটি ছিল খুবই ছোট। তাছাড়া শত্রুসেনারা পতঙ্গের পালের মত সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ফলে ছোট এই দলের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী তেমন কোন সুবিধা করতে পারেনি।

রাসূল (সা)-কে ঘিরে রাখা এই দলটি ততক্ষণে উত্তর-পশ্চিম কোণের খাড়া উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করেন। সেখানে তাঁরা একটি অপরিসর ছোট গুহায় আশ্রয় নেন। যে কয়জন অনুসারী তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা গায়ে-গা লাগিয়ে গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে রাসূল (সা)-এর গুহায় অবস্থানের কথা জানাজানি হয়ে যায় এবং হতাশাগ্রস্ত মুসলমান সৈন্যগণ গুহার কাছে জড়ো হতে শুরু করেন।

মুসলমানরা হেরে গেছে। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে। কুরাইশ বাহিনীর অন্তরে তখন সে কি আনন্দ। বিজয় উল্লাসে তারা মেতে উঠে। তৃপ্ত হয় ভীষণভাবে। কিন্তু নিষ্ঠুর এবং হিংস্র কুরাইশ মহিলাদের তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। তারা ভিন্ন পথে এগুলো। শহীদ মুসলমানগণের মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করে তাদের বিজয়কে কলংকিত করে তুলল। হিন্দা ঘৃণ্য আক্রোশে হামজার মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুক চিরে টেনে বের করে তাঁর হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ডটি মুখে পুরে সে চিবাতে শুরু করে এবং গিলে ফেলার চেষ্টা করে। হৃদপিণ্ড চিবাতে চিবাতে এক সময় তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তখন সে এটিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হিন্দা এবং কুরাইশ বাহিনীর এতসব হিংস্রতা এবং বর্বরতার কারণ সহজে বোধগম্য হলেও তাদের আচরণ একান্তই ক্ষমার অযোগ্য।

তবে একটি বিষয়ে মক্কাবাসীদের আচরণ খুবই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় রয়ে গেছে। যে নবীজীকে তারা জানের শত্রু মনে করত, যাঁকে তারা কোনক্রমেই সহ্য করতে পারছিল না, তাঁর প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য মক্কাবাসীরা সত্যিকার অর্থে কোন উদ্যোগ নেয়নি। অথচ যুদ্ধের ময়দানে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান এবং রাসূল (সা)-এর বেশ কয়েকজন সহচরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এমন এক সময় এই

ঘটনাটি ঘটে যখন মক্কাবাসীরা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং মুসলমানরা অবজ্ঞার সঙ্গে তা অগ্রাহ্য করে। এমন কি কয়েকজন মুসলমান রাসূল (সা)-কে নিয়ে পাহাড়ের যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, শত্রুসেনারা সেখানে জোর আক্রমণ করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে এত প্রস্তরখণ্ড এবং কংকর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে যে কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণ ভণ্ডুল হয়ে যায় এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এসব ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, কুরাইশরা রাসূল (সা)-কে বেষ্টনকারী দলের ক্ষতি করার মত ব্যাপক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ রসূল (সা)-এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ এমন এক স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন যেখানে আক্রমণ পরিচালনা করা ছিল একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া রাসূল করীম (সা)-এর পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থানের বিষয়টিও ছিল তাদের কাছে অজানা। এবং সে কারণেই বিজয়ী বাহিনী সদলবলে ফিরে যায় নিজেদের মূল শিবিরে।

জীবিত মুসলিম সেনারা সমবেত হয়ে গোটা অবস্থা পর্যালোচনা করে নিলেন। রাসূল (সা) ভালভাবেই জানতেন যে তাঁকে হত্যা করাই কুরাইশদের মূল লক্ষ্য। ওহুদের প্রান্তরে তারা মুহাম্মদ (সা)-কে খুঁজে না পেয়ে হয়ত তারা ভাববে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) কোন এক ফাঁকে মদীনায় ফিরে গেছে। আর সে কারণেই হয়ত বিজয় উল্লাসে মত্ত কুরাইশ বাহিনী নতুন করে মদীনায় আক্রমণ করে বসবে এবং তাঁকে হত্যা করে চিরদিনের মত তাদের সমস্যার সমাধান করবে। মদীনা আক্রমণের এই সম্ভাবনার কথা ভেবে রাসূল (সা) খুবই শংকিত হয়ে উঠেন। রাসূল (সা) পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করে দিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী স্বল্প সময়ের মধ্যে আবারো সংগঠিত হলেন। তাঁরা তৈরী হলেন কুরাইশদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য।

কিন্তু পার্থিব বুদ্ধিসম্পন্ন কুরাইশদের চিন্তা ছিল অন্যরকম। তারা ভাবল, মদীনা আক্রমণ করলে স্থানীয় গোত্রগুলোর মধ্যে জাতিগত বিবাদের উদ্ভব হতে পারে। কেউবা চলে যাবে কুরাইশদের বিপক্ষে। আরবের ঐতিহ্য অনুসারে এ বিবাদ একবার শুরু হলে তা সহজে শেষ হবার নয়, বরং তা চলতে থাকবে বংশ পরম্পরায়। তাছাড়া জাত ব্যবসায়ী হিসাবে তারা এটাও অনুমান করতে পেরেছিল যে, মদীনার উপর চড়াও হলে হয়ত বাণিজ্যপথের আশেপাশের কোন গোত্র তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সুযোগ পেলেই তারা বিপদাপন্ন করবে তাদের বাণিজ্যবহরকে। ফলে কুরাইশদের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আসলে স্বল্পমেয়াদী দু'টো উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছিল। প্রথমত বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়া, দ্বিতীয়ত শক্তিশালী জাতি হিসেবে নিজেদের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তারা যখন দেখল যে এ দু'টো উদ্দেশ্যই অর্জিত হয়েছে তখন তারা ফিরে গেল স্বদেশে। কুরাইশদের অবশ্য দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা ছিল। তারা ঠিক করে রেখেছিল

যে, মদীনার স্থানীয় অধিবাসীদের কোন ক্রমেই ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে না। বরং ইহুদী এবং মুনাফিক সম্প্রদায়কে দিয়েই কাটা তুলতে হবে। তাদের প্ররোচিত ও ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এতসব চিন্তা করেই তারা মদীনা আক্রমণ না করে মক্কার পথ ধরে। রাসূল (সা) এবং তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী বেশ খানিকটা পথ কুরাইশদের অনুসরণ করেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তারা সত্যি সত্যি মক্কায় চলে যাচ্ছে, তখন তিনিও ফিরে এলেন মদীনায়।

মুসলমানদের জন্য বদরের বিজয় ছিল খুবই গৌরবোজ্জ্বল। তেমনি গৌরবোজ্জ্বল ছিল ওহুদের পরাজয়। চমৎকার কৌশল এবং রণচাতুর্যের সঙ্গে রাসূল (সা) যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এককভাবে অধিনায়কত্বের উপর যদি যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করত, তাহলে বদরের যুদ্ধের ন্যায় ওহুদের যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় ছিল অবধারিত। কিন্তু বিশৃঙ্খল একটি তীরন্দাজ বাহিনী শত্রুসম্পদের লিপ্সায় অধিনায়কের স্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করল। তারই ফলে যে চমৎকার এবং নিশ্চিত বিজয় ছিল তাদের হাতের মুঠোয়, চোখের পলকে তা হাতছাড়া হয়ে গেল। বস্তুতপক্ষে জিহাদের ইতিহাসে ওহুদের যুদ্ধ "শৃঙ্খলা চর্চার" একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ
(২০ আগস্ট ৬৩৬)

মুহাম্মদ (সা) ছিলেন নবী, আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। তিনি ছিলেন আইন প্রণেতা, ধর্মীয় নেতা, প্রধান বিচারপতি, সেবাবাহিনীর অধিনায়ক, সর্বোপরি রাষ্ট্রপ্রধান। ফলে ৬৩২ সালে তাঁর ইন্তেকালে শিশু ইসলামী রাষ্ট্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। সর্বত্র চরম শূন্যতার সৃষ্টি হয়। স্পস্টতই নবী হিসেবে তাঁর কোন বিকল্প অথবা উত্তরাধিকার সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধর্মীয় এবং জাগতিক বিষয়ে একজন যোগ্য উত্তরাধিকার নির্বাচন করা জরুরী হয়ে পড়ে। এবং নবীজীর অনুপস্থিতিতে খলিফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের মধ্যে বড় রকমের একটা সমস্যার উদ্ভব হয়। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় মতপার্থক্য। তাঁরা বিভক্ত হয়ে পড়েন ছোট ছোট কয়েকটি দলে। প্রথম মতপার্থক্য দেখা দেয় মক্কার মুহাজির এবং মদীনার আনসারগণের মধ্যে। নবীজীর নিজের গোত্র বনু হাশিম এবং কুরাইশদের মধ্যেও মত-পার্থক্য দেখা দেয়। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল থেকে খলিফা নির্বাচনের জন্য দাবী করেন। খিলাফতের উত্তরাধিকার নিয়ে পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ঝগড়া-ফাসাদ এবং রক্তপাত হলেও, প্রথমবারের এই মতপার্থক্য বড় একটা দীর্ঘায়িত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দীর্ঘদিনের সহচর হযরত আবূ বকর (রা) সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে। রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর এসব অঞ্চলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তার কোন সহজ ও শান্তিপূর্ণ সমাধান পাওয়া গেল না।

বেদুঈন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রবলভাবে দানা বাঁধল যে রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। কতিপয় গোত্র নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলেও মদীনায় যাকাত প্রেরণ বন্ধ করে দিল। তারা যুক্তি দিল যে তাদের যাকাতের অর্থ তাদের গোত্রের দুস্থ এবং অসহায়দের প্রাপ্য। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) বিভিন্ন গোত্রের এই ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন যে এ ধরনের কোন নিয়ম চালু হলে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির ভিত্তি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়বে। কারণ, যাকাত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ কেবল দরিদ্রের সাহায্যের জন্যই ব্যয় করা হয় না, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের

প্রতিরক্ষা এবং যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এই অর্থ থেকে পরিশোধ করা হয়।

দ্বিতীয়ত কতগুলো গোত্র নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করলেও যাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করল। হযরত আবূ বকর (রা) এই মতের অনুসারীদের স্বধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন যে যাকাত প্রদানে অস্বীকার করার মানে হল ইসলামের অন্যান্য রীতি-নীতিগুলো অস্বীকার করা।

তৃতীয়ত কতগুলো গোত্র সরাসরি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় ফিরে গেল পৌত্তলিকতায়। চতুর্থ দলটি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে বেশ কিছু সংখ্যক ভণ্ড নবীর অনুসারী হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হল। এসব ভণ্ড নবীদের মধ্যে একজন ছিল মহিলা।

ইসলাম ধর্মের প্রতি কিছু সংখ্যক গোত্রের বিক্ষোভ অল্প সময়ের মধ্যে গণঅসন্তোষের রূপ নেয় এবং ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইসলামের ইতিহাসে এদের পরিচয় স্বধর্মত্যাগী হিসেবে। বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এ ধরনের আচরণের পশ্চাতে তাদের আজন্ম মানসিকতা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তাছাড়া বিশেষ করে বেদুঈনরা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া কোন নিয়ন্ত্রণকে কখনও সহ্য করতে পারেনি। তাছাড়া জন্মগতভাবেই তারা নিজ গোত্র বা বংশের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রদর্শন করতে অভ্যস্ত। অন্য কোন শক্তির প্রতি আনুগত্য অথবা বিশ্বস্ততার প্রশ্ন উঠলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন আরব গোত্রের এ ধরনের আচরণ মূলত তাদের মানসিকতার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাত্র। ইসলাম ধর্ম কবুল করে বেদুঈন আরবরা অনিচ্ছাকৃতভাবে রাসূল (সা)-এর নিকট তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। বস্তুতপক্ষে তাদের আনুগত্য ছিল একমাত্র রাসূল (সা)-এর নিকট, অন্য কারও কাছে নয়। ফলে রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রগুলো ধরে নেয় যে তাদের আনুগত্যের ধারাও পাল্টে গেছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এখন তারা স্বাধীন। মক্কা-মদীনা এবং তায়েফের লোকদের বাদ দিয়ে গোটা আরব উপদ্বীপের সকল গোত্রের জন্য একথা কম বেশী সত্য। তারা মদীনাকেন্দ্রিক খিলাফতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। সুযোগ আসলেই বিদ্রোহ করে।

নবীজীর ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে কনস্টানটিনোপলের খ্রিস্টান নৌবহর সিরীয় সীমান্ত দিয়ে মুসলমান এলাকায় অনুপ্রবেশ করে। নবীজীর নির্দেশে সিরিয়ার বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটি বাহিনী তৈরী হয়ে যায়। তাঁরা মদীনার বাইরে সুবিধাজনক একটি জায়গায় সমবেত হলেন। উসামা হলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। ইতিমধ্যে রাসুল (সা) ইন্তেকাল করেন। বিভিন্ন গোত্রের অভ্যুত্থান, স্বধর্ম ত্যাগ, ইসলামের মৌল অনুশাসন প্রতিপালনে অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়ের

প্রতি লক্ষ্য রেখে নব নির্বাচিত খলিফার ঘনিষ্ঠ সহচরগণ সিরীয় সীমান্তে আক্রমণ পরিচালনা করতে বারণ করেন। মদীনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি এবং খিলাফতের ভিত্তি সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু খলিফা আবূ বকর (রা) বললেন অন্য কথা। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, রাসূল (সা) নিজের জীবদ্দশায় যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সে নির্দেশ খলিফা কিছুতেই স্থগিত রাখতে পারেন না। খলিফার অনুমতি নিয়ে উসামার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার পথে যাত্রা শুরু করার পরপরই স্বধর্ম ত্যাগীরাও বিপুল সংখ্যায় মদীনার উপর চড়াও হয়। খলিফা হযরত আবূ বকর (রা) এমনিতেই নরম স্বভাবের মানুষ। তারপর বয়সও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইসলামের এই ঘোর দুর্দিনে তিনি চমৎকার তেজস্বিতা এবং সাহসিকতার পরিচয় দেন। অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে তোলেন একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী। সম্পূর্ণরূপে নাস্তানাবুদ করে দেন বিধর্মী আক্রমণকারীদের। মহাসাগরের মাঝে একটি দ্বীপকে যেমন খুবই নগণ্য এবং ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিপুল স্বধর্মত্যাগীদের মুকাবিলায় রাসূল (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনা একটি ক্ষুদ্র এবং সুনিশ্চিত শহরের মতো রয়ে গেল।

খিলাফতের গোড়ার দিকে মুসলমানদের অবস্থা এতটা সঙ্গীন ছিল যে, রাসূল (সা)-এর প্রথম সারির সাহাবাগণ পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে যান। তাঁরা নামেমাত্র মুসলমান গোত্রগুলোর প্রতি নমনীয় এবং সংযমপূর্ণ আচরণ করার জন্য খলিফাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) ছিলেন খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি এদের সঙ্গে আপোস রফায় পৌঁছা অথবা কোনরকম দুর্বলতা প্রদর্শনের ক্ষতিকর প্রতিফলকে পূর্বাহ্নেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। নামেমাত্র মুসলমান গোত্রগুলো থেকে তিনি যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন। তিনি বলে দেন যে, শুরুতে বুঝে–শুনে তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে কোন ফল না হলে বল প্রয়োগ করতে হবে। যারা কপট ও বিশ্বাসঘাতক, যারা স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

সিরিয়ার সীমান্ত থেকে উসামার প্রত্যাবর্তনের পরপরই হযরত আবূ বকর (রা) স্বধর্মত্যাগীদের প্রতি নজর দেন। তিনি তাদের দমন করার জন্য ১১ টি বাহিনী তৈরী করেন। একটি বাহিনীকে ছেড়ে দিলেন বীরবল খালিদের তত্ত্বাবধানে। তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রথমে বিদ্রোহী বনি আসাদ গোত্র এবং তাদের ভণ্ডনবী তোলায়হাকে কঠিন হস্তে শায়েস্তা করতে হবে। তারপর তাঁকে এগুতে হবে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারী বনু তামিম গোত্রের বিরুদ্ধে। ভণ্ডনবীদের মধ্যে মুসায়লামা ছিল সবচাইতে বেশী ক্ষমতাশালী। ইয়ামাহা অঞ্চলের শক্তিমান এবং ধর্মান্ধ বনু হানিফা গোত্র তাকে সমর্থন করেছিল। তাকে শায়েস্তা করার জন্য খলিফা ইকরামা বিন আবু জহল এবং সুরাহ বিল বিন হাসানাহ-এর নেতৃত্বে দু'টি বাহিনী পাঠিয়ে দেন।

ইয়েমেন থেকে বাহরাইনের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং ইয়েমেনের বেশ কতকগুলো গোত্র ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে। তারা সাধ্যমত ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। আবূ বকর (রা)-এর বলিষ্ঠ শাসন থেকে এরাও অব্যাহতি পেল না। ৮টি বাহিনীকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ইয়েমেন এবং বাইরাইন অঞ্চলে।

ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে সেনাপতি খালিদ তোলায়হা এবং তার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেন। এরপর তিনি বীরবিক্রমে এগিয়ে যান বনু তামিম গোত্রের দিকে। প্রথম আঘাতেই বনু তামিম গোত্র হার মানে এবং গোত্র প্রধান মালিক বিন নাওয়ারাহ নিহত হয়। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে খালিদের অভিযান সফল হলেও ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর চরম বিপর্যয় ঘটে। খলিফা এবার খালিদকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামাহায় পাঠিয়ে দেন এবং সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে খালিদকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। ইয়ামাহায় পৌঁছে তিনি মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের কারণ জানতে পারেন। সেনাপতি ইকরামা সুরাহবিলের অপেক্ষা না করে একাকী মুসায়লামার বাহিনী আক্রমণ করায় পরাজিত হয়। পুরাতন বন্ধু ইকরামার এ ধরনের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য খালিদ তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, "বিজয় সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত না হয়ে কোন বিজ্ঞ অধিনায়ক কখনও যুদ্ধে নামে না।"

ইতিমধ্যে মুসায়লামা বনু হানিফা গোত্রের সহযোগিতায় শক্তিশালী একটা মৈত্রী সংঘ গড়ে তুলে। বনু হানিফা গোত্রের লোকেরা ছিল খুবই দুর্ধর্ষ ও তেজস্বী যোদ্ধা। ধর্মের ব্যাপারে তারা ছিল একেবারেই অন্ধ। মুসায়লামার বাহিনীর তুলনায় খালিদের সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। যুদ্ধের ময়দানে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধ 'মৃত্যুর বাগান' (গার্ডেন অব ডেথ) বলে পরিচিত। এই যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হলেও তারা ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিতে সমর্থ হন। কথিত আছে যে এই যুদ্ধে ২১০০০ বিধর্মী নিহত হয়। ভণ্ডনবী মুসায়লামাও রেহাই পায়নি মৃত্যুর হাত থেকে। দীর্ঘ সাত মাস যুদ্ধের পর খালিদ ধর্মত্যাগীদের নির্মূল করতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধের পরে খলিফা সেনাবাহিনীকে ভেঙ্গে দিলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও খানিকটা বিশ্রাম নেয়ার প্রত্যাশায় সেনাপতি খালিদ চলে আসেন ইয়ামাহার একটি মরূদ্যানে। কিন্তু সেখানেও তিনি বেশী দিন অবকাশ জীবন কাটাতে পারেননি।

তদানীন্তনকালে পারস্য সম্রাট ইরাক শাসন করত। ইরাক সীমান্তের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাস করত বনু বকর নামে একটি মুসলিম সম্প্রদায়। বনু বকর গোত্রের একটি গোষ্ঠীর নাম ছিল বনু সায়বান। মুসান্না ইবনে আল-হারিসা ছিলেন এই গোষ্ঠীর প্রধান সর্দার। পারস্য সম্রাটের সঙ্গে একবার বনু বকর গোত্রের অসম বিবাদ বাঁধে। গোড়ার দিকে মুসান্না মোটামুটি টিকে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পারস্য সম্রাট সেখানে আরও বেশী সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে এবং এককভাবে মুসান্নার পক্ষে

পারস্য বাহিনীর মুকাবিলা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তিনি খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বলতে গেলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তিনি খালিদকে ইরাক যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বলে দিলেন যে নিয়মিত কোন বাহিনীকে ইরাক পাঠান যাবে না। যারা স্বেচ্ছায় অংশ নেবে তাদের নিয়ে তিনি অভিযানে বের হবেন। ইতিপূর্বে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তেমন ৫০০ পাকা যোদ্ধাকে নিয়ে খালিদ যথাশীঘ্র একটি বাহিনী গড়ে তুললেন। খলিফার নির্দেশ মুতাবিক তিনি চলে গেলেন ইরাক সীমান্তে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু মাখজুম গোত্রের সন্তান। প্রভাব এবং প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা ও সম্পদের প্রাচুর্য এবং খ্যাতিমান অসংখ্য পুত্র সন্তানের জন্য তাঁর পিতা ওয়ালিদের সুখ্যাতি ছিল সর্বত্র। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় কুরাইশ বংশের দায়িত্ব বন্টন রীতি অনুসারে বনু মাখজুম গোত্রকে সব সময় পদাতিক বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হত। এমনি একটি পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ সেই ছোটবেলা থেকেই একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠেন। প্রথম যুগে তিনি ছিলেন ইসলামের একজন ঘোরশত্রু। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত পদাতিক বাহিনীর আচমকা আক্রমণের কারণেই ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে যায়। নবীজীর ইন্তেকালের বছর তিনেক পূর্বে খালিদ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। রাসূল করীম (সা) খালিদকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তায়েক এবং বনু হাওয়াজিনে অভিযানকালে তাঁকে মুসলমানদের অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব দেয়া হয়। খালিদের সামরিক নৈপুণ্যের চমৎকারিত্ব মু'তা যুদ্ধের সময় প্রকাশ পায়। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় 'মৃত সাগরে'র দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে মু'তা নামক স্থানে এবং ৮ হিজরী মুতাবিক ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করতে করতে বাইজান্টাইনের অনেকখানি অভ্যন্তরে চলে যায়। এই সময় দুর্ধর্ষ এবং উন্নতমানের অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রুসেনারা আচমকা মুসলিম বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য রাসূল (সা) তিনজন অধিনায়ককে আগে থেকেই বাছাই করেছিলেন। কার পর কে যুদ্ধে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নেবেন তাও নির্দিষ্ট করা ছিল। যুদ্ধের সময় যাতে কোন রকম শূন্যতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু একে একে তিনজন অধিনায়কই শত্রুসেনার হাতে শহীদ হন। এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে খালিদ বিন ওয়ালিদ বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। নতুন প্রেরণায় সুকৌশলে তিনি বিপর্যস্ত বাহিনীকে আবার সংগঠিত করেন। এবং শত্রুপক্ষের সাঁড়াশী আক্রমণ থেকে মুসলিম বাহিনীকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। মু'তার যুদ্ধে খালিদের চমৎকার নৈপুণ্যের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে "আল্লাহ্‌র তলোয়ার" খেতাবে ভূষিত করেন।

৬৩৩ সালের এপ্রিল থেকে ৬৩৪-এর মার্চ পর্যন্ত খালিদ ইরাক সীমান্তে পারস্য

কাস্পিয়ান সাগর
আলেপ্পো
এন্টিয়ক
কিন্নাসোরিন
মোসুল
নিনেভে
তেহরান
সাইপ্রাস
ত্রিপলী
হামা
হিম্স
ভূমধ্য সাগর
হামাদান
বৈরুত
আল মুতা
দামেস্ক
নিহাওন্দ
টেসিফোন
ইস্ফাহান
আলেকজান্দ্রিয়া
হাইফা
ইয়ারমুক
জেরুজালেম
ডোমিয়েটা
ফিহল
কুফা
গাজা
হীরা
কারাকির
কাদিসিয়া
মানসুরাহ
মুতা
উবাল্লা
কায়রো
আকাবাহ
খালিদের সিরিয়া
হাফির
বসরা
কাজিমা
দুমাতুল জান্দাল
তাবুক
বনু কলব
পারস্য উপসাগর
বনু আসাদ
খায়বার
ওহুদ
বনু তামীম
ইয়ামামাহ
বনু হানিফা
মদীনা
বদর
নাবিয়া
কুরেশ
মক্কা
জেদ্দা
তায়েফ
মধ্যপ্রাচ্য ৬৩০ খৃঃ
স্কেল: ১ ইঞ্চি = ২০০ মাইল
১০০ ৫০ ০ ১০০ ২০০ ৩০০
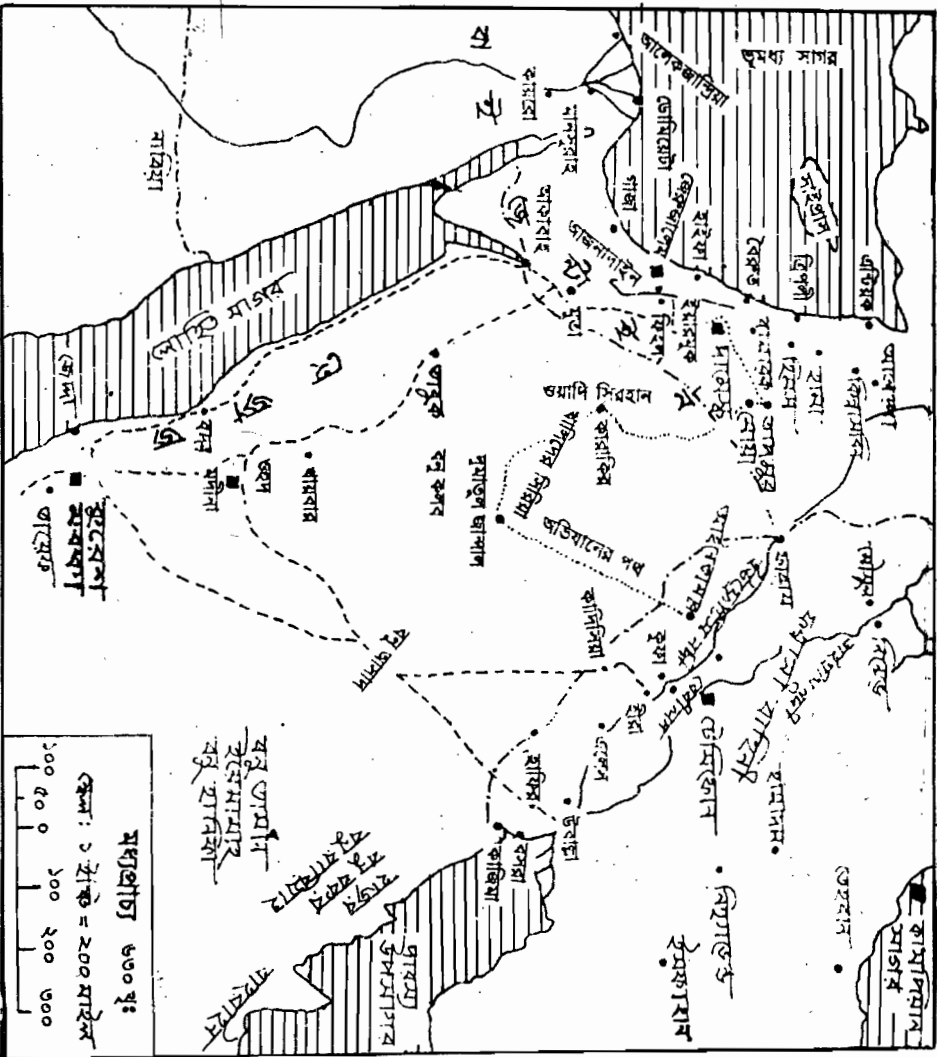
সম্রাটের বিরুদ্ধে বেশ কতগুলো অভিযানে নেতৃত্ব দেন। উবুল্লা, মাজার, ওয়ালজাহ, আলিস, হীরা, অম্বর, আইন, তামার এবং দুমাতুল জান্দাল সহ মোট ১৫টি যুদ্ধে তিনি পারস্য বাহিনীকে পরাভূত করেন। এই বিজয়গুলো খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইরাকের একজন অবিসংবাদী নেতার মর্যাদা দান করে। তাইগ্রীসের বাম তীরেই ছিল পারস্য সম্রাটের রাজধানী টেসিফোন। এবার খালিদ রাজধানী আক্রমণের জন্য তৈরী হলেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাইজান্টাইন বাহিনী যাতে পশ্চাদদিক থেকে মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করলেন। বাইজান্টাইন এবং পারস্যের সীমান্তেই ছিল ফিরাদ নামের সুরক্ষিত একটি দুর্গ। খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হন। পারস্যের বাহিনী এবং স্থানীয় খ্রিস্টান গোত্রগুলো একসঙ্গে জোট বাধে। তারা বিরাট এক বাহিনী নিয়ে ইউফ্রেটিসের পথে খালিদকে বাধা দেয়ার জন্য তৈরী হয়। বিবদমান দুটি পক্ষ ইউফ্রেটিস নদীর দুই তীরে ছাউনি ফেলে। এমতাবস্থায় পারস্য সেনাপতি খালিদকে দুটি প্রস্তাব দেন এবং যে কোন একটিকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

প্রথমত, খালিদ ইচ্ছা করলে তার বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে অপর প্রান্তে চলে আসতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে নদী পার হওয়ার সময় তার বাহিনীকে আক্রমণ না করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, নদী পারাপারের সময় কোনরকম হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিলে পারস্য বাহিনীও নদী অতিক্রম করে অপর প্রান্তে চলে আসতে সম্মত আছে।

মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে খালিদ শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হলেন। পরবর্তী যুদ্ধে পারসিকরা সম্পূর্ণরূপে হার মানে এবং খালিদ ফিরাদ শহরটি দখল করে নেন। খালিদের ইরাক ত্যাগের পর তাঁর স্থলভিষিক্ত আবূ উবায়েদকেও বিপক্ষ পারস্য সেনাপতি একই প্রস্তাব দেয়। আবূ উবায়েদ প্রস্তাব মুতাবিক নদী অতিক্রম করতে সম্মত হন। কিন্তু তার বাহিনী পারস্যের তীরে পৌঁছানোর পূর্বেই শত্রু বাহিনী তাদের আক্রমণ করে। ফলে মুসলিম বাহিনী ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হল। যুদ্ধে আবূ উবায়েদ শহীদ হলেন। এ সময় খালিদ পারস্য সম্রাটের রাজধানী টেসিফোন আক্রমণের ব্যাপারে দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে গেলেন। অবশ্য রাজধানী দখল কখনও খালিদের মূল লক্ষ্য ছিল না। এদিকে সিরিয়ার সীমান্তেও মুসলিম বাহিনী চরম এক সংকটের মুখোমুখি হল। হঠাৎ করেই খলিফা খালিদকে অবিলম্বে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ছিল অত্যাসন্ন। বস্তুতপক্ষে ইরাকে খালিদের অভিযান একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা। ইটালীতে হ্যানিবলের অভিযানের চেয়েও এই অভিযান ছিল অধিক ফলপ্রসূ এবং গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী স্থানীয় আরব গোত্রগুলো রোম সম্রাটের বশ্যতাকে মেনে নিয়েছিল। রোমক বাহিনী এবং স্থানীয় আরব গোত্রগুলো সম্মিলিতভাবে সিরিয়ায়

সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের বেশ কয়েক বছর পূর্বে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়। বসরার খ্রিস্টান রাজকুমার রাসূল (সা) প্রেরিত একজন দূতকে হত্যা করার পর এই বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। মুসলমানগণ এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্যোগ নেন। তারই ফলে সংঘটিত হয় মু'তার যুদ্ধ। যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনী পরাস্ত হয়। মুসলমান এলাকার অভ্যন্তরে খ্রিস্টান আরবদের আক্রমণ প্রয়াসকে নিরুৎসাহিত করার জন্য রাসূল (সা)-কে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তাবুকে একটি অভিযান পরিচালনা করতে হয়। ক্ষমতা প্রদর্শনের ফলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হলেও সীমান্তের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত এবং বিপদসংকুল থাকার কারণে সেখানে মুসলমানদের একটি স্থায়ী বাহিনী রাখতে হয়। এমনকি স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ যখন খুবই সংকটাপন্ন, ঠিক তখনও এই বাহিনীকে সরিয়ে নেয়া হয়নি।

ইরাকে মুসলিম বাহিনীর বিজয় সংবাদে রোমানরা শংকিত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির ফলে চাপা উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন করে বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা। মুসলমান বাহিনী সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি রোমান চৌককে পর্যুদস্ত করে দেয়। কিন্তু ট্রান্স জর্দানের অভ্যন্তরে প্রবেশকালে মুসলিম বাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়।

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব আরবের স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত মুসলিম বাহিনী এ সময় বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে আসেন। খলিফা বিজয়ী বাহিনীকে সিরিয়ায় যুদ্ধযাত্রার জন্য উৎসাহ দেন। নতুন প্রেরণায় উচ্ছল করে তোলেন। এই অভিযানে মোট ৪টি বাহিনী অংশ নেয়। প্রতিটি বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৭ হাজার। একটি বাহিনী নিয়ে আমর বিন আস মৃত সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত ওয়াদি আল আরাবার পথে যাত্রা করেন। দ্বিতীয় বাহিনী নিয়ে উবায়দাহ বিন আল জারাহ তাইবেরিয়াস-এর অভিমুখে যাত্রা করেন। সুরাহ বিল হাসানা তৃতীয় বাহিনী নিয়ে চলে যান দামেশকের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের জাবিয়াহ অঞ্চলে। সর্বশেষ বাহিনী নিয়ে ইয়াজিদ বিন আবূ সুফিয়ান দামেশকের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বলকা নামক স্থানে এসে হাযির হন। প্রত্যেকটি বাহিনী বীরবিক্রমে শত্রুর মুকাবিলা করল। কিন্তু আমর বিন আল আস ব্যতীত আর কেউ শত্রুসেনার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অগ্রগতি অর্জন করতে পারলেন না।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমকরা তাদের পরিকল্পনা ঠিক করে নেয়। তারা স্থির করে যে একে একে মুসলমানদের চারটি প্রধান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে হবে। অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় সেনারা বোঝাপড়া করবে। কৌশলগত দিক বিবেচনা করে তারা প্রথমে আমর বিন আল আসকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ মৃত সাগরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আমরকে হটাতে পারলে অন্যান্য বাহিনী সহজেই

রোমক বাহিনীর আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে। রোমানদের ব্যাপক পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে খলিফা খালিদকে অবিলম্বে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। তাঁকে নিয়োগ করা হয় মুসলমানদের সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে।

সময়টা ছিল খুবই সংকটময়। দামেশকে যাওয়ার উত্তর দিকের পথটি ছিল সহজ। কিন্তু পথটি ছিল ঘুরান এবং বেশ দীর্ঘ। তাছাড়া রোমানরা পথের মাঝে মাঝে অসংখ্য দুর্গ তৈরী করে রেখেছিল। এসব বিষয় বিবেচনা করে খালিদ ৮০০০ সৈন্যসহ ৫০০ মাইল দীর্ঘ জনমানবহীন সিরীয় মরুভূমি অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নেন। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল মহাবীর খালিদের একটি দুঃসাহসিক অভিযান। খালিদের পূর্বে অথবা পরে আর কেউ এ ধরনের দুঃসাহস দেখায়নি। বৃদ্ধ এবং মোটা উটগুলোকে একনাগাড়ে কয়েকদিন কোন পানি পান করতে দেয়া হল না। কিন্তু যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে সবগুলো উটকে বেশী বেশী করে পানি খাওয়ানো হল। উটগুলো যাতে জাবর কাটতে না পারে সেজন্য সবগুলো উটের মুখ সেলাই করে দেয়া হল। কারণ, জাবর কাটতে না পারলেই উটের পাকস্থলীতে বেশী পরিমাণ পানি জমা থাকবে। তাছাড়া চামড়ার মশকে ভর্তি করে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ পানি নেয়ার ব্যবস্থা করা হল। যে উটগুলোকে তিনি কেবল পানি বহন করার জন্য সঙ্গে এনেছিলেন, প্রতিটি বিরতি স্থানে তেমন কয়েকটি উটকে জবাই করে তার গোশত খাওয়া হয়। জবাই করা উটের পেটের সঞ্চিত পানি পান করে অন্যান্য উট। এমনি এক পরিবেশ এবং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তেজোদীপ্ত মুসলিম বাহিনী রোমানদের নির্মূল করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এই দীর্ঘ মরুপথে কেবল দুমাতুল জান্দালের মরূদ্যান এবং কুরাকিবে খানিকটা পানি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, দুমাতুল জান্দাল এখন আল-জাউফ নামে অধিক পরিচিত এবং মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে মরুভূমির মাঝামাঝি জায়গায় কুরাকিবের কুয়াটি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সিরিয়ার সীমান্ত বরাবর রোমানরা কতগুলো মজবুত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। মুসলিম বাহিনী ওয়াদি আল সিরহানের বাণিজ্য পথে রোমান দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়। বাণিজ্য পথ ধরে অগ্রসর হওয়াটা খানিকটা আয়াশসাধ্য হলেও খালিদ এই পথটাকে একদম পছন্দ করলেন না। তিনি ভাবলেন, এ পথ দিয়ে এগুতে গেলে একদিকে সময় নষ্ট হবে, অপরদিকে যুদ্ধের আকস্মিকতাও বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কিন্তু ৮০০০ সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে নির্ভয়ে এগুবার মত আর কোন বিকল্প পথও খালিদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

খালিদ তাঁর বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। বৃহদাংশকে তিনি বাণিজ্য পথ ধরে এগুবার নির্দেশ দিলেন। এই পথে পানীয় জলের কোন অভাব নেই। তাছাড়া বিরুদ্ধ পরিবেশের ঝড়-ঝাপটাও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। খালিদ নিজে হাজার

খানেক ঘোড়-সওয়ার নিয়ে দামেশকের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের মরুভূমির মধ্য দিয়ে পাড়ি জমালেন। ওয়াদি সিরহানের সন্নিকটে এসে খালিদ তাঁর গতিপথ পাল্টালেন এবং প্রত্যাশিত পথ ছেড়ে দিয়ে ঘোড়-সওয়ার বাহিনী নিয়ে আচমকা 'সুবা' এবং 'তাদমুরের' নিকট পৌঁছেন। রোমান বাহিনী এখানে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। আকস্মিকভাবেই তিনি রোমান বাহিনীর উপর চড়াও হন এবং তাদের নির্মূল করে দেন। অথচ রোমান বাহিনীর উপর বিপর্যয় নেমে এসেছিল খালিদের ইউফ্রেটিস পরিত্যাগের মাত্র ১৮ দিন পরে। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ সহিষ্ণুতা এবং গতিশীলতার পরিচয় দেন।

কেউ কিছু জানার আগেই খালিদ দামেশকের সীমান্তে এসে হাযির হলেন। খালিদ এবং তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর আকস্মিক উপস্থিতি এবং তাদের গতিশীলতা অনুধাবন করে রোমানদের মনে এমন একটি বিশ্বাসের উদয় হয় যে খালিদের পশ্চাদভাগে অবশ্যই শক্তিশালী বিরাট একটি বাহিনী সিরিয়া আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে আছে। প্রথমেই তারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বনু গাসসান গোত্রকে খালিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। তারা দামেশক থেকে উত্তর-পূর্বে মাত্র ১৫ মাইল দূরে মারজ-রাহিত নামক স্থানে মুসলমান বাহিনীর মুখোমুখি হয়। কিন্তু গাসসান গোত্রের পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বিফলে গেল। তারা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হল ভীষণভাবে। অতঃপর রোমানরা দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলের দুর্গসমূহের সৈন্যদেরকে দামেশকে রক্ষার জন্য ডেকে পাঠাল। রোমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করে খালিদ তাঁর রণকৌশল ঠিক করে নিলেন। আবারও তিনি চোখের পলকে তার বাহিনী নিয়ে হারিয়ে গেলেন নির্জন মরুভূমির মধ্যে। রোমানরা যখন দামেশকের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মুসলমান বাহিনীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, ঠিক তখনই খালিদ তার ঘোড়া সওয়ারদের নিয়ে দামেশকের পশ্চিম এবং জাবাল দুরুজের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। সীমান্ত ঘাঁটির রোমান সৈন্যরা পূর্বেই দুর্গ ছেড়ে এসেছিল দামেশকে। ফলে কুরাকিবের পথে মুসলমানদের অভিযান ছিল নিরাপদ এবং বিপদমুক্ত। খালিদ এবার নির্বিঘ্নে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। আকস্মিক আক্রমণে তিনি বসরা দখল করে নিলেন। এদিকে প্যালেস্টাইনে আমর বিন আল আসের অবস্থা ছিল খুবই সংকটাপন্ন। তাঁকে সাহায্যের জন্য খলিফা ইতিপূর্বে অতিরিক্তি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে সাহায্যকারী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলেন।

দামেশকে খালিদের দুর্বার আক্রমণ রোমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে একটি রহস্যের মধ্যে ফেলে দেয়। এর ফলে দক্ষিণ সিরিয়ায় তাদের সুবিন্যস্ত বাহিনীর ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হয়। রোমান বাহিনী যখন আমরের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তৎপর, ঠিক সেই মুহূর্তে খালিদ সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জর্দানের পশ্চিম তীরে রামলাহ এবং বাইত জিবরিন-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আজনাদাইন নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ৬৩৪ সালের জুলাই কি আগস্ট মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আক্রমণের শুরুতেই খালিদ রোমান বাহিনীর দক্ষিণাংশ ঘিরে ফেলেন এবং তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। পশ্চাদদিক থেকে ঘিরে ফেলার কারণে বিপর্যস্ত বাহিনী প্যালেস্টাইনের সুরক্ষিত দুর্গে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেল না। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে জর্দান নদী পার হয়ে পূর্ব তীরে যেতে বাধ্য করলেন। ঘটনাচক্রে রোমান অধিনায়ক অরেলিয়ান মুসলমানদের প্রহরা অতিক্রম করে জেরুযালেমে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। মুসলিম বাহিনী যাতে আবার জর্দান নদী অতিক্রম করতে না পারে সেজন্য রোমানরা তৎপর হয়ে উঠে। "বাইসান"এর নিকেট জর্দান নদীর বাঁধগুলোকে তারা নষ্ট করে দেয় এবং পারাপারের অযোগ্য করে ফেলে। এতকিছুর পরও তারা মুসলমান বাহিনীকে প্রতিহত করতে পারল না। খালিদ জর্দান নদী ঠিকই অতিক্রম করে গেলেন। ৬৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে উভয় বাহিনী পুনরায় 'ফহল' নামক স্থানে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। রোমান বাহিনী এবারও দারুণভাবে মুসলমানদের হাতে বিপর্যস্ত হল।

দ্রুতগতিসম্পন্ন মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী রোমানদের সংঘবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ দিল না। হয় তাদের ধ্বংস করে দিল নয়ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল সিরিয়ার বাইরে। একটি অংশ গিয়ে আশ্রয় নিল উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায়। মুসলমানরা এবার দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত শহরগুলোর প্রতি নজর দেয়। তারা দামেশক শহরকে অবরোধ করে ফেলে এবং উপর্যুপরি প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুসলমানদের অনুন্নত কলাকৌশল এবং উপকরণের অভাবে তাদের সে প্রয়াস বিফলে গেল। প্রতিবারেই রোমানরা সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করল। অবরোধকালে নতুন খলিফা ওমর (রা) খালিদকে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং বৃদ্ধ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবূ ওবায়দাকে নিয়োগ করেন সর্বাধিনায়কের পদে। এই পদচ্যুতি খালিদকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না। পূর্বের মত তেজ এবং উদ্দীপনা নিয়েই তিনি ইরাক থেকে আনীত তার বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে আবূ ওবায়দার অধীনে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দামেশক দখলে আনতে মুসলমানদের বিলম্ব হচ্ছিল এবং এই অবসরে রোমানরা দুটো বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে। কিন্তু নবগঠিত বাহিনী দুটি সক্রিয় উদ্যোগ নেয়ার পূর্বেই খালিদ তাদের গতিরোধ করে পিছু হটাতে বাধ্য করলেন। এরপরও রোমানরা আবূ খালিদ ওবায়দার শর্ত অনুসারে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। এবার খালিদ তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানেন। খালিদের বাহিনী মই বেয়ে রোমানদের প্রতিরক্ষা দেয়াল অতিক্রম করে, নিকটবর্তী দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। মুসলিম সেনারা এরকম একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবার তারা শহরের মধ্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

খালিদের আক্রমণ কৌশল যতই দুঃসাহসিক হোক না কেন রোমানদের জন্য এটা ছিল একান্তই অচিন্তনীয়। উপায়ান্তর না দেখে তখনই আবূ ওবায়দার নিকট তারা পূর্ব-প্রদত্ত শর্তানুসারে আত্মসর্মপণ করে। মুসলিম বাহিনী দু'দিক থেকে এসে শহরের মাঝামাঝি জায়গায় মিলিত হয়। শহরের অর্ধাংশ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হলেও সমগ্র শহরবাসীর প্রতি আত্মসমর্পণের শর্ত মুতাবিক আচরণ করা হল।

মুসলিম বাহিনী এবার উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার প্রতি নজর দিল। হিমস্, হাদির এবং কিনাসারিন শহর অনতিবিলম্বে তাদের দখলে এল। আবূ ওবায়দা হিমসে তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন এবং দখলকৃত অঞ্চলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেন। খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন দামেশকের পূর্ব ও উত্তর সীমান্তে। রোমানদের অধিকৃত দুর্গ এবং শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু মহৎ এবং ধর্মপ্রাণ আবূ ওবায়দার পক্ষে রোমানদের গতিবিধি এবং কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ম ও যথাযথ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হল না। এমনকি এন্টিয়কে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উপস্থিতি যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমানদের সর্বাত্মক আক্রমণের পূর্ব-প্রস্তুতি মাত্র, তা-ও তিনি অনুধাবন করতে পারলেন না। বছর কয়েক পূর্বে পারসিকদের সঙ্গে রোমানদের যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে হিরাক্লিয়াস যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যে এত সহজে সিরিয়ার মত একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ মুসলমানদের হাতে তুলে দেবেন এমনটি আশা করা যায় না। প্রদেশটি পুনঃ দখলের জন্য তিনি যে একটি মরণ-কামড় দেবেন-এটাই স্বাভাবিক। মুসলমানদের সামরিক গোয়েন্দাগণ বিষয়টি উদঘাটন করতে না পারায় পরিণামে মুসলমানদের চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। নতুনভাবে সংগঠিত রোমানবাহিনী যখন দৃপ্ততেজে এন্টিয়ক থেকে অভিযান শুরু করে, কেবলমাত্র তখনই আবূ ওবায়দা এই অভিযানের কথা জানতে পারলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। হিমস এবং অন্যান্য শহরের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে জিযিয়া হিসেবে যে অর্থ আদায় করেছিলেন তা ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর আবূ ওবায়দা সদলবলে ফিরে আসেন দামেশকে।

রোমান সাম্রাজ্য ছিল খুবই বড়। এদের ছয়শত বছরের সামরিক ইতিহাস যেমনি গৌরবময়, তেমনি ঐতিহ্যপূর্ণ। শক্তির দিক থেকেও এদের সুনাম-সুখ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। পারসিকদের সঙ্গে ছিল এদের দীর্ঘদিনের বিবাদ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা রোমানদের উপর সর্বশক্তি দিয়ে উপর্যুপরি অভিযান চালিয়েছে। রোমানরাও অমিততেজে বার বার পারসিকদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে। মাত্র বছর আটেক পূর্বে রোমানরা একটি যুদ্ধে পারস্য বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। তাদের নিকট থেকে পুনঃ দখল করে নেয় 'ট্রুক্রস'। এশিয়া এবং ইউরোপের বর্বর জাতির উপর ঝটিকা আক্রমণের ব্যাপারেও এরা ছিল সিদ্ধহস্ত। রোমানদের ইতিহাস তাই

যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ঘটনাবহুল। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে অনেক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই সফলতার সূর্য তাদের হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে। অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং তেজোদ্দীপ্ত সম্রাট হিরাক্লিয়াস স্থির করলেন যে সিরিয়ার ভূমি থেকে মুসলমানদের নির্মূল করার সময় এসে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোললেন। ইউরোপ, সিরিয়া, এন্টিয়ক, আরমেনিয়া এবং আরবের গাসসান গোত্রের বাছা বাছা সৈন্যদের নিলেন এই দলে। অসম সাহসী থিওডোরাসকে নিয়োগ করলেন এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে।

দামেশকে মুসলমানদের পরামর্শ সভা বসল। গোপন সূত্রে জানা গেল যে ইতিমধ্যে রোমান বাহিনী দামেশকের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে। তারা এগুচ্ছে হিমস্, বালাবাক, জাহলাহ, মারজ আইউন এবং বানিয়াসের পথে। তারা বুঝতে পারল যে প্রচুর রসদ সংগ্রহ এবং সেনাবাহিনীতে আরও সৈন্য ভর্তির আশা নিয়েই রোমানরা এ পথ ধরেছে। বিশেষ করে এ পথে এগুলে উত্তর প্যালেস্টাইন থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের যোগ দেয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তার চেয়ে বড় কথা, রোমানদের এই অগ্রযাত্রা সফল হলে সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনী পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। রোমানরা এসে যাবে দামেশকে মূল মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদভাগের সন্নিকটে।

এ খবরও পাওয়া গেল যে, রোমান বাহিনীর বিপুল সমারোহ সদ্য অধিকৃত খ্রিস্টান গোত্রগুলোর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তারা রোমান বাহিনীর সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতার মনোভাব দেখাচ্ছে। এদিকে প্যালেস্টাইন থেকে আমর বিন আল আস এর প্রেরিত সংবাদও সুখকর ছিল না। আমর জানান যে, হিমস থেকে মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের ফলে সেখানে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার ঢেউ এসে লেগেছে প্যালেস্টাইনে। বিজিত অঞ্চলের যে সমস্ত অধিবাসী এক সময়ে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য দেখাত, এখন তারা অবাধ্য হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে সামরিক পরিষদ সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া থেকে মুসলিম বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। এই বাহিনী এগিয়ে যাবে ইয়ারমুক নদীর আরও দক্ষিণে। এতে করে রোমানদের অভিযানের পথ যেমনি দীর্ঘায়িত হবে, তেমনিভাবে মদীনার সঙ্গে মুসলমান বাহিনীর যোগাযোগ হবে দ্রুত এবং বিপদমুক্ত। আমর প্যালেস্টাইন ছেড়ে মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য বেশ খানিকটা সময় পাবেন এবং মদীনা থেকে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণের পথও সুগম হবে।

কাল বিলম্ব না করে সেনাপতি আবূ ওবায়দা মদীনায় দূত পাঠালেন। খলিফাকে জানিয়ে দিলেন সিরিয়ার সর্বশেষ অবস্থার কথা। অবস্থার ভয়াবহতা বিবেচনা করে

জাবিয়া
নাওয়া
সেনাছাউনী
পায়ে হাঁটা পথ
ফিক
নহরে রাক্কাদ
সেনা ছাউনী
বাইজানটাইন বাহিনী
আলান
জ্যালিন
ইয়ারমুক নদী

০ ২ ৪ ৬ ১০ মাইল
১ ইঃ = ৪ মাইল

সংকেত ঃ
বাইজানটাইন — পদাতিক বাহিনী — মুসলিম
— // — অশ্বারোহী বাঃ — // —
জলস্রোতের গিরিখাত
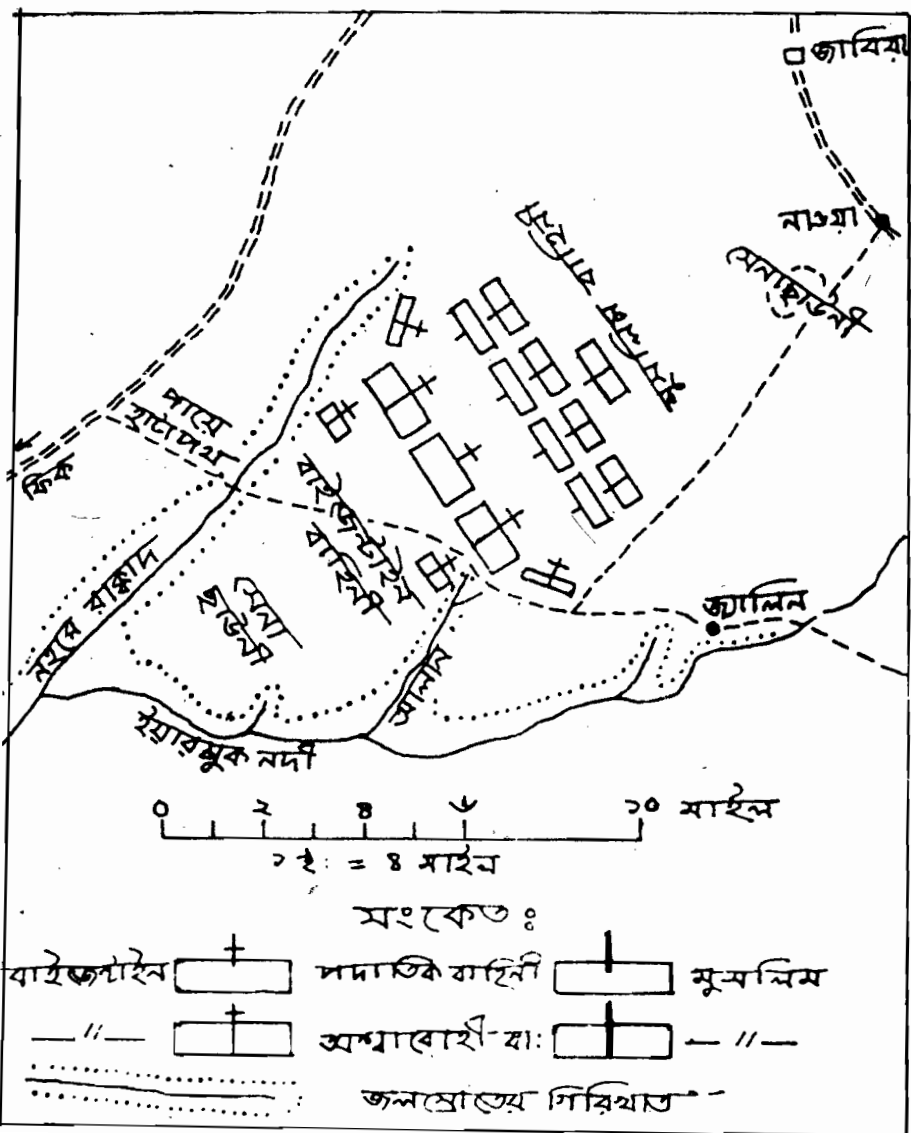
তিনি অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণের জন্যও অনুরোধ করলেন। দূত পাঠালেন আশপাশের মুসলমান বাহিনীর অধিনায়কগণের কাছে। সবাইকে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আবূ ওবায়দার নেতৃত্বে মূল বাহিনী ইয়ারমুকের দিকে অগ্রসর হল। প্রধান প্রধান শহর থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হল। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে জিযিয়া হিসেবে যে অর্থ আদায় করা হয়েছিল তা যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয়া হল।

খোশনিয়ায় এসে রোমান বাহিনী ইয়ারমুকের দক্ষিণে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপনের কথা জানতে পারে। খোশনিয়া থেকে ইয়ারমুকে আসার জন্য রোমান সেনাপতি থিওডোরাসের সামনে দু'টি পথ ছিল। প্রথমত খোশনিয়া হতে সে শেখ মাসকিন এবং দেরাজের পথে অগ্রসর হতে পারত। দ্বিতীয়ত পশ্চিম দিক থেকে চলে আসা 'ফিক' এবং মোলকার-এর পথও ছিল তার জন্য উন্মুক্ত। থিওডোরাস সম্ভাব্য দু'টি পথের একটিও গ্রহণ করল না। সে ভাবল তার বাহিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে তাদের খানিকটা বিশ্রামের প্রয়োজন। এই অবসরে আরও সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে। এতসব বিষয় বিবেচনা করে সে এমন একটি জায়গা খুঁজছিল যেখানে সে নিরাপদে শিবির স্থাপন করতে পারে। তাছাড়া জায়াগটি শত্রু শিবিরের এতটা কাছাকাছি হওয়া আবশ্যক যাতে সুযোগ বুঝে সে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ইয়ারমুক নদী 'হাওয়ারুন' পর্বত থেকে শুরু করে 'গ্যালিলি' সাগরের নিম্নভাগে এসে জর্দান নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জর্দান নদী এবং ইয়ারমুক নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ৩০ মাইল উজানে 'রাককাদ' নহরটি উত্তর দিক থেকে এসে ইয়ারমুকের সঙ্গে মিশেছে। নদীর আরও ৭ মাইল উজানে 'আলান' নামের আরেকটি ছোট জলস্রোত উত্তর দিক থেকে এসে ইয়ারমুকের সঙ্গে মিশেছে। আলান, নহর রাককাদ এবং ইয়ারমুক নদী বেশ গভীর। নদীর পাড়গুলো বেশ খাড়া। নদী এবং জলস্রোত দিয়ে তিন দিকে ঘেরা মাঝখানের ভূমিটুকু বেশ সমতল। স্থানটির নাম ওয়াকুশা। প্রায় ৭ মাইল লম্বা ও ৪ মাইল চওড়া এই স্থানটি। এই স্থানেই থিওডোরাস শিবির স্থাপন করল।

রাসূল (সা)-এর আমল থেকেই খলিফা ওমর (রা) খালিদের কতগুলো আচরণের তীব্র সমালোচনা করতেন। আচরণগুলোর মধ্যে ছিল-বনু জাদিমাহ গোত্রের বেশ কিছু মুসলমানকে হত্যা করা, যাকাত না দেয়ার অভিযোগে বনু তামিম গোত্রের সর্দার মালিক বিন নুয়ারকে হত্যা করার পর তার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরপরই বনু হানীফা গোত্রের সর্দারের কন্যাকে বিবাহ করা। বনু জাদিমাহ গোত্রের মুসলমানদের হত্যা করায় রসূল আকরাম (সা) দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অতি উচ্চমূল্যে এ আচরণের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু এজন্য

খালিদকে তেমনি কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। স্পষ্টতই তিনি ভুল বোঝাবুঝিকে এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার উৎপত্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ঘটনার কিছুকাল পরেই হাওয়াজিন গোত্রের বিরুদ্ধে অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তিনি খালিদকে নিয়োগ করেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর মতে দ্বিতীয় ঘটনা সৃষ্টির মূলে রয়েছে মতপার্থক্য । তৃতীয় ঘটনাটির ক্ষেত্রে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যরকম। তাঁর মতে, খালিদের মধ্যে ঔচিত্যবোধের অভাব ছিল বলেই শত্রু সেনাপতি কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এ ধরনের আচরণের জন্য খালিদকে খলিফার অনেক তিরস্কার সইতে হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপাারে ওমর (রা) ছিলেন খুবই কঠোর এবং স্পষ্টভাষী। তিনি খালিদকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার জন্য, অন্তত মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য আবূ বকর (রা)-কে বার বার অনুরোধ করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) দুটো প্রস্তাবকেই দৃঢ়তার সাথে অগ্রাহ্য করেন। তিনি অভিমত পেশ করেন যে, 'রাসূল (সা) খালিদকে মূর্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে 'আল্লাহ্‌র তলোয়ার' বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমি তাঁর এ উপাধিকে কোন ক্রমেই হরণ করতে পারব না।"

প্রথম যুগের সাহাবাগণের চরিত্র যতখানি উন্নত এবং বলিষ্ঠ ছিল, শেষের দিকে ইসলামের সাহচর্যে আসার জন্য খালিদের চরিত্রে ততখানি মাধুর্য এবং বলিষ্ঠতা ফুটে উঠেনি। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ওমর (রা) যখন মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হলেন, খালিদ তখন সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন। খলিফার পদ গ্রহণ করেই তিনি সেনাপ্রধানগণকে গনীমতের মালসহ অন্যান্য বিষয়ের হিসাব নিকাশ প্রেরণের নির্দেশ দেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ যথারীতি গনীমতের মাল প্রেরণ করলেও যতখানি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, ততখানি সতর্ক হতে পারেননি। তাছাড়া এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খানিকটা অনিয়মিত। বার বার তাগিদ দিয়েও খলিফা তেমন সুফল পেলেন না। অবশেষে সর্বাধিনায়কের পদ থেকে খলিফা তাকে অব্যাহতি দিলেন। খলিফা এমন এক সময়ে খালিদকে সরিয়ে দিলেন যখন মুসলিম বাহিনী দামেশক অবরোধ করে বসে আছে, তারা দিন গুণছে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য। কিন্তু খালিদ ছিলেন বিরল সামরিক প্রতিভার অধিকারী। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীতে একজন দক্ষ সমরবিদ হিসেবে তাঁর প্রভাব রয়ে গেল পুরোপুরিভাবে। সেনাবাহিনীর পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণে তাঁর অনন্য ভূমিকা অব্যাহত থাকল। ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অনুরূপ ভূমিকা পালন করলেন। বিভিন্ন অভিযান এবং যুদ্ধের সময় খালিদের এই অনন্য ভূমিকা লক্ষ্য করেই খলিফা ওমর (রা) মন্তব্য করেছিলেন যে, "মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই খালিদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।"

ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে খালিদ রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যায় রোমান সৈন্যদের 'ওয়াকুসা'র প্রান্তরে সমবেত হতে দেখে তাঁর অন্তরে জেগে উঠে আরেক চিন্তা। 'ওয়াকুসার' প্রবেশ পথের উপর তিনি ঝটিকা আক্রমণ চালান। শত্রুপক্ষের তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আকস্মিকভাবে তিনি দখল করে নেন গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবেশপথটি। কৌশলগত বিবেচনায় এটা ছিল থিওডোরাসের জন্য মস্ত বড় একটা পরাজয়। সে যেন যথার্থই একটা ফাঁদে আটকা পড়ে। এদিকে খালিদের এই সফলতাকে ধরে রাখার জন্য কৌশলগত আরেকটি বিজয় জরুরী হয়ে পড়ে। এই বিজয় অর্জনের জন্য তাঁকে যুদ্ধ করতে হয় মুসলমানদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে, যাদের প্রতিরক্ষা কৌশল এবং অবস্থান ছিল অধিকতর মজবুত এবং দৃঢ়।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খালিদের চমৎকার অধিনায়কত্বের ফলে মুসলমানগণ 'ওয়াকুসার' বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে 'রিদ্দা' যুদ্ধের সময় খালিদ সেনাপতি ইকরামাকে তিরস্কার করেছিলেন। তাঁর ব্যর্থতাকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে, বিজয় লাভের যথার্থ সম্ভাবনা ব্যতীত একজন বিজ্ঞ সেনাপতি কখনও শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায় না। ইতিপূর্বে 'ফিরাদ' যুদ্ধের সময় রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিন্তে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করার প্রস্তাব দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় যে, নদী অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত কোন রকম বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে না। এরপরও খালিদ মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নদী অতিক্রম করার ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করেন। আর সেই খালিদই দ্বিধাহীনচিত্তে 'ওয়াকুসার' প্রবেশ পথ দখল করার জন্য শত্রুশিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অথচ তার এই যুদ্ধ পরিকল্পনাটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, আক্রমণ ব্যর্থ হলে ইয়ারমুক নদীর গভীরতা এবং খাড়া পাড় অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদপসরণের কোন পথ থাকত না। কিন্তু খালিদের ভাবনা ছিল অন্য রকম। তিনি ভেবেছিলেন যে, রোমানদের কোনক্রমে পরাজিত করতে পারলে তাদের বাহিনী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপর দিকে দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। দ্রুতগতিসম্পন্ন মুসলিম বাহিনী এই ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নিতে পারবে। খালিদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর অতীত সাফল্য। 'মুতা'র যুদ্ধের সময় এই রোমান বাহিনীর হাতে মুসলমানরা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়। অথচ খালিদ বিপর্যস্ত এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে রোমানদের কবল থেকে সাফল্যের সঙ্গে উদ্ধার করেন। এতসব বিষয় বিচার-বিবেচনা করেই খালিদ 'ওয়াকুসায়' শত্রু শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর এই আক্রমণ ছিল একটি সুচিন্তিত ঝুঁকি মাত্র। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, যুদ্ধে জয় বা পরাজয় যা হোক না কেন, কৌশলগতভাবে এই যুদ্ধে মুসলমানদেরই জিত হবে।

রোমান ও মুসলিম বাহিনী কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পরস্পরের মধ্যে অর্থহীন আলাপ-আলোচনা চালায়। কখনও আবার একক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এভাবে কেটে যায় এক মাসেরও বেশি সময়। এই ফাঁকে উভয় বাহিনী অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। রোমানদের তুলনায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক কম। তবুও অধিকাংশ খণ্ডযুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়লাভ করে। এতে করে তাদের সাহস ও মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায়।রোমান সম্রাট মুসলমানদের নানাভাবে লোভ-প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। উৎকোচ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু নৈতিক বলে বলীয়ান মুসলমান বাহিনী দৃঢ়চিত্তে এসব কিছুই প্রত্যাখ্যান করে। আপোস করার সকল চেষ্টা বিফলে যাওয়ায় থিওডোরাস ৬৩৬ সালের আগস্ট মাসে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

হিরাক্লিয়াসের সৈন্যরা ছিল খুবই দুর্ধর্ষ এবং অসীম সাহসী। রণনৈপুণ্যে, দক্ষতায় এবং প্রশিক্ষণে তাদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। সামরিক ইতিহাসে থেরাসিয়ান, কেপাডোসিয়ান, আরমেনিয়ান এবং ইসাউরিয়ানরা জাত-যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত। হিরাক্লিয়াস এ সমস্ত জাতির বাছাই-করা সৈন্যদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং সে কারণেই তাদের সামরিক ইতিহাস যেমনি ঘটনাবহুল তেমনি গৌরবময়। তারা গভীর নিষ্ঠা এবং আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে চর্চা করত। এ ব্যাপারে অন্য কারও সঙ্গে তাদের তুলনা হত না। বিশেষ করে সৈন্য পরিচালনা বিদ্যার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল বেশী। তারা উৎসাহ দিত ধূর্ততা এবং শত্রুকে ফাঁকি দেয়ার কৌশলকে। রোমানদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে যুদ্ধের শুরুতেই তারা যুদ্ধের কৌশলগত সুবিধাগুলো নিশ্চিত করত। এ ব্যাপারে কোন সমরনায়কের কোন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেই তাকে ভীষণভাবে কটাক্ষ করত।

তৎকালীন সময়ে রোমান বাহিনী ছিল সবচেয়ে বেশী সুসংগঠিত। তাদের বাহিনী গঠিত হত পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে। প্রতিটি দল আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ভাগ হালকা অস্ত্র এবং অপরটি ভারী অস্ত্রে সজ্জিত থাকত। তাছাড়া ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার এবং রসদ সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র দল থাকত এই বাহিনীতে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে 'মরিসের' সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলে এই বাহিনী আরও দৃঢ় সংগঠিত এবং উন্নত হয়। তখনকার দিনে রোমান বাহিনী যে কত উন্নত ছিল তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকেই বোঝা যায় :

ক. গোড়ার দিকে রোমান বাহিনীর সৈন্যরা গোত্রীয় প্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত। মরিসের সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলে তাদের আনুগত্য চলে যায় সম্রাটের নিকট।

খ. তিনি গোটা বাহিনীকে কতগুলো ব্যাটালিয়ানে বিভক্ত করেন। জরুরী প্রয়োজনে এই ব্যাটালিয়ন আবার কতগুলো ব্রিগেডে এবং ডিভিশনে সংগঠিত হতে পারত।

গ. বাহিনীর সকল সদস্যকে তীর ও বর্শা নিক্ষেপ এবং গেরিলাযুদ্ধে পারদর্শী করে তোলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হত।

ঘ. সর্বোপরি যুদ্ধের অস্ত্র এবং উপকরণের ব্যাপারেও তারা ছিল যথেষ্ট সচেতন। এগুলোর মানও ছিল যথেষ্ট উন্নত।

রোমানদের হালকা পদাতিক বাহিনী তীরন্দাজ এবং বর্শা নিক্ষেপকারীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। তাদের গায়ে থাকত সাঁজোয়া পোশাক। হাতাহাতি যুদ্ধের সুবিধার্থে প্রত্যেক সদস্যের হাতে থাকত মারামারি করার উপযুক্ত ছোট্ট একটি কুঠার। ভারী পদাতিক বাহিনীর সদস্যদের মাথায় থাকত হেলমেট, গায়ে দিত সাঁজোয়া জামা, হাত এবং পা ঢেকে রাখত শক্ত আবরণে। সঙ্গে থাকত ঢাল, বল্লম, তলোয়ার এবং যুদ্ধ -কুঠার। ভারী অশ্বারোহী বাহিনী ছিল রোমানদের মূল ভরসাস্থল। এদের বলা হত বিজয়ী ফৌজ। এরাই শত্রুর হাত থেকে বিজয় পতাকা ছিনিয়ে আনত। অশ্বারোহী সৈন্যরা মাথায় লোহার হেলমেট পরত, গায়ে দিত লম্বা সাঁজোয়া জামা, হাতে থাকত শক্ত আবরণ, পায়ে দিত লোহার জুতা। সামনের সারির ঘোড়াগুলো ললাটে বন্ধন এবং 'পোয়েট্রেলস' দিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হত। অশ্বারাহী বাহিনীর অস্ত্রের মধ্যে থাকত একটি তলোয়ার, একটি ধারাল ছোরা, একটি ধনুক ও তীর এবং একটি লম্বা বল্লম। কেউ কেউ আবার তলোয়ারের সঙ্গে একটি কুঠারও রাখত। হালকা অশ্বারোহী বাহিনী গঠিত হত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ঘাসানিদ গোত্রের লোকদের নিয়ে। এই ঘাসানিদ গোত্রের লোকেরা জাতিতে আরব হলেও রোমানদের সঙ্গে একটি মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

সমরবিদ্যায় রোমানদের চেয়ে মুসলমানদের অভিজ্ঞতা অনেক কম। শুধুমাত্র গোত্রীয় বিবাদ-বিসংবাদের কারণে তারা সাধারণ যুদ্ধ এবং মারামারিতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল দুর্বল। যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কেও সমরনায়কগণের বড় একটা ধ্যান-ধারণা ছিল না। পেশার মাপাকাঠিতে বিচার করলে তারা ছিলেন নেহায়েত শিক্ষানবিস। ব্যাটালিয়ন, ডিভিশন, ব্রিগেড প্রভৃতি বিভাগে সেনাবাহিনীকে তখনও বিন্যস্ত করা হয়নি, বরং গোত্রই ছিল সৈন্যদের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার মূল ভিত্তি। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি গোত্রের একটি ব্যানার থাকত। গোত্রীয় ব্যানার অথবা পরিচয়কে সামনে রেখেই তারা জিহাদে অংশ নিত। গোত্রীয় পরিচয় এবং আনুগত্য কখনও মুসলিম বাহিনীর জন্য দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়াত। দেখা যেত যে, মূল যুদ্ধের মাঝে বিভিন্ন গোত্র পরস্পরের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দিত। কখনও আবার ছোটখাটো ব্যাপারে মন কষাকষির কারণে তারা সরে দাঁড়াত যুদ্ধের ময়দান থেকে। অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকত।

মুসলিম বাহিনীতে ছিল দু'টি দল-পদাতিক এবং অশ্বারোহী। হালকা, ভারী অথবা অস্ত্রের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না। পদাতিক বাহিনীর

অস্ত্রের মধ্যে ছিল ঢাল, তলোয়ার এবং বর্শা। কেউ কেউ আবার শুধুমাত্র তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধে যেত। অশ্বারোহী সৈন্যরা সাধারণ এবং বড় আকারের একটা বল্লম ব্যবহার করত। যোদ্ধাদের অনেকেই পরিবার-পরিজন এবং গোলামদের সঙ্গে রাখতেন। তারা সাধারণত আহতদের সেবাযত্ন এবং বিপর্যস্তদের মধ্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন।

মুসলমান সেনারা ছিল মরুভূমির সরল ও সাধারণ সন্তান। প্রধানত উট ও ঘোড়া নিয়েই ছিল এদের কারবার। কোন স্থায়ী ঘাঁটি থেকে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার প্রায় প্রয়োজন হত না। অল্প সময়ের মধ্যে তারা দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে এ কারণেই অবস্থানগত সুবিধা অর্জনের জন্য তারা দ্রুততার সাথে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে পারতেন। কিন্তু তাদের দুর্বলতা ছিল ব্যূহ রচনা এবং যুদ্ধের কলাকৌশল-এর ব্যাপারে। এদিক থেকে অবশ্য রোমানরা অনেকখানি অগ্রগামী ছিল। তাই বলা যেতে পারে যে নিম্নমানের অস্ত্র, দুর্বল সংগঠন এবং গোত্রীয় বা বংশীয় পরিচয় নিয়েই মুসলমান সেনারা ইয়ারমুকের প্রান্তরে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত রোমান বাহিনীর মুখোমুখি হলেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ২০ হাজার অশ্বারোহী এবং ১০ হাজার পদাতিক সৈন্য অংশ নেয়। এরা যুদ্ধে এসেছিলেন স্বেচ্ছায় এবং নিজেদের আগ্রহে। পরিকল্পিতভাবে মুসলমান সেনাদের কোন ডিভিশনে বিভক্ত করা হয়নি। নিজেদের পছন্দ এবং ইচ্ছা-মাফিক এক একজন অধিনায়কের অধীনে থেকে তারা যুদ্ধ করতেন। মোটামুটিভাবে ইয়ারমুকের লড়াইয়ে মুসলমানদের পক্ষে ছিল পাঁচটি দল। এক একটি দলকে এক একটি ডিভিশনও বলা যেতে পারে। প্রতি দল বা ডিভিশনে আনুমানিক ৪ হাজার অশ্বারোহী এবং ২ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিলেন। তারা যুদ্ধের ময়দানে তিন লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। পদাতিক বাহিনীর ১০ হাজার সৈন্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে সামনের কাতারে দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় লাইনে ছিল ১৫ হাজার অশ্বারোহী। এরাও চারটি দলে বিভক্ত হয়ে পদাতিক বাহিনীর ঠিক পেছনে দাঁড়ালেন। ৪ হাজার অশ্বারোহীকে রাখা হল রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে। এরা অবস্থান নিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে ঠিক মাঝখানে। এই যুদ্ধে বিভিন্ন দলের অধিনায়কগণের মধ্যে ছিলেন আমর বিন আল আস্, সুরাহ বিল, আবূ ওবায়দা, ইয়াজিদ বিন সুফিয়ান এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ। অধিনায়কগণের মধ্যে বিভিন্ন দলের পরিচালনার ভার নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের ডান দিকের বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হল আমার বিন আল আসের উপর, সুরাহ বিল মাঝখানের ডান অংশ এবং আবূ ওবায়দা মাঝখানের বাম দিকের অংশের সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন। বাম দিকের সর্বশেষ দলটির অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেলেন ইয়াজিদ বিন আবূ সুফিয়ান। রিজার্ভ বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত

হলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ।

ইরাক অভিযানের শুরু থেকেই খালিদের সঙ্গে শক্তিশালী একটি পদাতিক বাহিনী ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে এই বাহিনীকে কিভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল অথবা কার নেতৃত্বে দেয়া হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে আবূ ওবায়দা ছিলেন শক্তিশালী এই দলের অধিনায়ক। এ ছাড়া অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে একটি অগ্রগামী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে এই বাহিনী খালিদের রিজার্ভ ফোর্সের সঙ্গে যোগ দেয়। যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনী ৪/৫ মাইল এলাকা জুড়ে লম্বালম্বিভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের উভয় পার্শ্বভাগই ছিল উন্মুক্ত।

রোমান বাহিনীর ভারী পদাতিক বাহিনী মাঠের ঠিক মাঝখানে আগে পেছনে মোট দু'টি কলামে অবস্থান নেয়। প্রতি কলামে ১৬টি লাইনে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। যুদ্ধের ময়দানে পদাতিক বাহিনীকে এভাবে সাজানোটা ছিল রোমানদের একটি বিশেষ পদ্ধতি। বিশেষ করে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় তারা এভাবেই দাঁড়াত। হালকা পদাতিক বাহিনী দাঁড়াল ভারী পদাতিক বাহিনীর দু'পাশে। বিরোধী পক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণের সময় অথবা পদাতিক বাহিনীর প্রবল চাপের মুখে টিকতে না পারলে তারা চলে আসত ভারী পদাতিক বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে। অশ্বারোহীর বাহিনীর একটি দল পদাতিক বাহিনীর ডান পার্শ্বে এবং অপর একটি দল বাম পার্শ্বে অবস্থান নেয়। প্রতিটি দলে অশ্বারোহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার এবং তারা দাঁড়ায় দুই লাইনে। তাছাড়া অশ্বারোহীদের নিয়ে গঠন করা হল শক্তিশালী দু'টি রিজার্ভ ব্রিগেড।

প্রতিটি ব্রিগেডে ছিল ২ হাজার অশ্বারোহী। একটি ব্রিগেড দাঁড়াল মূল বাহিনীর পশ্চাতে, একেবারে ডান দিকে। অনুরূপভাবে অপর ব্রিগেডটি দাঁড়াল পশ্চাদ্‌ভাগে বাম দিকে। সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে ডান ও বাম কোণে বেশ কিছু জায়গা তখনও খালি পড়েছিল। খোলা জায়গাটুকু মুসলমানরা দখল করে নিতে পারে–এমন একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই থিওডোরাস অশ্বারোহী ফৌজের দু'টি দলকে দুই কোণে মোতায়েন করে। প্রতিটি দলে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল এক হাজারের মত। ঘাসানিদ গোত্রের হালকা অশ্বারোহী ফৌজকে মোতায়েন করা হয়েছিল সবার সামনে। খণ্ডযুদ্ধ পরিচালনা করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। রোমান বাহিনীর ডান প্রান্তে ছিল উন্মুক্ত স্থলভূমি। কিন্তু বাম সীমান্তে ছিল নহরে রাককাদ এবং এই পথে মুসলমানদের আক্রমণের কোন সম্ভবনা ছিল না।

মুসলিম অগ্রগামী রেজিমেন্টের সঙ্গে ঘাসানিদ অশ্বারোহী ফৌজের মুখোমুখি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের শুরু হয়। রোমানদের মিত্রশক্তি ঘাসানিদ অশ্বারোহীরা খুব বেশী অনুগত না থাকায় মুসলমানদের অগ্রগামী বাহিনীর মুকাবিলায় সুবিধা করতে

পারল না। প্রথম আঘাতেই পরাজিত হল। ঘাসানিদ সর্দার জাবালার কিছু সংখ্যক ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছাড়া পরবর্তী সময়ে আর কাউকে এই যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যায়নি। এর পরই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে চার-পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর উভয় বাহিনী ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে ৩০ হাজার ভারী অশ্বারোহী, ২০ হাজার ভারী পদাতিক এবং রোমান ও আরব বংশোদ্ভূত মোট ১৬ হাজার হালকা পদাতিক সৈন্য অংশ নেয়। রোমানদের মুকাবিলায় মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ হাজার। তন্মধ্যে ২০ হাজার ছিল অশ্বারোহী এবং অবশিষ্ট ১০ হাজার পদাতিক।

চূড়ান্ত যুদ্ধের ধারাবাহিক বিবরণ মোটামুটি নিম্নরূপ :

রোমান সেনাপতি থিওডোরাস বাম প্রান্তের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর ডান অংশের পদাতিক যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। আমর বিন আল আসের নেতৃত্বে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও তারা রোমানদের গতিরোধ করতে ব্যর্থ হলেন। রোমানরা নিশ্চিহ্ন করে দিল পদাতিক ফৌজকে। পদাতিক বাহিনীর পেছনেই ছিল অশ্বারোহী ফৌজ। অবস্থার ভয়াবহতা লক্ষ্য করে তারা রোমানদের অগ্রসরমান অশ্বারোহী ফৌজের উপর পাল্টা হামলা চালায়। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। কিন্তু এই সংঘর্ষে রোমান অশ্বারোহীদের সংখ্যাধিক্য এবং উন্নত অস্ত্রের মুকাবিলায় মুসলমান সেনারা সুবিধা করতে পারছিল না। খালিদ এবার মধ্যভাগের ডান দিকের অশ্বারোহী ফৌজকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সম্মিলিত অশ্বারোহী ফৌজের আক্রমণে রোমানরা একেবারে হকচকিয়ে যায়। রুদ্ধ হয় তাদের অগ্রযাত্রা। ব্যাপক ক্ষতি স্বীকার করে তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সংঘর্ষে মুসলমানদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্বার এবং মরণঘাতী আক্রমণ চালাতে গিয়ে ইকরামাহ বিন আবূ জহল এবং তাঁর ছেলেকে একই সাথে শহীদ হতে হয়েছে।

থিওডোরাস এবার ডান প্রান্তের ভারী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বাম প্রান্তের পদাতিক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। ডান প্রান্তের অতিরিক্ত রেজিমেন্টও মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। রোমানরা এবার অপূর্ব বিজয় লাভ করে। পদাতিক বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে রোমানরা অশ্বারোহী ফৌজের উপর প্রবল হামলা চালায়। বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়েও মুসলমানরা সুবিধা করতে পারল না। রোমানরা মুসলমানদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে ভেঙ্গে দেয় এবং তাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখে। তারা মুসলমান অশ্বারোহী ফৌজের প্রায় পশ্চাদ্ভাগে চলে আসে। পাশেই ছিল আবূ ওবায়দার অশ্বারোহী ফৌজ। জীবনকে বাজি রেখে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি রোমানদের অগ্রযাত্রা খানিকটা স্তিমিত করতে সমর্থ হলেও তাদের গতিরোধ করতে পারলেন না। গোটা অবস্থা পর্যবেক্ষণ

করে খালিদ আক্রমণ পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন। রিজার্ভ ফোর্সের একটি অংশকে সরাসরি পাঠিয়ে দিলেন থিওডোরাসের বিরুদ্ধে। খালিদ লক্ষ্য করলেন যে, রোমানদের অশ্বারোহী বাহিনী ইতিমধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সুবিধাজনক অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে, তাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে থিওডোরাসের তেমন উদ্যোগ নেই। খালিদ এবার আরও সচল হয়ে উঠেন। তিনি মুসলিম অগ্রগামী বাহিনীকে রোমানদের অশ্বারোহী বাহিনীর পশ্চাদদিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী চারদিক থেকে রোমানদের ঘিরে ফেলে। আসলে মুসলমানদের এই আক্রমণ ব্যূহ ভেদ করা রোমানদের পক্ষে কঠিন কিছু ছিল না। যথাযথ উদ্যোগ এবং তৎপরতা থাকলে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে তারা অনায়াসে ফিরে আসতে পারত পূর্বের সুবিধাজনক স্থানে।

থিওডোরাস ছিলেন একজন খ্যাতিমান যোদ্ধা। যুদ্ধের মাঠে সৈন্য পরিচালনা এবং সেনাপতি হিসেবে তার অভিজ্ঞতাও দীর্ঘদিনের । সেদিক থেকে বিচার করলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানদের বিরাট বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণের মত যথার্থ যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, তিনি দু'দুবার মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান। বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ তখন চিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তিনি যদি সামগ্রিকভাবে একযোগে মুসলমানদের আক্রমণ করতেন, অথবা তাঁর বাহিনীর অংশবিশেষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে প্রাথমিক সুবিধা বা বিজয় লাভ করেছিল, সেটুকু কাজে লাগাতেন, তাহলে হয়তবা যুদ্ধের গতি অন্যরকম হত। হয়ত প্রথম আঘাতেই সে মুসলমানদেরকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারত। কারণ, মুসলমানদের তুলনায় তার বাহিনী ছিল অনেক বড়, সুসংগঠিত এবং উন্নতমানের অস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু তার ভ্রান্ত রণকৌশলকে মুসলমানরা যথাযথভাবেই কাজে লাগায়। মুসলমানরা বারবার তাদের বাহিনীর বৃহদাংশ দিয়ে রোমান অশ্বারোহী ফৌজের ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। রোমানদের অবশিষ্ট বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রোমান মুসলমানদের সংঘর্ষ দেখে। থিওডোরাস সম্ভবত পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই যুদ্ধের কৌশল রচনা করেছিলেন। ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে রোমানদের ভারী অশ্বারোহী বাহিনী সব সময় শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ এবং আক্রমণকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। সম্ভবত থিওডোরাসের মনে এ ধরনের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, অন্যান্য যুদ্ধের মত এই যুদ্ধেও রোমানদের অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে হেস্ত-নেস্ত করে ছাড়বে। এখানেই ছিল থিওডোরাসের মস্ত বড় ভুল। মুসলমানদেরকে অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে একাকার করে দেখা ঠিক হয়নি। তার বোঝা উচিত ছিল মুসলমান সমাজের ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত, তাদের বিশ্বাস এবং যুদ্ধের প্রেরণা অন্যদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সে কারণেই একই রণকৌশলের

পুনরাবৃত্তি করা উচিত হয়নি।

দ্বিতীয়বারের ব্যর্থতা থিওডোরাসকে আরও বড়রকম ভুলের দিকে ঠেলে দিল। সে তার রণকৌশলকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলে। আক্রমণের নীতিকে পরিহার করে সে এবার আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করাই তার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

খালিদ এবার আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নেমে আসেন। তিনি স্থির করেন যে শত্রুপক্ষের মধ্যাংশ এবং ডান দিকের অংশকে স্থান ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকে। বরং সুকৌশলে বাম দিকের অংশকে সরিয়ে দিতে হবে। তাহলেই রোমানদের বিশাল বাহিনী আটকা পড়বে ওয়াকুসার সমতল প্রান্তরে। ইয়াজিদ বিন আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর বাম এবং মধ্যভাগ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সংঘর্ষ যাতে না বাঁধে তেমনি একটি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে। মুসলিম বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে থিওডোরাস পদাতিক বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেন। হালকা পদাতিক বাহিনী ভারী পদাতিক বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে চলে আসে। পদাতিক বাহিনীর আটটি লাইন নির্ধারিত দূরত্বে এগিয়ে গিয়ে থেমে যায় এবং তাদের বর্ম দৃঢ়রূপে ধরে রাখে। রোমান বাহিনীকে এভাবে অবস্থান নিতে দেখে খালিদ উৎফুল্ল হলেন। তিনি স্পষ্টভাবেই অনুভব করতে পারলেন যে থিওডোরাস হকচকিয়ে গেছে। হারিয়ে ফেলেছে মনোবল ও দৃঢ়তা। খালিদ এবার আরও একধাপ এগিয়ে যান। রোমানদের রিজার্ভ ফোর্সকে মাঠে নামানোর উদ্যোগ নেন। থিওডোরাসের ডান প্রান্তের অশ্বারোহী বাহিনী এতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। খালিদ এবার তার মধ্যভাগের বাম অংশ এবং বাম প্রান্তের সর্বশেষ অংশকে রোমান বাহিনীর নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বারোহী বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দেন।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে দৃঢ় মনোবল এবং প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে যদি কোন অশ্বারোহী বাহিনী নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা কোন অশ্বারোহী ফৌজের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে জয় তাদের সুনিশ্চিত। আক্রমণকারী ফৌজের অশ্বারোহীর সংখ্যা সীমিত হলেও শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করা তাদের জন্য অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান অশ্বারোহী বাহিনীর অভিযান সেই সত্যকে আবারো সুপ্রতিষ্ঠিত করল। তারা রোমান অশ্বারোহী ফৌজকে পিছু হটিয়ে দিল। থিওডোরাস তার অবস্থানকে বিপদমুক্ত করার জন্য ডান প্রান্তের রিজার্ভ ফোর্সকে তলব করতে বাধ্য হলেন। দুই পক্ষে এবার শুরু হল তুমুল সংঘর্ষ। ইতিমধ্যে রোমানদের পদাতিক বাহিনীও সক্রিয় হয়ে উঠে। তারা আক্রমণ চালায় মুসলমানদের পদাতিক বাহিনীর উপর। কিন্তু সম্মুখসমরে না এসে তারা নিজেদের অশ্বারোহী বাহিনীর মাথার উপর দিয়ে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তীরের আঘাতে

মুসলমানদের অনেকে হতাহত হয়। পদাতিক বাহিনীর দুর্যোগের কথা জেনেও খালিদ অশ্বারোহী রিজার্ভ ফোর্সকে ধরে রাখলেন। কারণ, খালিদ তখন ভাবছেন অন্য কথা। তিনি ঠিক করে রেখেছেন যে, যে কারণেই হোক থিওডোরাসের অবশিষ্ট রিজার্ভ ফোর্সকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাতে হবে। তিনি মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগের ডান দিক এবং ডান প্রান্তের অশ্বারোহী ফৌজকে রোমান বাহিনীর ডান দিকে অপেক্ষমাণ অশ্বারোহী ফৌজকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদের আক্রমণ এখানেও পূর্ণভাবে সফল হল। থিওডোরাস অবশিষ্ট অশ্বারোহী রিজার্ভ ব্রিগেডকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঠাতে বাধ্য হলেন। শত্রুপক্ষের গোটা বাহিনীকে এভাবে নামানোর ব্যাপারেও খালিদের সম্ভবত একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যুদ্ধের এই সূত্রটি ভালভাবেই জানতেন যে, কোন অশ্বযুদ্ধে যদি এক পক্ষ তার সমস্ত অশ্বারোহীকে মাঠে নামায় এবং বিপক্ষের হাতে রিজার্ভ অশ্বারোহী ফৌজ থাকে, তাহলে সে যুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষের বিজয় অবধারিত। ইয়ারমুকের লড়াইয়ে তাই ঘটল এবং সফল হল খালিদের মহাপরিকল্পনা।

খালিদ এবার ৪ হাজার অশ্বারোহী রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে অমিততেজে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরে এসে তিনি রোমান বাহিনীর বাম প্রান্তকে পশ্চাদদিক থেকে আক্রমণ করেন। অশ্বারোহী রোমান বাহিনী এবার ডান-বাম এবং পশ্চাদদিক থেকে আক্রান্ত হল। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তারা বাধ্য হল মাঝখান বরাবর সামনের দিকে সরে আসতে। রোমান বাহিনীর মধ্যে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। মুসলিম পদাতিক বাহিনী আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। রোমান সৈন্যরা সামনের দিকে এগিয়ে আসায় এবার তারা মুসলমানদের নাগালের মধ্যে এসে যায়।

মহাবীর খালিদের পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ পরিচালিত হল। রোমান বাহিনীর ডান দিকের অশ্বারোহী ফৌজ চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। রিজার্ভ বাহিনী আগে থেকেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং তাদের পক্ষে অতিরিক্ত সাহায্যপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিরুপায় হয়ে এবার তারা মরিয়া হয়ে উঠে। অনেকেই মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে ইয়ারমুকের প্রান্তর থেকে ছুটে পালায়। অবশিষ্ট অশ্বারোহীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এতক্ষণে রোমান বাহিনী আলান, ইয়ারমুক এবং নহর রাককাদের মধ্যে আটকা পড়ে। রোমান বাহিনীতে ত্রাহী ত্রাহী রব পড়ে যায়। যে যেভাবে পারে, যে যে দিক থেকে পারে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। অসংখ্য অশ্বারোহী পশ্চাদদিক থেকে ছুটে যায় নহরে রাককাদের দিকে। নদী পার হয়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দিয়েও নদী পার হতে পারল না। নহরে রাককাদেই তাদের সলিল সমাধি ঘটল। হাজার হাজার পদাতিক এবং অশ্বারোহী ইয়ারমুকের দিকে ছুটে যায়। নদীর খাড়া পাড় বেয়ে নামতে গিয়ে তারা গড়িয়ে পড়ে। ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। ইয়ারমুকের লড়াইয়ে হতাহতের সঠিক

সংখ্যা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে হাজার হাজার রোমান সৈন্যকে এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং লড়াইয়ের পর রোমানদের বিরাট বাহিনীরও অবলুপ্তি ঘটে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ছিল চূড়ান্ত এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। খলিফা ওমর (রা) বিজয়কে স্বাগত জানান। এই যুদ্ধের পর সিরিয়ায় রোমান সম্রাটের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশ্য এই বিজয় অর্জনের জন্য মুসলমানদের প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে। প্রায় ৪ হাজার মুসলমান সেনা এই যুদ্ধে শহীদ হন। রোমান বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে হিরাক্লিয়াস খুবই মনক্ষুণ্ন হন এবং হতাশভাবে বলেছিলেন ' বিদায়, হে আমার সুন্দরতম প্রদেশ, কিন্তু শত্রুর জন্য কত চমৎকার একটি পুরস্কার।" ইয়ারমুকের বিজয়ের পর উত্তর দিকে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকল। সিরিয়া এবং আনাতোলিয়ার মধ্যে তাউরুস পর্বতমালা ছিল একটি প্রাকৃতিক সীমারেখা। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা পৌঁছে যান তাউরুস পর্বতের পাদদেশে।

সিরিয়া বিজয়ের পর খালিদ কিন্‌নাস্‌রিনের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন। উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার বিশাল এলাকা জুড়ে গঠিত হয়েছিল কিন্‌নাসরিন প্রদেশ। গভর্নর হিসেবে নিযুক্তির অল্পকাল পরেই খলিফা জানতে পারেন যে, একজন কবির সুন্দর কাব্য রচনার জন্য খালিদ তাকে ১০ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছেন। এজন্য খলিফা ওমর (রা) খালিদকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। খলিফার সরল ও দৃঢ় যুক্তি ছিল এই যে, পুরস্কার হিসেবে প্রদত্ত এই অর্থ যদি রাজকোষ থেকে দেয়া হয় তাহলে খালিদ অবশ্যই দুনীর্তির দায়ে অভিযুক্ত। আর যদি তিনি নিজের পকেট থেকে প্রদান করে থাকেন তাহলেও এভাবে কুরআনী বিধান অমান্য করার কারণে সে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না।" খালিদ মদীনায় খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে এই অভিযোগ করেন যে হযরত ওমর (রা) তাঁর প্রতি সুবিচার করেননি। তিনি খলিফাকে আরও জানান যে, এই অর্থ তিনি নিজের পকেট থেকে দিয়েছেন। গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত এই অর্থ ছিল তাঁর ন্যায়সঙ্গত পাওনা।

অতঃপর খালিদ হিমসে ফিরে আসেন। পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা খালিদের বড় সাধ ছিল। কিন্তু খলিফা ওমর (রা) তাঁকে ইরাক যাওয়ার অনুমতি দেননি। ফলে দীর্ঘদিনের একটি সাধ অপূর্ণ রেখেই ৫৫ বছর বয়সে ৬৫১ সালে খালিদ হিমসে ইন্তেকাল করেন।

যুগান্তকারী বিভিন্ন যুদ্ধের সফল অধিনায়কগণের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ অন্যতম। যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রণকৌশল রচনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি চমৎকার ধীশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় দেন। ইরাক এবং সিরিয়ার স্থানীয় জনগণকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার মধ্য দিয়েই তার বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর মেলে। রোমান এবং পারস্য সম্রাটের বিপক্ষে তিনি সুকৌশলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলেন। ফলে রোমান এবং পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। আত্মসর্পমণের কতগুলো উদার এবং সহজ শর্ত তিনি প্রদান করেন। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় এবং বিষয়-সম্পদ ও জমি-জমা ভোগ করার স্বাধীনতা। ফলে মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে ইরাক এবং সিরিয়ায় এলেও স্থানীয় জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে তাদের সমর্থন করে। এমনকি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সিরিয়ার অধিবাসীগণও মুসলমানদের বিজয়কে স্বাগত জানায়। কারণ, মুসলমানগণের বিজয়ের মধ্য দিয়ে রোমানদের সাম্প্রদায়িক নির্যাতন থেকে অব্যাহতির নিশ্চয়তা পাচ্ছিল।

হযরত ওমর (রা) খলিফা হওয়ার পরই দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, অধিকৃত অঞ্চলের ভূমি গনীমতের মাল হিসেবে বিলি-বন্টন করা যাবে না। এই জমি-জমা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এই জমি-জমা যারা চাষাবাদ করেছেন, আগামীতেও তাদের উপর দায়িত্ব থাকবে চাষবাসের। বিনিময়ে তাদেরকে ভূমিকর দিতে হবে। বস্তুতপক্ষে চমৎকার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে খালিদ ইতিপূর্বে যে সুবিধা অর্জন করেছিলেন খলিফার নীতি নির্ধারণী বক্তব্যগুলো তাকে আরও পূর্ণতা প্রদান করে।

খালিদ দামেশক অভিযানের সময় ক্ষিপ্রতা এবং আকস্মিকতাকে কাজে লাগিয়ে কৌশলগত সুবিধা অর্জনের চমৎকার নজীর স্থাপন করেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে খালিদ অন্যান্য মুসলিম বাহিনীর আগমনের পূর্বেই ইরাক থেকে বিদ্যুতগতিতে সিরিয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে হাযির হন। খালিদের আগমন সংবাদে শত্রুপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। বিনা বাধায় খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে আমর বিন আল আসের সঙ্গে মিলিত হন। এবং দামেশকে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে উঠে। এটা সম্ভব হয়েছিল খালিদের ক্ষিপ্রগতির কারণে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খালিদের পরিকল্পনা ছিল অন্য রকম। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফিলিস্তিনে একটি যুদ্ধ অত্যাসন্ন। এই যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য একটি চূড়ান্ত বিজয় এনে দিতে পারে এবং সে কারণেই দামেশকে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পরিবর্তে তিনি ফিলিস্তিনে মুসলমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার প্রতি নজর দিলেন।

আজনাদাইনে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধে খালিদ রোমান বাহিনীর ডান অংশের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন। তিনি এই কাজটি করেছিলেন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। তিনি স্থির করেছিলেন যে, পরাজিত রোমান বাহিনীকে কোনক্রমেই ফিলিস্তিনের বিস্তৃত ভূখণ্ডের দিকে পশ্চাদপসরণ-এর সুযোগ দেয়া যাবে না। কারণ সেখানে রয়েছে

রোমানদের সুরক্ষিত অনেকগুলো শহর। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ সময়ের জন্য এই শহরগুলো অবরোধ করে রাখতে হবে। তাতে মুসলিম বাহিনীর ক্ষিপ্রতা হ্রাস পাবে। সময় ও শক্তির অপচয় হবে। খালিদ তাই সুকৌশলে রোমান বাহিনীকে ট্রান্সজর্দানের দিকে যেতে বাধ্য করলেন। সেখানে 'ফহল'-এর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত বিজয় লাভ করল এবং রোমান বাহিনী সংগঠিত হওয়ার কোন সুযোগই পেল না।

বিপদসংকুল পরিস্থিতিতেও খালিদ ছিলেন ধীরস্থির। কৌশলগত ভারসাম্য অর্জনের জন্য তিনি বহু কষ্টে দখলকৃত অঞ্চল হাতছাড়া করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ইয়ারমুকের লড়াইয়ের পূর্বে অধিকৃত সিরিয়া থেকে মুসলিম বাহিনী প্রত্যাহার করা ছিল এমনি ধরনের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। বস্তুতপক্ষে যিনি বিজ্ঞ সেনাপতি, অধিনায়কত্ব যার রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে আছে, যার হৃদয় সিংহের মত বড়, -একমাত্র তাঁর পক্ষেই এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কৌশল নির্বাচনের ব্যাপারে খালিদ সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত মানসিক শক্তি এবং দৃঢ় চিত্তের অধিকারী। সুচিন্তিতভাবে বড় রকমের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মুসলিম বাহিনী প্রথমে ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণ দিকে ছাউনি ফেলে। কিন্তু যখনই খালিদ জানতে পারলেন যে, রোমানরা ওয়াকুসা প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেছে, ঠিক তখনই তিনি কৌশলগত দিক বিবেচনা করে মুসলিম বাহিনীকে নদীর উত্তর প্রান্তে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। অথচ যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধাবোধ করেননি।

ওহোদ এবং মুতার যুদ্ধের সময় খালিদ রণকৌশল রচনার ব্যাপারে অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। ৬৩৩ সালে পারসিকদের বিরুদ্ধে ওয়ালজাহ-এর যুদ্ধের সময়েও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। যুদ্ধে তিনি পারসিকদের চরমভাবে পর্যুদস্ত করে দেন। অথচ পারসিকদের বাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী। অনুরূপভাবে ইয়ারমুকের প্রান্তরেও তিনি রোমানদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। বুদ্ধি খাটিয়ে সুকৌশলে রোমান বাহিনীর বৃহত্তর অংশকে বলতে গেলে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। বাম প্রান্তের অশ্বারোহী ফৌজকে এমনভাবে গুটাতে বাধ্য করেন যে, গোটা বাহিনীর উপর নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি।

অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি, নমনীয় আচরণ, স্থিরচিত্ততা এবং মানুষের মন-মানসিকতা হৃদয়ঙ্গম করার অপূর্ব ধীশক্তি ছিল খালিদের ব্যক্তি জীবনের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা এবং পরিণামদর্শিতার চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।এগুলো যে কোন সফল অধিনায়কের দু'টি গুণ। খালিদের গোটা জীবন জুড়ে আছে হাজার রকমের কৃতিত্ব। তাঁর এই কৃতিত্বের গভীরতা যেমন ব্যাপক, তেমনি বিস্তৃত; তার চেয়ে বড় কথা তিনি যে পন্থায় যেভাবে এই কৃতিত্বগুলো অর্জন করেন-

তা সবাইকে ভীষণভাবে আপ্লুত এবং চমৎকৃত করে। একের পর এক বিভিন্ন অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রতিবারেই খালিদের নেতৃত্বশৈলী যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছে। এত সব কারণেই খ্যাতিমান এবং শীর্ষস্থানীয় সেনাপতিগণের মধ্যে খালিদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। খালিদের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে হযরত আবূ বকর (রা) একবার বলেছিলেন, "আরবের মায়েরা এখন একান্তই অসহায়। তাঁরা খালিদের মত বীরপুরুষ জন্ম দিতে পারছেন না।" মিশর বিজয়ী আমর বিন আল আস ছিলেন খালিদের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি নিজেও ছিলেন খ্যাতিমান একজন সেনাপতি। তিনি একবার বলেছিলেন যে, যুদ্ধের কলাকৌশলের ব্যাপারে খালিদ হলেন প্রথম শ্রেণীর একজন মাস্টার। শিকারী বিড়ালের ন্যায় চাতুর্যপূর্ণ তার গতিবিধি। কিন্তু সে আক্রমণ করে ক্ষিপ্ত সিংহের মত।

রোমান বাহিনী সম্পর্কে অভিমত পোষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন-নানারকম দোষত্রুটি এবং পাপ ছিল রোমান বাহিনীর একেবারে মজ্জাগত। তাদের যুদ্ধে বিজয় লাভ করা ছিল একেবারেই আকস্মিক ঘটনা। আসলে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে এটা মস্তবড় একটা ঢালাও অপবাদ। এবং প্রকৃত অবস্থা বা সত্যের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। বরং বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধে বিজয় পতাকা অর্জন করা ছিল তাদের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং নেহায়েত আকস্মিক বা দৈবচক্রেতেই হয়ত কখনও তারা পরাজিত হত। গভীর পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, রোমানরা ছিল সে আমলের সবচাইতে দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সুসংগঠিত বাহিনী। তাদের নেতৃত্ব এবং সেনাবাহিনী উভয়টি এত নির্ভরযোগ্য ছিল যে, তাদেরকে যে কোন কাজের জন্য যে কোন স্থানে পাঠান যেত। ওমানের মতে, বিপর্যয়ের সাধারণ কারণ হল দুর্বল অধিনায়কত্ব, সংখ্যা স্বল্পতা এবং অদৃষ্টপূর্বক দুর্যোগ-সৈন্যবাহিনীর অযোগ্যতা নয়। আসলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ কেমন যেন একটা উভয় সংকটে পড়ে যান। রোমানরা সুসংগঠিত এবং সুসজ্জিত হয়েই ইয়ারমুকের ময়দানে এসেছিল। সংখ্যায় ছিল অগণিত। তাদেরকে কোন অদৃষ্টপূর্ব দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়নি। অথচ বিভিন্ন যুদ্ধে তারা মুসলমানদের হাতে উপর্যুপরি বিপর্যস্ত হন। এর পরেও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ প্রাথমিক যুগের মুসলমান অধিনায়কগণের উত্তম নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারেন না। ভীষণ রকমের সংকীর্ণতা তাদের দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে তারা মুসলমানদের 'দ্রুতগতি' এবং 'ধর্ম' উন্মাদনাকে' বিজয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১] কৌশলগত পরিকল্পনার একটা উপাদান হল 'গতিময়তা' এবং তা একজন সেনাধ্যক্ষকে নির্দিষ্ট স্থানে দ্রুত পৌঁছাতে সাহায্য করে। যুদ্ধের ময়দানে কৌশলগত গুরুত্ব খুবই কম। ইয়ারমুকে রোমানদের ৩৬ হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় মুসলমানদের ৩০ হাজার সৈন্যের বিজয়ের সাথে এই গতিময়তার প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক।

ধর্মান্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছা করলে মুসলিম বাহিনীর এই অনুভূতিকে ধর্ম উন্মাদনা বলে আখ্যায়িত করতে পারেন। কিন্তু এককভাবে ধর্মীয় অনুভূতিকে মুসলমানদের বিজয়ের একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের অসংখ্য নজির আছে যে মুসলমানদের চাইতে অধিকতর ধর্মোন্মত্ত অনেক বাহিনী স্বল্প সংখ্যক সুশৃঙ্খল সৈন্যের হাতে বার বার চরমভাবে মার খেয়েছে। সুতরাং অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রধানত খালিদের সামরিক প্রতিভার কারণেই মুসলমানদের পক্ষে এই বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে কৌশলগত প্রারম্ভিক সুবিধাটুকু নিয়ে নেন। এর পরই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং নিখুঁতভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং কৌশলগত দিকগুলো ঠিক করে নেন। চমৎকার নৈপুণ্য এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়ে একে একে গোটা পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ চালান। এভাবেই বাহিনীকে নিয়ে যান চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে।

খালিদের প্রতি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর আচরণকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। তন্মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া সবচাইতে সহজ এবং সরল মন্তব্যটি ছিল নিম্নরূপঃ একটিমাত্র কারণেই হযরত ওমর (রা) খালিদকে বরখাস্ত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাসীগণকে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে খালিদের উদ্ভাবনী অধিনায়কত্বের জন্য নয় বরং আল্লাহ্‌র অপার করুণায় উপর্যুপরি এই বিজয় সম্ভব হয়েছিল। বিদ্বেষপ্রসূত এবং সবচাইতে হাস্যকর মন্তব্যটি ছিল এরকম যে, বাল্যবয়সে খালিদের সঙ্গে ওমর (রা)-এর একবার কুস্তি হয়। কুস্তিতে ওমর (রা) বেশ আঘাত পান এবং একটা হাড় মচকে যায়। বাল্যবয়সের সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই ওমর (রা) খালিদের মত সমরনায়কের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করেছিলেন। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তারা দুই মহান পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত, ইসলামী প্রশিক্ষণ, কর্মধারা, মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তারই আলোকে মন্তব্য করেছেন যে- অপরাধমূলক কোন কাজের জন্য খালিদকে দোষী সাব্যস্ত করা না হলেও অধিনায়কের পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করাটা ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত।

সেনাপতি খালিদের ব্যাপারে খলিফা ওমর (রা)-এর গৃহীত ব্যবস্থাকে সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে ওমর (রা)-এর প্রশাসনকে বুঝতে হবে। ওমর (রা) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সামরিক এবং বেসামরিক কর্ম-কর্তাগণকে বিশেষ করে অহংকারী কুরাইশ সর্দারগণকে সব সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। খালিদের ঘটনা অসাধারণ কিছু ছিল না। আমর বিন আল আস মিশর জয় করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মিশরের গভর্নর নিযুক্ত

হয়েছিলেন। একবার তিনি একজন দরিদ্র মুসলমানকে বেত্রাঘাত করেন। অসহায় দরিদ্র ব্যক্তিটি খলিফার দরবারে ন্যায়বিচার দাবী করে। খলিফার আদালতে দরিদ্র ব্যক্তি নিরপরাধ বলে প্রমাণিত হয়। খলিফা তখন রায় দিলেন যে- আমর দরিদ্র ব্যক্তিকে যতগুলো বেত মেরেছে. দরিদ্র ব্যক্তিও এবার আমরকে ততগুলো বেত মারবে। আমর ইচ্ছা করলে অভিযোগকারী ব্যক্তির সঙ্গে কিছু একটা আপোস করে বেত্রাঘাতের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারতেন। পরবর্তী সময়ে আমরের বিরুদ্ধে রোমান রাজা-বাদশাহদের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ জীবন পরিচালনার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অভিযোগ সুপ্রমাণিত হওয়ায় খলিফা গভর্নরের দায়িত্ব থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন।

ইরাক বিজয়ী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ছিলেন নবীজীর চাচা এবং প্রথম যুগের একজন মুসলমান। কুফা প্রদেশের শাসনভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি পারসিক শাসনকর্তাদের আচার-আচরণের প্রতি খানিকটা ঝুঁকে পড়েন এবং নিয়মিতভাবে জামাতের ইমামতি করতেন না। এই অপরাধের জন্য ওমর (রা) তাঁকে গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। দামেশকের গভর্নর মু'আবিয়া ছিলেন খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। মদীনা থেকে কোন আগন্তুকের আগমন সংবাদ পেলেই তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। ভাবতেন এই বুঝি লোকটি বরখাস্তের নোটিশ নিয়েই দামেশকে এসেছে।

খালিদ মক্কার একটি ঐশ্বর্যশালী পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। লালিত-পালিত হন পারিবারিক ঐতিহ্যের জন্য ভীষণভাবে অহংকারী একটি পরিবেশে। বাবা-দাদা সকলেই মূর্তিপূজারী। ছোটবেলা থেকেই খালিদ কুস্তি মারামারিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। পরিণত বয়সে একজন খ্যাতিমান যোদ্ধা হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন অপূর্ব সামরিক প্রতিভার অধিকারী। তাঁর গোটা জীবনের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, সমরচর্চা এবং সামরিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে তিনি বেশি দিন থাকার সুযোগ পাননি। ওমর (রা) এবং তাঁর সমাসাময়িককালের নওমুসলিমগণ যত নিবিড়ভাবে রাসূল (সা)-এর সাহচর্য পান, যত বেশি সময় নবীজীর দরবারে আসা-যাওয়ার সুযোগ পান, খালিদ তা পাননি। ফলে রাসূল (সা)-এর শিক্ষা এবং আদব তার মধ্যে ততখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। অথচ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির প্রতিভা, যোগ্যতা এবং কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয় এককভাবে ধর্মীয় ঔচিত্যবোধ এবং উপযুক্ততার মাপকাঠিতে। একজন সফল সমরনায়ক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এবং মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিজয় লাভ করলেও ব্যক্তি জীবন এবং সামাজিক আচরণে তিনি আশানুরূপ নিষ্ঠা এবং ঔচিত্যবোধের পরিচয় দিতে পারেননি। এই জন্য মুমিনগণের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য খালিদকে উপযুক্ত বিবেচনা করা

হয়নি। খলিফা ওমর (রা) সরকারী কর্মকর্তাগণকে অর্থকড়ির ব্যাপারে খুবই হিসেবী এবং যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ সিরিয়া অভিযানকালে খালিদ নিয়মিত এবং যথাযথভাবে গনীমতমালের হিসাব-নিকাশ দাখিল করতে পারেননি। খ্যাতিমান একজন কবিকে কবিতা আবৃত্তির জন্য তিনি দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। ওমর (রা)-এর দৃষ্টিতে এটা ছিল অশোভন অপচয়। সে কারণেই ওমর (রা) প্রথমে তাঁকে সিরিয়ার মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ থেকে এবং পরে তাঁর নিজ বাহিনীর সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেন। অথচ খালিদ ছিলেন ওমর (রা)-এর নিকট-আত্মীয়। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কোন রকম প্রতিহিংসা অথবা অহেতুক কঠোরতার কারণে তিনি খালিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি। বরং তিনি যে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি সেই ধরনের ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতির একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং দক্ষ প্রশাসক। নিয়ম-শৃঙ্খলার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। খলিফা হওয়ার পর জনগণের উদ্দেশে দেয়া প্রথম ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে মরু সন্তানেরা ঠিক তাদের উটগুলোর মত। উটের নাকের রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারলে তারাও যথাযথভাবে তোমাকে অনুসরণ করবে। আর যদি তাদের লাগাম ছেড়ে দাও, তারা সঙ্গে সঙ্গে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর একজন বিজ্ঞ সহচর চমৎকার একটি মন্তব্য করেছিলেন। মন্তব্যটি অনেকটা ভবিষ্যদ্বাণীর মত। তিনি বলেছিলেন যে দুনিয়াতে ওমরের মত আর কোন খলিফা হবে না। উত্তরসুরিদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর মত কঠোর হতে চান, তাহলে আরববাসীরা বিদ্রোহ করবে। তিনি যদি নমনীয় হন, তা হলে আরববাসীরা তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে; তাঁকে অবহেলা করবে। অবশ্য একথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে, রোমান শক্তিকে পরাভূত করার পর খালিদকে পারস্য শক্তির মুকাবিলা করার সুযোগ দেয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর চেয়েও দুঃখজনক এবং শোকাবহ ব্যাপার এই যে, ওমর (রা)-এর তিরোধানের পর ইসলামের খিলাফতে দ্বিতীয় আর কোন ওমরকে পাওয়া যায়নি।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ
(মার্চ ৬৩৭)

তাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিসকে ঘিরে রচিত হয়েছে অনেক কাহিনী, অনেক ইতিহাস। যে এলাকার উপর দিয়ে নদী দু'টি বয়ে গেছে, তার দখল নিয়ে স্মরণাতীতকাল থেকে রাজায় রাজায়, সম্রাটে সম্রাটে যুদ্ধ হয়েছে। এই অঞ্চলের উপরিভাগের নাম মেসোপটেমিয়া। নিম্নভাগের নাম বেবিলোনিয়া। আরবদের কাছে অঞ্চলটি ইরাক-আরব নামে সমধিক পরিচিত। এই অঞ্চলটি বেশ সমতল এবং পাললিক ভূমি দ্বারা গঠিত। জাগরস পর্বতমালার পূর্বে এবং তাইগ্রীস নদীর তীর ধরে প্রসারিত ভূখণ্ড আরবদের কাছে ইরাক আজম নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি প্রাচীন পারস্যের মধ্যভূমি। এখান থেকে দু'টি নদী একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে। মিলিত স্রোত শাতিল আরব নাম ধারণ করে আধুনিক বসরার কাছে পারস্য উপসাগরে পড়েছে।

আরবের উত্তর-পূর্ব কোণেই রয়েছে পারস্য অধিকৃত ইরাক-আরব। আরবের এই সীমান্ত থেকে শুরু করে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম দিকে মৃত সাগর এবং হাওয়ারুনের উচ্চ ভূমির দিকে এটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি খুবই শুষ্ক এবং আরব নুফুদেরই একটি অংশ। তখনকার দিনে এখানে পারস্য সম্রাটের শাসন বলবৎ ছিল। ইরাক-আরবের উত্তরেই রয়েছে প্রাচীন তাদসুর। বিস্তৃত এই অঞ্চল ছিল আরব যাযাবরদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। সম্ভবত কালের বিবর্তনে তাদের নতুন নামকরণ হলেও আচরণ ও অভ্যাসের দিক থেকে তারা রয়ে গেছে অবিকল আগের মত। যাযাবরদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী। আনুগত্যের দিক থেকে তারা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। সিরীয় অঞ্চলে যারা বসবাস করত তারা বনু ঘাসসান গোত্রের মত রোমানদের বশ্যতা স্বীকার করে চলত। কিন্তু যারা পূর্ব দিকে বসবাস করত তাদের অবস্থা ছিল বনু তালিবের মত। এদের আনুগত্য ছিল পারস্য রাজার প্রতি। পারস্য অথবা রোমান যাদের অধীনতাই এরা স্বীকার করুক না কেন, প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলোর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল। দিনে দিনে এদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আত্মীয়তার বন্ধন এবং মৈত্রীর সম্পর্ক। শাতিল আরবের ব-দ্বীপ অঞ্চলে যারা বসবাস করত তাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে এবং যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে কৃষিকাজে মন দেয়।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর পরই সর্বত্র অসংখ্য ভণ্ড নবীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। মদীনার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দেখা দেয় চরম বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বড় রকমের হুমকির সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই যখন চলছে এমনি অস্থিরতা, ঠিক তখনই রাষ্ট্রের বাইরেও দেখা দেয় গোলযোগ। এমনকি 'রিদ্দা যুদ্ধের' চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বেই সিরীয় সীমান্তে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। মদীনার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কথা বিবেচনা করে বিচক্ষণ খলিফা আবূ বকর (রা) সিরীয় সীমান্তে পারস্য সম্রাটের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দাঁড়াল অন্যরকম। শিশু ইসলামী রাষ্ট্র পরিস্থিতির শিকার হল। জড়িয়ে পড়ল সীমান্ত সংঘর্ষে। গোটা পারস্য সাম্রাজ্য জয় না করা পর্যন্ত এই সংঘর্ষ অব্যাহত থাকল।

আরবের যাযাবর গোত্রগুলো কখনও রাজনৈতিক সীমারেখার ধার ধারত না। যেখানেই তারা মেষপালের বিচরণের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধান পেত, সেখানেই তারা অবাধে চলে যেত। রাষ্ট্রের সীমানার তোয়াক্কা না করে সুযোগ-সুবিধা মত লুট-পাট করত এবং প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হত।

নবীজীর ইন্তেকালের পর পরই সাজা নামের এক মহিলা নিজেকে নবী বলে দাবী করে। নিজের দাবী প্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাষ নিয়ে সে তার স্বামীর অনুগত শক্তিশালী একটি খ্রিস্টান বাহিনীসহ নিজস্ব গোত্র বনু তামিমে ফিরে আসে।

রিদ্দা যুদ্ধের অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের গোত্রগুলোর মধ্যে লুটতরাজ বৃদ্ধি পায়। শুরু হয় প্রতিশোধমূলক আক্রমণ ও সংঘর্ষ। ইরাক-আরবের সীমান্তের ওপারের এলাকাটির নাম ছিল হজর। আরবের ঠিক উত্তর-পূর্ব কোণেই এর অবস্থান। বনু বকর গোত্রের মুসলমানরা এখানে বসবাস করত। সুযোগ বুঝে পারস্য গভর্নর এই অঞ্চলের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়। শায়বান বংশের মুসান্না বিন হারিসা আশ-শায়বান ছিলেন এই গোত্রের সরদার। গোড়ার দিকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে সুসজ্জিত পারস্য বাহিনীর মুকাবিলা করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি প্রবল চাপের সম্মুখীন হলেন। নিরুপায় হয়ে তিনি মদীনায় সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু খলিফা পারস্য সম্রাটের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। মুসান্নার সাহায্যার্থে কোন বাহিনী না পাঠিয়ে তিনি মুসান্নার সাহায্যের জন্য খালিদকে নির্দেশ দেন। তিনি বলে দেন যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যারা যুদ্ধে যেতে রাজী হবে, তাদেরকে নিয়েই গঠিত হবে খালিদের বাহিনী। রিদ্দা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৫০০ নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ খালিদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দলটি নিয়ে খালিদ বিদ্যুৎ গতিতে ইয়ামাহা থেকে ছুটে গেলেন ইরাক সীমান্তে।

দুমাতুল জান্দালের মরূদ্যান ছিল সিরিয়া, ইরাক এবং মধ্য আরবের মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু। রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের বছর খানেক পূর্বে খালিদ

একান্ত আকস্মিকভাবেই দুমাতুল জান্দাল দখল করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ যখন রিদ্দা বিদ্রোহীদের দমনে নিয়োজিত ছিলেন, ঠিক তখনই দুমাতুল জান্দাল-এর খ্রিস্টান শাসক মদীনার প্রতি তার প্রদত্ত আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেয়। দুমাতুল জান্দাল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের জন্য দুটো সমস্যা দেখা দেয়। ক. ইরাকের বেশ কিছু বেদুঈন সম্প্রদায় পারস্য সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলত। এবার তাদের পশ্চাৎ দিক থেকে খালিদের বাহিনীকে আক্রমণ করার আশংকা দেখা দেয়। খ. তাছাড়া এই পথ দিয়েই হয়ত রোমান এবং পারস্য সম্রাট একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার সুযোগ পাবে। এতসব ভেবে-চিন্তে খলিফা আবূ বকর (রা) দুমাতুল জান্দাল পুনঃ দখলের সিদ্ধান্ত নেন। একটি বাহিনী নিয়ে আয়াদ বিন ঘানামকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। অপরদিকে হজর নামক স্থানে খালিদ পারস্য বাহিনীকে নিয়োজিত করে রাখলেন।

ইরাক-আরবের গভর্নরের নাম ছিল হরমুজ। হরমুজ দৃঢ় পদে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় এগিয়ে গেল। যুদ্ধের ময়দানে একটি মাত্র ঝরনা ছিল। হরমুজ বিচক্ষণতার সঙ্গে ঝরনাটিকে নিজের দখলে রেখে খালিদের মুকাবিলার জন্য তৈরী হল। খালিদও ছিলেন অমিততেজা বীর সেনাপতি।

খালিদ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, যারা সাহসী, যারা বীরপুরুষ, নহরটি তাদেরই প্রাপ্য, নহর তাদের দখলেই থাকবে। হরমুজকে আরও জানিয়ে দিলেন যে, সত্যকে গ্রহণ কর। নিজেকে নিরাপদে রাখ। অন্যথায় খাজনা বা জিযিয়া প্রদান কর। আর দুটো প্রস্তাবকেই যদি প্রত্যাখ্যান কর, তা হলে এর দায়-দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। তুমি স্মরণ রেখ যে তোমরা এমন একটি বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছ যারা জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করে। হরমুজের প্রতি খালিদের এই ঘোষণাটি ছিল একটি ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ। প্রথমেই শুরু হয় দ্বৈত যুদ্ধ। কিন্তু হরমুজ খালিদের মুকাবিলায় সুবিধা করতে পারল না। অল্প সময়ের মধ্যে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এর পরেই পারস্য বাহিনীর উপর নেমে এলো চরম বিপর্যয়। তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল।

এই যুদ্ধে হরমুজ একটি অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছিল। যুদ্ধের ময়দান থেকে কেউ যাতে পালিয়ে না যায়, অথবা পশ্চাদপসরণ না করে, সেজন্য সৈন্যদেরকে পরস্পরের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। সে কারণেই ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধটি 'শিকলের যুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

খালিদ পলায়নপর পারস্য বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে ঢুকে পড়লেন ইরাকের অভ্যন্তরভাগে। ইতিমধ্যে আরও ১৫টি যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বিজয় গৌরব অর্জন করেন। এমনিভাবে এক ইরাক অভিযানে খালিদের কেটে যায় গোটা একটি বছর।

এদিকে দুমাতুল জান্দালে আয়াদ বিন ঘানামের অভিযান বিফলে গেল। তিনি ব্যর্থ হলেন শহরটি পুনঃদখল করতে। যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন। খালিদের কাছে পৌঁছে গেল এই দুঃসংবাদ। তিনি ইরাক অভিযানের মোড় ঘুরিয়ে দেন। খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাভূত করে তিনি অবিশ্বাস্য রকমের একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। দখল করে নেন আম্বার এবং ফিরাদ নামের দু'টি শহর। অথচ এই শহর দু'টি ছিল ইউফ্রেটিস নদী দিয়ে চলাচল এবং পারস্য সিরিয়ার মধ্য দিয়ে যাতায়াতের দু'টি প্রধান শহর। দুমাতুল জান্দালও চলে আসে তার দখলে। এই শহরটি ছিল মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাতায়াতের কেন্দ্রবিন্দু এবং সিরিয়া ও আরবের পশ্চাৎভূমি। এবার পশ্চিম দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দূরীভূত হল। খালিদও পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর চমৎকার একটি ঘাঁটি পেলেন। এবার খালিদের দৃষ্টি পড়ল পারস্য সম্রাটের রাজধানী টেসিফোনের উপর। খালিদ যথারীতি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে মদীনা থেকে খলিফার দূত এসে হাযির হল ইরাকে। খালিদ জানতে পারলেন যে– সিরীয় রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। সেখানে মুসলিম বাহিনীকে আরও দৃঢ় এবং শক্তিশালী করতে হবে। সেনাবাহিনীর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে তাঁকেই চলে যেতে হবে সিরিয়ার রণাঙ্গনে। ফলে অবশিষ্ট আট হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে মুসান্না শক্তিশালী পারস্য বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য রয়ে গেলেন।

বেদুঈন সরদার মুসান্না জন্মগতভাবেই ছিলেন একজন নামজাদা সমরনায়ক। খালিদের অনুপস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তিনিই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। হঠাৎ করেই তিনি খবর পেলেন যে, পারস্য সম্রাটের শক্তিশালী একটি বাহিনী নিয়ে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করলেন। প্রাচীন ব্যাবিলনের সন্নিকটে তিনি শক্তিশালী পারস্য বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রবল পরাক্রান্ত আক্রমণের মুখে পারস্য বাহিনী টিকতে পারল না। মুসান্না পারস্য বাহিনীকে রাজধানী টেসিফোন-এর তোরণ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সাসানিয়ান রাজধানীটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। এত স্বল্প সৈন্য নিয়ে টেসিফোন দখল করা ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। সেনাপতি মুসান্না বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন এবং এ ধরনের কোন উদ্যোগ নেয়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু এই অভিযান থেকে তাঁর মনে এ ধারণা আরও দৃঢ় হল যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য পেলে অনায়াসেই রাজধানী টেসিফোন দখল করে নেয়া যায়।

অবিলম্বে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে মুসান্না খলিফার নিকট পত্র লেখেন। কিন্তু খলিফার দরবার থেকে কোন জবাব না পেয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি নিজেই মদীনায় চলে আসেন। খলিফা আবূ বকর (রা) তখন শয্যাশায়ী, বলতে গেলে মৃত্যুপথ যাত্রী। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তেকালের পর

নব নির্বাচিত খলিফা ওমরের নিকট পুনরায় আবেদন করেন। কিন্তু জনগণের তরফ থেকে জিহাদে যোগদানের তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। এর প্রধান কারণ ছিল দু'টো। প্রথম হযরত আবূ বকর (রা)-এর অনুসৃত নীতি এ স্থলে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রিদ্দা যুদ্ধে ভণ্ড নবীদের পক্ষে যারা অংশ নিয়েছিল, খলিফা আবূ বকর (রা) কখনও তাদের মধ্য থেকে জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতেন না। দ্বিতীয়ত মুসলিম সেনারা ইরাকের পরিবর্তে সিরিয়ার রণাঙ্গনে যাওয়ার ব্যাপারে বেশী আগ্রহ দেখাতেন। এরও সুস্পষ্ট দু'টি কারণ ছিল। ১. খলিফাদের সুনাম-সুখ্যাতি এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, সবাই তাঁর বাহিনীতে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন, ২. পশ্চিম আরবের লোকজনের সিরিয়া সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা ছিল এবং এই দেশটির প্রতি তাদের আকর্ষণও ছিল বেশী। খলিফা ওমর (রা) অবশ্য ইরাকে একটি শক্তিশালী বাহিনী রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। অবশেষে খলিফার উদ্যোগ এবং উৎসাহে তিন হাজার সৈন্যের একিট বাহিনী গঠিত হল। এই বাহিনীকে তিনি ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন। আবূ উবায়েদ তাকাফীকে নিয়োগ করলেন সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে। আবূ উবায়েদ ছিলেন খুবই সাহসী। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর বিচক্ষণতার অভাব ছিল। অভিযানের শুরুতে একটি যুদ্ধ সহজে বিজয় লাভ করে তিনি খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে পারসিকদের একটি শক্তিশালী বাহিনী আবূ উবায়েদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। তারা মুসলিম বাহিনীকে নদী অতিক্রম করে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করে। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই আবূ উবায়েদ শত্রুপক্ষের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। নৌকা দিয়ে পুল তৈরী করে তিনি নদী পার হয়ে যান। শত্রুপক্ষ তাদের পছন্দমত একটি অপ্রশস্ত ও অসমতল স্থানকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়। বলতে গেলে তারা মুসলিম বাহিনীকে সেখানে আবদ্ধ করে ফেলে। পারস্য বাহিনীতে ছিল ৩০টি হাতী। হাতীর উন্মত্ততায় মুসলিম বাহিনী একেবারে হকচকিয়ে যায়। ঘোড়াগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঘোড়াগুলো কোনক্রমেই এই ভয়ংকর প্রাণীর মুখোমুখি হতে চাইল না। আবূ উবায়েদ এবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলেন। অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি পালের সর্দার হাতীকে আহত করলেন, কিন্তু নিহত করতে পারলেন না। যন্ত্রণায় হাতীটি চিৎকার করতে করতে এক সময় সেনাপতি আবূ উবায়েদকে ধরে ফেলে। পায়ের নিচে ফেলে তাঁকে পিষ্ট করে মারে। একে একে আরও কয়েকজন মুসলিম সেনানায়ক যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হলেন। এই প্রথমবারের মত মুসলিম বাহিনীকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পেয়ে বসে। হারিয়ে ফেলে বিশ্বাস এবং সংকল্পের দৃঢ়তা। তারা মুখোমুখি হল আসন্ন পরাজয়ের।

এদিকে শত্রুপক্ষের সাহসী এক যুবক আরেক কাণ্ড করে বসে। মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়ার আশায় সেতুটি ভেঙ্গে ফেলে। প্রথম নৌকাটি সে

ভাসিয়ে দেয় নদীর স্রোতে। এদিকে মুসলিম নেতারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা ছুটে যায় সেতুর কাছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে, ডুবে মারা যায় অনেকে।

এমনি এক সংকটময় মুহূর্তের মধ্যে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে মুসান্না পুনরায় নিজ হাতে গ্রহণ করেন মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব। নিজ গোত্রের নির্ভীক সাহসী অনুসারীদের নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়ে তিনি দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিছুক্ষণের জন্য ঠেকিয়ে রাখেন বিজয়ী পারসিক বাহিনীকে। এই ফাঁকে সেতু পুনঃনির্মাণের কাজ সম্পন্ন হল। এভাবেই মুসলিম বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। এই যুদ্ধে ৪০০০ মুসলিম সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয় অথবা নদীবক্ষে ডুবে মারা যায়। অনেকেই দল-ছাড়া হল, পালিয়ে গেল মদীনার দিকে। সবচাইতে শোকাবহ বিষয় এই ছিল যে, যুদ্ধে মুসান্না আহত হন। দিনে দিনে তাঁর এই ক্ষত এতটা মারাত্মত আকার ধারণ করে যে, মাত্র কয়েক মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

সেতুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসান্না মাত্র ৩০০০ সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ হিরার আলিসে চলে আসেন। এখানে তিনি স্থানীয় আরবদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দেন। বিজয়ী পারস্য বাহিনী কিছু সময় বিশ্রামের পর আবার সচল হয়ে উঠে। ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে তারা হিরা দখল করে নেয়। মুসলমানদের মরু অঞ্চলে তাড়িয়ে দেয়ার আশায় তারা আলিসের দিকে অগ্রসর হয়। পারসিকদের মুকাবিলায় মুসলিম বাহিনীও এগিয়ে আসে। ইউফ্রেটিস নদীর ডান তীরে এবং শাখানদী 'নহরে বুয়ার্সে'-এর দক্ষিণে উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এবারেও পারসিকদের হস্তিবাহিনী মুসলমান সেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পারস্য সেনারাও প্রাণপণে যুদ্ধ করল। কিন্তু মুসান্নার প্রবল পরাক্রান্ত আক্রমণের মুখে পারস্য বাহিনীর গতি রুদ্ধ হল। তিনি তার বাহিনী নিয়ে শত্রুসেনার মধ্যভাগে ঢুকে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বুয়ায়েব সেতুটি দখল করে নেন। এই সেতু পার হয়েই পারসিকরা মুসলমানদের আক্রমণ করার নেশায় ছুটে এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল সেতুর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ।

বুয়ায়েবের সেতু হাতছাড়া হয়ে গেছে। পারস্য বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পথ এখন রুদ্ধ। এবার তারা হকচকিয়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু মুসলমানদের দৃঢ়তার মুখে তারা টিকতে পারল না। পারসিক সেনারা অস্ত্রের মুখে প্রাণ দিতে লাগল। বুয়ায়েব নদীতে ডুবে মরল অনেকে। এই যুদ্ধে মুসলমানদেরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তবু একথা সত্য যে, বুয়ায়েবের প্রান্তরে বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম সেনাদের মন থেকে পারস্য-ভীতি দূর হয়। পূর্বের ক্ষয়ক্ষতিকে তারা পুষিয়ে নেয়। শত্রুপক্ষের প্রচুর বিষয়-সম্পদ তারা হস্তগত করে। ভবিষ্যতে আরও অভিযান চালানোর পথ প্রশস্ত হয়।

রাসূল আকরাম (সা) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট পত্র পাঠালে সম্রাট খসরু রাসূল (সা)-এর পত্রবাহককে অপমান করে। ক্রোধে এবং অবহেলায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে রাসূল (সা)-এর পত্র। শুধু তাই নয়, তৎক্ষণাৎ তিনি মুহম্মদ (সা)-কে গ্রেফতার করার জন্য এয়ামনের শাসনকর্তাকে হুকুম দিলেন। রাসূল (সা) যথাসময়ে পেয়ে গেলেন এই সংবাদ। তিনি মন্তব্য করলেন যে, খসরু যেভাবে পত্রখানি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারস্য সম্রাজ্যও তেমনি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে সপ্তম হিজরীতে (৬২৮ খৃ) খসরু পারভেজ ক্ষমতাচ্যুত এবং নিহত হন। অথচ একজন সফল সাম্রাট হিসেবে তিনি একাধারে ৩৮ বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। খসরুর পরে দ্বিতীয় কোবাদ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনিও বেশী দিন রাজদণ্ড ধরে রাখতে পারলেন না। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে অষ্টম হিজরী মুতাবিক ৬২৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পর সাম্রাজ্যের সর্বত্র নেমে আসে চরম অরাজকতা এবং বিশৃংখলা। ৬২৯ থেকে ৬৩৪ সালের মধ্যে পর পর ৬ জন সম্রাট পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শহর বরাজ, খসরু পারভেজের কন্যা পুরান দুখ্‌ত, তৃতীয় খসরু, খুরমজাদ খসরু-ফরমুখজাদ খসরু এবং হরমুজ্‌দ। এরা কেউ বেশী দিন সিংহাসন ধরে রাখতে পারেননি। এদের প্রত্যেকেই সিংহাসনের ব্যাপারে ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত। ফলে কেউ যাতে সিংহাসন দাবী না করে, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত না হয়, সেজন্য রাজপরিবারের সদস্যদের নির্মূল করার ব্যাপারে তারা সচেষ্ট থাকতেন। অবশেষে এমন হল যে খসরু পারভেজের নাতী ইয়াজদিগিরদ ব্যতীত সামান বংশের আর কোন যুবরাজ বেঁচে থাকতে পারলেন না। এমনকি ইয়াজদিগিরদও ইসতাখর-এ আত্মগোপন করেছিলেন। ইসতাখর থেকে তাকে ডেকে আনা হল। ইয়াজদিগিরদকে বসান হল অরাজকতাপূর্ণ এবং বিক্ষুব্ধ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে। অল্পবয়সী এই যুবকই আবির্ভূত হলেন পারস্য সম্রাজ্যের আশা-ভরসার শেষ অবলম্বন হিসেবে।

সিরিয়া এবং ইরাক সীমান্তে মুসলমানগণ যখন একের পর এক বিজয় লাভ করছিলেন, ঠিক তখনই সেতুর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হল। মৃত্যুমুখে পতিত হলেন আবূ ওবায়দা। এই দুঃসংবাদে গোটা মদীনা যেন ভীষণভাবে কেঁপে উঠে। শোকের ছায়া নেমে আসে ঘরে ঘরে। এদিকে সাহসী, উদ্যোগী যুবক ইয়াজদিগিরদ -এর শাসনকাল এক বছরের বেশী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মুসলিম বাহিনীর পরাজয়কে তিনি অদূর ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক সফলতার পূর্ব-লক্ষণ হিসেবে ধরে নেন। বিরাট সাম্রাজ্যের অপরাজেয় সামরিক শক্তির সযত্ন এবং উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠেন। সৌভাগ্যবশত তখন মুসলমানদের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত ওমর (রা)-এর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। মুসলিম বাহিনীর পরাজয় সংবাদ এবং উবায়েদের

ইন্তেকালে তিনি মনে কষ্ট পেলেন, বিমর্ষ হলেন। কিন্তু হতোদ্যম হননি। অথবা কোনরকম নিরাশ এবং অবসাদে তাঁকে পেয়ে বসেনি। ইরাক সীমান্তে বড় রকমের অভিযান চালানোর জন্য অনতিবিলম্বে তিনি প্রস্তুতির কাজ হাতে নিলেন। রিদ্দা যুদ্ধে ভণ্ড নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ না করার যে নীতি হযরত আবূ বকর (রা) গ্রহণ করেছিলেন তা রহিত করা হলো। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে স্বেচ্ছাসেবী এবং সৈন্য সংগ্রহ করা হল। পারসিকদের মুকাবিলায় মুসলমানদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করা হল। ওমর (রা) বলেন, তিনি পারস্য বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বকে মরু অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে মুকাবিলা করবেন। আরবের কোন সৈন্য, কোন কবি বা বাগ্মী পেছনে পড়ে থাকতে পারবে না। সবাইকে পারসিকদের মুকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু এই বিরাট বাহিনীর সেনাপতি কে হবেন? কার উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা যায়? ইয়ারমুকের লড়াইয়ে খালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী রোমানদের সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ইরাক অভিযান সম্পর্কে খালিদের মোটামুটি জানা-শোনাও ছিল। এদিক থেকে বিবেচনা করলে সম্ভবত খালিদই ছিলেন সর্বাধিনায়ক হওয়ার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু খালিদের ব্যাপারে ওমর (রা)-এর মনোভাব ছিল অন্যরকম। তিনি ইতিমধ্যে সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব থেকে খালিদকে অব্যাহতি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। সেক্ষেত্রে ইরাক অভিযানে খালিদকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অথচ এতবড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করার মত উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এক পর্যায়ে খলিফা ওমর (রা) নিজেই সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ঘনিষ্ঠ সহচরবৃন্দ। তাঁরা খলিফাকে মদীনা ত্যাগ করে ইরাক যেতে বারণ করলেন। অবশেষে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সাদ বিন আবি ওয়াককাসের উপর মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হল।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ছিলেন রাসূল (সা)-এর আপন চাচা এবং একজন শ্রদ্ধাস্পদ সাহাবী। ইসলামের প্রথম পর্বে যে ১০/১২ জন মহিলা পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন সাদ ছিলেন তাঁদেরই একজন। এ সময়ে সাদ বিন আবি ওয়াককাসের বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা তীরন্দাজ এবং ইসলামের জন্য তিনি প্রথম রক্তপাত করেন। জীবদ্দশাতেই যে দশজন ভাগ্যবান সাহাবা বেহেশতে প্রবেশের সুখবর অর্জন করেন, সাদ বিন আবি ওয়াককাস তাঁদের মধ্যে একজন। রাসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে সাদ বিন আবি ওয়াককাসের নৈকট্য-কর্তব্যপরায়ণতা এবং অভিজ্ঞতার বিচারে সম্ভবত তিনিই ছিলেন ইরাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ার মত যোগ্যতম ব্যক্তি। অবশ্য একথা ঠিক যে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিকতা এবং একজন যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম সুখ্যাতি

থাকলেও কোন যুদ্ধেই তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেননি। এ ধরনের সুযোগ তাঁর জীবনে কখনও আসেনি। সর্বাধিনায়ক হিসেবে যিনি পরীক্ষিত নন, যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ যিনি পাননি, তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যাবে কিনা– এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। সম্ভবত এ ব্যাপারে খলিফা ওমর (রা) নিজেও ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। এবং সে কারণেই তিনি তাৎক্ষণিক এবং সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারটি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের উপর ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধের কৌশলগত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রেখে দেন। পারসিকদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভিযানে এ ধরনের দায়িত্ব বন্টন ব্যবস্থাকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হবে। কিন্তু ইরাক সম্পর্কে খলিফার জানাশোনা এবং অভিজ্ঞতা এত বেশী ছিল যে তিনি নিঃসংকোচে এ ধরনের একটা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। বলা বাহুল্য জীবনের শুরুতে ব্যবসায়ী হিসেবে ইরাক সফরকালে তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

খলিফা ওমর (রা) বাহিনীকে খুব যত্ন এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সাজিয়ে দিলেন। বিভক্ত করলেন পদাতিক, অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী, দূর পাল্লার আক্রমণকারী বাহিনী, অনিয়মিত, গোয়েন্দা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে। সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক দিকটিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে ঢেলে সাজালেন। কাজের সুবিধার্থে সেনাবাহিনীতে রসদ সরবরাহ, নিয়মকানুন বা শৃংখলা রক্ষা ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসা বিভাগ গঠন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, এই প্রথমবারের মত সেনাবাহিনীকে অতি চমৎকারভাবে বিন্যস্ত এবং সুসংগঠিত করা হল। ইতিপূর্বে সেনাবাহিনীর সংগঠন মজুবত এবং দৃঢ় করার জন্য আর কখনও এতখানি মনোযোগ দেয়া হয়নি।

বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ৭০ জন গাজী, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসংখ্য সাহাবা এবং মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারী অনেক সৈনিক ইরাক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। এই বাহিনীতে আরও ছিলেন আরবের খ্যাতনামা কবি এবং বাগ্মীগণ। এঁদের সকলের উপস্থিতিতে সেনাবাহিনীর মনোবল ছিল একেবারে তুঙ্গে।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ১৫ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদীনা ছেড়ে ইরাকের পথে রওয়ানা হন। যাত্রার প্রাক্কালে খলিফা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে দু'টি বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, ১. যথাসম্ভব কাদিসিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধের আয়োজনের চেষ্টা করবে, ২. বাহিনীর অগ্রযাত্রা এবং পারসিকদের গতিবিধি সম্পর্কে সার্বক্ষণিকভাবে খলিফাকে অবহিত করতে হবে যেন তিনি মদীনা থেকে বাহিনীকে সুচারুরূপে পরিচালনা করতে পারেন। সুবিশাল আরব ভূমির মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলল ইরাক সীমান্তের দিকে। ওমর (রা)-এর দেয়া পরিকল্পনা অনুসারে তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে থামেন, বিশ্রাম করেন, আবার পথ চলতে শুরু করেন। যাত্রাপথে আরও অনেকে স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। সাদ যখন
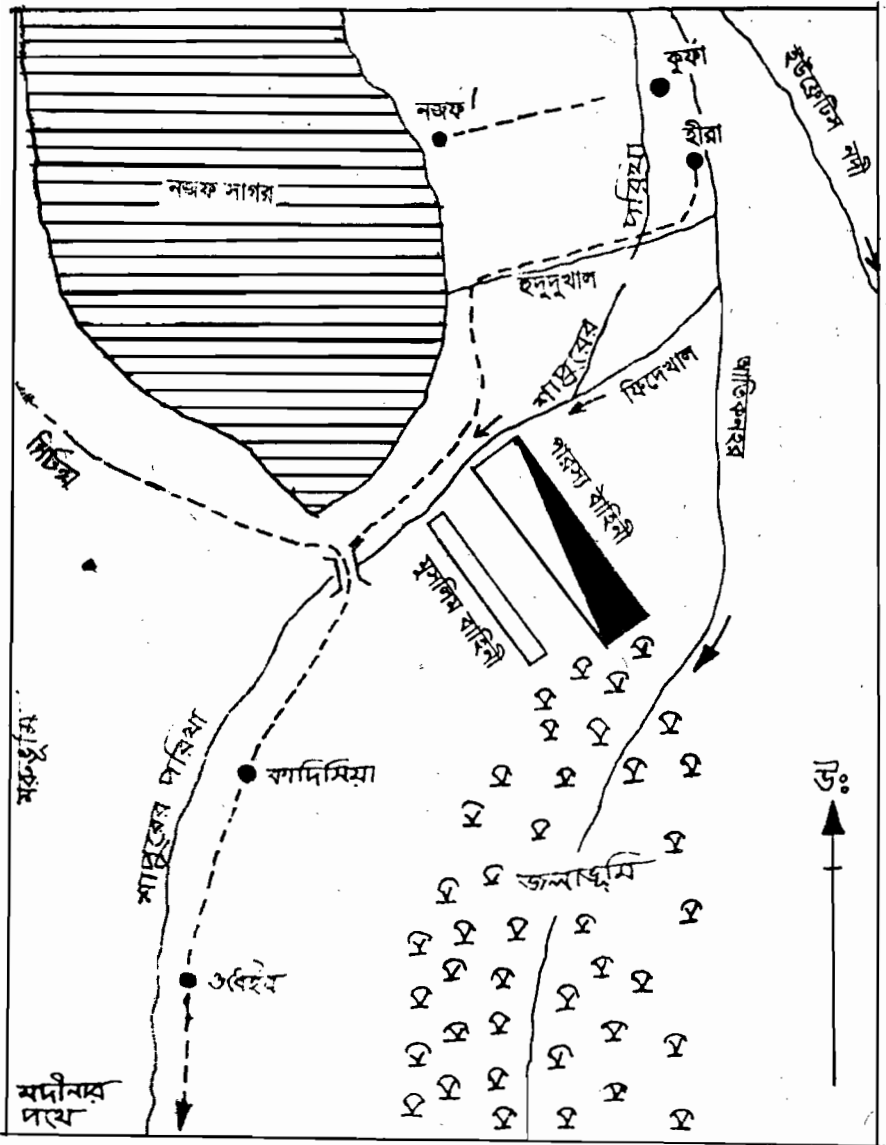
স্কেল ১ ইঞ্চি= ৪ মাইল

শরফে পৌঁছলেন তখন মুসান্নার বাছা বাছা যোদ্ধারা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। ইতিপূর্বে খলিফা সিরীয় বাহিনীকে সাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলেও তখনও তাঁরা ইরাকে এসে পৌঁছায়নি। অবশ্য ইতিমধ্যে সব মিলিয়ে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ হাজার।

মুসান্নার বাহিনী সাদের সঙ্গে যোগ দিলেও সাদের সঙ্গে মুসান্নার দেখা হয়নি। কারণ, সাদ শরফে আসার পূর্বেই মুসান্না ইন্তেকাল করেন। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি সাদের জন্য একটি বার্তা রেখে যান। মুসলিম বাহিনীর পারস্যের খুব বেশী অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় পারস্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। যুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে মরুঅঞ্চলকে পশ্চাৎভাগে রেখে। মুসান্নার পরামর্শ অনুসারে মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়ার উর্বর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হন।

ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরের আবাদী ভূমি অঞ্চলকে বলা হত তাফ। সে আমলেও এখানে পানি সেচের ব্যবস্থা ছিল। সেচ ব্যবস্থার জন্য খনন করা হয়েছিল বেশ বড় একটা খাল। পারস্য সম্রাট শাপুর-এর নির্দেশে এই খাল খনন করা হয়েছিল বলে তাঁর নাম অনুসারে এ খালকে বলা হত 'ডিচ অব সাপুর'। ডিচ অব শাপুরে পানি সরবরাহের জন্য আরও কতগুলো সংযুক্ত খাল খনন করা হয়েছিল। 'হিট' নামক স্থানে ইউফ্রেটিস নদী থেকে ডিচ অব শাপুরের উৎপত্তি। হীরার আবাদী ভূমির পশ্চিম প্রান্ত বরাবর এবং নাজাফ উপসাগরের নিম্নভাগ দিয়ে এই খালের প্রবাহ পশ্চিম দিকে চলে গেছে। অল্প কিছুদূর পরেই এই খাল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কাজিমার নিকট পারস্য উপসাগরের সঙ্গে মিশেছে। বর্তমানে আমরা যে অঞ্চলটিকে কুফা বলি, তার কয়েক মাইল উত্তরে থাকতেই ইউফ্রেটিস দু'টি প্রধান শাখা নদীতে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব দিকের শাখা নদীটির নাম ইউফ্রেটিস। পশ্চিমাংশের শাখা নদীকে বলা হত নহরে আতিক। এটিই ছিল মূলত ইউফ্রেটিস নদীর মূল স্রোত। নহরে আতিকের বাংলা অর্থ দাঁড়ায় আদি নদী অথবা পুরাতন নদী। হীরা অতিক্রম করে নহরে আতিক বিরাট একটি বৃত্তের আকৃতি নিয়ে আলিসের নিকটে ইউফ্রেটিসের সঙ্গে মিশেছে। নহরে আতিকে অনেকগুলো সংযুক্ত খাল খনন করা হয়। সংযুক্ত খালের পানি দিয়েই নহরে আতিকের পশ্চিমাঞ্চলের ভূমিতে সেচের ব্যবস্থা হত। দ্বিতীয়ত সংযুক্ত খালগুলো দিয়ে ডিচ অব সাপুরে নিয়মিত পানি সরবরাহ করা হত। হীরার দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া নহরে হুদহুদ এমন একটি সংযুক্ত খাল।

ডিচ অব সাপুর এমনভাবে খনন করা হয় যে, তা তাফ-এর আবাদী অঞ্চলকে মরুভূমি থেকে পৃথক করে দিয়েছে। এই খাল খননের ফলে দু'টি চমৎকার ফল পাওয়া গিয়েছিলঃ ১. এই খালের পানি দিয়েই তাফ-এ সেচের কাজ চলত। ২. ডিচ

অব শাপুর একটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই খালের কারণেই মরুঅঞ্চল থেকে সহজে কেউ এ অঞ্চলের উপর চড়াও হতে পারত না। খালের তীরে অনেকগুলো সুরক্ষিত চৌকি এবং প্রহরা টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছিল। এই টাওয়ার থেকেই মরুবাসী বেদুঈনদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হত। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম থেকে এই খালের পানি দিয়ে সেচ কাজ চলত এবং পানির সরবরাহ আসত নহরে আতিক থেকে। কুফার পশ্চিমে ডিচ অব সাপুরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

ছোট শহর কাদিসিয়া। কুফার দক্ষিণে মাত্র ১৯ মাইল দূরে এই শহরটি অবস্থিত। মদীনা থেকে কাদিসিয়া হয়েই হীরায় যেতে হয়। কাদিসিয়ার পাশেই রয়েছে একটি সেতু। এই পথটি সেতুর উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে নহরে হুদহুদের তীর ধরে সোজা হীরার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। সেতুর ঠিক উত্তর প্রান্ত দিয়েই একটি রাস্তা নাজাফ সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম তীর দিয়ে চলে গেছে সিরিয়ার দিকে। কাদিসিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিক রয়েছে ডিচ অব সাপুর। পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বয়ে গেছে নহরে আতিক। নহরে আতিকের উত্তর পাশেই রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাশয়। কাদিসিয়ার দক্ষিণ দিকেও রয়েছে ডিচ অব সাপুরের একটি বৃহৎ অংশ। এখানে সেচের কাজে খালটির বিন্দুমাত্র ব্যবহার নেই। কিন্তু প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এই খালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাদিসিয়ার দক্ষিণে পাঁচ মাইল দূরে রয়েছে উদায়েব নামের একটি স্থান। উদায়েব পার হলেই চোখে পড়বে উন্মুক্ত এবং সুবিশাল মরু অঞ্চল। হীরা থেকে মদীনা যাওয়ার রাস্তাটি উদায়েব হয়ে মরুঅঞ্চলের মধ্য দিয়ে সোজা পৌঁছে গেছে মুসলিম জাহানের রাজধানী মদীনা শহরে।

ইয়াজদিগিরদ ছিলেন যুবক ও উৎসাহী। কিন্তু বিশাল পারস্য শক্তি তখন ষড়যন্ত্র এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে শতধাবিভক্ত। বুয়ায়েবের যুদ্ধে বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য ইয়াজদিগিরদ বিরাট একটি বাহিনী গড়ে তুললেন। খোরাসানের শাসনকর্তা রুস্তমকে নিয়োগ করলেন সর্বাধিনায়ক হিসাবে। জন্মগতভাবে একজন যোদ্ধা হলেও জ্যোতিষ বিদ্যায় ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি নিজেও ছিলেন একজন জ্যোতিষী। তিনি চাঁদ-তারা গণনা করে দেখলেন যে এই অভিযানে পারস্য বাহিনীর বিজয়ের সম্ভাবনা নেই। সে কারণেই তিনি সৈন্যসহ রাজধানী মাদাব্রেন থেকে অগ্রসর হয়ে সাবাতেই অবস্থান করছিলেন। এই জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, পারস্যের উত্তর-পূর্ব প্রদেশে তাঁর ভাইকেও এ খবর জানিয়ে দিলেন। বলে দিলেন যে-অবিলম্বে আরব সন্তানেরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবে। সুতরাং দুর্গগুলোকে যথাসম্ভব সংস্কার এবং শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ইয়াজদিগিরদ বারংবার তাকীদ দিলেন। কিন্তু রুস্তম বিষয়টিকে খুব গায়ে লাগালেন না। তিনি তুচ্ছ বিষয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করতে লাগলেন। পারস্য বাহিনীর ভাগ্যের লিখন হয়ত পাল্টে যাবে, অবিলম্বেই হয়ত চাঁদ-তারার গণা-গুণতির

ফলাফল এসে যাবে তাদের পক্ষে– এই আশায় রুস্তম খুবই ধীর গতিতে হীরার পথে এগিয়ে চললেন। তার চলার গতি এতটা মন্থর ছিল যে, ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করতে রুস্তমের সময় লেগেছিল দীর্ঘ ৪ মাস। এই ফাঁকে মুসলমানগণ নিজেদেরকে আরও গুছিয়ে নেন। অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ এবং সমর প্রস্তুতি নিয়ে কাদিসিয়ার প্রান্তরে সমবেত হওয়ার সুযোগ পান।

রুস্তমের সাবাত ত্যাগের পূর্বেই খলিফা ওমর (রা) সাদকে ইয়াজদিগিরদ-এর কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুসারে সাদ বিন আবি ওয়াককাস তৎক্ষণাৎ যথাযথ ব্যবস্থা নিলেন। গুণে এবং মর্যাদায়, যুদ্ধে এবং বক্তৃতায় নেতৃস্থানীয় ২০ জনের একটি প্রতিনিধিদলকে পাঠিয়ে দিলেন সম্রাটের দরবার টেসিফোনে। প্রতিনিধিদের সাধারণ বেশভূষা এবং আয়োজন দেখে পারস্যবাসীরা তামাশা করল, বিদ্রূপ করল। অনেকেই আবার মুসলমানদেরকে চরকায় সুতা কাটার নরম-মোলায়েম তুলার সঙ্গে তুলনা করল। কিন্তু সম্রাট এবং সভাসদদের কারোরই সিরিয়ার মুসলমান বাহিনীর গৌরব-গাঁথা অজানা ছিল না। তাঁরা মরু সন্তানদের অমিত তেজ, বিনয়-নম্র স্বভাব, নির্ভীকচিত্ততায় ভীষণভাবে মুগ্ধ হল। প্রতিনিধিদলের প্রধান দোভাষীর মাধ্যমে ইসলামের মহিমা বর্ণনা করে সম্রাট ইয়াজদিগিরদকে ইসলাম কবুল করার অথবা জিযিয়া প্রদান করার আহব্বান জানালেন। ইরানের একজন যোগ্য সন্তানের মত ইয়াজদিগিরদ প্রতিনিধিদলের এই অপমানজনক প্রস্তাবকে ক্রোধের সাথে নাকচ করে দেন। তিনি মরুবাসীদের দৈন্যদশা, শিশু-কন্যার কবর দেয়া এবং ঘৃণ্য স্বভাবের জন্য নগ্নভাবে তাদের তিরস্কার করেন। ইয়াজদিগিরদের কথাগুলো শেলের মত বুকে বিঁধলেও প্রতিনিধিগণ মর্যাদাবোধ এবং ভদ্রতার সীমা ছাড়ালেন না। স্বীকার করে নিলেন সম্রাটের অভিযোগগুলো। সহজভাবে বললেন-এককালে মরুসন্তানরা এরকমই ছিল। কিন্তু এখন সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য এখনও আমরা দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত। কিন্তু আল্লাহ্ হয়ত আমাদের সমৃদ্ধিশালী করবেন, আমাদের পরিতৃপ্ত করবেন। সম্রাট তুমি কি তাহলে তলোয়ারকে বেছে নিয়েছ? অস্ত্রই কি এই বিরোধ মীমাংসা করে দেবে? প্রতিনিধিদলের প্রয়াস বিফলে গেল। পারসিক ও মুসলিম বাহিনী এবার অনিবার্য সংঘর্ষের মুখোমুখি হল।

বিলম্বে হলেও রুস্তম হীরায় পৌঁছে গেলেন। বিশাল বাহিনী[১] হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছে। তবুও রুস্তম নিশ্চুপ। চাঁদ-তারার রাহু কেটে যাবে, পারস্য বাহিনীর ভাগ্য ফিরবে-এই আশায় তিনি দিন গুণতে লাগলেন। এদিকে মুসলিম বাহিনীর হালকা অশ্বারোহী দল ক্ষণে ক্ষণে শত্রু এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। বার বার আক্রমণ চালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে। নিরুপায় হয়ে স্থানীয় জনগণ সম্রাট ইয়াজদিগিরদের শরণাপন্ন হল। অভিযোগ করল মুসলমানদের

এই আক্রমণ সম্পর্কে। রুস্তমের পক্ষে আর বিলম্ব করা সম্ভব হল না। সম্রাটের কঠোর নির্দেশ পেয়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সমস্যায় পড়লেন কাদিসিয়ার সেতু অতিক্রম করা নিয়ে। সেতু পার হওয়ার সময় মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা আছে। নিরাপদে সেতু পার হওয়ার জন্য মুসলিম বাহিনীর সহযোগিতা প্রয়োজন। রস্তম চেষ্টাও করলেন তদনুসারে। কিন্তু সেনাপতি সাদের কৌশলগত হিসাব-নিকাশ বড়ই নিখুঁত। তিনি সরাসরি রুস্তমের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। রুস্তমের সামনে তখন একটি পথই খোলা থাকল। তিনি সেতুর কাছে না এসে উজানে থাকতেই 'ডিচ অব শাপুর' পার হয়ে গেলেন। সামনেই ছিল 'ডিচ অব শাপুর' এবং নহরে আতিক দিয়ে ঘেরা তিন কোণাবিশিষ্ট একটি এলাকা। কাদিসিয়া নামে খ্যাত পলি পড়া উর্বর ভূমিতেই উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হল।

হস্তী, ভারী অশ্বারোহী এবং পদাতিক দলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল পারস্য বাহিনী। পদাতিক বাহিনীতে ছিল নিপুণ তীরন্দাজ এবং বল্লমধারী সেনারা। রণনিপুণ হস্তিবাহিনী ছিল রুস্তমের মূল শক্তি। তাঁর পশ্চাতেই অবস্থান নিয়েছিল ভারী অশ্বারোহী বাহিনী। ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১সালে আরবেলার যুদ্ধে মহাবীর আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে পারসিকরা সর্বপ্রথম হাতী ব্যবহার করে। কিন্তু এই যুদ্ধে তারা হাতীকে কিভাবে এবং কতটুকু সফলতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিল তার কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য সেতুর যুদ্ধে হস্তিবাহিনী চমৎকার কার্যকারিতার পরিচয় দেয়। পারসিকদের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত। একমাত্র মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইটদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে। কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারসিকদের পক্ষে কোন হালকা অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না বললেই চলে। আসলে হালকা অশ্বারোহী বাহিনীর ব্যাপারে কখনও তাদের তেমন কোন আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল না। মরু অঞ্চলের বেদুঈনদের মত কতগুলো গোত্রের সঙ্গে পারসিকদের সম্পর্ক থাকলেও কোন রকম সৌহার্দ গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন সময়ে তারা পারসিকদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিত। গড়ে তুলত হালকা অশ্বারোহী বাহিনী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বেদুঈন সম্প্রদায় মুসলিম বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে এবং স্বাভাবিকভাবেই পারসিকদের হালকা অশ্বারোহী বাহিনীর বিলোপ ঘটে।

পারস্য অশ্বারোহী সেনারা মাথায় হেলমেট পরত। গায়ে দিত কোট জাতীয় শক্ত আচ্ছাদন। অধিকতর নিরাপত্তার জন্য তারা গোলাকার ঢাল ব্যবহার করত। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল বিরাটাকারের বল্লম, তলোয়ার এবং তীর ও ধনুক। এমনকি তাদের ঘোড়াগুলো ইস্পাতের পাত দিয়ে আবৃত করা থাকত। পদাতিক বাহিনীর মধ্যে তীরন্দাজ দলই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরক্ষা দলের পশ্চাৎ ভাগ থেকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে তীর ছোঁড়ার ব্যাপারে তারা ছিল খুবই

পারদর্শী। অন্য পদাতিক সেনাদের প্রধানত কাজ ছিল তীরন্দাজ বাহিনীকে সাহায্য করা। তাদের হাতে থাকত বর্শা এবং তলোয়ার। কিন্তু তারা আত্মরক্ষামূলক তেমন কোন যুদ্ধ-পোশাক ব্যবহার করত না। ওয়েস্ট বেল্টের সাহায্যে তারা তলোয়ার বহন করত। এ ব্যাপারে মুসলিম সেনাদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর; তাদের কাঁধে থাকত বেল্ট। এই বেল্টের সঙ্গেই তারা তলোয়ার ঝুলিয়ে রাখত।

আনসিরওয়ান-এর হাতেই পারস্য বাহিনীর আধুনিকীকরণ ঘটে। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই পারস্য বাহিনী একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। খসরু পারভেজ পারস্য বাহিনীর অতুলনীয় এই শক্তিকেই সফলতার সঙ্গে কাজে লাগান। রোমা সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পরাজিত করে ৬১১ থেকে ৬২২ সালের মধ্যে সিরিয়া, মিশর, প্যালেস্টাইন এবং আনাতোলিয়া দখল করে নেন। সাহস এবং শক্তিতে পারস্য বাহিনীর স্থান যখন সবার শীর্ষে, তখন তারা রোমানদের অশ্বারোহী বাহিনীর খুব কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করাকে পরিহার করে চলত। আরব এবং পারস্য সেনাদের যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মুসান্নার ছিল বিস্তর অভিজ্ঞতা। পারস্য সেনাদের সম্পর্কে একবার তিনি চমৎকার একটি মন্তব্য করেছিলেন-পূর্ব থেকে কথাবার্তা স্থির করে পছন্দ মত কোন স্থান থেকে যদি পারস্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে হঠাৎ করেই তাদের খুব কাছাকাছি চলে আসতে হবে। এবং এভাবেই হরণ করে নিতে হবে তাদের দূরপাল্লার তীর-ধনুক ব্যবহারের সুবিধাটুকু। রোমান এবং পারসিক উভয় বাহিনীর সঙ্গেই খালিদ সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতেও রোমানদের চাইতে পারস্য সেনারা অধিকতর উন্নতমানের যোদ্ধা। অসম সাহসিকতা এবং তেজস্বিতার জন্য তিনি পারস্য বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু খসরু পারভেজের মৃত্যুর পর দেশজুড়ে দেখা দেয় চরম অস্থিতিশীলতা এবং অস্থিরতা। তারই ফলশ্রুতিতে পারস্য সেনাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। হ্রাস পায় তাদের মনোবল। কিন্তু ইয়াজদিগিরদের শাসন ক্ষমতায় আরোহণের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি এবং সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি তৎপর হয়ে উঠেন। পারস্যবাসীরা আবারো জেগে উঠে। তাদের অন্তরে নতুন আশা, নতুন শক্তির স্পন্দন জাগে।

বিশাল এই বাহিনীর মুকাবিলায় সাদ মুসলিম বাহিনীকে সাজিয়ে নিলেন। পারসিকদের মত মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগ তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি অংশকে মধ্যভাগে রেখে অপর দু'টি দল ডান ও বাম দিকে অবস্থান নেয়। যুদ্ধের ময়দানে তারা এমনভাবে অবস্থান নেয় যে, তাদের দক্ষিণ প্রান্ত কাদিসিয়ার উদ্যান এবং বাম দিকের অংশ 'ডিচ অব শাপুর' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। এদিকে পারস্য বাহিনীও ডিচ অব শাপুর এবং কাদিসিয়ার জলাভূমি বরাবর লম্বালম্বিভাবে অবস্থান নেয়। এবং ডিচ অব শাপুর এবং জলাভূমির কারণে ডান ও বাম উভয় দিক থেকেই

তারা মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মুকাবিলার জন্য সাদ একটি শক্তিশালী রিজার্ভ ফোর্স গড়ে তোলেন। বনু আসাদ এবং বনু তামিম গোত্রের যোদ্ধারাই ছিলেন এই দলের সদস্য। কাদিসিয়ার অদূরে উদায়েবে মুসলিম সেনাদের পরিবারবর্গ এবং বেসামরিক সফর সঙ্গীগণ অবস্থান করছিলেন। তাদের হেফাজতের জন্য সাদ উদায়েবে ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দলকে মোতায়েন করেন। পারস্য বাহিনীর ডান বা বাম প্রান্তের সেনাদলের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করাও ছিল এই দলের একটি প্রধান দায়িত্ব। যুদ্ধের ময়দানে পারস্য সেনারা মোট ১৩ টি লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতি লাইনে সেনা সংখ্যাও ছিল অগণিত। তারই বিপক্ষে মুসলিম বাহিনীর লাইন সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি।

ইতিমধ্যে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি সাইটিকায় আক্রান্ত হন। যন্ত্রণাদায়ক কতগুলো ফোঁড়ার অসহ্য ব্যথায় ভুগতে থাকেন। পরে এমন অবস্থা হল যে তাঁর পক্ষে আর অশ্বের পিঠে আরোহণ করা, যুদ্ধের ময়দানে ছোটাছুটি, করা সম্ভব ছিল না। অবশেষে তিনি একটি বিকল্প পেয়ে গেলেন। যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনী যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন, ঠিক তার পশ্চাদভাগের মাঝামাঝি স্থানেই ছিল একটি খামারবাড়ী। সেনাপতি সাদকে নিয়ে যাওয়া হল সেই খামারবাড়ীর উঁচু বারান্দায়। অসুস্থতার কারণে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নিতে না পারলেও এখান থেকে যুদ্ধের গতিবিধিকে খুবই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। ফলে সুচারুরূপে সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া ছিল সহজ। আরফাতাকে নিয়োগ করলেন মুসলিম বাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসেবে। খামারবাড়ীর সামনে, সাদ যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন ঠিক তার নিচেই আরফাতা সব সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ সময়ে মুসান্নার বিধবা পত্নী এবং পরবর্তীতে সাদের স্ত্রী সালমা সব সময় তার পাশে পাশে থাকতেন। তিনিও যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি সাদকে উৎসাহ দিতেন, কখনও বা বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন।

খামারবাড়ীর বারান্দায় একটি চেয়ারে তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এখানে বসেই তিনি যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। অবিরাম লিখে যাচ্ছিলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং পরামর্শগুলো। এগুলো তিনি সরবরাহ করতেন আরফাতার নিকট। আরফাতও তদনুসারে ব্যবস্থা নিতেন। পারস্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রুস্তম এই যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেননি। তিনি পারস্য বাহিনীর মাঝখানে একটি সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে বসে যুদ্ধের গোটা চিত্র তার পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। ফলে রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষের মাঝে কখনও কোন সুযোগ এলেও রুস্তম তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এখানেই ছিল পারস্য সর্বাধিনায়কের ব্যর্থতা।

প্রাচীন যুদ্ধরীতি অনুসারে প্রথমেই শুরু হল মল্লযুদ্ধ। পারসিকরা মুসলমানদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না। এর পরেই শুরু হল ব্যাপক যুদ্ধ। শুরুতেই পারসিকরা হস্তিবাহিনী দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। মধ্যভাগ এবং ডান ও বাম প্রান্তের মোট ৩৩ টি হাতী এতে অংশ নেয়। উৎকৃষ্টমানের একটি শ্বেতহস্তী ছিল সবার সামনে। আসলে এটিই ছিল তাদের দলপতি। পাহাড়ের মত বিরাটাকারের হাতীগুলো দেখে আরবী ঘোড়াগুলো পিছু হটতে থাকে। বনু বাজিলাহ গোত্রের অশ্বারোহী দলটি ছিল খুবই শক্তিশালী। পারসিকদের হস্তিবাহিনী মশহুর এই অশ্বারোহী দলকে খুবই ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে যায় যায় অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সাদ রিজার্ভ ফোর্স থেকে বনু আসাদ গোত্রকে তাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেন। আসাদ গোত্রের সেনারা অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন। যুদ্ধ চালিয়ে যান বীরবিক্রমে। হস্তিবাহিনীকে তারা পরাভূত করলেন। হত্যা করলেন শ্বেত হস্তীকে। আসাদ গোত্রের সেনারা অসামান্য সাহসের পরিচয় দিলেও তারা কোন দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের এই প্রয়াস নিরর্থক এবং আত্মঘাতী বলে প্রমাণিত হল। দেখতে দেখতে তাদের ৫০০ বীরসেনানী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।[২] এবার তিনি বনু তামিম গোত্রকে তাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। এরা ছিলেন রিজার্ভ বাহিনীর দলভুক্ত। বনু তামিম গোত্রকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "অবাধ্য ঘোড়াগুলোকে তোমরা পোষ মানাও, উটগুলোকে তোমরা বশে আন। কিন্তু তোমরা কি পারবে এই উন্মত্ত ক্রুদ্ধ হাতীগুলোকে বাগে আনতে?"

তীর এবং বর্শা নিক্ষেপের ব্যাপারে বনু তামিম গোত্রের লোকেরা ছিল খুবই সিদ্ধহস্ত। এজন্য তাদের খ্যাতিও ছিল সর্বজনবিদিত। কাদিসিয়ার প্রান্তরেও তারা বীরত্ব এবং পারদর্শিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তারা লক্ষ্য করেন যে মূল বাহিনী থেকে হাতীগুলো খানিকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পারসিকদের কোন দলই হাতীগুলো পাহারা দিচ্ছে না। ঝানু তীরন্দাজরা তীর-বৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করে। হাতীগুলোকে পিছু হটিয়ে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তারা ছুটে এসে হাওদার রশিগুলো কেটে ফেলে। সংখ্যায় অল্প হলেও হাতীগুলো ছিল ভীষণ জেদী। তারাও সাধ্যমত মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করল। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে দিনটি কেটে গেল। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় আচমকা যুদ্ধের গতি ফিরে যায়। একটি হাতী আহত হতেই পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করে। তার দেখাদেখি পালের অন্যান্য হাতীও ছুটে পালায়। ডান ও বাম প্রান্তের যে হাতীগুলো এতক্ষণ মুসলমানদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল, পিষে মারছিল অনেককে -তারাও পলায়নপর হাতীগুলোর সঙ্গে যোগ দেয়। বহু কষ্টে পারস্য সেনারা হাতীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। অতঃপর রণে ক্ষান্ত দিয়ে উভয় বাহিনী ফিরে যায় নিজেদের ছাউনিতে।

তীব্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কাদিসিয়ার যুদ্ধের প্রথম দিনটি অতিবাহিত হয়। যুদ্ধে উভয় বাহিনী অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেয়। অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে। অমীমাংসিতভাবে যুদ্ধ শেষ হলেও প্রথম দিনের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর জিত হয়। কেবলমাত্র হস্তিবাহিনীর আক্রমণে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। গোটা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিচলিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় দিনেও মল্লযুদ্ধ দিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু ব্যাপকভিত্তিতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই সিরিয়া থেকে সাহায্যকারী অতিরিক্ত বাহিনীর অগ্রগামী দলটি কাদিসিয়ার রণক্ষেত্রে এসে পৌঁছে। তেজোদ্দীপ্ত কাকা বিন আমর ছিলেন এই বাহিনীর সেনানায়ক। বিচক্ষণতা ও যুদ্ধ কৌশল নিরূপণে তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তিনি অগ্রগামী দল থেকে হাজার খানেক সৈন্যকে যুদ্ধ ময়দান থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে আসেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, তোমরা এখানে বিশ্রাম নেবে। এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবে। একটি দল শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর আরেকটি দল এসে হাযির হবে যুদ্ধের ময়দানে। একটি বিশেষ অভিসন্ধি নিয়ে তিনি এই কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সাধারণ মুসলিম সেনাদের মনে এ ধারণা দিতে চেয়েছিলেন যে, একের পর এক দলে দলে নতুন সৈন্যদল মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। ফলে মুসলিম সেনারা যেমন উৎসাহ পাবে, তেমনিভাবে শত্রু সেনাদের অন্তরে ভীতি এবং ত্রাসের সৃষ্টি হবে।

কাকা ছিলেন সে আমলের একজন শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা। তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং উঁচুদরের একজন সমরবিশারদ। যুদ্ধের শুরুতে তিনি 'বাহমানের' সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। এই বাহমানই ছিলেন সেতুর যুদ্ধের বিজয়ী বীর। কিন্তু কাকার প্রবল আক্রমণের মুখে বাহমান বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। নাঙ্গা তলোয়ারের আঘাতে তার শির দ্বিখণ্ডিত হল। দ্বিতীয় দিনের এই যুদ্ধে তিনি আরও একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তামিম গোত্রের উটগুলোকে কাল কাপড় দিয়ে ঢেকে পিঠে অদ্ভুত এক ধরনের ঝুল বেঁধে দেন। উটগুলো তখন দেখতে হাতীর চাইতে অদ্ভুত এক ধরনের জন্তুর মত মনে হল। এই আজব প্রাণীদের দেখে পারস্য বাহিনীর অশ্বগুলো একেবারে ভড়কে যায় এবং বিচলিত হয়ে উঠে।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যুদ্ধের তীব্রতা অব্যাহত থাকে। যুদ্ধশেষে রাতের আঁধারে বিচক্ষণ কাকা তাঁর অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে আবার গা ঢাকা দিলেন। মুসলিম শিবিরে না গিয়ে তিনি চলে গেলেন আরও দূরে। আগের দিন যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন ঠিক সেখানে। তিনি পুনরায় সেনাদলকে নির্দেশ দিলেন যে-গতকাল যেভাবে তোমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কিছুক্ষণ পর পর যুদ্ধের ময়দানে ছুটে গিয়েছ, আগামীকালও ঠিক সেভাবেই অগ্রসর হবে। তিনি আরও বললেন যে, হয়ত অল্প

সময়ের মধ্যে সিরিয়া থেকে মূল বাহিনী এখানে এসে পৌঁছবে। তাদের ঠিক একইভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়ার পরামর্শ দিলেন।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনটি ছিল খুবই ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময়। এই দিনে পারস্য বাহিনী আবারো তাদের হস্তিবাহিনী দিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করে। এবারে তারা হস্তিবাহিনীকে এককভাবে ছেড়ে না দিয়ে পদাতিক বাহিনী দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের এই আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। প্রমাণিত হল যে পদাতিক এবং হস্তিবাহিনীর পক্ষে পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করার মত প্রস্তুতি তাদের নেই। পদাতিক সেনারা হস্তিবাহিনীর সঙ্গে সমান তালে চললে হাতীগুলোর উন্মত্ততা লোপ পায়। ভুলে যায় শত্রুকে নিষ্পেষণের কথা। কোন আনন্দ মিছিলে হাতীরা যেভাবে চলে যুদ্ধ-হাতীগুলোকেও তখন সেই আমেজে পেয়ে বসে। আবার পদাতিক সেনারা পশ্চাদভাগে থাকলে হস্তিবাহিনী অরক্ষিত হয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে রুস্তম হাতীগুলোকে এককভাবে ছেড়ে দেয়। হাতীগুলো এবার মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যুদ্ধে উভয় বাহিনী অভূতপূর্ব বীরত্ব এবং সাহসিকতার পরিচয় দেয়। কিন্তু তখনও মুসলমান সেনারা অপ্রতিরোধ্য হাতীগুলোর গতি রোধ করার কোন পথ খুঁজে পায়নি। হাতীগুলো বার বার মুসলিম বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরিশেষে এমন হল যে তাদের প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে যায় যায় অবস্থা। সর্বাধিনায়ক সাদ এবার মরিয়া হয়ে উঠেন। এবারেও তিনি উন্মত্ত হাতীগুলো সামাল দেয়ার দায়িত্ব বনু তামিম গোত্রের উপর অর্পণ করেন। দুটি হাতী মুসলিম বাহিনীকে খুব বেশী ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। বনু তামিমের কাকা এবং আসিম নামের দু'জন গোত্র-প্রধান ভীম বিক্রমে একটি হাতীকে আক্রমণ করে। দু'জন নওজোয়ান যোদ্ধাকে পাঠিয়ে দেন অন্য হাতীটির বিরুদ্ধে। তারা সুকৌশলে হাতী দু'টির চোখ লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করেন। তাদের এই আক্রমণ সফল হল। হাতী দু'টি অন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি খেল। হাতীর পিঠে হাওদায় যারা বসেছিল তারাও রেহাই পেল না। তীরের তীব্র আঘাতে তারাও ভূতলশায়ী হল।

অন্ধ হাতী দু'টিকে আর বাগে আনা গেল না। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে তারা পেছন দিকে ছুটল। ডান দিক দিয়ে তারা চলে গেল মাঠের বাইরে। তাদের দেখাদেখি অন্য হাতীরাও পালিয়ে গেল। ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে তারা সোজা চলে গেল রাজধানী টেসিফোনে। এই যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্যরা তেমন সুবিধা করতে পারল না। রণক্ষেত্রের খানে খানে কতগুলো গর্ত এবং সেচ খালের কারণে অশ্বগুলোর দৌড়-ঝাঁপ ভীষণভাবে ব্যাহত হল। ফলে মুসলমানদের উপর তারা উল্লেখযোগ্য তেমন কোন আক্রমণ পরিচালনা করতে পারল না। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পারস্যবাসীদের এতদিনের বড়াই এবার ভূলণ্ঠিত হল।

পদাতিক সৈন্যরা অবশ্য সাধ্যমত যুদ্ধ করে। কখনও আক্রমণ, কখনও প্রতিরক্ষার মধ্য দিয়ে তারা অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দেয়।

দিনের প্রথম ভাগেই ৭০০০ সৈন্যের সিরীয় বাহিনী কাদিসিয়ায় পৌঁছে। কিন্তু কাকার পরামর্শ অনুসারে সিরীয় বাহিনী এক সঙ্গে রণক্ষেত্রে না এসে ছোট ছোট কতকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পর ১০০ সৈন্যের এক একটি দল দ্রুতবেগে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করে। এবং মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। আরব ঐতিহাসিকগণের মতে সিরীয় বাহিনী এভাবে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ না করলে পারস্য বাহিনীর মুকাবিলায় মুসলমানরা টিকে থাকতে পারত না। হয়ত পালিয়ে যেত যুদ্ধের ময়দান থেকে। কারণ, মুসলমানদের তুলনায় পারস্য বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এমনকি সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা পারস্য বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের জন্য বিব্রত বোধ করছিল, এবার তারা নিজেদেরকে পারস্য বাহিনীর সমতুল্য ভাবতে শুরু করে।। প্রকৃতপক্ষে এক একটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হতে থাকে এবং অভূতপূর্ব তেজস্বিতার সঙ্গে সারারাত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তবে এ কথা সত্য যে, কাদিসিয়ার যুদ্ধে মুসলমান সেনারা পারস্য শক্তিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করে খুবই খাট করে রেখেছিল।

দিবাবসানে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অস্ত গেল। তবু তারা রণে ক্ষান্ত দিল না। বিরতি দিল না মুহূর্তের জন্য। পারসিকদের পদাতিক বাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। আরব সেনারা এ পর্যন্ত যত যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, যত শত্রুর মুকাবিলা করেছে- তন্মধ্যে কাদিসিয়ার প্রান্তরে পারসিকদের পদাতিক সেনাদের মত এত দুর্ধর্ষ বাহিনীর মুকাবিলা তারা কখনও করেননি। জীবন-মরণ এ লড়াইয়ে কোন পক্ষই তেমন কোন সুবিধা করতে পারল না। চতুর্থ দিন বিকেলে অপ্রত্যাশিতভাবেই যেন একটি সুযোগ এসে যায়। পারস্য বাহিনীর বাম প্রান্ত যেন মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টলমল করে উঠে। হঠাৎ করেই তারা মধ্যভাগের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমন একটি চমৎকার সুযোগ সাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিজার্ভ বাহিনীকে দুর্বল স্থানে আঘাত করার হুকুম দেন। রিজার্ভ বাহিনীও তৈরী ছিল। ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে তারা পারস্য বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক তখনই প্রবল বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। বাতাসের প্রচণ্ডতায় পারস্য সেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাশেই ছিল বিভিন্ন মালামালে বোঝাই করা একটি গাধা। বাতাসের বেগ সইতে না পেরে রুস্তম সেই গাধার পেছনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কাকা এবং তার বাহিনী রুস্তমের কাছাকাছি চলে আসে। আলকাসা-এর পুত্র হেলাল রুস্তমকে দেখে তাকে আক্রমণ করলেন। সম্মুখেই ছিল একটি সংযুক্ত খাল। ভীত হয়ে রুস্তম সাঁতরে সংযুক্ত খাল পার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হেলাল তাঁকে ধরে হত্যা করেন। অতঃপর হেলাল রুস্তমের শূন্য সিংহাসনে উঠে সজোরে চিৎকার করে

বলেন-পবিত্র কাবাঘরের প্রভুর শপথ, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি। হেলালের এই চিৎকারধ্বনি পারস্য সেনাদের অন্তরে গভীর আতংকের সৃষ্টি করে। রণে ক্ষান্ত দিয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। মুসলমানরা তাদেরকে ডিচ অব শাপুর এবং পার্শ্ববর্তী খালের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। অগণিত সৈন্য পানিতে ডুবে মরল। অনেকেই মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাতে জীবন দিল। এভাবেই কাদিসিয়া যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হল পারস্য শক্তি।

পারস্য সেনারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গেছে। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী তখনও ছাউনি ফেলে কাদিসিয়ার প্রান্তরে বসে আছে। একদিন দু'দিন করে তারা সেখানে দীর্ঘ দু'টি মাস কাটিয়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল- যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালার পরও সাদ কেন সেখানে দু'টি মাস অবস্থান করলেন? এটা কি এজন্য যে, যুদ্ধের পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে খলিফা ওমর (রা) কোন নির্দেশ দেননি? অথবা সেনানায়ক সাদের মধ্যে অদম্য উৎসাহের কোন কমতি ছিল? কারণ যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, পারস্য বাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার অবকাশ দিয়ে সাদ অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সাদের ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন বলতে হবে। কারণ, কাদিসিয়ার প্রান্তরে পরাজিত হওয়ার পর পারস্য সেনারা এতটা হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে মুসলমানদের মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেলে। এমনকি তাইগ্রীস নদী অতিক্রম এবং রাজধানী টেসিফোন দখল করার সময়ও পারস্য সেনারা শক্তিশালী তেমন কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। মুসলিম বাহিনী আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করে। আনন্দ ও উল্লাসে চিৎকার করে বলে উঠে, মহান আল্লাহ্ প্রিয় নবীজিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন- এতদিন পর তা পূর্ণ হল। রাজপ্রাসাদে গিয়ে তাঁরা আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি তাঁরা সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন "কত বাগান, কত ঝরনাধারা তারা পশ্চাতে রেখে এল। পশ্চাতে পরে রইল কত শস্যক্ষেত্র ও চমৎকার আবাস ভূমি। এবং উপভোগ্য আরও অনেক বিষয় সামগ্রী। অথচ আমরা অন্য দলকে এর উত্তরাধিকারী করলাম।"

প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, লোহিত সাগর দ্বারা মিশরের রাজা-বাদশাহদের বিপর্যস্ত হওয়ার কাহিনী এই আয়াতে বিধৃত হয়েছে।

হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ইয়াজদিগিরদ সর্বশেষ উদ্যোগ নেন। কিন্তু জালুলাহ-এর যুদ্ধে (৬৩৭ খ্রি) মুসলিম বাহিনী তার সে প্রয়াস নস্যাৎ করে দেয়। এর পর থেকে পারস্য বাহিনীর পক্ষে বিজয়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। মুসলিম সেনারা দ্রুতগতিতে পর্বতমালার পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত ভূমি দখল করে নেয়। এখানেই আরব

অগ্রাভিযানে শেষ সীমা নির্ধারণ করে খলিফা নির্দেশ দিলেন যে, পারস্যবাসীর মাতৃভূমি আক্রমণ করা যাবে না।

খলিফা ওমর (রা) ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক এবং মহান প্রশাসক। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা বিজিত রাজ্যে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করাই বড় কথা। বস্তুতপক্ষে এ বিষয়টির প্রতি খলিফার নজর ছিল বেশী। সিরিয়া সীমান্তে আবূ ওবায়দা খলিফার নির্দেশ যথার্থভাবে পালন করেন। দক্ষিণে তাউরুস পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মুসলিম বাহিনীর অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পশ্চিম সীমান্তে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন উচ্চাভিলাষী আমর বিন আল-আস। খুবই চতুরতার সঙ্গে খলিফার আদেশ সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি তিনি মিশর আক্রমণ করে মাত্র ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ফেরাউনের দেশটি দখল করে নেন। ইরাকের কুফা এবং বসরায় দু'টি সেনানিবাস তৈরী করে জটিল সামরিক এবং প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান অত্যন্ত বিচক্ষণতার এবং সাহসিকতার সঙ্গে করা হল। কিন্তু খলিফা ওমর (রা) তাঁর এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলেন না। পারসিকরাই তাঁকে নতুন করে অভিযান চালাতে বাধ্য করল। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ইরাক বিজয়কে বিপদমুক্ত করতে হলে পারস্য দখল করতে হবে। ওমর (রা)-এর এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পশ্চাতে প্রধানত দু'টি কারণ ছিল। পারস্যবাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তাঁরা পারস্যে অভিযান চালানোর জন্য ওমর (রা)-কে অনুরোধ করেন। তার চেয়েও বড় কথা, পারসিকরা বার বার মুসলিম এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করছিল।

ওমর (রা)-এর সুচিন্তিত এই সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দিতে খুব বেশী সময় লাগল না। মুসলমান বাহিনী আবারো দুর্বার অভিযান চালালেন। ৬৪২ সালে অনুষ্ঠিত হল নিহাবন্ধের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এই যুদ্ধেই মুসলমান ও পারসিকদের ভাগ্য নির্ধারিত হল। যুদ্ধে বিজয় পতাকা চলে এল মুসলমানদের পক্ষে। গোটা পারস্য সাম্রাজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হল আরবদের আধিপত্য। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সিসতান এবং খুরাসানও চলে এল মুসলমানদের দখলে। জ্যোতিষবিদ্যার যে গণনা রুস্তমকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল এতদিনে তার সেই ধারণাই সত্য হয়ে ধরা দিল।

কাদিসিয়া এবং নিহাবন্দ ও শিকলের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সঙ্গে একমাত্র গ্রানিকাস, ইসাস এবং আরবেলার যুদ্ধে আলেকজান্ডারের বিজয়ের তুলনা করা চলে। কিন্তু একথা সত্য যে, যুদ্ধ কলাকৌশলের বিচারে ইসাস অথবা আরবেলার চাইতে কাদিসিয়ার যুদ্ধ ছিল অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ সবিস্তারে ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। বিশেষ কোন সামরিক প্রতিভা বা মেধা দিয়ে এই যুদ্ধের ব্যাপারে কারও বিবেচনা বা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করা যাবে না।

বিবদমান পক্ষের উভয় সেনাপতি ছিলেন মোটামুটি সমমানের। এর মাঝেও

রুস্তম অপেক্ষা সাদ অধিকতর বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। অভিজ্ঞ যোদ্ধা মুসান্নার পরামর্শ এবং খলিফা ওমর (রা)-এর নির্দেশ অনুসারে তিনি কাদিসিয়ার প্রান্তরকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। এখান থেকেই তিনি পারস্য বাহিনীর মুকাবিলার চেষ্টা করেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে পারস্য বাহিনীতে প্রকৃতপক্ষে নিয়মিত কোন অশ্বারোহী নেই। তারই প্রেক্ষিতে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে ছোট ছোট কতগুলো দলে বিভক্ত করেন। ছোট ছোট এই অশ্বারোহী দল নিয়েই তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালান। উপায়ান্তর না দেখে ইয়াজদিগিরদ সেনাপতি রুস্তমকে বিলম্ব না করে যথাশীঘ্র আরব বাহিনীর মুকাবিলা করতে এবং তাদের নিঃশেষ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। ফলে মুসলিম বাহিনী মুকাবিলা করার জন্য সাদের পছন্দমত যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে রুস্তম বাধ্য হলেন।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেনাপতি সাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়া সম্ভব হল না। এজন্য মুসলিম বাহিনীতে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে, তাঁর এই অসুস্থতাই মুসলিম বাহিনীকে পরোক্ষভাবে বিজয়ের পথে নিয়ে গেছে। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে অন্য সৈনিকদের সঙ্গে একই কাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলে জিসির-এর যুদ্ধে আবূ উবায়েদ যেমন হস্তিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হয়েছিলেন, সাদেরও তেমনি আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। তদুপরি যুদ্ধের ময়দানে অধিনায়কের মৃত্যুতে মুসলিম বাহিনীর হাল ধরার মত খালিদ অথবা মুসান্নার মত অসম সাহসী কোন যোদ্ধাও এই বাহিনীতে ছিল না। এমনি অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর উপর যে কত বড় বিপর্যয় নেমে আসত চোখের পলকে কিভাবে যে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত, তা বলা বাহুল্য। সাদের অসুস্থতা মুসলিম বাহিনীর ভাগ্যকে আরও সুপসন্ন করেছিল। অসুস্থতার কারণে তিনি বাহিনীর পশ্চাদভাগে একটি উঁচু স্থানে বসলেন। যুদ্ধের ময়দানে কোথায় কি ঘটছে , কি অসুবিধা অথবা দুর্বলতা আছে এ সবই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। ফলে অবস্থানুসারে উপযুক্ত এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেয়াও ছিল তাঁর জন্য অধিকতর সহজ। দেখা গেছে যে তিনি শত্রুর আক্রমণকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিহত করছেন, আবার শত্রুপক্ষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছেন যথাযথভাবে। যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিনিয়ত তিনি রিজার্ভ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছেন। এক এক করে অগণিত বিপর্যয়কে প্রতিহত করেছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়ে তিনি অদ্ভুত রকমের সাহসী এবং শক্তিশালী পারস্য বাহিনীর মুকাবিলা করেছিলেন। সমসাময়িককালের অনেক মুসলিম অধিনায়কের অভূতপূর্ব সাফল্য হয়ত সাদের এই সাফল্যকে ম্লান করে দেবে। তাদের তুলনায় সাদকে হয়ত বা নিষ্প্রভ মনে হবে। তবু একথা বলতেই হবে যে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘতম এবং সংকটপূর্ণ

একক যুদ্ধে সাদ সবচাইতে বেশী ক্ষিপ্রতা, সমরকুশলতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি ছিলেন অপরিচিত এবং অনাবিষ্কৃত।

সিরীয় বাহিনীর যুদ্ধের মাঠে প্রবেশের ব্যাপারে কাকার পরামর্শ সত্যই অভিনব এবং বিস্ময়কর। হতে পারে যে পারস্য বাহিনীর উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি, অথবা তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। কিন্তু সংখ্যা স্বল্পতার কারণে যে মুসলিম বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, হস্তিবাহিনীর আক্রমণে যারা বারবার দলিত-মথিত হচ্ছিল, তাদের উপর অবশ্যই এই কৌশলটির প্রভাব ছিল অপরিসীম। পারস্য বাহিনীর মনোবল ও দৃঢ়তা খুব বেশী উন্নত ছিল না, কিন্তু জাতিগত গর্ববোধ এবং অহংকার ছিল খুবই প্রবল। তারা মুসলমানদের সমরশৈলীকে খুব নীচ চোখে দেখত, মনেপ্রাণে অবজ্ঞা করত। কিন্তু কাকার দেয়া একটি কৌশল অবলম্বনের ফলে মুসলমানদের মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায়। মুসলমানরা এবারে নিজেদেরকে পারস্য বাহিনীর সমান ভাবতে শুরু করে। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে মুসলমানদের বিজয়ের পথে কাকার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পারস্য বাহিনীর মধ্যে পরিবর্তনশীলতার বড় অভাব ছিল। তারা দৈহিক বা মানসিক ব্যাপারে সহজে নমনীয় হত না। তাছাড়া তাদের বাহিনীতে রিজার্ভ ফোর্স বলে কোন দল ছিল না। তাদের মস্তবড় আরও দু'টি ত্রুটি ছিল। প্রথমত পারস্য বাহিনীর বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বড় অভাব ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের অধিনায়কত্ব ছিল খুবই দুর্বল।

পারস্য বাহিনীতে মূল দল ছিল তিনটি-হস্তিবাহিনী, ভারী অশ্বারোহী এবং পদাতিক। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনটি দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও তাদের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। তাদের ভারী অশ্বারোহী দলটি ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু বলতে গেলে যুদ্ধের ময়দানে অশ্বারোহী দলটি ছিল একেবারেই নিষ্ক্রিয়। যুদ্ধের ময়দানের অনুপযুক্ততার কারণে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। তাছাড়া প্রয়োজন মুহূর্তে ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করার মত প্রশিক্ষণ তাদের ছিল না।

পারস্য বাহিনীতে ছিল ৩৩টি হাতীর একটি শক্তিশালী দল। সে আমলের এক একটি হাতীকে আধুনিককালের ট্যাংকের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ট্যাংক যুদ্ধের প্রধান দুটি শর্ত হল ট্যাংকগুলো একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাতে হবে এবং ট্যাংক আক্রমণের রক্ষণভাগে অবশ্যই পদাতিক বাহিনীর সমর্থন থাকতে হবে। হস্তিবাহিনীর ক্ষেত্রে এই শর্ত সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর হাতীগুলোর অবস্থা ছিল এর ঠিক উল্টো। ৩৩টি হাতীকে ছোট ছোট তিনটি দলে বিভক্ত করা হয় এবং কোন দলের পশ্চাতেই পদাতিক অথবা অশ্বারোহী বাহিনীর কোন সমর্থন ছিল না। অবশ্য এর পরেও হাতীগুলো যুদ্ধে চমৎকার সাফল্যের পরিচয় দেয় এবং উভয় দিনেই

মুসলিম বাহিনীকে ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। বলতে গেলে তাদের রক্ষণভাগকে প্রায় পর্যুদস্ত করে দেয়। অনুমান করা হয় যে কাদিসিয়ার যুদ্ধে হস্তিবাহিনীকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে এবং হস্তিবাহিনীর পশ্চাৎ দিকে পদাতিক বাহিনীর সমর্থন থাকলে যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হত। হয়ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হত। দু'দিনের যুদ্ধে পারস্য বাহিনী ৩৩টি হাতীর মধ্যে মাত্র তিনটি হাতী হারায়। আসলে হাতীগুলোরে পশ্চাতে অন্য কোন দলের সমর্থন না থাকায় মাহুতেরা ছিল সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। মুসলমান সেনারা সহজেই তাদের কাবু করে ফেলে এবং চালকের অভাবে হাতীগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে রণক্ষেত্র থেকে ছুটে পালায়। বস্তুতপক্ষে পারসিকদের হস্তিবাহিনী এবং পদাতিক সেনাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ ছিল না। বলতে গেলে এই একটি মাত্র কারণেই কাদিসিয়ার যুদ্ধে রুস্তমের বিশাল বাহিনী ছোট্ট মুসলিম বাহিনীর হাতে ভীষণভাবে মার খায়, বিপর্যস্ত হয় সম্পূর্ণরূপে। অথচ এই যুদ্ধে রুস্তমের বিজয় ছিল সুনিশ্চিত।

যুদ্ধে যিনি হেরে গেছেন, যে সেনাপতি পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন-ইতিহাস কখনও তার প্রতি সুবিচার করে না, তাঁকে মূল্যায়ন করে না বস্তুনিষ্ঠভাবে। এটাই ইতিহাসের অমোঘ বিধান। বিশেষ করে কোন যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে কোন জাতি যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। তবু একথা সত্য যে, কাদিসিয়ার যুদ্ধের আগে অথবা পরে সেনাপতি রুস্তম কখনও সামরিক নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সিরিয়া থেকে ৮০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী যোগ দেয়ায় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর পরেও পারস্য বাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার কোন তুলনা হত না। বস্তুতপক্ষে পারস্য বাহিনীর মুকাবিলায় তাদের অবস্থান ছিল খুবই নাজুক। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের টিকে থাকাই ছিল দুষ্কর। রুস্তম যদি জ্যোতিষী গণনার ফলাফলের উপর এতটা নির্ভর না করতেন, যদি তিনি আস্থা রাখতেন পারস্য সেনাদের অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যের উপর, তাহলে সিরীয় বাহিনী আসার বহু পূর্বেই হয়ত কাদিসিয়া যুদ্ধের ফলাফল চূড়ান্ত হয়ে যেত। চরমভাবে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটত সর্বাধিনায়ক সাদের।

মুসলিম সেনারা বারবার পারস্য সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালিয়ে পারসিকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। মুসলমানদের মুকাবিলা করার মত হালকা অশ্বারোহী বাহিনী রুস্তমের ছিল না। ফলে তিনি পারস্য বাহিনীর সুবিধামত কোন স্থানকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়ার সুযোগ পাননি। বরং সাদের পছন্দ অনুসারে কাদিসিয়ার প্রান্তরেই তাঁকে সৈন্য সমাবেশ করতে হয়। এর পরেও একথা সত্য যে,

উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার পরও সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রুস্তম সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। সাধারণ সৈনিকেরা অবশ্য অসম সাহসিকতা এবং অটল মনোভাবের পরিচয় দিল। তারা এতটা দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিল যে, তাদেরকে এক বিন্দু নড়ানো গেল না। কিন্তু হঠাৎ করে যেই প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করল, অমনি যুদ্ধের মোড় গেল ঘুরে। যুদ্ধের গতি চলে গেল পারস্য বাহিনীর বিপক্ষে। এই যুদ্ধে পারস্য সেনাদের কোন রিজার্ভ বাহিনী ছিল কিনা তা বলা মুশকিল। তবে যুদ্ধের আগে বা পরে কখনও তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি।

পারস্য বাহিনীর শক্তিশালী অশ্বারোহী দলটি ছিল তাদের শক্তির একটি প্রধান উৎস। অথচ কাদিসিয়ার ভাগ্য বিপর্যয়কারী এই যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনাদের ভূমিকা ছিল একেবারে গৌণ। পদাতিক সেনারা হস্তী দলকে কোন রকম সহযোগিতা দেয়নি। এর পরেও প্রথম দিনের যুদ্ধে হস্তিবাহিনী যখন মুসলমানদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, ঠিক তখনই রুস্তম যদি সমস্ত শক্তি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে তার বিজয় ছিল অবধারিত। আসলে রুস্তমের মধ্যে উদ্যম এবং উদ্যোগের প্রচণ্ড অভাব ছিল। উদাসীনতার কারণেই একটি নিশ্চিত বিজয় তার হাতছাড়া হয়ে গেল। তার ফলে পারস্যবাসীদের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় আচরণ ও বিশ্বাসের বিলুপ্তি ঘটল। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তারা চলে গেল মুসলমানদের অধীনে। দীর্ঘ ৮০০ বছরের জন্য মুসলমানদের আধিপত্যের এই ধারা অব্যাহত থাকল।

কনস্টানটিনোপল অভিযান

দ্বিতীয় হিরাক্লিয়াস-এর সময় গোটা জীবনটাই ছিল দুর্বিসহ এবং দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর বিষাদময় জীবনে খানিকটা স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আবারো দুর্যোগের ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠে। পারস্য সম্রাট হঠাৎ করেই রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নেয় ইরাক, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া। এ সময় রোমানবাসীরা আরেক আমেজে আকণ্ঠ ডুবেছিল। তারা আলোচনা করছিল যীশু-খ্রিস্টকে নিয়ে। তার দেহ কি দিয়ে গড়া, তিনি কি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ? সাধারণ খাদ্য খাবার এবং পানীয় জলেই কি তাঁর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটেছিল? এসব বাক-বিতণ্ডার মাঝে তারা এতটা মেতে উঠেছিল যে পারসিকদের আক্রমণ সংবাদ অথবা কতগুলো শহর দখল করে নেয়ার ব্যাপারটা তাদের নজরে আসেনি। ইতিমধ্যে 'টুক্রুস'-এর অপসারণের বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। রোমানবাসীরা এবার যেন আগুনের ফুলকির মত জ্বলে উঠে। তাদরে মধ্যে দেখা দেয় চরম ধর্মীয় উন্মত্ততা। প্রত্যেকেই যেন চরম ঔদাসীন্যের স্বপ্নপুরী থেকে চোখের পলকে চেতনার রাজ্যে ফিরে আসে। প্রবল আক্রোশ এবং উন্মত্ততায় তারা পারস্যবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রবল পরাক্রমশালী পারস্য বাহিনী রোমানদের উন্মত্ততার মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারল না। তারা বারবার পরাজিত হল। অবশেষে রোমানরা 'টুক্রুস' পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হল। এই একটি মাত্র কারণে বৃদ্ধ হিরাক্লিয়াসের মান-সম্মান বহুগুণ বেড়ে গেল। বিগত এক শত বছরের মধ্যে যত রাজা-বাদশা এসেছেন, তন্মধ্যে হিরাক্লিয়াসের স্থান দাঁড়াল সবার শীর্ষে। তার সুনাম-সুখ্যাতি তখন সবার মুখে মুখে।

কিন্তু হঠৎ করেই যেন দ্বিতীয় হিরাক্লিয়াসের উপর নেমে এল আরেক দুর্যোগ। চোখের পলকে ধূলোয় মিশে গেল তার যশ ও খ্যাতি। নির্জন আরব মরু অঞ্চল থেকে মুসলমানরা জেগে উঠে। ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তারা আবির্ভূত হয় অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে। অথচ রোমানদের কাছে এটা ছিল একান্তই অপ্রত্যাশিত। মাত্র এক দশকের মধ্যে তারা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্সজর্দান ছিনিয়ে নেয়। দখল করে নেয় মিশর এবং উত্তর আফ্রিকা। এমনি ধরনের বিস্ময়কর উত্থান এবং পতনের কাহিনীগুচ্ছ নিয়েই হিরাক্লিয়াসের জীবন বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠে। এবং রোমান ও মুসলমানদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত হয় এ সময় থেকেই।

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া রোমান সাম্রাজ্যের আনাতোলিয়ায় অভিযান চালান। বসফোরাস প্রণালী পর্যন্ত তাঁর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। পরবর্তী সময়ে উভয় শক্তির মধ্যে বড় রকমের সংঘর্ষ বাধে সম্রাট দ্বিতীয় কনস্‌টান্স-এর আমলে। ৩৫ হিজরী মুতাবিক ৬৫৫ সালে ফেনেক্স পর্বতের উল্টো দিকে রোমান নৌবহরের সঙ্গে মুসলিম নৌ-বাহিনীর একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম নৌবহরের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বসর ইবনে আবি আরতাহ। রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষে রোমান নৌবহরের পরাজয় ঘটে। কম করে হলেও ২০ হাজার নৌ-সেনা প্রাণ হারায়। মুসলিম বাহিনীরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেও বসর পশ্চাদপসরণ করে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসেন।

কনস্টানটিনোপল মুসলমানদের পদানত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এমনকি এই অভিযানে যারা অংশ নেবেন রাসূল (সা) তাদের জন্যও দোয়া করেছিলেন। মু'আবিয়া আনাতোলিয়ায় আকস্মিকভাবেই এক এক করে তিনটি অভিযান চালান এবং পরে তিনি চূড়ান্ত অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ৫৩ হিজরী অর্থাৎ ৬৭২ সালে বিরাট একটি বাহিনীকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন রোমানদের বিরুদ্ধে। সুফিয়ান ইবনে আউফ-আল-উজদীকে নিয়োগ করলেন মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশ কিছু সংখ্যক ঘনিষ্ঠ সাহাবা এবং সম্মানিত সাহাবাগণের সন্তান-সন্ততিগণ এই যুদ্ধে অংশ নেন। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের। হযরত মু'আবিয়ার ছেলে ইয়াজিদ একটি দলের অধিনায়ক হিসেবে এই অভিযানে অংশ নেন। উল্লেখ্য যে, ইয়াজিদই ছিলেন হযরত আলীর পুত্র ইমাম হুসাইনের একজন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে একটি বিরাট নৌবাহিনী এই অভিযানে অংশ নেয়। বসর ইবনে আবি আরতাহ ছিলেন নৌবহরের প্রধান সেনাপতি।

বিশাল বাহিনী চারদিক থেকে কনস্টানটিনোপল ঘিরে ফেলে। কিন্তু সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী এবং মজবুত দুর্গ দ্বারা শহরটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। মুসলিম বাহিনী খোলা মাঠে যুদ্ধের ব্যাপারে অবশ্যই পারদর্শী ছিল। কিন্তু অবরোধের মাধ্যমে সুরক্ষিত একটি শহর দখলের ব্যাপারটা অন্যরকম। সম্ভবত এ ব্যাপারে তাদের নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাই দেখা যায় যে, অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং আস্থার সঙ্গে বার বার তারা রোমান বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। আক্রমণ চালায় সর্বশক্তি দিয়ে। কিন্তু প্রতিবারেই তাদের সেই আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সর্বাধিনায়ক সুফিয়ান তবু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। গ্রীষ্মের শুরুতে তিনি কনস্টানটিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু শীতের মৌসুমে অবরোধ প্রত্যাহার করেন। ফিরে আসেন ৮০ মাইল দূরে একটি দ্বীপ "সাইজিকাসে"। এমনিভাবে অবরোধ প্রক্রিয়া চলতে থাকে

একাধারে সাতটি বছর। অবশেষে তারা হৃদয়ঙ্গম করল যে এভাবে খণ্ডকালীন অবরোধের মাধ্যমে দেশটি দখল করা একেবারেই সম্ভব নয়। ৬৭৮ সালে (হিজরী ৫৯) তাঁরা এই অভিযান প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ততদিনে আবূ আইয়ুব আনসারীসহ ত্রিশ হাজার মুসলিম সেনা শাহাদাতবরণ করেন। এভাবেই মুসলিম বাহিনীর কনস্টানটিনোপল দখলের প্রথম প্রয়াস বিফলে গেল। তারা ব্যর্থ হল রোমান বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ভেঙ্গে দিতে।

কাল পরিক্রমায় ৩৭টি বছর অতিবাহিত হল। মু'আবিয়ার উত্তরাধিকারীদের সময় মুসলিম বাহিনীর সামরিক শক্তি সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। মুলতান এবং বুখারায় মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্পেন এসে গেছে তাদের দখলে।

মহাপরাক্রমশালী সোলায়মান তখন খিলাফতের আসনে সমাসীন (হিজরী ৯৬-৯৯/৭১৫-৭ সাল)। ধর্মবিশারদগণ একবার তাঁকে জানালেন যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য অনুসারে কনস্টানটিনোপল অবশ্যই মুসলমানদের দখলে আসবে। এবং এ দেশটি এমন একজন দখল করবেন যার নাম একজন নবীর নামে হবে। তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, নিশ্চয়ই তিনি সেই ভাগ্যবান পুরুষ। তাঁর জন্যই রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়া। তাঁর নেতৃত্বে পরাভূত হবে রোমান শক্তি। অধিকৃত হবে কনস্টানটিনোপল। সুলায়মান নতুন করে সামরিক আয়োজন শুরু করলেন। শুরু হল ব্যাপক প্রস্তুতি।

এদিকে কনস্টানটিনোপলের তখন ভগ্নদশা। বিপুল শক্তির অধিকারী বিশাল এই সাম্রাজ্যটি চলে গেছে অধঃপতনের চরম সীমায়। হাজার রকমের গোড়ামি এবং কুসংস্কারে খ্রিস্টানরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, অর্থহীন কতগুলো বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শত দল-উপদলে। শাসন ব্যবস্থা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সামরিক বিভাগ খুবই অবহেলিত এবং উত্তরাঞ্চলের বর্বর গোত্রগুলো তাদের পুরানো পেশায় মেতে উঠেছে। সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে অবলীলাক্রমে দস্যুপনা চালিয়ে যায়। মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে ৬ জন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার ছয় জনই অপসারিত হন। রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র যখন বিরাজ করছে এমনি একটি অরাজক অবস্থা, সুলায়মান ঠিক তখনই এই অভিযানে বের হন। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা হয়েছিল যে, এই অভিযানে মুসলমানদের বিজয় মোটামুটি অবধারিত। তাদের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে হয়ত আরেকটি বিজয় গৌরব সংযুক্ত হবে। কিন্তু হঠাৎ করে, বলতে গেলে অপ্রত্যাশিতভাবেই একজন মাত্র ব্যক্তি মুসলমানদের এই নিশ্চিত বিজয়ের পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। ব্যর্থ করে দেন তাদের বিজয় অভিযান।

লোকটির নাম লিও। দক্ষিণ আনাতোলিয়ার মারাসের একজন অধিবাসী। কষ্ট

সহিষ্ণুতা এবং সাহসিকতার জন্য খ্যাত একটি গোত্রে তার জন্ম। লিও যেন নিজ হাতে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলেছিলেন। সালাহউদ্দীন যখন কনস্টানটিনোপলে অভিযান চালান তখন লিও ছিলেন রোমান সরকারের অধীনে এ্যামোরিয়াম (Amorium)-এর একজন গভর্নর। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক, ঝানু রাজনীতিবিদ এবং সাহসী সৈনিক। তিনি খুব কাছে থেকে ইসলাম ধর্ম, মুসলমানদের প্রশাসন পদ্ধতি এবং যুদ্ধের কলাকৌশল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কোথায় তাদের দুর্বলতা, কিসে তাদের শক্তি–এসব কিছুই তিনি ভালভাবে জানতেন।

কনস্টানটিনোপল অভিযানকালে সুলায়মানের ভ্রাতা মাসলামা সর্বাধিনায়ক হিসেবে এ্যামোরিয়াম অবরোধ করেন। আত্মসমর্পণের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে লিও বিশ্বাসপ্রবণ মুসলিম অধিনায়ককে প্রতারিত করেন। লিও সুলায়মানদের পক্ষে কনস্টানটিনোপল দখল করা এবং তাঁরই অধীনস্থ হয়ে দেশটি শাসন করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেন। মাসলামা এই প্রস্তাবে সম্মত হন। নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক লিও এবার নিজের বাহিনী নিয়ে কনস্টানটিনোপলের দিকে অগ্রসর হন। ৭১৭ সালের মার্চ মাসে সম্রাট থিওডোরাসকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই রাজমুকুট পরিধান করেন। এদিকে মুসলিম বাহিনী লিওর মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে ধীরগতিতে কনস্টানটিনোপলের দিকে অগ্রসর হয় এবং দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে ৭১৭ সালের ১৫ ই আগস্ট কনস্টানটিনোপল পৌঁছে শহরটি অবরোধ করে। এই অবসরে লিও নিজেকে গুছিয়ে নেন। অমানুষিক পরিশ্রম এবং অপূর্ব নিষ্ঠা ও উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি শক্তিশালী একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। স্বাভাবিক গতিতে যে প্রস্তুতির জন্য পাঁচ বছর সময় লাগে, লিও সে কাজ সম্পন্ন করেন মাত্র পাঁচ মাসে।

এই অভিযানে মুসলমানদের পক্ষে স্থল এবং নৌসেনা মিলিয়ে সর্বমোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার সৈন্য অংশ নেয়। তন্মধ্যে নিয়মিত স্থলবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। মুসলিম নৌবহর এডমিরাল সোলায়ামানের নেতৃত্বে কনস্টানটিনোপলের পথে পাড়ি জমায়। অপরদিকে স্থলবাহিনী মাসলামার অধীনে 'আবিডোসের' সন্নিকট দিয়ে ইউরোপের মাটিতে পা রাখে। রাজধানীর কাছাকাছি যেতেই মাসলামা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, 'পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে লিও-এর আত্মসমর্পণ অথবা শহরটিকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। মাসলামা এবার সচল হয়ে উঠেন। অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং আস্থার সঙ্গে তিনি রাজধানী অবরোধ করেন।

বলে রাখা আবশ্যক যে, তখনকার দিনে জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং যুদ্ধ কলাকৌশলে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারে গ্রীকদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। রাজধানীর অভ্যন্তরে বেশ কতগুলো অস্ত্র নির্মাণ কারখানা ছিল। অকেজো এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে কারখানাগুলো বোঝাই করা হল। অস্ত্রগুলোর মাজা-ঘষা এবং মেরামতের কাজ চলল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং এগুলো বসান হল রাজধানীর

চারপাশে সুবিধামত স্থানে। এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো দিয়ে অবরোধকারী শত্রুদের প্রতি বড় বড় পাথর, হুকবিশিষ্ট লম্বা দণ্ড এবং তীর নিক্ষেপ করা যেত। উপরন্তু রোমানদের কাছে এমন কতগুলো মারাত্মক অস্ত্র ছিল যেগুলো দিয়ে রীতিমত শত্রুদের প্রতি অগ্নিকুণ্ড বর্ষণ করা যেত। এর নামই ছিল গ্রীক ফায়ার।[২]

যে কোন অবরোধ প্রতিহত করার ব্যাপারে রোমান সম্রাটের আরও একটি মস্তবড় সুবিধা ছিল। কনস্টানটিনোপলের পশ্চিম দিকের স্থলভাগ বাদ দিয়ে তিনদিকেই ছিল পানি–মর্মর সাগর এবং অনুকূল শৃঙ্গ দিয়ে ঘেরা। বাছাই করা গ্রীক যুদ্ধবিশারদগণ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পশ্চিম দিকের গোটা স্থলভাগ জুড়ে চওড়া এবং গভীর পরিখা খনন করা হয়েছিল। তারপরেই ছিল মজবুত তিনটি দেয়াল; প্রথম দেয়ালটি ছিল বুক সমান উঁচু। নিরাপদ অবস্থানে থেকে শত্রুর মুকাবিলা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় দেয়ালটি ২৫ ফুট এবং তৃতীয় দেয়ালটি ৪০ ফুট উঁচু ছিল। তৃতীয় দেয়ালের মাঝে মাঝে অনেকগুলো চৌকি বা দুর্গ ছিল। এসব স্থানে ছোট ছোট দলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা যেত। সামগ্রিক বিচারে গোটা কনস্টানটিনোপলকে বলা যেতে পারে একটি দুর্গ। এটি এমন একটি দুর্গ যা সত্যিকার অর্থেই দুর্ভেদ্য। এমনি একটি দুর্গের মধ্যে অবস্থান করে এবং লিও-এর মত একজন বলিষ্ঠ নেতা পেয়ে অবরুদ্ধ রোমানবাসীদের শক্তি এবং মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায়। তারা যেন সত্যিকার অর্থেই একটি অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়। পিচকারী দিয়ে যেমন অবিরাম পানি ছোঁড়া যায়, তেমনিভাবে রোমান সেনারা দেয়ালের পশ্চাদভাগে নিরাপদ অবস্থানে থেকে 'সিফনের' সাহায্যে অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। অপরদিকে রোমান নৌবহরও সচল হয়ে উঠে। স্থল এবং নৌপথে উভয় দিক থেকেই তারা আক্রমণকারী মুসলিম বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

মাসলামা তাঁর বাহিনী নিয়ে কনস্টানটিনোপলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে প্রতিরক্ষা দেয়ালের উপর সজোরে আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে মই দিয়ে দেয়াল অতিক্রম করার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু রোমান সেনাদের দৃঢ়তা এবং গোলাবারুদের মুখে মুসলিম বাহিনী সুবিধা করতে পারল না। প্রতিবারেই তাদেরকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে হয়। আসলে রোমানদের প্রতিরক্ষা বাঁধ চূর্ণ করে দেয়ার মত কোন আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক উপকরণ তাদের ছিল না। ফলে রোমানদের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের মুখে মুসলিম বাহিনী একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে মাসলামা দীর্ঘমেয়াদী অবরোধের পথ বেছে নেন। স্থির করেন যে, সমস্ত সরবরাহ পথ বন্ধ করে দিতে হবে। তাহলেই কনস্টানটিনোপলে নেমে আসবে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। রোমান সেনাদের মধ্যে দেখা দিবে হতাশা ও নৈরাশ্য। পরিকল্পনা মাফিক তিনি শিবির স্থাপন করলেন। শিবিরের

কনসটানটিনোপল
৬৭২–৭১৫

স্কেল : ১/ ১০০,০০০

মাইল ১ ১/২ ০ ১ ২
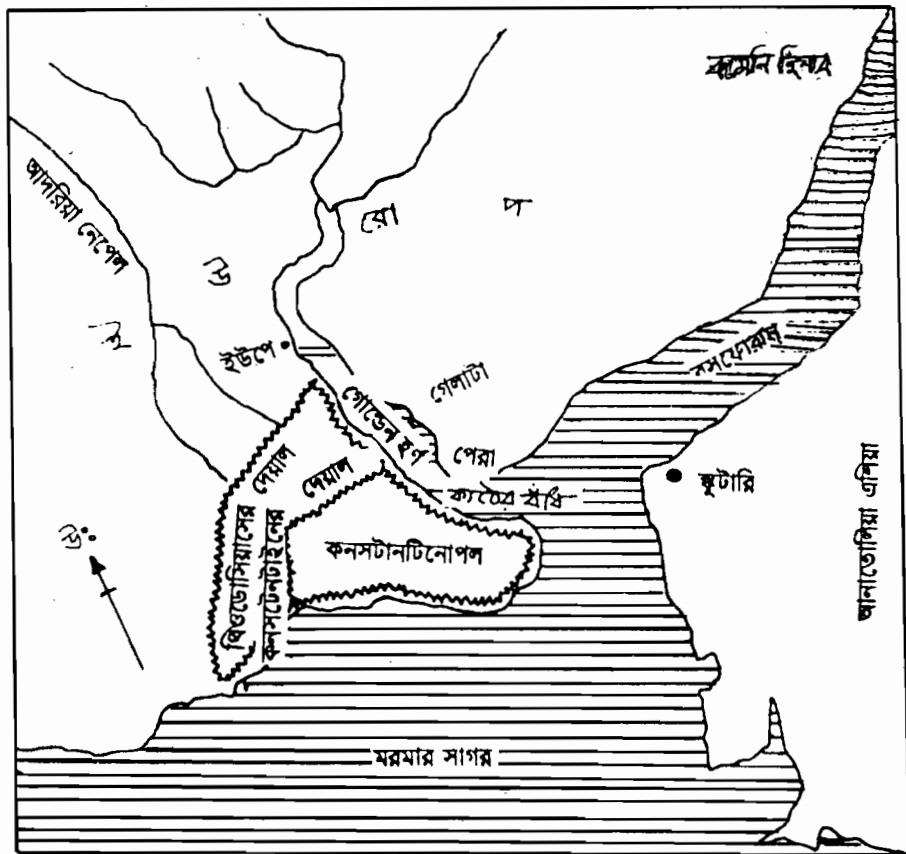
আশপাশে খাল কাটলেন। পরিখা নির্মাণ করলেন, সৃষ্টি করলেন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা। সৈন্যদের বসবাসের জন্য তৈরী করলেন অস্থায়ী ঘরবাড়ী। সৈন্যদের নিয়ে ছোট ছোট কতগুলো দল গঠন করলেন। প্রতিদিনই তারা কনস্টানটিনোপলের আশপাশের জনবসতির উপর চড়াও হত, লুটতরাজ করত; জোর করে নিয়ে আসত তাদের বিষয়-সম্পদ।

কনস্টানটিনোপলের তিন দিকেই ছিল জলভাগ। ফলে এই অবরোধ পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্য নৌবহরের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এডমিরাল সোলায়মান যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে দুটি দলে বিভক্ত করেন। একটি দলকে মর্মর সাগরের পূর্ব প্রান্তে এশিয়ার কুল ঘেঁষে মোতায়েন করেন। এই দলটি দারদানেলেস এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জের উপর নজর রাখত। এসব অঞ্চল থেকে যাতে কোন রসদ সামগ্রী কনস্টানটিনোপলে পৌঁছতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখত। কনস্টানটিনোপলের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোর সঙ্গে জলপথে যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত ছিল। কৃষ্ণসাগরের পথে, বিশেষ করে উত্তর আনাতোলিয়ার ' চেরসন এবং তেরেবিজোন্দ' থেকে অতিরিক্ত বাহিনী এবং রসদসামগ্রী আসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এই পথটি রুদ্ধ করার জন্য এডমিরাল সোলায়মান দ্বিতীয় দলটি পাঠিয়ে দেন কনস্টানটিনোপলের উজানে। এই দলটি হেলেসপন্টের সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হয়।

কৃষ্ণসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রবাহিত জলস্রোতের বেগ ছিল খুবই প্রবল। মুসলমান বাহিনীর ভারী জাহাজগুলো স্রোতের উল্টো দিকে লম্বা লাইন ধরে এগুচ্ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জাহাজের গতি ছিল খুবই মন্থর। বিষয়টি নজরে আসতেই সুচতুর লিও চঞ্চল হয়ে উঠেন। তিনি কোনক্রমেই চমৎকার এই সুযোগ হেলায় হারালেন না। রোমানদের কতগুলো যুদ্ধজাহাজ ছিল বেশ ছোট, কিন্তু খুবই দ্রুত গতিসম্পন্ন। আগুনের গোলা নিক্ষেপণযোগ্য হালকা ইঞ্জিন দিয়ে তিনি এই জাহাজগুলো সুসজ্জিত করলেন। হালকা এই নৌযানগুলো দিয়ে তিনি আক্রমণ চালালেন নৌবহরের পশ্চাদভাগের মাঝামাঝি অংশে। রোমানদের এই আক্রমণ সফল হল। মুসলমানদের বিশটি জাহাজে আগুন ধরে গেল। কোন রকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই রোমানদের নৌযানগুলো দ্রুতগতিতে ফিরে এল নিরাপদ ঘাঁটিতে। কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এই অভিযানে রোমানদেরই প্রথম বিজয় সূচিত হল। সেই সঙ্গে এই প্রথমবারের মত প্রকাশ পেল লিও-এর রণনৈপুণ্য এবং রণচাতুর্যের। নৌবহরের অধিনায়ক সোলায়মান এবার ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এবার তিনি প্রতি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সমস্ত নৌবহরকে এক জায়গায় সমাবেশ করেন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে জলভাগের প্রতিরক্ষা দেয়ালের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। রোমান বাহিনীও যেন তৈরী ছিল। তারাও এই আক্রমণের পাল্টা

জবাব দেয়। উভয় দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কিন্তু রোমানদের প্রতিরোধের মুখে মুসলিম নৌবহর সুবিধা করতে পারল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। এই খণ্ডযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হল যে, এই অভিযানে মুসলমান সেনারা যদি অভিনব কোন কিছুর সংযোগ ঘটাতে না পারে তাহলে যুদ্ধে রোমানদেরই জিত হবে। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে মুসলিম বাহিনী।

মাসলামা ছিলেন নিষ্ঠাবান, উৎসাহী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। কিন্তু বিস্ময়কর বা অভূতপূর্ব কোন কিছু দেখাবার যোগ্যতা তার ছিল না। বিশেষ করে রোমান সেনানায়ক লিও-এর ছলচাতুরীর কাছে মাসলামা ছিলেন অসহায়। তাছাড়া কনস্টানটিনোপলের পূর্বদিকে মুসলমান সেনাদের অবরোধ ব্যবস্থাও ছিল অসন্তোষজনক এবং দুর্বল। এরই মধ্যে মুসলিম শিবিরে দুটি বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যায়। ৭১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুলায়মান এবং মাত্র কয়েক দিন পরে অক্টোবরের ৪ তারিখে (৭১৭) নৌবহরের অধিনায়ক এডমিরাল সোলায়মানও মারা যান। সে বছর প্রচণ্ড শীত পড়ে। শীত মৌসুমও শুরু হয় খুবই আগেভাগে। শহরের অভ্যন্তরভাগে বসবাসকারী খ্রিস্টানরা মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু অস্থায়ী শিবিরে বসবাস করে শীতের প্রকোপে মুসলিম সেনারা একেবারে অস্থির হয়ে পড়ল। এদিকে মুসলিম শিবিরে খাদ্য সংকট চরমে পৌঁছে। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ল মহামারীর আকারে। আশপাশের বর্বর গোত্রগুলোও যেন এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। যেসব এলাকায় তারা অবাধে ঘুরে বেড়াত, শিকার খুঁজত দিনরাত, সে সব এলাকায় মুসলিম বাহিনীর আগমনকে তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একান্ত অনধিকার প্রবেশ। এই দুর্যোগ মুহূর্তে তারা মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। তাদেরকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে তোলে। একের পর এক দুর্যোগগুলো এমনভাবে আসতে থাকে যে মুসলমান সেনারা এবার ভীষণভাবে অসহায় এবং হতাশার মধ্যে পড়ে যায়। তারা হাড়-হাড্ডি চামড়াসহ গৃহপালিত পশুগুলো খেয়ে ফেলে। লতা-পাতা ও মূলসুদ্ধ গাছপালাগুলো পর্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়। বলতে গেলে ধূলো-বালি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে আলেকজান্দ্রিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে জাহাজের দু'টি বহর এসে যায়। অভুক্ত এবং রুগ্ন মুসলমান সেনারা এবার খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে যে নৌবহরটি এসেছিল তাতে বেশ কিছু নতুন সৈন্যও ছিল। এই বহরের অর্ধেকাংশ নাবিকই ছিল নববিজিত খ্রিস্টান। এরা মুসলিম বাহিনীর পক্ষ হয়ে কনস্টানটিনোপলে এলেও মুসলমানদের জন্য এদের বড় একটা দরদ ছিল না। মুসলিম শিবিরের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে তারা খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। তারা যথার্থভাবেই ভাবতে শুরু করে যে-হাওয়া উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে। মুসলমানদের এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রোমানদের হাতে বিপর্যস্ত হবে

মুসলিম বাহিনী। সুচতুর লিও-এর প্রচারকেরা তাদের এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে তোলে। নানান কথা বলে তাদেরকে রোমানদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে। অথচ মুসলিম সেনাপতি এর নাড়ী-নক্ষত্র কিছুই আঁচ করতে পারলেন না।

আলেকজান্দ্রিয়ার এই নৌবহরটি কনস্টানটিনোপলের খুবই কাছাকাছি অবস্থান নেয়। ইতিমধ্যে সম্রাট লিও মুসলিম বাহিনীর উপর আরেকটি আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করে। এদিকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আসা নাবিকেরাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। একদিন সন্ধ্যার দিকে খ্রিস্টান নাবিকেরা নৌ-যানগুলোকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়। মুসলিম শিবির ত্যাগ করে রোমানদের দলে এসে যোগ দেয়। ঠিক তখনই রোমানদের নৌ-যানগুলো আগুনের গোলা নিক্ষেপণযোগ্য ইঞ্জিনগুলো নিয়ে দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। নোঙ্গর করে বসে থাকা মুসলমানদের জাহাজগুলোর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পরিকল্পিতভাবে জাহাজগুলোকে ধ্বংস এবং লুটতরাজ করে সাফল্যের সঙ্গে ফিরে আসে নিজেদের ঘাঁটিতে। রোমানদের এই আক্রমণের মধ্য দিয়েই মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের সূত্রপাত ঘটে।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। দীর্ঘ দিনের অর্থহীন অবরোধ এবং অসংখ্য মুসলমান সৈন্যের মৃত্যু সংবাদে তিনি ভীষণভাবে বিরক্ত হলেন। কনস্টানটিনোপল অবরোধ তুলে নেয়ার খবর জানিয়ে তিনি মাসলামার নিকট দূত পাঠালেন। খলিফার নির্দেশ অনুসারে ৭১৮ সালের ১৫ই আগস্ট মাসলামা অবরোধ তুলে দামেশকের পথ ধরেন। প্রত্যাবর্তনের পথে স্থলবাহিনী বিপদমুক্ত থাকলেও আরব নৌ-বহরকে বড় রকমের দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। হঠাৎ করেই দারদানালেস থেকে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়। মুসলিম নৌবহরও এই ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়। ঝড়ের তাণ্ডবতায় নৌ-বহরের প্রভূত ক্ষতি হল। নিখোঁজ হল অনেকগুলো জাহাজ। কিছুক্ষণ পরই শুরু হল শিলাবৃষ্টি। শিলাবৃষ্টি এবং ঝড়ের দাপটে অবশিষ্ট জাহাজগুলো তছনছ হয়ে যায়। জাহাজগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে নানা দিকে। কতগুলো জাহাজ পার্শ্ববর্তী দ্বীপে গিয়ে ঠেকে। স্থানীয় গ্রীকবাসীরা জাহাজগুলো আক্রমণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। সোলায়মানের এই নৌবহর ছিল খুবই উৎকৃষ্টমানের। নৌবহরে ছোট-বড় জাহাজের সংখ্যা ছিল ১৮০০। এটাই ছিল মুসলমানদের সবচাইতে বড় নৌবহর। ক্ষত-বিক্ষত এবং ধ্বংস হওয়ার পর মাত্র কয়েকটি জাহাজ সিরিয়ার বন্দরে পৌঁছে। বলা যেতে পারে যে, এই জাহাজ কয়টি ছিল বিশাল নৌবহরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

ইতিহাসের পাতায় লেখা হল আরও একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। একজন ব্যক্তির কারণে একটি শহর ও সাম্রাজ্য নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা পেল, একটি জাতি ও সভ্যতা বেঁচে গেল অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে। মুসলিম বাহিনীর অবরোধ প্রতিহত করার পর লিও রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের কাজে তৎপর হয়ে উঠেন। যে

ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মানসিক বৈকল্য রোমান সাম্রাজ্যের শক্তিকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল, তিনি সে ত্রুটিগুলো দূর করার প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে ঢেলে সাজালেন। ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা নিলেন। পুনর্বিন্যাস করলেন প্রশাসনিক অবকাঠামোকে। রোমান সাম্রাজ্য এবার নতুনভাবে জেগে উঠে। জাতীয় এবং সমাজ জীবনের প্রতি পরতে দেখা দেয় জীবনের স্পন্দন। বস্তুতপক্ষে লিও-এর সংস্কার কর্মসূচীর ফলে ক্ষয়িষ্ণু রোমান সাম্রাজ্য আরও কয়েক শতাব্দী টিকে থাকার মত শক্তি সঞ্চয় করে। এমনকি নবীন এবং বর্ধিষ্ণু খিলাফত অপেক্ষা রোমানদের অস্তিত্ব অধিকতর স্থায়ী হয়। লিও-এর মৃত্যুর ৭৩৫ বছর পর ১৪৫৩ সালে রোমানদের ভাগ্যবিড়ম্বনা দেখা দিল। অবশ্য রোমানদের পদানত করা আরবদের ভাগ্যে জোটেনি। মধ্যে এশিয়ার মুসলমানদের কাছে তারা পরাভূত হল। কনস্টানটিনোপল দখল করার মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ নিল মুসলমানদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন-সাধ।

সেনানায়ক হিসেবে মাসলামার কোন অসাধারণ প্রতিভা অথবা অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর সরল মন এবং নিঃসংকোচ বিশ্বাসপ্রবণতার কারণেই চতুর লিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৫ মাস অবরোধ প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পায়। এমনকি মুসলিম বাহিনীর অবরোধকালীন সময়েও লিও অত্যন্ত সফলতা ও চাতুর্যের সঙ্গে মাসলামার সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগায়। আত্মসমর্পণের আশ্বাস এবং গোপনে রসদ সরবরাহের কথা বলে মাসলামাকে দীর্ঘদিন গোলকধাঁধার মধ্যে রেখে দেয়। তাছাড়া যুদ্ধ পরিকল্পনার ব্যাপারে মুসলিম বাহিনীর মধ্যেও ত্রুটি ছিল। স্থলবাহিনী এবং এডমিরাল সোলায়মানের নৌবহরের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচুর অভাব ছিল। সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রতিরক্ষা দেয়ালের উপর সোলায়মান যখন তাঁর নৌবহর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, মাসলামার স্থলবাহিনী তখন নিশ্চল বসে থাকে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের একক আক্রমণ ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ভাগ্যেও ঠিক তেমনটি ঘটেছিল।

এটা স্পষ্ট যে, মাসলামা অথবা এডমিরাল সোলায়মান ছিলেন মধ্যম ধরনের সেনানায়ক। তাদের সম্পর্কে আমাদের চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত অথবা অভিমত না দেয়াই উচিত। অবশ্য একথা বলতেই হবে যে অভিযানে মাসলামা ব্যর্থ হয়েছেন, সে অভিযানে মাসলামাকে স্থলাভিসিক্ত করার মত দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যক্তি মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন কিনা– তাতে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। গোটা কনস্টানটিনোপলের চারপাশে ছিল প্রতিরক্ষা দেয়াল। এখানে-সেখানে সর্বত্র বসান হয়েছিল অগণিত আগ্নেয়াস্ত্র এবং আগুনের গোলা নিক্ষেপণযোগ্য ইঞ্জিন। সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত এবং আত্মবিশ্বাসী শক্তিশালী একটি বাহিনী শহরটি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। লিও-এর মত অসামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন একজন সেনানায়ক ছিলেন তাদের নেতৃত্বে। সে

তুলনায় মুসলিম বাহিনীর প্রতিরক্ষা দেয়াল বিচূর্ণ করে দেয়ার মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছিল না। অবরোধ যুদ্ধে তারা ছিল অনভিজ্ঞ। কনস্টানটিনোপলের উজানে ইউরোপীয় অংশে সোলায়মান যে নৌবহরটি প্রেরণ করেন, রোমানদের প্রথম আঘাতেই তা ধ্বংস হল। বস্তুতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে নৌযুদ্ধে মুসলমানদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। তাছাড়া প্রকৃতিও ছিল তাদের বিপক্ষে। সে বছর খুব তাড়াতাড়ি শীত মৌসুম শুরু হয়। শীতও পড়ে ভীষণভাবে। সারাদেশ বরফে ছেয়ে যায়। এমনভাবে কেটে যায় তিন মাসের বেশী সময়। এই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশই খ্রিস্টান বীর সেনানী লিও-এর কাছে মুসলমান বাহিনীর বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তোলে।

প্রথমযুগের খলিফাগণ যুদ্ধের ব্যাপারে ছিলেন আগ্রাসী নীতির বিপক্ষে। কিন্তু উমাইয়া খিলাফতকালে যুদ্ধের এই ধারা পাল্টে যায়। এই সময় আরবদের সামরিক যান এবং মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত অবস্থানগত দূরত্বের কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গভর্নরগণ খলিফার কোনরকম ওজর-আপত্তি ছাড়াই অনেক ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারতেন। ফলে মুসলমানদের পক্ষে নতুন এলাকা জয় করা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত রাজধানী দামেশকের নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের গভর্নরগণের অবস্থা ছিল এর উল্টো। তাঁদের পক্ষে অনুরূপ উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ ছিল না। উমাইয়া শাসনামলে রাজ্যবিস্তারের প্রসঙ্গটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম বাহিনী পূর্ব ও পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। পূর্বদিকে তাঁরা সিন্ধু, আফগানিস্তান এবং মধ্যএশিয়া পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। অনুরূপভাবে পশ্চিম সীমান্তে সুদান, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড চলে আসে মুসলমানদের দখলে।

উত্তর এবং পশ্চিমে উমাইয়া বাহিনী বীর বিক্রমে এতটা পথ এগিয়ে গেলেও রাজধানীর সন্নিকটস্থ আনাতোলিয়া বিজয়ের ব্যাপারে তাঁরা তেমন কোন উদ্যোগ নেননি। অথচ ইরান, আফগানিস্তান অথবা স্পেন অপেক্ষা আনাতোলিয়া জয় করা ছিল অধিকতর সহজ। কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যবিস্তারে খলিফাগণ ছিলেন অনিচ্ছুক। অথচ কনস্টানটিনোপল জয় করার জন্য অনুরূপ রাজ্যবিস্তার ছিল অপরিহার্য।

খলিফা মু'আবিয়া এবং সোলায়মান যখন কনস্টানটিনোপল দখলের জন্য অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন তখন এ বিষয়টি অবশ্যই তাঁরা যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করেছিলেন। তবু আরববাসীরা যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে যতখানি না বাস্তববাদী এবং সামরিক নীতির ব্যাপারে দৃঢ় দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তার চেয়ে বেশী ছিলেন আবেগপ্রবণ। আবেগজড়িত হয়েই তাঁরা কনস্টানটিনোপল জয়ের জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন। বরং আরবদের তুলনায় তুর্কী সুলতানগণ কনস্টানটিনোপলের ব্যাপারে অধিকতর দৃঢ় সামরিক নীতি গ্রহণ করেন। যোদ্ধা

হিসেবেও তাঁরা ছিলেন বেশী বাস্তববাদী এবং সুশিক্ষিত। তাঁরা কেবল রাজধানী কনস্টানটিনোপল দখলের জন্য উপর্যুপরি অভিযান চালিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং একই সময়ে তাঁরা ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বাংশ দখল করে নেন। তাই দেখা যায় যে আরবদের অভিযান চালানোর ৭০০ বছর পর সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ কনস্টানটিনোপল দখল করার পূর্বেই সমগ্র বলকান অঞ্চল এবং মধ্য ইউরোপের একটি বিরাট অংশে তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ বছরের বেশী সময় তাদের এই আধিপত্য বলবৎ থাকে।

রোমান বাহিনীর অসাধারণ কোন প্রতিভা ছিল না। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমান সেনারা বিশাল রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দেয়। রাজধানী কনস্টানটিনোপল অভিযানকালে তারা মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এমনকি রাজধানী অবরোধ করে থাকাকালীন সময়ে তারা মুসলমান সেনাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। এসব ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উন্মুক্ত ময়দানে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার মত শক্তি তাদের ছিল না। তাদের বাহিনীও সেভাবে গড়ে তোলা হয়নি। এমতাবস্থায় সমগ্র আনাতোলিয়া এবং বলকান অঞ্চল দখল করা উমাইয়া বাহিনীর জন্য কঠিন কিছু ছিল না। এর অংশবিশেষ দখল করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। অথচ এ ব্যাপারে মুসলমানরা ছিলেন একান্তই উদাসীন। বস্তুতপক্ষে সামরিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ, রাজনৈতিকভাবে ভ্রান্ত এবং ধর্মীয় দিক থেকে ইসলামের ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর নীতির জন্য তাঁরা আনাতোলিয়া ও বলকান জয় সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে মধ্য এবং উত্তর ইউরোপে কতগুলো বর্বর ও যুদ্ধপ্রিয় উপজাতি বসবাস করত। চার্লিমেন অস্ত্রের মুখে তাদেরকে ধর্মান্তরিত না করা পর্যন্ত তারা ক্রমাগত খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাবকে দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে আসছিল। কিন্তু কনস্টানটিনোপল অবরোধ করার সময়ে মুসলমানগণ যদি বলকান অঞ্চল দখল করত, তাহলে ঐশী গ্রন্থে অবিশ্বাসী এই উপজাতিগুলো সরাসরি ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেত। আর এটা একটা সুবিদিত আত্মিক বিষয় যে, যখনই এই ধরনের লোক ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে যে কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে তখনই তারা ইসলামকে গ্রহণ করেছে। কারণ যুদ্ধপ্রিয় বাস্তববাদী এই লোকগুলোর কাছে বাস্তবধর্মী ও সরল ধর্ম ইসলামের আবেদন ছিল অসামান্য। বিশেষ করে অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলামের অনুকূলে। তখনকার দিনে খ্রিস্টানদের তুলনায় মুসলমানরা ছিল অধিকতর মার্জিত, সত্য এবং শক্তিশালী। মুসলিম বাহিনী যদি বলকান দখল করত তাহলে ইউরোপ যে মুসলমান অধ্যুষিত মহাদেশ হিসেবেই চিহ্নিত হত, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিশাল নৌবহর এবং শক্তিশালী স্থলবাহিনীর সম্মিলিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানদের সামরিক শক্তির সঙ্গে যদি ধর্মীয় দূরদৃষ্টি এবং নীতির সমন্বয় ঘটত, তাহলে তা একটি ফলপ্রসূ চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়ে পাল্টে দিতে পারত মানবজাতির ইতিহাসের ধারাকে। সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করার পরও কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার আয়োজন ব্যর্থ হলে তা অবশ্যই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে যে বিজয় মঙ্গলজনক এবং সুনিশ্চিত, যে বিজয় সহজে এবং অনায়াসে অর্জন করা যায়, তেমন একটি বিজয় হাতছাড়া হয়ে গেলে তা কেবলমাত্র শোকাবহই নয়, রীতিমত মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, দুর্গদ্বারা বেষ্টিত দুর্ভেদ্য কনস্টানটিনোপল দখলের ব্যর্থতা নয়, সহজে আনাতোলিয়া এবং বলকান দখল করার ক্ষেত্রে আরবদের উদাসীনতাই হল ইসলামের সত্যিকার ট্রাজেডি।

ওয়াদি বাক্কাহ্-এর যুদ্ধ

(জুলাই ৭১১)

আরবদের প্রাথমিক বিজয়গুলো সামরিক ইতিহাসে বিদ্যুতের মত ক্ষীপ্রতা, বিস্ময়কর বিস্মৃতি এবং স্থায়ী ফলাফলের অনন্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। হিজরতের ১৫ বছরের মধ্যে (৬৩৬ সালে) মুসলিম বাহিনী ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং জর্ডান দখল করে। ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের (১৮ হিজরী) মিসরে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ২৩ হিজরীতে পারস্য সাম্রাজ্য (ইরান) চলে আসে মুসলমানদের দখলে। এর কিছুকাল পরেই আফগানিস্তান এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানা দখল করা হয়। পশ্চিম সীমান্তেও মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ছিল একই রকম দ্রুত। মিসরে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর গভর্নর ইব্ন আবি সর ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ২৬) ত্রিপলিটানিয়ায় অভিযান চালান। কিন্তু রাজস্বপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। মু'আবিয়ার আমলে গভর্নর ইবনে হুদাইজ ৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে (৪৭ হিজরী) পশ্চিম সীমান্তে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে সিসিলি দখল করে নেন। বর্তমানে আমরা যে অঞ্চলটিকে আলজেরিয়া এবং মরক্কো বলি, তৎকালে এই অঞ্চলটি পরিচিত ছিল মগরেব নামে এবং এর প্রকৃত বিজেতা ছিলেন আমর ইবন আল-আসের ভাইয়ের ছেলে উকবা ইব্ন নফি। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে উকবা ইব্ন নফি মাত্র চার হাজার সৈন্য নিয়ে মিশর দখল করেন। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে (৫০ হিজরী) উকবাকে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

উত্তর আফ্রিকায় স্থায়ী আরব শাসন প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি সাধারণত রোমান গভর্নরদের পক্ষ সমর্থনকারী স্থানীয় বার্বার (Berber)-দের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাদের সহযোগিতায় উকবা খ্রিস্টানদের শাসন শৃঙ্খল থেকে তিউনিসিয়াকে মুক্ত করেন। দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে অভিযান চালানোর সুবিধার্থে (কায়রাভান) নব-প্রতিষ্ঠিত সামরিক ঘাঁটি তার সদর দফতর স্থাপন করার পর পরই খলিফা তাঁকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

কলহপ্রিয় বারবার (Berber) উকবার উদ্দেশ্য-আদর্শের কথা ভুলে যায়। ফলে নব অধিকৃত অঞ্চলগুলো ফিরে যায় পূর্বের সেই বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থায়।

প্রথম ইয়াজিদ ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে (৬৪ হিজরী) উকবাকে পুনরায় উত্তর আফ্রিকায় গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। দীর্ঘ ১৩ বছর পর দুঃসাহসী সমরনায়ক উত্তর

আফ্রিকা এসে দেশ জয়ের ব্যাপারে তার অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার দিকে মনোযোগ দেন। বারবারদেরকে (Berber) অনুগত থাকারও আহ্‌বান জানানো হয়।

উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে খ্রিস্টানদের অনেকগুলো দুর্গ ছিল। উকবা পশ্চিমে অভিযান চালিয়ে এক এক করে সবগুলো প্রতিরক্ষা দুর্গকে পরাভূত করেন। সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত প্রতিরোধ প্রতিহত করে এক সময়ে তিনি আটলান্টিকের তীরে এসে উপস্থিত হন। মহাসাগরের তরঙ্গে তার হাঁটু পর্যন্ত ভিজে গেল, রুদ্ধ হল ঘোড়ার গতি। এবার তিনি পরম নিষ্ঠা ও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে বললেন -হে আল্লাহ্‌, এই বিশাল সমুদ্র এবং অতলস্পর্শী জলরাশি যদি অন্তরায় না হত, তাহলে সমুদ্রের অপর প্রান্তের অধিবাসীদের কাছেও আমি ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতাম। এর কিছুকাল পরেই একদল উচ্ছৃঙ্খল বারবার গোপন স্থান থেকে আক্রমণ চালিয়ে উকবাকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর থেকেই বারবার জাতির মধ্যে নেমে আসে অশান্তির কালো ছায়া। যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উকবা তাদের উদ্ধার করেছিল, তারা আবারো ফিরে যায় সেই অবস্থায়।

নুসাইর ছিলেন একজন ন্যায়বান এবং যোগ্য সেনানায়ক। তিনি মু'আবিয়া সরকারের পুলিশ প্রধান হয়েও হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। তবু তাঁর প্রশংসনীয় এবং চমৎকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মু'আবিয়া তাঁর অবাধ্যতাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। নির্ভীক নুসাইর-এর ছেলের নাম ছিল মুসা। খলিফা আবদুল মালিক কখনও মুসাকে সুনজরে দেখেননি। বরং তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। খলিফার ভ্রাতা এবং মিশর ও উত্তর আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি আবদুল আজিজ তবু তাঁকে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।

বয়সের তুলনায় মুসা ছিলেন অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত এবং অভিজ্ঞ। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ সেনানায়ক ও দক্ষ প্রশাসক। একজন অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কের দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর মধ্যে। কখনও তিনি শক্তি প্রয়োগ, কখনও অনুপ্রেরণা-উৎসাহ, কখনও আবার ধর্মের কথা বলে অবাধ্য বারবারদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তাদের নিয়ে আসেন নিজের বশে। ৭৯০ খ্রিস্টাব্দের (৯১ হিজরী) মধ্যে কিউটা-বাদ দিয়ে গোটা উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসা এবার কিউটা-এর প্রতি নজর দেন। খ্রিস্টানদের সুরক্ষিত এই দুর্গটি দখল করার ব্যাপারে যথারীতি প্রস্তুতিও শুরু করেন। ইতিমধ্যে শহরের প্রধান কাউন্ট জুলিয়ান গভর্নর মুসার নিকট অদ্ভুত একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। মুসা গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, খানিকটা শঙ্কা-সন্দেহের মধ্যে পড়ে যান। তাঁর কাছে মনে হল, এই পরিকল্পনা যেন হঠকারিতায় ভরা; এটি যেন খুবই বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এ ব্যাপারে ভালমন্দ কিছু বলার পূর্বে তিনি খলিফার অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কারণ সে অভিযান চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার তাঁর ছিল না।

স্পেনে তখন রাজতন্ত্র বলবৎ ছিল। রাজা নির্বাচিত হত নির্বাচনের মাধ্যমে এবং রডারিক ছিলেন স্পেনের রাজা। নোবল বা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা উইটিজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষান্ত হল না। তাকে হত্যা করে বিচক্ষণ এবং প্রবীণ অধিনায়ক রডারিককে বসায় সিংহাসনে। এই ঘটনার পরে উইটিজার আত্মীয়-স্বজনেরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়-অনেক বিষয়-সম্পদ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তাদের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বহুল পরিমাণ হ্রাস পায়। এতসব হারিয়ে তারা সরকারের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। রডারিক অবশ্য যথাসাধ্য তাদের ক্ষোভ এবং অসন্তোষ প্রশমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার এই প্রয়াস পুরোপুরি সফল হয়নি। রডারিকের প্রতি ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল উইটিজার দুই পুত্র, সেভিলিতে প্রধান ধর্মযাজক হিসেবে নিযুক্ত তার জামাতা এবং কিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান। কথিত আছে যে জুলিয়ানের কন্যা 'কোরার' সঙ্গে রডারিক অশোভন আচরণ করেছিলেন। এবং সেই সূত্র ধরে দু'জনের মধ্যে আমরণ শত্রুতা শুরু হয়। অবশ্য জনপ্রিয় এই কাহিনীটি একটি রূপকথা মাত্র, এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

রডারিক স্পেনকে কতগুলো বড় বড় জায়গীর বা স্টেটে বিভক্ত করেন। অভিজাত শ্রেণী এবং পাদরীরা ছিলেন এসব স্টেটের মালিক। অভিজাত শ্রেণীর লোকগুলো ছিল খুবই নিষ্ঠুর, দুর্বলচিত্তের এবং ভীষণ রকমের আরামপ্রিয়। পাদরী বা ধর্মযাজকদের অবস্থা ছিল এর চাইতেও জঘন্য। ইহুদীদের বাদ দিয়ে ৬০ লক্ষ স্পেনবাসীরা সবাই ছিল ভূমিদাস। বিষয়-সম্পদ বা জমিজমায় তাদের কোন অধিকার ছিল না। তারা ছিল ভূস্বামী তথা অভিজাত বা পাদরীদের হাতের পুতুল মাত্র। ইহুদীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হত এবং এরাই ছিল সমাজের সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষ। যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টানরা তাদের উপর নির্দয়ভাবে শোষণ ও উৎপীড়ন চালিয়ে আসছে। বছর কয়েক পূর্বে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইহুদীরা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের সেই গোপন তৎপরতা কার্যকর করার পূর্বেই খ্রিস্টানরা টের পেয়ে যায়। খ্রিস্টানরা এবারও ক্ষেপে যায় এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে উৎপীড়নের স্টীমরোলার চালাতে শুরু করে। জোর করে তাদের দাস বানান হয়। এমনকি অন্যান্য গোত্র বা পরিবারের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাদের সন্তানদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে খ্রিস্টান বানানো হয়। সর্বোপরি ইহুদীদের কোন সম্পদ অর্জন বা ভোগ করার অধিকার ছিল না।

আরও সহজভাবে বলতে গেলে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ছিল অতিমাত্রায় নিষ্ঠুর, আরামপ্রিয় এবং শতধাবিচ্ছিন্ন। অনুরূপভাবে পাদরীরা ছিল লম্পট, মূর্খ এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সাধারণ স্পেনবাসীরা ছিল নির্যাতিত, অতিশয় দুঃখভারাক্রান্ত। জীবন সম্পর্কে তারা ছিল একেবারেই উদাসীন। ক্ষেতে-খামারে কৃষি কাজ করেই তাদের

জীবন কাটত। ইহুদীরা হতাশাগ্রস্ত হলেও সমাজ ও সরকারের প্রতি ছিল বিক্ষুব্ধ। বস্তুতপক্ষে অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে এই ছিল স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। তৎকালীন সময়ে অন্যান্য দেশের মত স্পেনের কোন নিয়মিত সামরিক বাহিনী ছিল না। যুদ্ধের সময় রাজা অভিজাত সম্প্রদায় বাহিনী গঠন করার এবং তাদের ভূমিদাসদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দিত। রাজপরিবারের জন্য অল্প কিছু সৈন্য এবং ভূমিদাসদের নিয়েই গঠিত হত স্পেনের সামরিক বাহিনী।

স্পেনে অভিযান চালানোর প্রস্তাব দিয়ে মুসা দামেশকে খলিফার নিকট পত্র লিখলেন। ওয়ালিদ তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। তিনি সমুদ্রের অপর প্রান্তে অভিযান চালিয়ে মুসলমান সেনাদের জীবন বিপন্ন করা পছন্দ করলেন না। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে স্পেনে অভিযান চালানোর ব্যাপারে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি কাউন্ট জুলিয়ানের সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার উপর কড়া নজর রাখতেন এবং স্পেনে অভিযান চালানোর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মুসাকে নির্দেশ দিলেন।

স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার অবস্থানগত দূরত্বের কথা জানিয়ে খলিফাকে আবারো পত্র দেয়া হল। জানানো হল যে স্পেন সমুদ্রের অপর প্রান্তের কোন অঞ্চল নয়। উত্তর আফ্রিকার উত্তর সীমানা দিয়ে বয়ে গেছে সংকীর্ণ একটি খাল। তার অপর প্রান্তই স্পেন। গোটা অবস্থা জেনে খলিফা ওয়ালিদ মুসাকে নিজের বিবেচনা মত ব্যবস্থা নেয়ার অনুমতি দিলেন।

তারিক বিন যিয়াদ ছিলেন উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। খলিফার সম্মতি-পত্রকে তিনি স্বাগত জানান। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, জন্মগতভাবে তারিক ছিলেন উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী। স্মরণাতীতকাল থেকেই বারবার রমণীগণ খালের অপর প্রান্তের এই অঞ্চল সম্পর্কে সন্তানদের উচ্চ ধারণা দিত। শিশুদের ঘুমপাড়ানী গানে স্পেনের ভূয়সী প্রশংসা করত। তারা বলত যে খালের ওপারেই আছে একটি স্বর্গ। সেখানে সারা বছর ফসল ফলে, গাছে গাছে পাকা সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। পরীরা স্বচ্ছ পানির কাছে এসে ভালবাসার গান গায়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে খুবই যত্নবান মুসা পূর্বাপর চিন্তা-ভাবনা না করে অবিবেচকের মত অপরিচিত স্থানে গিয়ে বিপদ মাথায় নেয়ার মানুষ ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় খবরাখবর এবং সামরিক তথ্য সংগ্রহে মন দিলেন।

মুসা কাউন্ট জুলিয়ানকে স্পেনের মূল ভূখণ্ডে আচমকা আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। মুসা ধরে নিয়েছিলেন যে, এতে করে রডারিকের সঙ্গে জুলিয়ানের যে বিবাদ বাধবে তা আর কখনও মিটমাট হবার নয়। আবূ জুরা তারিফ নামের একজন আরব গোত্র-প্রধানকে গোটা ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণের জন্য স্পেনে পাঠিয়ে দিলেন। আবুজুরা ৪০০ পদাতিক এবং ১০০ অশ্বারোহী নিয়ে স্পেনের পথে রওয়ানা হলেন। জুলিয়ানের

একজন পথপ্রদর্শক এবং তারই জাহাজে চড়ে তিনি আলজেকিরাসে গিয়ে অবতরণ করলেন। তারই নাম অনুসারে পরবর্তীতে এই স্থানটির নামকরণ করা হল 'তারিফা'। স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে সফল অভিযান চালিয়ে তিনি নিরাপদে ফিরে আসেন উত্তর আফ্রিকায়। মুসাকে জানালেন যে স্পেনের মাটি উর্বর। দেশটি খুবই সমৃদ্ধ। এখানে অভিযান চালালে বিরোধিতার সম্ভাবনাও কম।

একজন পরিণামদর্শী অধিনায়ক হিসেবে মুসার উদ্যম ও উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এ কাজ তাঁর সাধ্যের মধ্যে, তখন তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজ শুরু করলেন। তাঁর নির্দেশমত উপজাতীয় লোকেরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হল। শুরু হল জাহাজ নির্মাণের কাজ। শত্রুকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়ার জন্য তারিককে ৭০০০ বারবার এবং ৩০০ আরব সেনার একটি বাহিনীসহ সংকীর্ণ খাল অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হল। মূল বাহিনীর পরবর্তী অভিযানের জন্য তাকে একটি মজবুত ঘাঁটি নিশ্চিত করতে বলা হল।

জুলিয়ানের জাহাজগুলো দিয়েই মুসলিম বাহিনীর পারাপারের কাজ চলল। মুসলিম বাহিনীর প্রথম দলটি ৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন কিউটার ঠিক অপর প্রান্তে একটি পাহাড়ে অবতরণ করল। সেনাপতি তারিকের নাম অনুসারে এই স্থানটির নাম রাখা হয় জিব্রালটার অথবা জাবাল-আত তারিক। অর্থাৎ তারিকের পাহাড়। একনাগাড়ে সাতদিন ধরে এই পারাপারের কাজ চলল। অবশেষে ২৩ জুন (৭১১) সেনাপতি তারিক সর্বশেষ দলটি নিয়ে স্পেনের উপদ্বীপে পদার্পণ করলেন। পাহাড়টিকে গড়ে তুললেন মুসলিম বাহিনীর মূল ঘাঁটি হিসেবে। এই ঘাঁটিকে আরও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি পার্শ্ববর্তী সুরক্ষিত শহর 'কারটিয়া' দখলের উদ্যোগ নেন। একটি বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন কারটিয়ার পথে। আরব বংশোদ্ভূত মুয়াফিরি গোত্রের আবদ-আল মালিক ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। তিনি ছিলেন আন্দালুসিয়ার স্বনামধন্য রাজা আল মানজুরের পূর্বপুরুষ। কারটিয়ার স্পেনীয় গভর্নরের নাম ছিল থিওডোসির। থিওডোসির সাধ্যমত আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে থিওডোসির-এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ হল। উপায়ান্তর না দেখে সমূহ বিপদ এবং সংকটের কথা জানিয়ে সে রাজার নিকট জরুরী বার্তা পাঠায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করে। মুসলিম বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ স্পেনের পশ্চিম উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমনের পূর্বেই থিওডোর সন্তর্পণে পিছু হটে যায়।

উত্তর স্পেনের বিদ্রোহী শহর পেমপালুনায় রডারিক তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অবস্থান করার সময় তার কাছে থিওডোসিরের সংবাদ এসে পৌঁছে। সৈনিক রাজা রডারিক ত্বরিত ব্যবস্থা নিলেন। অবরোধ তুলে নিয়ে তিনি তাঁর বাহিনীকে দক্ষিণে

অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায়কে রাজধানী টলেডোয় ডেকে পাঠালেন। এখানেই বসল যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কিত পরামর্শ সভা। স্থির হল যে- অবিলম্বে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণকারী বাহিনীর মুকাবিলা করতে হবে। আক্রমণকারীরা পাকাপোক্তভাবে ঘাঁটি স্থাপনের পূর্বেই তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে সমুদ্রের ওপারে। রডারিকের সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দ্রুতগতিতে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য ছুটে যায়। পথে আরও অনেকে যোগ দেয় তাদের সঙ্গে।

যথাসময়ে তারিক জেনে গেলেন রডারিকের গতিবিধি এবং কার্যকলাপের কথা। জুলিয়ানের লোকজনেরাই জানিয়ে দিল। অবিলম্বে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে তারিক মুসার কাছে সংবাদ পাঠালেন। কিন্তু মুসার কাছে খুব বেশী সৈন্য মওজুদ ছিল না। ফলে তারিকের অনুরোধপত্র মুসার জন্য খানিকটা উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়ে বড় কথা, এত অল্প সময়ের মধ্যে মুসার পক্ষে পারাপারের জন্য জাহাজ তৈরী করা সম্ভব হয়নি। এতকিছুর পরেও মুসা বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। পূর্ণোদ্যমে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করলেন, ডেকে পাঠালেন জুলিয়ানের নৌবহরকে। ইতিমধ্যে রডারিক তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ভীম বিক্রমে, বলতে গেলে বিপজ্জনকভাবেই মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি এসে যায়। সেনাপতি তারিক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে যুদ্ধ কৌশল ঠিক করলেন। তিনি অপূর্ব দৃঢ়তা সহকারে নদীর বাঁকে 'লাগুনা ডিলা জুন্দা'-এর পশ্চিম প্রান্তে ঢুকে পড়েন এবং এখানেই সেনা ছাউনি ফেলেন। রডারিকের বাহিনীও বারবেট নদী অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগে শিবির স্থাপন করে।

তার কাছে প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত বাহিনী না আসায় তারিক ভীষণ রকমের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে যান। যে অমিততেজ এবং গতি নিয়ে রডারিক পেমপালুনা থেকে যাত্রা করেছে, সেই গতি নিয়ে সে কি মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? এ ধরনের একটি প্রস্তাবনার কথা বিবেচনা করেই তারিক স্থির করলেন যে, প্রয়োজনবোধে তিনি ফিরে যাবেন কারটিয়ায়। সেখানকার দুর্জয় ঘাঁটিতেই তিনি অবস্থান নেবেন। কিন্তু রডারিকের বাহিনীতে প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গীরদার যোগ দিচ্ছিল। এজন্য তিনি আক্রমণ বিলম্বিত করলেন। এটা ছিল তারিকের জন্য সুসংবাদ। এমনিভাবে আরও কয়েকদিন কেটে যায়। ১৯ জুলাই তারিখে উভয় বাহিনীর মধ্যে শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। ইতিমধ্যে তারিকের ভাগ্য যেন আরও সুপ্রসন্ন হয়। মুসার প্রেরিত অতিরিক্ত বাহিনী তারিকের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করে। তারা ছোট ছোট জাহাজে চড়ে জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে সরাসরি চলে আসে যুদ্ধের ময়দানে। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে মুসার প্রেরিত অতিরিক্ত বাহিনীর সর্বশেষ দল ২৫ জুলাই স্পেনের মাটিতে পা রাখে। অতিরিক্ত সৈন্য আসার ফলে মুসলিম বাহিনীর

শক্তি বৃদ্ধি পেলেও ৬ দিনব্যাপী খণ্ডযুদ্ধে স্পেনীয় সৈন্যদেরই জিত হয়। যুদ্ধে তারা অসামান্য দৃঢ়তা এবং নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ফলে বারবারদের মনোবল অনেকখানি হ্রাস পায়।

এই সময়ে রডারিকের বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম করার কারণে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ছিলেন সুঠাম দেহ এবং সতর্ক মনের অধিকারী। একজন প্রবীণ অধিনায়ক হিসেবে তাঁর সামরিক অভিজ্ঞতাও ছিল বৈচিত্র্যময়। বিসাকার এবং গ্যালিসিয়ায় সামরিক অভিযান পরিচালনাকালে তিনি বিস্ময়কর সামরিক নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দেন। বস্তুতপক্ষে এই যুদ্ধ দু'টি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। উন্নত নৈতিকতা এবং দৃঢ় মনোবল ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে তিনি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন জায়গায় বহন উপযোগী একটি সিংহাসনে বসেই তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। আধুনিককালে যুদ্ধের সদর দফতর থেকে কমান্ডারগণ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সিংহাসনটি ছিল ব্রোঞ্জ ও রূপা দিয়ে কারুকাজ করা এবং নানা বর্ণের সিল্কের চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। সিংহাসনটি দামী তো বটেই, দেখতেও ভারী চমৎকার লাগত। তিনি বারবেট নদী অতিক্রম করে নানা বর্ণখচিত চাদোয়ার নিচে সিংহাসনখানি স্থাপন করেন।

রডারিকের গায়ের জামা-কাপড়গুলো ছিল খুব দামী এবং ভারী চমৎকার। বেগুনী রঙের একটি আলখেল্লা কাঁধ বরাবর ঝোলান ছিল। মাথায় ছিল রাজমুকুট। মনিমুক্ত বসান ঢিলে-ঢালা পোশাক দেখলেই চমক লেগে যেত। সেনাপতি রডারিকের তুলনায় তারিকের অবস্থা ছিল খুবই নিষ্প্রভ। তারিকের পিতা ছিলেন কেনা গোলাম। মুসাই তাকে দাস জীবন থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। তখনও তারিকের খুব বেশী একটা বয়স হয়নি। গায়ের রং বেশ ফর্সা, মাথার চুল লালচে ধরনের–মোটের উপর তিনি ছিলেন বেশ সুদর্শন। বয়সে নবীন হলেও মুসার প্রধান সেনাপতি হিসেবে অনেক যুদ্ধ দেখেছেন, অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস, দুর্বার সাহস এবং অদম্য উদ্দীপনাই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘদিনের লালিত একটি স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়ার প্রত্যাশা নিয়েই তিনি স্পেনের মাটিতে পা রাখেন। আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা এবং ভাগ্যের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া সত্ত্বেও তিনি রডারিকের বিরাট বাহিনী দেখে খানিকটা বিব্রত বোধ করেন। বিশেষ করে খণ্ডযুদ্ধের পর বারবারদের হীন মনোবল লক্ষ্য করে তিনি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এক হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তারিকের মূল বাহিনী। তন্মধ্যে ৩০০ ছিল আরব এবং ৭০০ ছিল বারবার। অল্প সংখ্যক ঘোড়সওয়ার বাদ দিয়ে বাকীরা ছিল পদাতিক। পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত যে

বাহিনী প্রেরণ করা হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৫০০০ ছিল অশ্বারোহী। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে স্পেনে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০০। ৫০০ আরব সর্দারদের বাদ দিয়ে বাকী ছিল এটলাস পার্বত্য অঞ্চলের বারবার জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত।

বারবাররা সব সময় ছোট-খাট যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। এমনিতেও তারা ছিল শক্ত-সামর্থ্য, কষ্টসহিষ্ণু এবং অসম সাহসী। তারা ছুটতে পারত অত্যন্ত দ্রুত; নতুন নতুন কলা-কৌশল উদ্ভাবনে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। গোত্রগত বন্ধনের ভিত্তিতেই অবতীর্ণ হত যুদ্ধের ময়দানে। তারিক তাদেরকে নতুনভাবে সংগঠিত করলেন। বিন্যস্ত করলেন নতুন আঙ্গিকে। গোত্রীয় বন্ধনকে বাদ দিয়ে যুদ্ধের চাহিদা অনুসারে কতগুলো দলে বিভক্ত করলেন। উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ আরব সর্দারগণকে নিয়োগ করলেন তাদের অধিনায়ক হিসেবে।

বারবারদের পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে অন্য কারও বড় একটা তুলনা হত না। বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধে তাদের প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। বারবারদের অশ্বারোহী সৈন্যরাও ছিল শক্তিশালী। ঐতিহ্যবাহী নুডিয়ান ঘোড়াগুলো ছিল তাদের দখলে। সেই হ্যানিবলের পূর্বে থেকেই অশ্বারোহী যুদ্ধে রয়েছে তাদের গৌরবময় ইতিহাস। মুসলিম সৈন্যরা সাধারণত মাথায় সাদা পাগড়ী পরত। পদাতিক সেনাদের কারও কারও গায়ে ছিল বর্ম। এই যুদ্ধে তলোয়ার, লম্বা বর্শা এবং হালকা তীর ছিল মুসলিম বাহিনীর প্রধান হাতিয়ার।

নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল রডারিকের বিশাল বাহিনী। সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল পদাতিক। ভিসিগোথ বংশের এই সৈন্যদের মধ্যে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তারা ঘোড়াকে ব্যবহার করত যাতায়াতের একটি মাধ্যম হিসেবে। তারা ভাবত ঘোড়া হল মান-মর্যাদার প্রতীক। কিন্তু তারা সাধারণত ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করত না। ফলে রডারিকের বাহিনীতে হাজার হাজার ঘোড়া থাকলেও বলতে গেলে তার কোন অশ্বারোহী দল ছিল না। বারবারদের মত তার বাহিনীর সংগঠন ছিল খুবই দুর্বল এবং অবিন্যস্ত। প্রত্যেক জায়গীরদারের নিজস্ব সৈন্য-সামন্ত ছিল এবং যুদ্ধের ময়দানে তারা নিজস্ব বাহিনীর নেতৃত্ব দিত। অথচ রডারিকের প্রতি এই যুবরাজ বা জায়গীরদারদের আনুগত্য সব সময় সমপর্যায়ের বা সমমানের ছিল না। কখনও কখনও তারা রাজার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। ফলে রডারিকের পক্ষে সমস্ত যুবরাজদের কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। স্পেনের সাধারণ সেনারা ছিল নির্যাতিত ও নিপীড়িত। দেশ বা সরকারের প্রতি তাদের সামান্যই মমত্ববোধ ও ভালবাসা ছিল। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন এবং উত্তরণের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে বড় একটা আগ্রহ ছিল না। এবং সে কারণেই এতবড় বাহিনী নিয়েও রডারিক কখনও
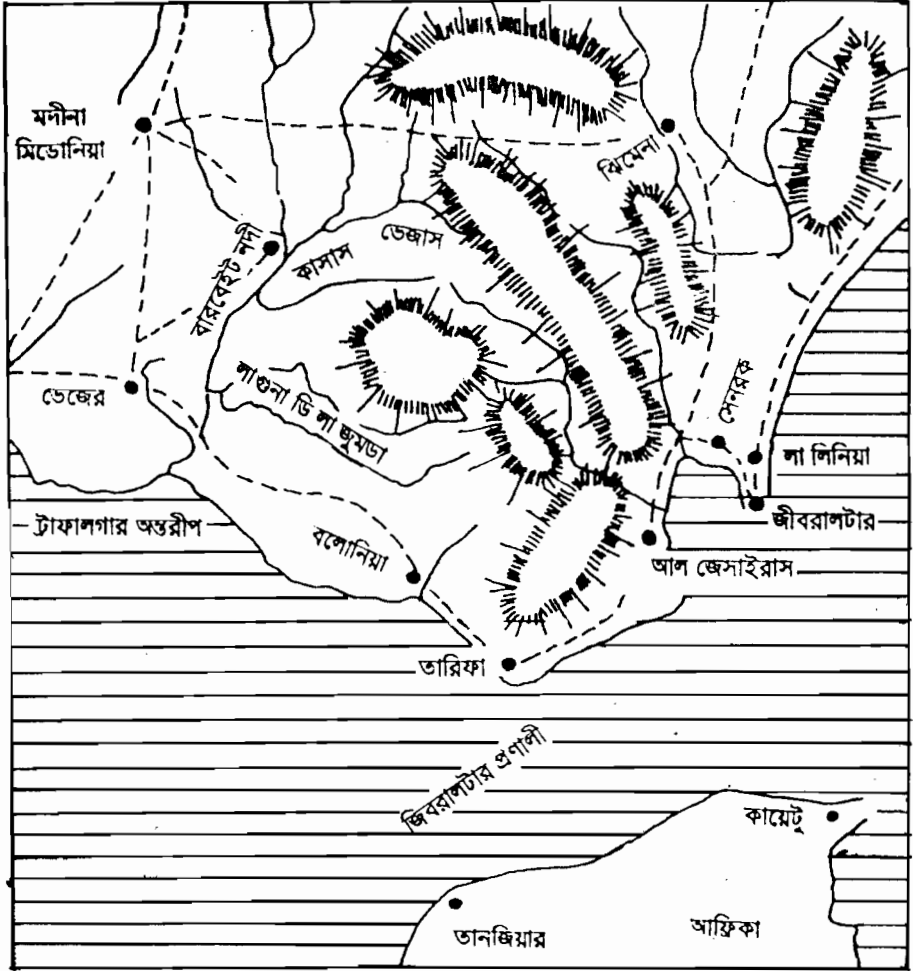
স্কেল ১ ইঞ্চি– ১২ মাইল

১০ ৫ ০ ১০ মাইল

অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। এদিক থেকে তারিক অনেকখানি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। তার বাহিনীতে ছিল আরব বংশোদ্ভূত ৫০০ আরব সরদার। তারিকের প্রতি প্রত্যক্ষ এবং অবিচ্ছেদ্য আনুগত্য থাকার ফলে মুসলিম বাহিনীকে একটি একক শক্তি হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছিল। স্পেনীয় পদাতিক বাহিনীর মধ্যে দু'টি দল ছিল– একটি দল ভারী অস্ত্র এবং বিশেষ পোশাকে সুসজ্জিত, অপর দলটির হাতে থাকত সাধারণ হাতিয়ার। শত্রুর আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারী পদাতিক সেনারা বর্ম জাতীয় শক্ত পোশাক পরিধান করত। ঢাল-তলোয়ার ও বর্শা ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। অপরদিকে হালকা পদাতিক সেনাদের হাতিয়ারগুলো ছিল খুবই সাধারণ এবং নিম্নমানের। দৈনন্দিন জীবনে যে অস্ত্র ব্যবহার করত সেগুলো নিয়েই তারা হাযির হত যুদ্ধের ময়দানে। এগুলোর মধ্যে ছিল তীর ও ধনুক, কুঠার, পাথর ছোঁড়ার মত যন্ত্র (ফিঙ্গা), কাস্তে এবং সাধারণ লাঠি।

বারবেট নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল বারবাট এবং বখশ (আধুনিক নাম ভেজের) নামে স্পেনের দু'টি প্রধান শহর। এই শহর দুটির নামানুসারে তারা নদীটিকে বলত ওয়াদি বখশ। আবার কেউ কেউ বলত ওয়াদি বারবাট। রোন্ডা পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে ওয়ার্দি বখশ এঁকেবেঁকে চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। আরও কতগুলো উপনদীর উৎসমূলে রয়েছে রোন্ডা পর্বতমালা। দক্ষিণ দিকের কতগুলো উপনদী দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে লাগুন ডি লা জুন্দা-এর (আরবী ভাষায় আল-কুহায়রা) সঙ্গে মিশেছে। উত্তর-পূর্বদিক থেকে এসে শাখা নদীগুলোর মিলিত স্রোত একটি চটাল বা জলাশয়ের রূপ নেয়। এখানে পানির গভীরতা খুবই কম। কিন্তু জলাশয়টি লম্বায় সাত মাইল এবং চওড়ায় দু'মাইলের মত। লাগুনার দু'মাইল উত্তর দিকে এই মিলিত স্রোত প্রধান নদীতে পড়েছে। এখানে বারবেট নদী বিরাট একটি বাঁক সৃষ্টি করে এবং ভেজের-এর নিম্নভাগ দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে চলে যায়। অতঃপর ট্রাফালগার অন্তরীপের সামান্য দক্ষিণ দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে বিরাট একটি বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। বৃত্তের দু'দিকে রয়েছে বারবেট নদী এবং অন্য দিকে লাগুনার পশ্চিম উপকূল। বৃত্তের আকারে ঘেরা এই জায়গাটুকু বেশ সমতল ও সুন্দর। তারিক বৃত্তাকার এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশ দখল করেন। সম্ভবত তাঁর বাহিনী লাগুনা থেকে বারবেট নদী বরাবর একটি লাইনে অবস্থান নেয়। অবশ্য এই অঞ্চলটুকু ধরে রাখার ব্যাপারে তার বাহিনীর দৃঢ়তা এবং সামর্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। এদিকে রডারিক তার বিশাল বাহিনী নিয়ে নদীর উপকূলভাগ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভেজের-এর নিকট দিয়ে নদী অতিক্রম করতেই তিনি মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হলেন এবং বৃত্তাকারে অঞ্চলের উত্তর দিকের মুক্ত অংশে তিনি শিবির স্থাপন করেন।

ইসলামের ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ সেই দিনটি ছিল ৭১১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই। এই দিনেই স্পেনীয় এবং মুসলিম বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। আগামী কয়েক শতাব্দীর জন্য সাইবেরিয়ান উপসাগরীয় অঞ্চলের ভাগ্যে কি ঘটবে, কেমন হবে একটি সভ্যতার গতিপ্রকৃতি – তা এই দিনেই নির্ধারিত হয়। অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সময়ে এই যুদ্ধ সম্পর্কে ছিটেফোটাভাবে যে মন্তব্য বা অভিমত পেশ করেছেন, তার উপর ভিত্তি করেই মোটামুটি যুদ্ধের একটি নাতিদীর্ঘ চিত্র রূপায়ণ করা যেতে পারে।

তারিকের নির্দেশ অনুসারে পদাতিক সেনাদের মাঝখানে রেখে অশ্বারোহী বাহিনী দু'প্রান্তে অবস্থান নেয়। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি অংশকে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে তারিক নিজের কাছে রেখে দিলেন। পূর্ব থেকেই ভেবেচিন্তে তারিক মুসলিম বাহিনীকে কার্টিয়ার পথে লম্বালম্বিভাবে সাজালেন। ঘটনাচক্রে কোন রকম বিপর্যয় দেখা দিলে মুসলিম সেনারা যাতে কোনরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নিরাপদে কার্টিয়ার ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে সেজন্যই সেনাপতি তারিক এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে মুসলিম বাহিনীর জন্য এটা ছিল মস্তবড় কৌশলগত সুবিধা এবং যুদ্ধের শুরুতে তারিক এই সুবিধাটুকু নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন।

রডারিকের সঙ্গে ছিল অগণিত সৈন্যের বিশাল বাহিনী। প্রচলিত প্রথা অনুসারে রডারিক তার বাহিনীকে সাজালেন। খুবই বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ অধিনায়কগণের উপর স্পেনীয় বাহিনীর দু'প্রান্তে এবং মধ্যভাগের সেনাদলের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। নদীর তীরে স্থাপিত রাজসিংহাসনে বসে যুদ্ধের সামরিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকলেন তিনি নিজে।

বিভিন্ন দলের অধিনায়কত্বে রডারিক যাদের নিয়োগ করেছিলেন, তাদের নাম পরিচয় কি, আদৌ তার কোন রিজার্ভ বাহিনী ছিল কি-না, থাকলেই বা সৈন্য সংখ্যা কত সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। পরবর্তী সময়ে রচিত খ্রিস্টীয় বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিক্ষুব্ধ যুবরাজদের সন্তুষ্ট করার জন্য রডারিক নিহত রাজার এক ছেলেকে প্রান্তভাগের একটি দলের সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় এই বিবরণটি যে কতখানি ইতিহাসসম্মত, অথবা এই ঘটনা যে কতখানি বাস্তব ও যথার্থ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে জুলিয়ান এবং উইটিজার এক ছেলে ইতিমধ্যেই মুসলিম বাহিনীর পক্ষে তারিকের দলে যোগ দিয়েছিল।

যুদ্ধের ময়দানে রডারিকের কৌশলগত অবস্থান ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ। তিনি স্পেনীয় বাহিনীকে যেখানে মোতায়েন করেছিলেন তার প্রান্তসীমায় ছিল লাগুনা এবং বারবেট নদী। ফলে বাহিনীর ডান প্রান্তের উপর কোন বিপর্যয় নেমে এলে তার পশ্চাদপসরণের কোন পথ ছিল না। অবশ্য যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে এ ধরনের অবস্থানগত ত্রুটিগুলোকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া বিচিত্র কোন ব্যাপার নয়। সামরিক ইতিহাসে

এর অসংখ্য নজির আছে। আসলে রডারিক অগণিত সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে পশ্চাদপসরণের বিষয়টি একবারও ভেবে দেখেননি এবং এটাই খুব স্বাভাবিক যে, যে বাহিনী বিজয় লাভ করে তার পশ্চাদপসরণের প্রশ্নই উঠে না। যুদ্ধ শুরু হল। রডারিক মুসলিম বাহিনীর প্রান্তভাগের অশ্বারোহী দলের উপর দুর্জয় আক্রমণ চালান। স্পেনীয় বাহিনীর পক্ষে সম্মুখভাগের সেনাদল এতে অংশ নেয়। খণ্ডযুদ্ধে স্পেনীয় বাহিনীর উপর্যুপরি বিজয়ের কারণে মুসলিম সেনারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। তাদের মনোবল ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বিষয়টি তারিকের দৃষ্টি এড়ালো না। সমস্ত অধিনায়কদের নিয়ে তিনি একটি সভা ডাকলেন। হোমেরিক স্টাইলে চমৎকার একটি বক্তৃতায় সকলকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এবং উত্তেজিত করে তুললেন। তারিকের সেই বক্তৃতা একজন বিদগ্ধ সেনাপতির আদর্শ ভাষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রথমেই তিনি সৈনিকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন বারবারদের সেই ছোট বেলার কথা, যখন থেকে তারা শিকারের স্বপ্ন দেখে, মেতে উঠে শিকারের সুখকর কল্পনায়। তিনি তাদের সামনে তুলে ধরলেন উর্বর ভূমি এবং মনোমুগ্ধকর বাগানরাজির চমৎকার একটি চিত্র। তিনি বললেন, এ সবই রয়েছে তোমাদের দখলের অপেক্ষায়। তিনি দৃঢ়ভাবে তাদের জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে একটি সুমহান দায়িত্ব। একটি মিশন-একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তোমরা ঘর ছেড়েছ। এবং জিহাদ হল প্রতিটি মু'মিন মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। তিনি রডারিকের বিশাল বাহিনীর সংখ্যাধিক্যকে খুবই হালকাভাবে দেখলেন। অবজ্ঞা ও উপহাস করলেন ভীষণভাবে। তিনি বললেন সেই বদরের যুদ্ধ থেকেই মুসলমানরা কি অসম শক্তির মুকাবিলা করেনি? মুসলমান বাহিনীর এই সংখ্যাল্পতা কবে না ছিল? কিন্তু আরব, সিরিয়া, ইরান, আফ্রিকার কোথাও কি শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্য তাদের কোন উপকারে এসেছে? তারা কি পেরেছে মুসলমান বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করতে? সেনাপতি তারিক বক্তৃতার সমাপ্তিতে বললেন-তোমরা কি পারবে এখান থেকে ফিরে যেতে? তোমাদের চলে যাওয়ার পথ কোথায়- তোমাদের পেছনে রয়েছে সাগরের অথৈ জলরাশি, খোলা তলোয়ার হাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছে রডারিকের বিশাল বাহিনী। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মুক্তির কোন পথ নেই, তোমরা এখন অবরুদ্ধ। অবশ্য তোমরা যদি কর্তব্য-কর্মে অবিচল থাক, যুদ্ধ কর অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সঙ্গে, কেবলমাত্র তাহলেই তোমরা অব্যাহতি পেতে পার, রক্ষা পেতে পার নিশ্চিত বিপর্যয়ের গ্লানি থেকে। বক্তৃতার পর্ব শেষ হল। অধিনায়কগণ চলে গেলেন নিজ নিজ বাহিনীর কাছে। তারিক বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে সাধারণ সৈনিকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার মত পর্যাপ্ত সুযোগ দিলেন। এর পরই তারিক শত্রুশিবির আক্রমণ করলেন। শুরু হল অসম শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ।

যুদ্ধের শুরুতেই মুসলিম বাহিনীর বাম প্রান্তের অশ্বারোহী দল সচল হয়ে উঠে। সেনাপতির নির্দেশ পেয়েই তারা বীরবিক্রমে স্পেনীয় বাহিনীর ডান প্রান্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম আঘাতেই ভেঙ্গে গেল খ্রিস্টানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল রডারিকের ডান সীমানার বিশাল বাহিনী। উপায়ান্তর না দেখে তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। এতে করে খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল। তারা স্পেনীয় বাহিনীর বাম প্রান্তের উপর আক্রমণ চালাল। কিন্তু মুসলমান বাহিনী এবার খুব বেশী একটা সুবিধা করতে পারল না। স্পেনীয় বাহিনী পরাজিত হলেও সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হল না। শত্রুসেনাদের অনেকেই নদী সাঁতরিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু বেশীর ভাগ সৈন্যই নিরাপদে পশ্চাদপসরণের সুযোগ না পেয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকল। তারিকের নির্দেশ পেয়ে এবারে মধ্যভাগের অশ্বারোহী সেনারা দৃপ্ত পদে অগ্রসর হল। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা বেশীদূর এগুতে পারল না। শত্রুসেনাদের অনেকেই হতাহত হল। সহসা রুদ্ধ হল তাদের অগ্রগতি। তারিক লক্ষ্য করলেন যে, যুদ্ধ দ্রুত অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ অবস্থা মুসলিম বাহিনীর জন্য কোনক্রমেই সুখকর নয়। কারণ, এতে করে রডারিক নতুন করে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার সুযোগ পাবে। এমনকি ইচ্ছা করলে রডারিক নিরাপদে এবং অনায়াসে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। তারিক এবার একটি দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ হল রডারিকের উপর। রডারিক যেখানে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তারিক সেখানে সরাসরি আক্রমণ চালালেন। রিজার্ভ অশ্বারোহী বাহিনী একযোগে এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল রডারিকের রাজসিংহাসনের দিকে। তারিক নিজে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন। খ্রিস্টান পদাতিক সেনারাও তৈরী ছিল। শিলাবৃষ্টির ন্যায় তারা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। মুসলিম বাহিনীর অশেষ ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হল। বিশেষ করে তাদের অনেকগুলো ঘোড়া হতাহত হল। রিজার্ভ বাহিনী যতই রডারিকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই তাদের সৈন্যসংখ্যা কমছে। বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, নিহত হচ্ছে অনেকে, তবু তাদের গতি রুদ্ধ হল না। তারা ভারী পদাতিক বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে হালকা পদাতিক সেনাদের প্রতিরক্ষা ছিন্ন করে একেবারে পশ্চাৎভাগে চলে গেল। রডারিকের নিজস্ব দেহরক্ষীরা সাধ্যমত মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা মুসলিম সেনাদের দুর্বার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হল। নিহত হল খ্রিস্টান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। রডারিক মুসলিম বাহিনীর এমন উন্মত্ত এবং দুঃসাহসিক আক্রমণের গুরুত্ব উপলব্ধি করার পূর্বেই তার দ্বিখণ্ডিত দেহ ধূলায় গড়িয়ে পড়ল।[২]

বলতে গেলে ওয়াদি বাক্কাহ-এর যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনী কোন রকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বরং মুসলিম বাহিনী উপর্যুপরি তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। ফলে এই যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনীর পক্ষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হওয়াটাই

স্বাভাবিক ছিল।[৩] কিন্তু রডারিকের বাহিনীর মধ্যভাগ এবং বাম প্রান্তের সেনারা এত মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে যে, এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীরও বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। ১২ হাজার সৈন্যের মধ্যে ৩ হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। ওয়াদি বাক্কাহ্-এর যুদ্ধে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। তন্মধ্যে ভিসিগোথদের অশ্বগুলোই ছিল সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। এই ঘোড়াগুলো পাওয়ার ফলে মুসলিম বাহিনীর রণসজ্জা ও শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এবার তারা অধিকতর ক্ষিপ্রতা এবং দ্রুততার সাথে রাজ্যের অভ্যন্তরে আক্রমণ করার মত শক্তি সঞ্চয় করে।

তারিক ছিলেন একজন সাধারণ অধিনায়ক। যুদ্ধের ময়দানে তিনি মুসার নির্দেশ অনুসারে কাজ করতেন। স্পেনে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তারিককে নিয়োগ করা হলেও এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার তাঁর ছিল না। বরং গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ব্যাপারে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে আলাপ করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু বাস্তবতা তারিককে ভিন্ন পথে নিয়ে গেল। এককভাবেই তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হল। এদিকে স্পেনের বাস্তব অবস্থা ছিল খুবই নাজুক এবং বিপদসঙ্কুল। মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় ভিসিগোথরা ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। রডারিকের মৃত্যু সংবাদ জানার অল্প সময়ের মধ্যেই সমবেত হয়ে গড়ে তোলে বিশাল বাহিনী। তাছাড়া এমনিতেই মুসলমানদের প্রতি স্পেনীয়বাসীরা ছিল ক্ষুব্ধ। উপরন্তু জুলিয়ানের দ্বারাও মুসলিম বাহিনীর বিপাকে পড়ার সমূহ আশংকা ছিল। এসব মিলিয়ে মুসা খুবই সন্ত্রস্ত এবং শংকিত হয়ে পড়েন। তিনি স্পেনে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণের সময় তারিককে নির্দেশ দিলেন যে, শত্রুর মুকাবিলায় কোন রকমে নিজেকে ধরে রাখ এবং আরও সৈন্য নিয়ে না আসা পর্যন্ত স্পেনের অভ্যন্তরভাগে কোনক্রমেই অভিযান চালাবে না। কিন্তু ওয়াদি বাক্কাহ্-এর যুদ্ধের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। তারিক দেখলেন যে, স্পেনের শাসন ব্যবস্থায় রয়েছে নির্বাচিত রাজতন্ত্র। যুদ্ধের ময়দানে রাজা রডারিকের মৃত্যু হয়েছে। তার কোন ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারও নেই। এদিকে পরাজয়ের কারণে যুবরাজরাও ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে। এমতাবস্থায় তারা সমবেত হওয়ার সুযোগ পেলেই নতুন করে রাজা নির্বাচন করবে। রাজাকে কেন্দ্র করে আবারো তারা সংগঠিত হবে। নতুন করে গড়ে তুলবে প্রতিরোধ। সুতরাং এ ধরনের সুযোগ দেয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। তারিক ভাবলেন, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বাধিনায়ক মুসা স্পেনের অভ্যন্তরভাগে অনুপ্রবেশ করতে বারণ করেছিলেন সে অবস্থা এখন আর নেই। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় মুসার নির্দেশ মেনে চলা জরুরী নয়। বিষয়টি নিয়ে তিনি অন্য সর্বাধিনায়কগণের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলেন। সকলেই অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করল। তারই প্রেক্ষিতে তিনি মুসলমান সেনাদের পলায়নপর স্পেনীয় বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলেন।

ওয়াদি বাক্কাহ্-এর যুদ্ধের পর স্পেনীয় বাহিনীর সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে কোনরকম বাধাপ্রতিবন্ধকতা ছাড়াই শহরের পর শহর মুসলিম বাহিনীর পদানত হল। ইতিমধ্যে তারিকের বিজয় সংবাদ আফ্রিকায় পৌঁছে গেছে। প্রতিদিনই অসংখ্য লোক জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। তারিক এবার গোটা স্পেন একযোগে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিলেন। তিনি মুগিথকে পাঠালেন কর্ডোভায়, জাহিদ বিন কাসাভা গেলেন মালাগা এবং গ্রানাডায়; জুলিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন টলেডোর পথে। স্পেনের মাটিতে পা রাখার এক বছরের মধ্যে তারিক গোটা মধ্য এবং পূর্ব স্পেন দখল করে নিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মুসা স্পেনে আসার পূর্বেই এই দখলের কাজ সম্পন্ন হল।

সামরিক ইতিহাসে তারিকের আবির্ভাব একটি ছুটন্ত তারকার মত। তাঁর সামরিক জীবন খুবই স্বল্পকালের হলেও যেমনি উজ্জ্বল তেমনি চাকচিক্যময়। বস্তুতপক্ষে একটি মাত্র অভিযানকে কেন্দ্র করেই তাঁর সামরিক খ্যাতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই অভিযানে তিনি যে কৌশল, নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তা সত্যি বিরল এবং খুবই চমকপ্রদ। তদানীন্তনকালে স্পেন ছিল খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে স্পেনবাসীরাও ছিল ভাল যোদ্ধা। অথচ এই বিশাল বাহিনীকে অল্প সময়ের মধ্যে পরাভূত করেন, দখল করে নেন গোটা দেশটা; অথচ তাঁর বাহিনী ছিল খুব ছোট। একজন বিশিষ্ট সমরনায়ক হিসেবে এখানেই রয়েছে তারিকের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব। বিশেষ করে গোটা অভিযানটি তিনি যে নৈপুণ্য এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন, তা মহাবীর তারিককে বিশ্বের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ সমরনায়কের মর্যাদা দান করেছে।

স্পেনের মাটিতে অবতরণ করেই তারিক জিব্রালটার দখল করে নেন। জিব্রালটারকে একটি সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলেন। সামরিক ঘাঁটি হিসেবে জিব্রালটার এত মজবুত ছিল যে এখান থেকেই তিনি স্পেনের অভ্যন্তরভাগে আঘাত হানতে পারতেন। আবার ঘটনাচক্রে অবস্থা নাজুক হলে নিরাপদে ফিরে এসে এখান থেকেই দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হত। তারিকের পরবর্তী পদক্ষেপটিও ছিল বিচক্ষণতায় ভরা। আফ্রিকা থেকে স্পেনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে নতুন একটা আমেজ ও তীব্র তেজ ছিল। তাদের এই উদ্যমে ভাটি পড়ার আগেই তিনি স্পেনের অভ্যন্তরভাগে আক্রমণ পরিচালনা করেন। যুদ্ধের জন্য তিনি যে ময়দান নির্বাচন করেন, যে রণকৌশল অবলম্বন করেন -তাও ছিল ভারী চমৎকার এবং মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে। কারণ, ১. তাঁর ছোট বাহিনীর প্রান্তভাগের সৈন্যরা ছিল বিপদমুক্ত। ২. মূল ঘাঁটির সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই চমৎকার ও নিরাপদ। ৩. তিনি রণকৌশল এমনভাবে রচনা করেন যে শত্রুপক্ষের সম্মুখভাগের সৈন্যরা বিপক্ষের প্রান্তভাগের সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

বাধ্য হয়। ৪. ফলে শত্রুসেনারা খুবই অসুবিধায় পড়ে যায়। প্রান্তভাগ এবং পশ্চাদভাগের সেনাদের যুদ্ধে অংশ নিতে খুবই বেগ পেতে হয়। ৫. সর্বোপরি, চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে দেয়া তারিকের ভাষণটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই ভাষণ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্যুতের গতি সঞ্চার করে। তাদের মধ্যে জেগে উঠে নতুন তেজ ও অদম্য উদ্দীপনা। প্রবল হয় তাদের মনোবল। বস্তুতপক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার এই ভাষণের মর্মবাণী মুসলিম যোদ্ধাদের অন্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে।

ওয়াদি বাক্কাহ্‌র যুদ্ধের শুরুতে তারিকের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। তিনি জানতেন যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে শত্রুসেনাদের মনোবল এবং দৃঢ়তা পঙ্গু হয়ে যাবে। রডারিকের বাহিনীর মধ্যভাগ ছিল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। সেকারণেই তারিক মধ্যভাগকে বাদ দিয়ে বাম প্রান্তের সেনাদলের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু সেখানেও তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। শত্রুপক্ষের দুর্বার প্রতিরোধের মুকাবিলায় কেবলমাত্র আংশিক বিজয় লাভে ব্যর্থ হন। এর পরেও তারিকের উদ্যমে কোন ভাটা পড়ল না। সমস্ত দ্বিধা-সংশয়কে পাশে ঠেলে রেখে তিনি শত্রুপক্ষের শক্তিশালী মধ্যভাগের উপর আক্রমণ চালালেন। এখানেও স্পেনীয় বাহিনী আক্রমণকে প্রতিহত করল। অবস্থাদৃষ্টে তারিক অনুধাবন করলেন যে স্পেনীয় বাহিনীর শক্তি এবং সাহসের মূলে রয়েছে রাজা রডারিক। রডারিকের কারণেই তারা এমন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছে। সে কারণেই তিনি রাজা রডারিককে কেন্দ্র করে যুদ্ধ কৌশল রচনা করলেন। অশ্বারোহী রিজার্ভ ফোর্সকে পাঠিয়ে দিলেন তার বিরুদ্ধে। তারিক তার রণচাতুর্যে সফল হলেন। রডারিকের মৃত্যুতে স্পেনীয় বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রণে ক্ষান্ত দিয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

স্পেনের অভ্যন্তরভাগে আক্রমণ পরিচালনা করার ব্যাপারে সর্বাধিনায়ক মুসার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। অথচ পরিবর্তিত সামরিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনিই নির্দেশ লঙ্ঘন করলেন। বস্তুতপক্ষে এই ঘটনাটির মধ্য দিয়েই তারিকের রণচাতুর্যের প্রখরতা এবং দুরদৃষ্টির গভীরতার ছাপ পাওয়া যায়। পলায়নপর স্পেনীয় বাহিনীর ফেলে যাওয়া অশ্বগুলো হস্তগত হওয়ায় মুসলিম বাহিনীর ক্ষিপ্রতা ও গতি বৃদ্ধি পায়। নব অর্জিত এই শক্তি নিয়েই তারিক সমগ্র স্পেনে ব্যাপক অভিযান চালান। তিনি এত দ্রুত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছেন যে তখনও স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ওয়াদি বাক্কাহর যুদ্ধের ফলাফল জানতে পারেনি। ফলে যুবরাজরা সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন একজন রাজা নির্বাচনের অথবা প্রতিরোধ গড়ে তোলার ফুরসত পেল না। ফলাফল যা হাবার তাই হয়। বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিরোধে শহর-বন্দরগুলো একের পর এক মুসলমানদের পদানত হল।

একথা সত্য যে সংখ্যার বিচারে মুসলিম বাহিনী খুব বেশী শক্তিশালী ছিল না। তবু এই বিরাট রাজ্য জয়ের সময় মুসলিম সেনাদের কোনরকম ঝুঁকি অথবা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। এর মূলে ছিল দু'টি কারণ। প্রথমত ওয়াদি বাক্কাহর যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা ছিল অসংগঠিত এবং আতংকিত। তাদের মনোবল ছিল খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনীর গতি ছিল খুবই দ্রুত। তাদের বিপক্ষে শত্রুসেনারা যুদ্ধ করত পায়ে হেঁটে। ফলে অশ্বারোহী ফৌজের সঙ্গে স্পেনীয়রা কোন রকমেই তাল সামলাতে পারেনি। উপরন্তু তারিক খুবই বিচক্ষণতার সাথে নব অর্জিত এই ক্ষিপ্রতা কাজে লাগান। সীমিত শক্তিকে ব্যবহার করেন অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সাথে। আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ফলে এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে স্পেন অভিযানকালে একবারের জন্যও তাকে বির্পযয়ের মুখোমুখি হতে হয়নি। বিশাল এলাকা দখল করতে গিয়ে পোহাতে হয়নি কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনা।

তারিকের স্পেন অভিযান সম্পর্কে এ ধরনের একটি বহুল প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, অগ্রবর্তী মুসলিম বাহিনী জিব্রালটার পদার্পণের পর পরই তারিক জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। আসলে এটি একটি কল্পকাহিনী মাত্র। পরবর্তী সময়ের লেখকগণ স্পেন বিজয়ের কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য এ ধরনের কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। জিব্রালটার প্রণালী পারাপারের জন্য মুসলমানদের নিজস্ব কোন নৌবহর ছিল না। কাউন্ট জুলিয়ানের ৪টি জাহাজই ছিল তারিকের একমাত্র অবলম্বন। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে, এই চারটি জাহাজ দিয়ে এক সময়ে এক জাহাজ পদাতিক সৈন্য জিব্রালটার পার হতে পারত। এবং একবার পারাপারের জন্য সময় লাগত ২৪ ঘন্টার মত। ৭০০০ মুসলমান সৈন্যের পারাপারের জন্য ৭টি ট্রিপ দরকার হয়। এ কাজে সময় লেগেছিল সাতদিন। সর্বাধিনায়ক মুসা অবশ্য জাহাজ তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু কারিগরি দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও কাঠের অভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ জাহাজ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তারিকের জিব্রালটারের অবতরণের পরপরই ওয়াদি বাক্কাহর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে জাহাজ তৈরীর জন্য তাঁর হাতে সময়ও ছিল না। তাছাড়া তারিকের দলে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। এবং একজন পদাতিক সৈন্যের তুলনায় অশ্বসহ একজন অশ্বারোহীকে জাহাজে পাঠাতে জায়গা লাগে অনেক বেশী। ফলে অশ্বারোহী ফৌজকে পাঠানোর জন্য জুলিয়ানের ৪টি জাহাজের সঙ্গে অতিরিক্ত আরও কিছু জাহাজ সংযুক্ত করতে হয়েছিল। উপরন্তু তারিক অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে স্পেনে এসেছিলেন। নিরাপদ স্থানে একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্মাণ করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। অনতিবিলম্বে মুসা স্থলবাহিনীকে যে স্পেনে পাঠাবেন- তারিক তা জানতেন। এমতাবস্থায় বলা যেতে পারে যে, ক. মুসার

স্থলবাহিনীকে জিব্রালটার প্রণালী পারাপারের সুযোগ না দিয়ে জাহাজগুলো ধ্বংস করে দেয়ার প্রশ্নটি একান্তই অযৌক্তিক ও অবান্তর। খ. মুসা নিজেই যেখানে আরও জাহাজ নির্মাণের জন্য ব্যতিব্যস্ত সেখানে হাতের পাঁচ হিসেবে জুলিয়ানের নৌবহরকে নষ্ট করে দেবেন– এমনটি আশা করা যায় না। গ. রডারিকের বাহিনীর বিশালতার কথা জানতে পেরে তারিক অবিলম্বে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি যদি প্রথম পদক্ষেপেই নৌবহরটি পুড়িয়ে দিতেন, তাহলে এমন অব্যান্তর অনুরোধ অবশ্যই করতেন না।

কথিত আছে যে, সর্বাধিনায়কের আদেশ অমান্য করে স্পেনের অভ্যন্তরভাগে অভিযান চালানোর অপরাধে সর্বাধিনায়ক মুসা সেনাপতি তারিককে বেত্রাঘাত করেছিলেন। কিন্তু নৌবহর পুড়িয়ে ফেলার অপরাধে তারিককে কখনও অভিযুক্ত করেছেন বলে শোনা যায়নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, পরিকল্পনা প্রণয়নে মুসা ছিলেন খুবই নিখুঁত এবং যত্নবান। স্পেনে অবতরণের পর জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেললে তা হতো ঝুঁকিপূর্ণ। এতে করে মুসলিম বাহিনীর অহেতুকভাবে নির্মূল হয়ে যাওয়ায় সমূহ আশংকা থাকত। অথচ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারটি হত একান্তই অর্থহীন ও ত্রুটিপূর্ণ। তারিক এ ধরনের একটি কাণ্ড করে থাকলে মুসা অবশ্যই তাকে নিস্তার দিতেন না। বরং গুরুতর সামরিক অপরাধে অভিযুক্ত করতেন।

হতে পারে মহাবীর তারিকের উদ্যম এবং উৎসাহে কল্পনার সংমিশ্রণ ছিল। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সেনানায়ক। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন মুসার মত একজন প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ সেনানায়কের কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে তারিকের পক্ষে এ ধরনের একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি একান্তই অকল্পনীয়। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহকে ইতিহাসের নিরিখে শ্রেণীবদ্ধ করা হলে এই কল্পকাহিনীর অবসান ঘটানো যেতে পারে। তারিক তাঁর বাহিনী নিয়ে স্পেনে পৌছার পর জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলেননি। ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, জুলিয়ানের যে নৌবহরে চড়ে তারিক জিব্রালটার পার হয়েছিলেন, মুসার প্রেরিত অতিরিক্ত বাহিনীও সেই নৌবহরকে পারাপারের কাজে ব্যবহার করেছিল। এবং এই বাহিনী যখন আলজেসিরাসে অবতরণ করে, তারিক তখন ৫০ মাইল অভ্যন্তরে লাগুনা ডি লা জুন্দার সেনা ছাউনিতে ছিলেন। সুতরাং জাহাজ পুড়িয়ে ফেলা অথবা ধ্বংস করে দেয়ার বিষয়টি একান্তই অপ্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেয়া যায়। স্পেনের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে মুসা অবহিত ছিলেন না। সে কারণেই তিনি স্পেনের অভ্যন্তরভাগে তারিকের অগ্রযাত্রাকে অবাধ্যতা এবং আদেশ অমান্য করার শামিল বলে ধরে নেন। এবং তারিকের প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত হন। কথিত আছে যে, তিনি যখন তারিকের সঙ্গে মিলিত হন তখন বিজয়ী সেনাপতিকে বেত্রাঘাত করেন। সম্ভবত এ

কথাটি অতিরঞ্জন মাত্র এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। অনুমান করা হয় যে খলিফা কর্তৃক গভর্নর এবং সর্বাধিনায়ক মুসার নিগৃহীত হওয়ার পরই এ ধরনের অতিরঞ্জনের উদ্ভব ঘটে। সে যাই হোক, উভয়ের মধ্যে কোনরকম বিবাদ বা মতান্তর থাকলেও অচিরেই তার মিটমাট হয়ে যায় এবং উভয়ে সমগ্র উপদ্বীপ অঞ্চল দখলে আত্মনিয়োগ করেন।

স্পেন বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনীর উৎসাহ -উদ্দীপনা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাদের মনোবল তখন তুঙ্গে। বিশেষ করে তাদের হাতে রয়েছে শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী। অথচ সে সময় পিরেনীজ অঞ্চলে বসবাসকারী ভিসিগোথ অথবা ফরাসী কারোই অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলাচল করত ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধ করত পায়ে হেঁটে। ফলে অন্যদের চেয়ে মুসলমানদের কৌশলগত সুবিধা ছিল বেশী। তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ আরবের বংশোদ্ভূত গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার কোন্দল শেষ হয়ে গেছে। মিটে গেছে আরব, বারবার এবং স্পেনীয় মুসলমানদের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদ। গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গড়ে উঠেছে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি। সকলের মধ্যে বিরাজ করছে একাত্মতা। অথচ গোটা খ্রিস্টান জাতি তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহের কারণে শতধাবিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল না কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এমনি পরিস্থিতিতে ইউরোপে চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। সমগ্র অঞ্চলে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এ সময়ে মুসলিম বাহিনীতে বিরল কতগুলো প্রতিভার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন মুসা, তারিক এবং মুসার পুত্র আবদুল আজিজ। যে কোন কাজের ব্যাপারেই মুসা ছিলেন খুবই হিসাবী এবং নিষ্ঠাবান। অসম সাহসী এবং অদম্য যোদ্ধা হিসাবে তাঁর স্থান ছিল সবার শীর্ষে। একজন সফল সেনানায়ক হিসাবে তারিক ছিলেন অনন্য। অনুরূপভাবে যুদ্ধ পরিচালনা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে আবদুল আজিজ বিন মুসার দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে অন্য কারও বড় একটা তুলনা হত না। বিজিত অঞ্চলের সংহতি বিধান এবং শাসনভার আবদুল আজিজ বিন মুসার উপর ন্যস্ত করে তারিক এবং মুসা সামনের দিকে এগিয়ে যান। এবার তারা মনোযোগ দেন আইবেরীয়ান উপদ্বীপের অবশিষ্ট অঞ্চল দখলের প্রতি। এই অভিযানে তাঁরা নিরঙ্কুশ সফলতা অর্জন করেন। শুধুমাত্র উত্তর ও পশ্চিমের খানিকটা দুর্গম পাবর্ত্য অঞ্চল খ্রিস্টানদের হাতে থাকে। বিস্তীর্ণ এলাকা বিজয়ের পর মুসা এক সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হন। সেখানেও তিনি সামরিক অভিযান শুরু করেন। কথিত আছে, মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি এতখানি আস্থাবান ছিলেন যে তিনি দক্ষিণ ইউরোপ দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সাফল্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিশ্চিত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে খলিফা ওয়ালিদ মুসা এবং তারিককে রাজধানী দামেশকে ডেকে পাঠান।

উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের শাসনভার আবদুল আজিজের উপর ন্যস্ত করে মুসা বিজয়ীর বেশে দামেশকের পথে রওয়ানা হলেন। ইতিমধ্যে ওয়ালিদ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সোলায়মান ছিলেন তাঁরই উত্তরাধিকারী। রাজধানী বাগদাদ থেকে বেশ কিছু দূরে থাকতেই আগামী দিনের খলিফা সোলায়মানের একজন দূত মুসা ও তারিকের সঙ্গে দেখা করল। দূত জানাল যে, এই মূহূর্তে মুসার বাগদাদ যাওয়াটা ভাবী খলিফা পছন্দ করছেন না। তার ইচ্ছা, মুসা পথিমধ্যে তার যাত্রা বিলম্বিত করবেন এবং খলিফার অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় তিনি শহরে প্রবেশ করবেন। কিন্তু মুসা ছিলেন যোগ্য পিতার ন্যায়বান সন্তান। সোলায়মানের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারলেন না। মুসার এ ধরনের আচরণে সোলায়মান খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। প্রতিশোধ নিলেন খুবই নৃশংভাবে। খলিফা হওয়ার পর সোলায়মান বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মুসাকে দামেশকে অবস্থান করান। কিন্তু একবারও তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন না। বেশ কিছুদিন পর অবশেষে খলিফার দরবারে তাঁর ডাক পড়ল। সেখানে এই মহান বৃদ্ধ সেনানায়ককে ঘণ্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হল। শূন্য মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল প্রখর রৌদ্রের মধ্যে। অবশেষে মুসা যখন রাজদরবারে প্রবেশের সুযোগ পেলেন তখন খলিফা তাকে ফলের প্যাকেটের মধ্যে একটি উপহার দিলেন। সে এক হৃদয়বিদারক কাহিনী। এই প্যাকেটে ছিল তারই পুত্র আবদুল আজিজের কর্তিত মস্তক। এই ঘটনার অনতিকাল পরেই মুসা অত্যন্ত দৈন্যদশায় মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তারিক সম্পর্কিত আর কিছু জানা যায় না। এমনিভাবেই একজন অকৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাসঘাতকের ঘৃণ্য খামখেয়ালীপনা এবং নগ্ন আচরণের কারণে পশ্চিম ইউরোপ মুসলিম শাসনের বাইরে রয়ে গেল। পাল্টে দিল ইতিহাসের অমোঘ ধারাকে।

বালাত আশ-শুহাদা

(৭৩২ খ্রিস্টাব্দ)

ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা আরববাসীদের[১] অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু আন্তঃগোত্রীয় বিবাদের ক্ষেত্রে তাদের আচরণে এর প্রভাব তেমন একটা পড়েনি। ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিকে অবজ্ঞা করার কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রই মুসলমানারা মস্তবড় একটি সংকটের মুখোমুখি হয়। পারস্য, সিরিয়া এবং স্পেনে (আরবরা স্পেনকে বলতে আন্দালুসিয়া) উত্তর আরবের বনু আদনান এবং দক্ষিণ আরবের বনু কাথানদের মধ্যকার বিসংবাদ চরমে পৌঁছে। বিশেষভাবে স্পেন বিজয়ী বারবারদের উপস্থিতির কারণে এখানকার সংকট আরও জটিল আকার ধারণ করে। বারবারদের অভিযোগ ছিল যে স্পেনের মাটিতে তারাই যুদ্ধ করেছে। স্পেন মুসলমানদের দখলে এসেছে তাদের কারণে। এতদসত্ত্বেও মধ্য মালভূমির অনুর্বর শুষ্ক অঞ্চলটুকু তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ আন্দালুসিয়ার সবচাইতে উর্বর অঞ্চলটি আরব মুসলমানরা ভোগদখল করছে। বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল তাদের মধ্যকার বিবাদের মূল সূত্র।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, বিভিন্ন বংশ বা বর্ণের লোকেরা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে এক একটি জেলা বা প্রদেশে বসবাস করত। ফলে পরস্পরের মধ্যে জানা-শোনা অথবা সম্প্রীতি গড়ে উঠার তেমন কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনা ছিল না একটি একক জাতি বা একক সত্তার অনুভূতি নিয়ে আত্মপ্রকাশের।

উপরন্তু বহিরাগত মুসলমানদের চাইতে নও-মুসলিম এবং খ্রিস্টান মিলিয়ে স্পেনের আদি অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল বেশী। দিনে দিনে তাদের মনেও নতুন চেতনা দানা বাঁধে। বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদের মাঝে তারাও হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করে নিজেদের অবস্থানগত গুরুত্বের কথা। ফলে সংকটের জটাজাল আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অথচ এতকিছুর পরেও স্পেনে মুসলমানদের আধিপত্য একটানা আট শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী হয়। এবং বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হলেও এটাই বাস্তব সত্য।

খলিফা সুলায়মান তাঁর প্রথিতযশা সেনানায়ক মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন জায়েদের প্রতি ছিলেন ঈর্ষাকাতর। খলিফার নির্দেশেই মুসার ইউরোপ অভিযান বন্ধ হল। বিফলে গেল তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। খলিফার নির্দেশেই এই বিজয়ী পুরুষকে অপমান-অপদস্থ করা হল। মৃত্যুবরণ করতে হল অত্যন্ত দৈন্যদশায়। তারই ছেলে আবদুল আজীজও খলিফার নিষ্ঠুর হাত থেকে নিস্তার পেল না। খলিফার নির্দেশেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। অথচ সেই তরুণ বয়সেই তিনি ছিলেন একজন

বিচক্ষণ প্রশাসক ও সাহসী সেনানায়ক। মুসার অনুপস্থিতিতে তিনিই ছিলেন উত্তর আফ্রিকার গভর্নর। তাঁর মৃত্যুর পর পরই রাজ্যময় দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ। গভর্নর হিসেবে সা'মের নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে একই অবস্থা। সা'ম পরিস্থিতি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে আনলেও বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে পারল না। একবার তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রচণ্ড অভিযান চালান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাউলুস-এর সন্নিকটে একটি যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম বাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই দুর্যোগ মুহূর্তে তাঁর সহকারী আবদুর রহমান গাফিকী দৃঢ় হস্তে বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে বিশৃঙ্খল বাহিনীকে তিনি অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

সা'ম -এর মৃত্যুর পর 'আন বা বিন লহম'কে নিয়োগ করা হল গভর্নর হিসাবে। তিনিও দক্ষিণ ফ্রান্সে ব্যাপক অভিযান চালান এবং শত্রুপক্ষের প্রচুর বিষয়-সম্পদ হস্তগত করেন। কিন্তু সেনা শিবিরে প্রত্যাবর্তনকালে গুপ্ত বাহিনীর হাতে তিনিও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকায় আবারো অরাজক অবস্থার উদ্ভব হয়। দেশব্যাপী দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ। পাঁচ বছরে ৫ জন গভর্নর নিয়োগ করা হয়। অশান্তি ও বিশৃঙ্খল অবস্থার তবু পরিবর্তন হয় না। বরং দিন দিন যেন গৃহযুদ্ধের তীব্রতা বাড়তেই থাকে। ইতিমধ্যে সোলায়মানের শাসন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। নতুন খলিফা হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেছেন হিশাম। ৭৩১ সালে তিনি আবদুর রহমান গাফিকীকে নিয়োগ করলেন আন্দালুসিয়ার গভর্নর হিসেবে।

আবদুর রহমান ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক এবং অভিজ্ঞ সেনানায়ক। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাজ্যময় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেও উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশে তখনও গোলযোগ ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। উসমান নামের একজন বারবার ছিলেন এ অঞ্চলের শাসক। ইউরোপীর ইতিহাসে তার নামকরণ করা হয়েছে মুনুজা অথবা মুনেজ নামে। স্পেনের মাটি থেকে আরবদের উৎখাতের প্রত্যাশায় সে একুইটেন-এর শাসক ডিউক ইউডোর (ইউডস) সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ সময় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মেরোভিন গিয়ানের রাজপ্রাসাদে কার্ল (চার্লস) মেয়র হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। দিনে দিনে তাঁর ক্ষমতা এবং প্রভাব বৃদ্ধি পেতে দেখে ইউডো খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কার্লকে কোণঠাসা করে রাখার জন্য সেও অধীর আগ্রহে একজন সহযোগী খুঁজছিল। হাঙ্গামা-প্রিয় উসমানকে পেয়ে তার সে আশা পূর্ণ হল। ষড়যন্ত্রের বন্ধনকে আরও দৃঢ় এবং পাকাপোক্ত করার জন্য সে তার কন্যা ল্যামপিজিয়াকে উসমানের নিকট বিয়ে দেয়। কিন্তু নির্ভীক সেনানায়ক আবদুর রহমান মিলিত শক্তির তোয়াক্কা না করে আচমকা উসমানকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে উসমান নিহত হল। বন্দী হল তার স্ত্রী ল্যামপিজিয়া। প্রাক্তন গভর্নর বৃদ্ধ সা'মকে হত্যার প্রতিশোধ এবং ইউডোকে উচিত শিক্ষা দেয়ার আশায় আবদুর রহমান

ইউডোর রাজ্য একুই টইন-এর উপর চড়াও হলেন। কেড়ে নেন তার বিষয়-সম্পদ। বলে রাখা আবশ্যক যে, আবদুর রহমানের এ ধরনের অভিযান চালানোর পশ্চাতে প্রধান লক্ষ্য ছিল দু'টি- প্রথমত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহ থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নেয়া। দ্বিতীয়ত পরবর্তীতে সংস্কার কার্যক্রমকে আরও সহজ এবং সফল করার আশায় নিজের ভাবমূর্তিকে বড় করে তোলা।

আবদুর রহমান পূর্ব একুইটেইনে শক্তিশালী একটি দল পাঠিয়ে দেন। ইউডোর শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করাই ছিল তার লক্ষ্য। পূর্ব দিকের এই অভিযানে মুসলিম বাহিনী বেশ সফলতা অর্জন করে। দখল করে নেয় আরলে, লিওনাস এবং বেসানকন। অবশেষে তারা 'সেনস'-এর প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছে। এখান থেকে পূর্ব-দক্ষিণে প্যারিসের দূরত্ব ছিল মাত্র ১০০ মাইল। মূল বাহিনীর গভর্নর আবদুর রহমানের নেতৃত্বে পিরেনীজ-এর পশ্চিম ভাগ দিয়ে অগ্রসর হয়। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে বসন্তের শুরুতেই তিনি এই অঞ্চল অতিক্রম করেন। উভয় বাহিনী গ্যানোনী নদীর তীরে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে ইউডো সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়। অতঃপর তিনি 'বরডক্সে' অভিযান চালান। 'দরদগান' অতিক্রম করে তিনি তার বাহিনীকে কতগুলো দল-উপদলে বিভক্ত করেন। তাঁরা সারা রাজ্যময় তোলপাড় করে তোলে। অবশেষে তিনি 'পয়েটিয়ারস' শহরের প্রবেশদ্বারে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকায় কিছু সংখ্যক সৈন্যকে এখানে রেখে তিনি উত্তরের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। 'টুরস'-এর সন্নিকটে এসে তিনি জানতে পারলেন যে জার্মানীতে অভিযান শেষে কার্ল দেশে ফিরে এসেছে। অতঃপর কার্ল-এর অধীনতা স্বীকার করে নেয়ার বিনিময়ে দু'জনে (ইউডো এবং কার্ল) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। ক্লোডিসের শাসনামলেই মেরোভিনগিয়াল রাজবংশ ক্ষমতা ও শক্তির শীর্ষে পৌঁছে। ৫০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর হাতেই ভিসিগোথেরা চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়। এমনকি তারা ফ্রান্স ছেড়ে স্পেনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ৬৬৯ সাল থেকেই শুরু হয় শক্তিশালী সেই রাজবংশের অধঃপতন। উত্তরাধিকারসূত্রে যারা সিংহাসনে আরোহণ করে তারাও ছিল লম্পট, দুশ্চরিত্রের এবং অকর্মণ্য। তারা বিয়ে-শাদী করে খুবই অল্প বয়সে। ১৫/১৬ বছর এমনকি ১৪ বছর বয়সে অনেকে সন্তান-সন্ততির জনক হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের অনেকে মৃত্যুবরণ করে ২৪/২৫ বছর বয়সে। উত্তরাধিকারী হিসেবে যাদের রেখে যায় তারাও হয় দুর্বল। বলতে গেলে এভাবেই তারা রাজবংশকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। প্রধানত রাজপ্রাসাদের মেয়রই ছিল রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তারাই ছিল সেনাবাহিনীর প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। এভাবেই মেয়র-শাসকগণ মেরোভিগিয়ান রাজবংশের মধ্যে আরেকটি রাজবংশের ভিত্তি গড়ে তোলে। আবদুর রহমান যখন ফ্রান্স আক্রমণ করেন, তখন মেয়র দ্বিতীয় পেপিন-এর জারজ সন্তান কার্ল ছিল সেখানকার মেয়র। সে ছিল খুবই উচ্চাভিলাষী এবং শক্তিমান

পুরুষ। ১৮ বছরের শাসনামলে মেরোভিনগিয়ান রাজ্যের সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল করায়ত্ত হলেও ইউডোর রাজ্য একুইটেইন তখনও পুরোপুরি বশে আসেনি। আবদুর রহমান ইউডোর রাজ্য আক্রমণ করার পরই কার্ল তাকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করার মস্তবড় একটা সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু কার্ল ছিল খুবই চতুর এবং দূরদর্শী। ইউডোর বশ্যতা স্বীকার করা সম্পর্কে সে ছিল সন্ধিগ্ধ। সে কারণেই মুসলমান বাহিনী দেশটাকে পুরোপুরি পিষ্ট করার পূর্ব পর্যন্ত সুচতুর কার্ল সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করা থেকে বিরত থাকল। ইউডো যখন এককভাবে আবদুর রহমানের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, কার্ল তখন নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে। সে আরও সৈন্য সংগ্রহ করল, সুসংগঠিত করল নিজের বাহিনীকে। 'ট্রান্স রাইন'-এর যাযাবর গোষ্ঠিকেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। লুটতরাজে অভ্যস্ত উত্তরাঞ্চলেও ফরাসী এবং জার্মানীর যাযাবরেরা ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেল। নিশ্চিত হল তাদের শক্তি সম্পর্কে। চার্লস-এর নিষ্ক্রিয়তার কারণে ইউডো হতাশার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এদিকে সবাই মিলে চার্লসকে যথাশীঘ্র তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু চার্লস-এর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। সে বলল- তোমরা যদি আমার উপদেশ শুনতে চাও তা হলে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাধা দিও না। অথবা আক্রমণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তাদের গতি ও শক্তি অত্যন্ত দুর্বার ও দুর্দান্ত। খরস্রোতা নদীর ন্যায় তারা সবকিছু ভাসিয়ে যেতে পারে। তারা এখন বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে। তাদের উন্নত মনোবল এবং দৃঢ় সংকল্প আমাদের সংখ্যার আধিক্যকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। নিষ্প্রভ করে দিয়েছে সুসংহত প্রতিরক্ষা শক্তিকে। তাদেরকে আরও খানিকটা সময় দাও। তারা যুদ্ধবিরতি দিক। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সামগ্রী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠুক। কর্তৃত্ব নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হোক। এর পরই আসবে তোমাদের আক্রমণের পালা। তখন সহজেই তোমরা তাদের পরাভূত করে দিতে পারবে।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠে একজন সেনানায়ক হিসেবে কার্ল-এর চাতুর্য এবং নৈপুণ্য। সে নিজের ও শত্রুপক্ষের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ ছিল। মুসলমানদের মধ্যকার তীব্র মতবিরোধ ও মতপার্থক্যের খবরাখবর সম্পর্কে সে জানত। এবং ডিউক ইউডোর মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপর্যস্ত হওয়ার পরই সে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মুকাবিলা করার পরিকল্পনা নিল। বস্তুতপক্ষে কার্ল যে কত বড় চতুর রাজনীতিবিদ ছিল এই ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ফরাসী বাহিনীর সৈন্যরা ছিল খুবই দক্ষ এবং চমৎকার নৈপুণ্যের অধিকারী। কিন্তু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। মেরোভিনগিয়ান, একুইটেনিয়ান এবং জার্মান যাযাবর গোষ্ঠীর লোক ছিল এই বাহিনীতে। তন্মধ্যে জার্মান যাযাবরদের রণসজ্জা ছিল অদ্ভুত ধরনের। তারা যুদ্ধের সময় বাঘের চামড়া পরিধান করত।

কাঁধের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে থাকত জটপাকানো লম্বা চুল। বস্তুতপক্ষে কার্ল-এর এই বাহিনীতে কোন অশ্বারোহী দল ছিল না। তবে তাদের অনেকগুলো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াগুলো ব্যবহৃত হত যাতায়াতের কাজে। যুদ্ধের বাহন হিসেবে নয়। পদাতিক সেনাদের অস্ত্রের মধ্যে হুলবিশিষ্ট বর্শাই ছিল প্রধান। অবস্থা রিশেষে এগুলো শত্রুসেনাদের উপর ছুঁড়ে মারত, কখনো আবার শত্রুকে সরাসরি খোঁচা দিত, অথবা আঘাত করত। এ ছাড়া 'ফ্রানসিসকা' নামের একটি অস্ত্র ছিল তাদের খুবই প্রিয়। এটি মূলত নিক্ষেপণযোগ্য এক ধরনের কুঠার। কুঠারের ওজন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এর অভ্যন্তরভাগ ফাঁকা রাখার ব্যবস্থা ছিল। এগুলো দেখতে ঠিক রেড ইন্ডিয়ানদের রণ কুঠারের মত। শত্রুসেনা খুব কাছাকাছি আসার পূর্বে ফরাসী সেনারা খুবই নৈপুণ্য এবং কৌশলে এগুলো নিক্ষেপ করত। শত্রুকে ঘায়েল করতে পারত অতি সহজেই। সে কারণেই মারণাস্ত্র হিসেবে এই কুঠারটি জাতীয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। যোদ্ধারা প্রধানত ঢাল, তলোয়ার এবং ধারাল ছোরা দিয়ে শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করত। ঢালটি ছিল খুবই চওড়া। দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতির এবং চারপাশে লোহার শক্ত একটি বেড় থাকত। তলোয়ারের দু'টিকটাই ধারাল। প্রয়োজনবোধে কোপ দেয়া বা খোঁচা মারা দু'টো কাজই চলত। তলোয়ার সাধারণত ৩০ থেকে ৩৬ ইঞ্চি লম্বা। চওড়া এবং ব্লেডের মতো ধারালো ছোরাগুলো লম্বায় ছিল ১৮ ইঞ্চি।

অপরদিকে মুসলমানদের বাহিনী গড়ে উঠেছিল হালকা অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে প্রচলিত রীতি অনুসারে অশ্বারোহী সেনারা যে বর্শা ব্যবহার করেছিল-একথা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ঘটনা পরম্পরা থেকে স্পষ্ট হয় যে মুসলিম বাহিনীতে শক্তিশালী কোন তীরন্দাজ দল ছিল না। এবং সে কারণেই যুদ্ধের ময়দানে খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তাদের পক্ষে শত্রুবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। এদিক থেকে ফরাসী সেনারা অনেকখানি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কুঠার এবং বর্শা নিক্ষেপ করে তারা শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত এবং ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারত। আসলে সামগ্রিক বিবেচনায় উভয় বাহিনীর মধ্যে বড় রকমের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বাহিনী পদাতিক সেনাদের নিয়ে গড়ে উঠছিল বলে তাদের পক্ষে অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। অনুরূপভাবে মুসলিম বাহিনীরও মস্তবড় সীমাবদ্ধতা ছিল। তীরন্দাজ অথবা ভারী অশ্বারোহী দল না থাকায় তাদের পক্ষে শিবির স্থাপন করে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালান অসম্ভব ছিল। অথবা সম্ভব ছিল না ফরাসী বাহিনীর অগণিত পদাতিকের উপর কোনরকম সফল আক্রমণ পরিচালনা করা।

যুদ্ধের শুরুতে মুসলিম বাহিনীর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে মুসলিম বাহিনী যখন 'লয়েরী' নদী অতিক্রম করছিল অথবা

অতিক্রম করার উদ্যোগ নিচ্ছিল, ঠিক তখনই ফরাসী বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে। অবস্থানগত সুবিধার কথা বিবেচনা করে আবদুর রহমান তার বাহিনী নিয়ে নদীর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সরে আসেন। কার্ল কোনরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নদী পার হয়ে আসেন এবং উত্তর প্রান্তে শিবির স্থাপন করেন। এই এলাকাটি ছিল 'লাউদূন'-এর নিকটবর্তী এবং 'কেইন' ও 'ভিয়েনি'-এর মিলনস্থলে বিশাল বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তর। বিশাল এই প্রান্তরের উত্তরে 'টুরস' এবং দক্ষিণে গোয়েটিয়ার। এখানেই উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। সম্ভবত কৌশলগত বিবেচনায় মুসলিম বাহিনী ফরাসীদের তুলনায় অনেকখানি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। যুদ্ধের অবস্থা বুঝে তাদের পশ্চাদপসরণের পথটি ছিল খুবই নিরাপদ। কিন্তু এদিক থেকে ফরাসীদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। লয়েরী নদী তাদের পশ্চাদপসরণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বিবদমান পক্ষের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেণে অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ ফ্রান্স দখল করার পরিকল্পনা বা মিশন নিয়ে আবদুর রহমান অভিযান চালায়নি। বরং তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ধনসম্পদ সংগ্রহ করা। সুতরাং তার বাহিনীর কলেবর খুব বড় না হওয়াটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু গোয়েটিয়ারস এবং অন্যান্য শহর পাহারা দেয়ার জন্য কিছু কিছু সৈন্য মোতায়েন করতে হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে আবদুর রহমান তাঁর বাহিনী নিয়ে 'লয়েরী' নদীর উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ তীরে চলে আসেন। এভাবে স্থান পরিবর্তনের মূলে ছিল তার সংখ্যাস্বল্পতা। অপর দিকে ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে, কার্ল তাঁর বাহিনীর স্বল্পতার জন্য খবুই চিন্তিত ছিলেন। ধরে নিয়েছিলো যে তুলনামূলকভাবে তাঁর বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কম। কিন্তু সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস এবং যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাদের আগ্রহ দেখে তা মনে হয় না। বরং বলা যেতে পারে যে, মুসলমানদের তুলনায় ফরাসী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। সর্বোপরি, ফরাসীরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় এবং কলহবাজ। তারা যুদ্ধ করছিল নিজেদের দেশে নিজেদের মাটিতে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইউডোর বাহিনী এবং জার্মান যাযাবরেরা। ফলে সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী।

মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যরা এক লাইনে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আবদুর রহমান শিবির প্রতিরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, অথবা তাঁর হাতে কোন রিজার্ভ ফোর্স ছিল কিনা সে ব্যাপারে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নীরব। তবে একথা সত্য যে ইতিপূর্বে ফ্রান্সে অভিযান চালিয়ে তিনি দ্রব্যসামগ্রীর যে বিরাট ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন এবার তা একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো দ্রুত স্থানান্তরের অথবা নিজেদের কোন্দল বা গণ্ডগোল শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরিত্যাগ করাও সম্ভব ছিল না। ফলে মুসলিম বাহিনীর এতদিনের সহজাত ক্ষিপ্রতা হ্রাস পেল। এদিক থেকে ফরাসী

বালাত আশ শুহাদ
৭৩২
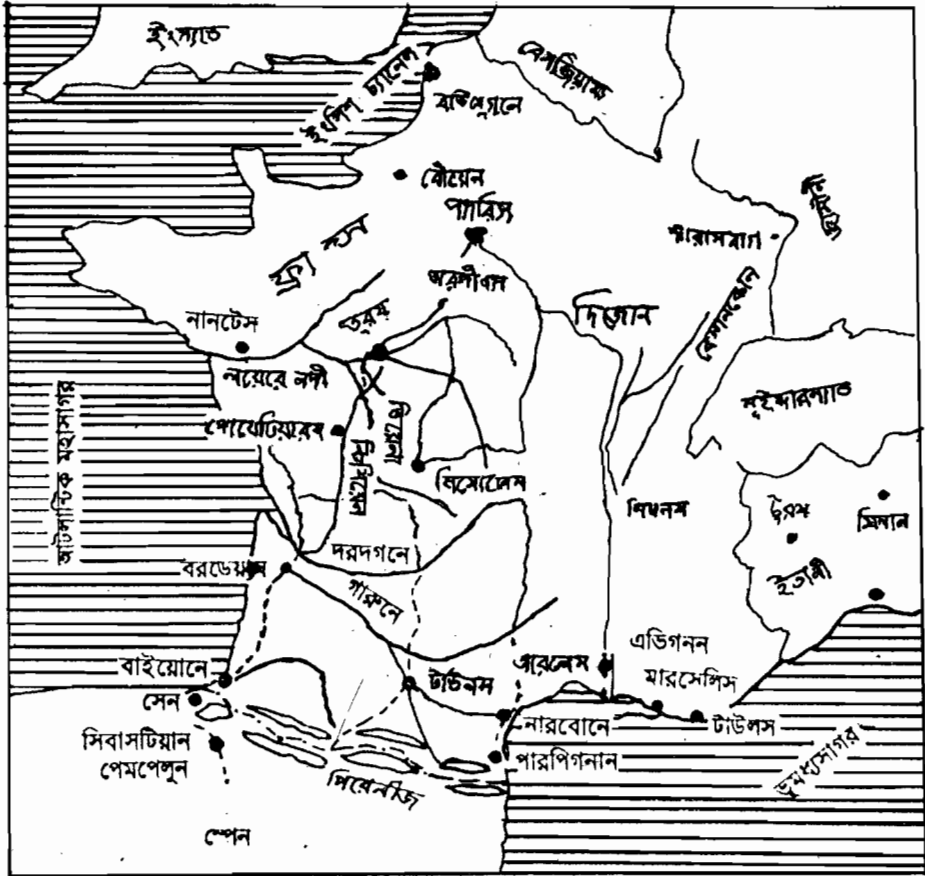
বাহিনীর কোন সমস্যা ছিল না। এমনকি রসদ সামগ্রীর ঝামেলাও ছিল কম। পদাতিক বাহিনী হিসেবে তাদের গতি ছিল মন্থর। কিন্তু তাতে একটি সুবিধাও ছিল। তারা যে কোন সময় যে কোন দিকে চলে যেতে পারত। তাছাড়া পদাতিক বাহিনীও ছিল শক্তিশালী। এমনি একটি দৃঢ় এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান থেকে ফরাসীরা মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসে থাকল।

যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেও উভয় বাহিনী নিষ্ক্রিয় থাকে। এক দিন দু'দিন করে কেটে যায় এক সপ্তাহ। অবশেষে মুসলিম অশ্বারোহীরাই প্রথম উদ্যোগ নেয়। তারা আক্রমণ চালায় ফরাসী বাহিনীর উপর। কিন্তু অশ্বারোহী সেনারা অবিরাম আক্রমণ চালিয়েও ফরাসী বাহিনীকে কাবু করতে পারল না। পরের দিন যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। অশ্বারোহী সেনারা উপর্যুপরি ফরাসীদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ এই আক্রমণের ফলাফলকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- উত্তর দিকের মানুষগুলো দেয়ালের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। গোটা সেনাবাহিনী তখন যেন একটি বরফপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বরফপিণ্ড যেন শুধু জমতে জানে, কিন্তু গলতে জানে না। একই সময়ে ফরাসী সেনারা ধারাল তলোয়ার দিয়ে মুসলিম সেনাদের হত্যা করছিল। অস্ট্রাসিয়ানরা ছিল আরও ভয়ঙ্কর। তাদের হাতে ছিল কুঠার। তুমুল যুদ্ধের মাঝে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এবং শক্ত হাতে মুসলমানদের টুকরো টুকরো করছিল। ফরাসী সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল একসাথে, একযোগে। তারা কখনও স্থান ত্যাগ করেনি, পরিত্যাগ করেনি রণসজ্জা।

ইতিমধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে-মুসলিম শিবিরে লুটতরাজ চলছে। গুজবটি ছড়াল একান্ত আকস্মিকভাবে। খবর পেয়েই মুসলিম বাহিনীর একটি দল শিবির রক্ষার্থে সেখানে ছুটে গেল। কিন্তু অন্য সৈন্যরা বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করল। তারা ভাবল-ওরা নিশ্চয়ই ফরাসী বাহিনীর হাতে পরাভূত হয়েছে। পশ্চাদপসরণ করছে আত্মরক্ষার জন্য। অতর্কিতে মুসলিম বাহিনীতে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। সেনাপতি আবদুর রহমান বিশৃঙ্খল অশ্বারোহীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। কিন্তু এলোপাতাড়ি লড়াইয়ে হঠাৎ করেই তিনি নিহত হন। প্রাচ্যদেশীয় সেনাবাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য হল-সেনা প্রধানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ফায়সালা হয়ে যায়, লড়াইয়ের অবসান ঘটে। আবদুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। ফরাসী বাহিনী এবার মুসলিম বাহিনীর খুব কাছাকাছি চলে আসে। মুসলমান অশ্বারোহীরাও মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করল। সন্ধ্যা অবধি তারা ফরাসী বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখল। রাতের আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে উভয় বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উভয় পক্ষই চলে যায় যার যার শিবিরে।

মুসলিম সেনাদের বুঝতে বাকী রইল না যে এই যুদ্ধে তাদের বিজয় সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। হতাশা ও বিষণ্ণতায় তারা একেবারে মুষড়ে পড়ল। তড়িঘড়ি করে

পরামর্শ সভা ডাকল। শত জনে শত কথা বলল। অবশেষে যা অনিবার্য ছিল তাই ঘটল। রাতের আঁধারে সমগ্র বাহিনী অতি সংগোপনে পালিয়ে গেল। পশ্চাতে রেখে গেল রুগ্ন ও আহতদের। ফেলে গেল সেনাছাউনি ও যুদ্ধসামগ্রী। এতদিনে তারা যে বিষয়-সম্পদ অর্জন করেছিল, যে বিষয়-সম্পদের কারণে তারা যুদ্ধে পরাভূত হল-সে গুলোও তারা সঙ্গে নিতে পারেনি। তার বৃহাদংশ ফেলে যেতে বাধ্য হল।

প্রতিদিনের মত সেদিন প্রত্যুষেও ফরাসী সেনারা শিবির থেকে বেরিয়ে আসে। নিত্য দিনের মত যথারীতি যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নেয়। বিপক্ষ দলের শিবির থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘ সময় পরেও কাউকে না আসতে দেখে ফরাসী সেনাদের মধ্যে সন্দেহ জাগে । তারা ভাবে -এটাও নিশ্চয়ই কিছু একটা কৌশল । ইতিমধ্যে গুপ্তচরেরা খবর দিল যে, মুসলিম শিবিরগুলো শূন্য পড়ে আছে। কেউ নেই সেখানে। কিন্তু ফরাসীরা এ কথাকে সহজে বিশ্বাস করতে পারল না। বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখার জন্য একটি দলকে পাঠিয়ে দিল। তারাও একই সংবাদ নিয়ে এল। কিন্তু এসব ব্যাপারে কার্ল ছিল খুবই সচেতন । এত কিছুর পরেও তার সন্দেহ গেল না। ফরাসী সৈন্যরা দূর থেকে বৃত্তের আকারে শিবিরটি ঘিরে ফেলল। ধীর গতিতে অতি সতর্কতার সাথে এগিয়ে গেল শিবিরের দিকে। অবশেষে তারা যখন শিবিরের একেবারে কাছাকাছি চলে এল, কাউকে দেখতে পেল না শিবিরের মধ্যে, তখন তারা বুঝল যে মুসলিম বাহিনী হেরে গেছে। পালিয়ে গেছে যুদ্ধের ময়দান থেকে। অতঃপর তারা পরিত্যক্ত শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহত ও রুগ্নদের নির্দয়ভাবে হত্যা করল। নিয়ে গেল মুসলমান সেনাদের ফেলে যাওয়া সমস্ত বিষয়-সম্পদ।

এই যুদ্ধের পর কার্ল মারটেল উপাধি ধারণ করে। পলায়নপর মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য উগ্র মেজাজের কিছুলোক কার্ল মারটেলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু কার্ল নিজের বাহিনীর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল। সে ভালভাবেই জানত যে একটি বিশৃঙ্খল পদাতিক বাহিনীর পক্ষে হালকা অশ্বারোহী ফৌজের পিছু ধাওয়া করা সম্ভব নয়। তদনুসারে কার্ল শিবির গুটিয়ে প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করল। এভাবেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল।

পরবর্তীতে টুরস-এর এই যুদ্ধের মুসলমানী নামকরণ করা হয়েছে 'বলাত আশ শুহাদা' হিসেবে। এর অর্থ শহীদানদের কবরস্থান। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরিণাম বা সংখ্যাগত ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক না কেন, বৈশিষ্ট্যগত ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বিশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীকে সংগঠিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করার আমরণ প্রচেষ্টায় আবদুর রহমানসহ অধিকাংশ অধিনায়কই নিহত হন। খ্রিস্টান অথবা মুসলমান কোন পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত পরিসংখ্যান কোথাও পাওয়া যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ টুরস-এর এই যুদ্ধকে মস্তবড় বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করলেও সংখ্যাগত কোন পরিসংখ্যান দেননি। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে এই যুদ্ধে

মুসলমানদের পক্ষে ৩,৭৫,০০০ সৈন্য মারা যায়। এর বিপক্ষে ফরাসী বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০০০। এই পরিসংখ্যানকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা বহুল নিন্দিত ধর্মীয় মতপার্থক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাকেন। তবে সামরিক বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে ফরাসীদের চাইতে মুসলিম বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা বেশী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ আর যাই হোক না কেন এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ভূমিকা ছিল আক্রমণাত্মক। তারা ফরাসীদের উপর অবিরাম আক্রমণ চালায়। যদিও অপরাজিত মুসলিম বাহিনী শেষ পর্যন্ত কোন রকম চাপের মুখে না পড়েই হঠাৎ করে যুদ্ধের ময়দান থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

মুসলমান-খ্রিস্টান সংঘর্ষের ইতিহাসে বালাত আশ শুহাদা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলেকজান্ডারের জন্য ভারতের বিপাশা নদী যেমন গুরুত্বপূর্ণ, মুসলমানদের জন্য টুরস-এর যুদ্ধও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধই পশ্চিমে মুসলমানদের অগ্রযাত্রার প্রান্তসীমা নির্ধারণ করে দেয়। এর বাইরে এই যুদ্ধের কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিগণ এই যুদ্ধের গুরুত্বকে অহেতুক বড় করে তুলেছেন। এই যুদ্ধকে তারা চিহ্নিত করেছেন ইতিহাসের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে। ঐতিহাসিক গিবন বলেছেন যে, এই যুদ্ধ পশ্চিমা দেশগুলোকে কুরআনের সামাজিক এবং ধর্মীয় বন্ধন থেকে রক্ষা করেছে। আরনল্ডের মতে এই যুদ্ধ হল মুক্তির নিদর্শন যা কয়েক শতাব্দী ধরে মানব জাতির সুখ-শান্তি নিশ্চিত করেছিল। এই যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভন শ্লোগেলের বক্তব্য আরও স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। তার ভাষায়-কর্ল মার্টেল তার তলোয়ারের সাহায্যে ইসলামের সর্বগ্রাসী ধ্বংসের হাত থেকে পশ্চিমের খ্রিস্টান দেশগুলোকে রক্ষা করেছে।

কিন্তু এই আবেগপ্রবণ ঐতিহাসিকগণ ভুলে যান, যে ইসলামকে তারা তথাকথিত 'সর্বগ্রাসী ইসলাম' বলে চিহ্নিত করেছেন, সেই ধর্মের ছত্রছায়ায় আসার পরই স্পেন কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিশ্বের দরবারে সবচেয়ে সভ্য এবং প্রগতিশীল দেশ হিসেবে এবং ইউরোপের গুরু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অথচ তথাকথিত 'মুক্তি লাভের' আট'শ বছর পরও খ্রিস্টানদের স্পেন মরুভূমির সন্তানদের[২] শাসনামলের মত বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং সামাজিক উন্নতির স্তরেও পৌঁছাতে পারেনি।

আসলে ইউরোপীয়গণ পয়শিয়ার যুদ্ধের উপর অহেতুক এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য দু'চারজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিষয়টিকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক ফিনলে বলেছেন-অহমিকাবোধের কারণেই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কার্ল মার্টেলের সফলতাকে মস্তবড় এবং গৌরবময় বিজয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ কার্ল এমন একটা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল যারা দেশ জয়ের পরিকল্পনা নিয়ে ফ্রান্সে আসেনি। তারা এসেছিল শুধুমাত্র সম্পদ আহরণের জন্য। ট্রেডোর-রোপার-এর মতে কার্ল মার্টেলের কারণে আরবরা পরাজিত হয়নি, বরং তারা পরাজিত হয়েছিল আনুষঙ্গিক প্রয়োজন এবং সহায়ক সামগ্রীর অভাবের জন্য। হিত্তি

সরাসরিভাবে ইউরোপীয়দের মিথ্যা অহমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে- আসলে টুরস-এর যুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, ফয়সালা হয়নি জয় বা পরাজয়ের। জিব্রালটার থেকে শুরু করে তারা হাজার মাইল চড়াই-উৎরাই করে পার হয়ে এসেছিল। মুসলমানরা যখন টুরস-এ পৌঁছে তখন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, নিঃশেষ হয়ে আসছিল তাদের গতি ও শক্তি। তাই সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যেতে পারে যে, টুরস-এর যুদ্ধকে মানবেতিহাসের একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করাটা একটি মিথ্যা দাম্ভিকতা বা অলস কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি এই যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী বিপর্যস্ত এবং পরাস্ত-প্রায় আরব বাহিনীকে নির্মূল করতে পারেনি। আন্দালুসিয়ায় নতুন গভর্নরের আগমনের এক বছরের মধ্যে আবার তারা তৎপর হয়ে উঠে। একুইটেইন-এর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা সংগ্রহ করে বিপুল সম্পদ সামগ্রী। ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা নরবোনীতে মুসলমানদের একটি দুর্গ দখল করতে ব্যর্থ হয়। অথচ কার্ল মার্টেল নিজেই ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। ৭৩৪ সালে তাঁরা 'এভিগনন' দখল করেন। তারও ৯ বছর পর মুসলিম বাহিনী 'লিয়নস' শহরে অভিযান চালান। নরবোনী ছিল মুসলিম সেনাদের মূল ঘাঁটি এবং এখান থেকেই সমস্ত অভিযান পরিচালনা করা হত। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ৭৫৯ সাল পর্যন্ত এখানে তাদের দখল বলবৎ ছিল।

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা একটি মহান বিজয় হিসেবে বালাত আশ শুহাদা সম্পর্কে বিতর্ক থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর কারণেই হয়ত মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল। তবু একথা সত্য যে, বিবদমান দু'টি পক্ষই হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। দু'দিনের এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে উভয় বাহিনী জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল। এবং সে কারণেই এই যুদ্ধের কলাকৌশলগুলো যত্ন সহকারে পর্যালোচনার দাবী রাখে। অবশ্য এই যুদ্ধের কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায়, তার মধ্যেও রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এবং পরস্পর বিরোধিতা। ব্যাখ্যা-বিবরণীতে অতিরঞ্জন রয়েছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। এসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে কার্ল মার্টেল একজন বিচক্ষণ সেনানায়ক হিসেবে না হলেও একজন উন্নতমানের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

কার্ল মার্টেল মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল একটি প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। ফরাসী সৈন্যরা ছিল ঐতিহাসিকভাবেই বিশৃঙ্খল। অপরদিকে জার্মান সহযোগীরা ছিল উগ্র পৌত্তলিক এবং খ্রিস্টান বিরোধী। ফরাসী বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের প্রতি তাদের তেমন একটা আন্তরিকতা ছিল না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ফরাসী বাহিনীতে ছিল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের সমাবেশ মাত্র। মুসলিম সৈন্যদের তুলনায় তাদের মধ্যে বিভিন্নতা এবং মতভেদ ছিল বেশী। কার্ল মার্টেলের কোন অশ্বারোহী দল ছিল না। যুদ্ধের পূর্বে অথবা পরে সব সময়ই এটা মস্তবড় একটা দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা দেয়। উপরন্তু বেশীর ভাগ

পদাতিক সেনাদের যুদ্ধ সজ্জা বা বর্ম ছিল না । ফলে তাদের পক্ষে অশ্বারোহী ফৌজের দুর্বার আক্রমণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সেনাবাহিনীকে সুবিধামত বিন্যস্ত না করে সংঘবদ্ধভাবে রাখতে হয়। এতে করে অশ্বারোহী মুসলমান সেনাদের দ্বারা অগ্র-পশ্চাৎ অথবা প্রান্তভাগ থেকে সহজেই আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায়। কিন্তু চমৎকার নেতৃত্বগুণে কার্ল মার্টেল এ সমস্ত অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা সহজেই কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হন। ৭৩২ সালের অক্টোবর মাসে টুরস-এর ময়দানে বিজয়সূচক এই যুদ্ধে বিবদমান পক্ষের অগণিত সৈন্যের চেয়ে কার্ল-এর ব্যক্তিত্ব বড় হয়ে দেখা দেয়। উন্নত ব্যক্তিত্বগুণেই তিনি ফরাসী সৈন্যদের উগ্রতা এবং যাযাবর সহযোগীদের অত্যাগ্রহের লাগাম টেনে ধরতে পেরেছিলেন। সমর্থ হয়েছিলেন যুদ্ধের শুরুতেই মুসলিম সেনাদের মুকাবিলা করা থেকে নিরস্ত করতে। দু'দিনের এই যুদ্ধে অশ্বারোহী মুসলিম সেনারা যখন উপর্যুপরি আক্রমণ চালাচ্ছে, তখনও ফরাসী বাহিনী ছিল সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে। অথচ পদাতিক সেনাদের অসময়ের একটি আক্রমণ হয়ত তাদের জন্য মস্তবড় বিপর্যয় ডেকে আনত। মুসলিম বাহিনী যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে গেছে, ফরাসী বাহিনী তখন মুসলমানদের ধাওয়া করলে মস্তবড় একটা বিপদের আশঙ্কা ছিল। পাল্টা আক্রমণে হয়ত তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু নেতৃত্বগুণে তিনি বিজয়ী যাযাবর গোষ্ঠীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিলেন। সর্বোপরি তিনি যেভাবে লুটতরাজে অভ্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল যাযাবরে গোষ্ঠীকে মধ্য ইউরোপে ফিরিয়ে আনেন, তা সত্যিই বিস্ময়কার। এ সবকিছুই মূলত কার্লের নেতৃত্বশৈলীর স্বাক্ষর বহন করে।

এটা স্পষ্ট যে কার্ল বড় ধরনের তেমন কোন সমরবিদ বা রণকৌশলী ছিলেন না। কৌশলগতভাবে বিপজ্জনক একটি স্থানকে যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করার মধ্য দিয়েই তার স্বাক্ষর মেলে। অবশ্য এর বাইরে কার্লের জন্য কোন বিকল্প ছিল কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে শক্তিশালী যে মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের এতখানি অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল, কার্ল-এর চমৎকার নেতৃত্বগুণেই তাদের ফ্রান্স থেকে তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

স্পেনে কয়েক শতাব্দীকালের মুসলমানদের শাসন ছিল অত্যন্ত গৌরবময় এবং দীপ্তিমান। কিন্তু সেখান থেকে মুসলমানদের নৃশংসভাবে নির্মূল করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটা একটা মর্মভেদী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। টুরসের যুদ্ধ, যা নাকি ছিল ইউরোপীয় অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য বড় রকমের প্রথম বিপর্যয়, তাকে কখনও একক এবং যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়নি। এই যুদ্ধকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে স্পেন থেকে মুসলিম শাসন নির্মূল করার প্রেক্ষাপটে। এবং সে কারণেই এই যুদ্ধটি চিত্রিত হয়েছে একটি হৃদয়বিদারী এবং মর্মস্পর্শী কাহিনী হিসেবে। যুদ্ধক্ষেত্রটির নামরকণ করা হয়েছে 'শহীদানদের কবরস্থান' বলে। তারই পাশাপাশি

আবদুর রহমানকে একজন খ্যাতিমান সেনাপতি এবং উঁচুদরের শহীদ হিসেবে স্মরণ করা হয়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন মুসলিম শাসক হিসেবে তাঁর সদিচ্ছার কোন অভাব ছিল না। যোদ্ধা হিসেবেও তিনি ছিলেন সাহসী এবং নির্ভীক হৃদয়ের অধিকারী। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাঁর এই অভিযান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তার মধ্যে একজন সেনাপতির তীক্ষ্মতা এবং বিচক্ষণতার অভাব ছিল।

একজন সেনাপতি যখন দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন মাঝেমধ্যেই তাঁকে পরস্পর বিরোধী কতগুলো প্রয়োজন অথবা চাহিদার মুখোমুখি হতে হয়। এই চাহিদাগুলোর উৎসমূলে থাকে সেনা দপ্তর এবং প্রশাসনিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা। এমতাবস্থায় কতখানি দূরদর্শিতার সঙ্গে তিনি এগুলোর গুরুত্ব নিরূপণ করলেন, সমন্বয় সাধন করলেন পরস্পরবিরোধী এই প্রয়োজনের মধ্যে তার উপরই নির্ভর করে তার সাফল্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে স্পেনে রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের সুবিধার্থে আবদুর রহমান যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত এ ধরনের একটি চিন্তাই তাঁর বিচার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয়। কারণ একটি ব্যাপক পরিকল্পনা এবং কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি চিন্তা কোনভাবেই উপযোগী ছিল না।

দক্ষিণ ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন ডিউক ইউডো এবং উত্তর-ফ্রান্সে ছিলেন কার্ল মার্টেল। শাসন ক্ষমতা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে চলছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কার্ল মার্টেলের শক্তি বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের কারণে ইউডো এতখানি ভীত ছিলেন যে, তিনি মুসলমান বারবার সর্দার উসমানের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। মৈত্রীর সম্পর্ককে দৃঢ়তর করার জন্য নিজের কন্যাকে সর্দারের কাছে বিয়ে দেন। এটা স্পষ্ট এবং অত্যন্ত পরিষ্কার যে, আন্দালুসিয়ার স্বার্থে ফ্রান্সের খ্রিস্টান শাসকদ্বয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিইয়ে রাখা জরুরী ছিল। ইউডোকে কোন ক্রমেই কার্ল মার্টেলের সঙ্গে হাত মিলানোর সুযোগ দেয়া উচিত হয়নি। উচিত হয়নি তার কাছে মাথা নত করার মত একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দেয়া। বিদ্রোহী উসমানের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন বলেই আবদুর রহমান ইউডোকে শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নেন। আবদুর রহমানের এই উদ্যোগ ছিল একান্তই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই শাস্তিমূলক অভিযানের ব্যাপকতা কতটুকু হবে, তা নির্ধারণ করাই ছিল আবদুর রহমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং মূল পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা দরকার ছিল। শাস্তির পরিমাণ কম হলে হয়ত ইউডোর উপযুক্ত শিক্ষা হত না। কিন্তু এ বিষয়টিও যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার ছিল যে, শাস্তির পরিমাণ বেশী হলে, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক কোন অভিযান চালালে মূলত তাঁকে কার্ল মার্টেলের শিবিরের দিকে ঠেলে দেয়া হবে। তিনি বাধ্য হবেন মার্টেলের সঙ্গে হাত মিলাতে।

ফ্রান্স অভিযানের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, যুদ্ধের পরে আবদুর রহমানের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ অন্যরকম হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। ভীত-সন্ত্রস্ত ইউডোকে কার্ল মার্টেলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া দরকার ছিল। সেক্ষেত্রে লিমপিজিয়াকে বন্দী হিসেবে দামেশকে না পাঠিয়ে ইউডোর হাতে তুলে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত হত। কার্ল মার্টেলের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সম্ভবত এটাই হতে পারত প্রথম পদক্ষেপ।

আবদুর রহমান যেভাবে একুইটেইনের দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাতে করে ইউডোর অন্তরে ত্রাস এবং আতংকের সৃষ্টি হয়। সে ভাবতে শুরু করে যে, এ যাত্রায় না হলেও পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা অবশ্যই একুইটেইন দখল করে নেবে। তাই বলা যেতে পারে যে, একান্ত বাধ্য হয়েই ইউডো কার্ল মার্টেলের মুখাপেক্ষী হয়। সে বাধ্য হয় কার্লের বশ্যতা স্বীকার করতে, অধীনতাপাশে আবদ্ধ হতে। অথচ কার্ল মার্টেল ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থাৎ অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে দক্ষিণ ফ্রান্সে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েই আবদুর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শাসককে একতাবদ্ধ হওয়ার পথ তৈরী করে দেন। পরবর্তীতে তারাই মুসলমানদের বিপক্ষে একটি শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে বলা রাখা আবশ্যক যে, মাত্র এক পুরুষ পূর্বে মুসলিম সেনারা যখন স্পেন দখল করে তখন কিউটার কাউন্ট জুলিয়ান গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। আন্দালুসিয়ার আরব এবং বারবাররা যদি একত্র হতে পারতো, ভুলে যেতে পারতো তাদের বিরোধ-বিসংবাদ এবং ইউডোকে যথাযথভাবে চালান যেত, তাহলে পশ্চিম ইউরোপের মানচিত্র হয়ত অন্যরকম হত। হয়ত বছর কয়েকের মধ্যে গোটা ফ্রান্স না হলেও অংশ বিশেষ এসে যেত মুসলমানদের দখলে।

যে কোন যুদ্ধের প্রথম এবং প্রধান একটি নীতি হল যুদ্ধের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা অর্জনের চেষ্টা করা। কিন্তু পয়শিয়ার এই নীতি উপেক্ষা করা হল মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের একটা প্রধান কারণ। আবদুর রহমানের ফ্রান্স অভিযানের মূল লক্ষ্যই ছিল ধনসম্পদ অর্জন করা। এমতাবস্থায় একুইটেইনের এতটা অভ্যন্তরভাগে অভিযান চালান যুক্তিসঙ্গত হয়নি। অবশ্য এই দীর্ঘ অভিযানের পেছনে দু'টো কারণ রয়েছে। প্রথম ২০০ মাইলের এই যাত্রাপথে কোথাও তাকে শক্তিশালী তেমন কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়নি। দ্বিতীয়ত পয়শিয়ার এবং টুরসে অভিযান চালান ছিল খুবই লাভজনক। কিন্তু একথা সত্য যে কার্ল মার্টেলের বাহিনী যখন টুরসের পথে অগ্রসর হয়, তখন টুরসে অভিযান চালিয়ে তার মুখোমুখি হয়ে আবদুর রহমান মস্তবড় ভুল করেছিলেন।

আবদুর রহমান যদি রাজ্য দখলের সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন, মুকাবিলা করতেন সম্মিলিত ফরাসী শক্তির, তা হলে অবশ্যই তা যুক্তিসঙ্গত হত। বলা যেত

যে, শত্রুসেনাকে নির্মূল করার জন্যই তিনি শিবির স্থাপনপূর্বক সম্মুখসমরে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু আবদুর রহমানের অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা এবং শত্রুপক্ষকে শাস্তি দেয়া। ইচ্ছে করলে অভিযানে বিরতি দিয়ে শিবির স্থাপন এবং সম্মুখসমরে লিপ্ত না হয়েও অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিনি তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারতেন। স্পেনে ফিরে যাওয়ার সময় পয়শিয়ার অথবা নরবোনের পথে অগ্রসর হলে তার অভিযান অধিকতর সহজ হত। সেক্ষেত্রে কার্ল মার্টেলের অভিযান নেহায়েত একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। আবদুর রহমানের পিছু ধাওয়া করলেও পূর্ব-মধ্য একুইটেইনে তাঁর অভিযান প্রতিহত করতে পারত না। কারণ, মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে ফরাসী পদাতিক বাহিনীর পাল্লা দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব হত না। এমনি একটি অবস্থা ফরাসীদের জন্য করুণ পরিণতি বয়ে আনত। লুণ্ঠনে ব্যর্থ হয়ে জার্মান যাযাবর সৈন্যরা ভীষণভাবে হতাশ হত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত তাদের বাহিনী। তাছাড়া একুইটেইন প্রতিরক্ষায় কার্লের ব্যর্থতার কারণে ইতিমধ্যে ইউডোর সঙ্গে কার্লের যে ফাটল ধরেছিল এবারে তা চূড়ান্ত রূপ নিত। অবশ্য ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে শিবির স্থাপনপূর্বক সম্মুখসমরে লিপ্ত হওয়াটা মুসলিম বাহিনীর জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে টুরসের সমতল ভূমির পরিবর্তে নরবোন অথবা বরডিয়ক্সের কোথাও ছাউনি ফেলা যুক্তিসঙ্গত হত। বিশেষ করে সম্মিলিত বাহিনীর পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্নভাবে ফরাসীদের মুকাবিলা করলে আবদুর রহমানের অনেকখানি সুবিধা হত।

প্রধানত দু'টি অভিপ্রায় আবদুর রহমানকে টুরসের ময়দানে ফরাসী বাহিনীর মুকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রথমত তিনি তারিকের ন্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারিকের মর্যাদায় নিজেকে ইতিহাসের পাতায় প্রতিষ্ঠা করতে। দ্বিতীয়ত, টুরস এবং পয়শিয়ার নামের দু'টি প্রধান শহরে একই সময়ে সফল অভিযান চালাতে চেয়েছিলেন। অথচ মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এই দু'টি অভিপ্রায়ের কোন সঙ্গতি ছিল না। বরং মূল লক্ষ্য থেকে সরে এসে তিনি অপরিকল্পিতভাবেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। টুরসের ময়দানে কার্ল মার্টেলকে বিপর্যস্ত করা অথবা যুদ্ধে জয়লাভের চিন্তা না করলে অনায়াসেই তিনি তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারতেন। তাই বলা যেতে পারে যে বালাত আশ শুহাদা যুদ্ধের সবচেয়ে দুঃখজনক দিক এই যে, মুসলমানদের জন্য এই যুদ্ধ ছিল একেবারেই অর্থহীন, একান্তই অনাবশ্যক।

টুরসের যুদ্ধের বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলে যুদ্ধের কৌশলগত বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা দুষ্কর। তবে যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ থেকে মুসলিম সেনাধ্যক্ষ আবদুর রহমানের মস্তবড় কতগুলো ভুল-ক্রটি সহজেই শনাক্ত করা যায়। প্রথমত, বিরোধী শক্তির চোখের সামনে দিয়ে নদী অতিক্রম করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ

কাজ। এমনকি একটি সুশিক্ষিত এবং সুসংগঠিত বাহিনীর জন্য এটা দুরুহ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ফরাসী বাহিনীর লয়েরী নদী অতিক্রম করা ছিল আরও কঠিন। আবদুর রহমান যদি লয়েরী নদীর তীর ধরে কয়েকটি পারাপারের স্থানে প্রহরার ব্যবস্থা করতেন তাহলে ফরাসী সেনারা সহজে নদী অতিক্রম করতে পারত না। এ ধরনের কোন উদ্যোগ নিলেও তা বিলম্বিত হত, মুসলমান সেনারা অনায়োসেই তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে পারত। এভাবেই দুর্বল করে দিতে পারত তাদের উদ্যম এবং মনোবলকে। কিন্তু এ ধরনের কোন উদ্যোগ না নিয়ে তিনি ভিন্ন পথে পা বাড়ালেন। তিনি অবতীর্ণ হলেন সম্মুখসমরে। স্থির করলেন যে প্রথম আঘাতেই শত্রুসেনাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিতে হবে। এর পরেই আসবে টুরস এবং পায়শিয়ার-এর সম্পদ সংগ্রহের পালা। তারপরই তিনি বিজয়ীর বেশে ফিরে যাবেন স্পেনে। অথচ তার এই পরিকল্পনাটি ছিল দাম্ভিকতায় ভরা। বাস্তবের সঙ্গে খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ অভিযান চালিয়ে আবদুর রহমান প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন। এই সম্পদ বিনষ্ট হওয়ায় অথবা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সামান্য সম্ভাবনা দেখা দিলেও যে মুসলিম সেনারা বিগড়ে যাবে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাদের আচরণ ও শৃঙ্খলায় আবদুর রহমান তা বুঝে উঠতে পারেননি। এটাও ছিল সেনাপতি আবদুর রহামনে মস্তবড় একটা ক্রটি।

আসলে শিবিরের চারপাশে পরিখা খনন করে সঞ্চিত সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। যেহেতু সাধারণ সৈনিকেরা সম্পদকে বড় করে দেখেছিল, সেহেতু সম্পদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সৈনিকদের নিশ্চিত করা উচিত ছিল। তাহলে শিবির লুট-পাট হয়ে যাওয়ার মত একটি ভিত্তিহীন গুজব রটতে পারত না। সৃষ্টি হত না ভুল বোঝাবুঝির। আবদুর রহমানের পূর্বসূরী সা'ম এবং আনবা-এর অভিযানগুলো যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, তা থেকে আবদুর রহমানের এই শিক্ষাটুকু নেয়া উচিত ছিল। বোঝা দরকার ছিল যে, তাদের অর্জিত সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলেই তাদেরকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় পেয়ে বসবে। হয়ত আবারও মুসলিম বাহিনীর উপর নেমে আসবে স্বাভাবিক বিপর্যয়।

তৃতীয়ত, আবদুর রহমান তাঁর নিজস্ব বাহিনী এবং ফরাসী সেনাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে দেখেননি। পরিমাণ করেননি তাদের দুর্বলতাকে। এটাই ছিল আবদুর রহামনের সবচেয়ে বড় কৌশলগত ব্যর্থতা। কার্ল মার্টেলের ফরাসী বাহিনীর চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- ক. ফরাসী বাহিনীর মধ্যে প্রচুর বিভিন্নতা ছিল, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি-সৌহার্দ ছিল খুবই সামান্য। তন্মধ্যে ইউডোর সৈন্যদের অবস্থা ছিল বেশী শোচনীয়। মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়ে তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। খ. ফরাসী বাহিনী কেবল হালকা পদাতিক সেনাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। উপরন্তু

তাদের তেমন কোন যুদ্ধ সাজ বা যুদ্ধ পোশাক ছিল না। স্থির ও নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে অশ্বারোহী বাহিনীর মুকাবিলা করার মত সামর্থ্য তাদের ছিল। কিন্তু প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হওয়া অথবা পলায়নপর শত্রুর পিছু ধাওয়া করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, তাতে করে বাহিনীর প্রান্তসীমা অথবা পশ্চাৎভাগের সেনারা সহজেই মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারত। সুতরাং ফরাসী বাহিনীর দ্বারা দ্রুতগতিসম্পন্ন মুসলিম বাহিনীর আক্রান্ত বা শঙ্কিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। গ. ফরাসী বাহিনীর দূরপাল্লার অস্ত্রগুলোর একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। জ্যাভেলিন, ফ্রানসিসকা, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র বড়জোর ১০০ গজ পর্যন্ত ছুঁড়ে মারা যেত। ঘ. একথা সত্য যে ফরাসী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কার্ল মার্টেল একজন বড় নেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের কতগুলো দুর্বল দিকও ছিল। সম্ভবত স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন ও হিসাবী। বড় রকমের কোন ঝুঁকি নেয়া, অসম সাহসিকতার সঙ্গে কোন ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া তাঁর সইত না। তাছাড়া ফরাসী বাহিনীর মধ্যকার বিভেদ সম্ভবত এই বিষয়গুলো তাঁকে আরও নিস্পৃহ করে তুলেছিলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে রণকৌশল নির্বাচন না করে আবদুর রহমান মস্তবড় ভুল করেছিলেন।

যে বাহিনী কেবল পদাতিক সেনাদের নিয়ে গঠিত, একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের পরাস্ত করারও কতগুলো কলাকৌশল আছে। তন্মধ্যে চারটি কৌশলই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১. একপক্ষের পদাতিক বাহিনী যদি অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং শত্রুপক্ষের পদাতিক সেনাদেরকে যুদ্ধ এবং অস্ত্র নিক্ষেপে ছাড়িয়ে যেতে পারে কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই শত্রুসেনাদের যুদ্ধের ময়দান থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর কোন পদাতিক সৈন্য ছিল না। ২. ভারী অশ্বারোহী দল বর্ম সজ্জিত থাকলে শত্রুর আঘাতকে উপেক্ষা করতে পারে। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে। কিন্তু হালকা অশ্বারোহী দলের এই সুবিধাটুকু নেই। তাদেরকে শত্রুর খুব কাছাকাছি এসে যুদ্ধ করতে হয়। শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কোথাও কোন ফাটল ধরাতে পারলেও দৃঢ়চেতা। পদাতিকেরা অল্পতেই তা পুষিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীতে ভারী কোন পদাতিক দল ছিল না। ৩. অশ্বারোহী তীরন্দাজদের দিয়েও পদাতিক সেনাদের পরাভূত করা যেতে পারে। অশ্বারোহী তীরন্দাজেরা শত্রুসেনাদের আক্রমণ সীমানার বাইরে থেকে চমৎকার এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে পদাতিক সেনাদের উপর তীর নিক্ষেপ করে। অবিরাম তীরবর্ষণ করেই তারা শত্রুসেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু সেনাপতি আবদুর রহমানের অশ্বারোহী তীরন্দাজ দল ছিল না। ৪. এমনকি হালকা অশ্বারোহীদের দ্বারা পদাতিক সেনাদের পর্যুদস্ত করাও বিচিত্র কোন ব্যাপার নয়। তবে উপর্যুপরি শত্রুসেনাদের সম্মুখভাগের উপর আক্রমণ করে তা সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে অশ্বারোহী দলকে খানিকটা ভিন্ন পথে এগুতে হয়। আঘাত হানতে হয় পদাতিক সেনাদের প্রান্তভাগ এবং পশ্চাৎদিক থেকে। এই আক্রমণ হবে নিরবচ্ছিন্ন এবং দৃঢ়তাপূর্ণ। কখন কোন মুহূর্তে শত্রু বিচলিত হবে, কোথায় দেখা দিবে দুর্বলতা- তারই সন্ধানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হবে।

অথার্ৎ হালকা অশ্বারোহী সেনারা শত্রুসেনাকে বলতে গেলে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। অশ্বারোহী সেনারা যদি দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়, তাহলে কোনরকম ঝুঁকি বা বিপদাশংকা ছাড়াই বড়সড় একটা পদাতিক বাহিনীকে অনায়াসে ঘিরে ফেলতে পারে। উপরন্তু, একজন সুচতুর সেনানায়ক যদি পদাতিক বাহিনীকে নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করতে পারেন, তা হলে তো আর কথাই নেই। অশ্বারোহী সেনারা তখন অতি সহজেই পদাতিক বাহিনীকে পরাস্ত করে ফেলতে পারে। বস্তুতপক্ষে এই একটি পন্থা অবলম্বন করে আবদুর রহমান কার্ল মার্টেলকে পরাভূত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ কৌশলটি অবলম্বন করেননি। তিনি শত্রুপক্ষের সম্মুখভাগ দিয়ে একটানা আক্রমণ চালিয়েছেন। অথচ স্পষ্টতই শত্রুপক্ষ ছিল অধিকতর শক্তিশালী। অশ্বারোহী সেনারা তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত রাখে। বস্তুতপক্ষে সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠতা এবং নিষ্ঠার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। এবং সে কারণেই মুসলিম সেনারা সেনাপতি আবদুর রহমানের নেতৃত্বের চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং প্রতিভাবান নেতৃত্বের দাবীদার।

মানজিকার্টের যুদ্ধ

(১০ আগস্ট ১০৭১)

আব্বাসীয় খিলাফতের জন্য দশম শতাব্দী ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ। এই শতাব্দীতেই বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে খণ্ড-বিখণ্ড হতে শুরু করে। প্রদেশগুলো একে একে বাগদাদের শাসনক্ষমতার বাইরে চলে যায়। শিয়া মতাবলম্বী ফাতেমীয়রা ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সময়ে মিশর, প্যালেস্টাইন এবং লেবাননে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয়রা ছিল সুন্নী মতের অনুসারী। ফাতেমীয়রা প্রায়ই রোমানদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করত। আব্বাসীয়দের সঙ্গে বিরোধিতা করতে গিয়ে রোমানদের সঙ্গে গড়ে তুলত সহযোগিতার সম্পর্ক। অবশ্য এ সময়ে আব্বাসীয় খলিফা নামেমাত্র শাসক ছিলেন। ইরান বংশোদ্ভূত শিয়া প্রধানগণ ছিলেন খলিফাদের প্রকৃত অভিভাবক বা রাজপ্রতিনিধি। বস্তুতপক্ষে খলিফাগণ ছিলেন এদের হাতে বন্দী। সে যাই হোক, খলিফা এবং রাজপ্রতিনিধি উভয়েই পরস্পরকে ধর্মদ্রোহী বলে মনে করত। এই সময়ে রোমানরাও বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে। বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের যে প্রদেশগুলো আরবরা এক সময়ে দখল করে নিয়েছিল, এবার তারা বলপূর্বক সেগুলো দখল করে নেয়। মুসলমানদের অমিততেজ এবং শক্তিকে হালকাভাবে দেখে, বলতে গেলে উপেক্ষা করতে শুরু করে। মুসলমানদের বিরোধিতা করা, সময়-সুযোগ পেলেই মুসলমানদের আক্রমণ করা তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে তারা সিলিসিয়া এবং এন্টিয়ক দখল করে নেয়। অতঃপর তারা আলেপ্পো এবং ত্রিপলীকে করদরাজ্যে পরিণত করে। ১০৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী 'ইডেসাহ'সহ উত্তর ইরাক রোমানদের দখলে চলে যায়। ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে দখল করে নেয় আর্মেনিয়ান সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চল। ট্রজানের পরে যে সমস্ত সম্রাট এসেছেন, তাদের আমলে যা হয়নি, নবম কনসটেনটেইন-এর আমলে তাই হল। পূর্বদিকে তার রাজ্যের সীমানা বেড়ে গেল বহুদূর পর্যন্ত। এ নিয়ে সম্রাট কনসটেনটেইনের অহমিকার অন্ত ছিল না। এরপর থেকেই খ্রিস্টান শক্তি অগ্রপ্রায় মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর চড়াও হয়। ঠিক সে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আরেকটি ঘটনা ঘটে। ইসলামের নয়া প্রতিরক্ষাকারী হিসেবে আরেকটি শক্তির উদ্ভব ঘটে। এরা ছিল এককালে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী মধ্য এশিয়ার সেলজুক সম্প্রদায়।

তুর্কীস্তানের 'ঘুজ' গোত্রের সর্দার ছিলেন সেলজুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবত মঙ্গোল্ বংশোদ্ভূত পূর্বাঞ্চলীয় জনগোষ্ঠীর দ্বারা বিতাড়িত হয়েই তিনি বুখারায় চলে আসেন। গোত্রের অন্যরাও চলে আসে তার সঙ্গে। এরা ছিল অসভ্য, মূর্খ এবং যাযাবর শ্রেণীর। তারা যখন ট্রান্সঅকসিয়ানায় প্রবাস জীবন কাটাচ্ছিলেন, তখন এই অঞ্চলটি ছিল সামানিদ রাজবংশের অধীনে। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে এ অঞ্চলে বড় রকমের একটি পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়ে তুর্কী সর্দারগণ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। সামানিদ রাজবংশের পতনের পর ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হয়। সুলতান মাহমুদ গজনী তাদের অভিযানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করলেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের পর পরই সেলজুকরা আবার সচল হয়ে উঠে। মাহমুদের উত্তরাধিকারী ছিল খুবই দুর্বল। সেলজুকদের সঙ্গে পরাস্ত হয়ে তারা ভারতীয় অঞ্চলের দিকে পালিয়ে গেল। হিন্দুকুশ পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে জুড়ে ছিল গজনী রাজ্য। এই অঞ্চলটি দখল করার পর সেলজুকরা ইরান অঞ্চলে প্রবেশ করে। সেলজুকরা ছিল সুন্নী মুসলমান। সে কারণেই আব্বাসীয় খিলাফতের পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত জানান হয় এবং এদের গ্রহণ করা হয় খিলাফত রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আনুষ্ঠানিকভাবে তুঘরিলের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। ঘোষণা দেন যে তুঘরিল হলেন পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সুলতান। ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দে তুঘরিলের ইন্তেকালের পর তারই ভাইয়ের ছেলে আল্প-আরসালান হলেন নতুন সুলতান।

আব্বাসীয় খিলাফতের রক্ষক হিসেবে সেলজুকরা অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর-পশ্চিমে তিনটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতের মুখোমুখি হয়। মিশরকেন্দ্রিক ফাতেমীয় শক্তি তখন প্যালেস্টাইন এবং উত্তর-পশ্চিম সিরিয়া শাসন করছিল। শিয়াদের হাত থেকে এই অঞ্চলটি মুক্ত করে সেখানে আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেলজুকদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ অন্য দিকে মোড় নিল। সেলজুকদের সঙ্গে ফাতেমীয়দের এই টানাপড়েনে রোমানরা ফাতেমীয়দের সমর্থন দিল। তাছাড়া একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি হিসেবে শিয়া অঞ্চলে সেলজুকদের আবির্ভাবকে রোমানরা কখনও সুনজরে দেখতে পারেনি। এ কারণেই উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি ও সংঘাতের সূত্রপাত ঘটল।

পূর্ব-মধ্য আনাতোলিয়ার বিরাট অঞ্চল জুড়ে আর্মেনিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে উঠে-ছিল। তখনকার রাজা ছিল খ্রিস্টান। রোমান সম্রাট ভাবতেন, আর্মেনিয়া তারই প্রভাবাধীন একটি অঞ্চল। এবং খ্রিস্টান রাজার দুর্বলতার সুযোগে এতদঞ্চলের কিছু কিছু অংশ দখল করতে শুরু করেন। আর্মেনীয় সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তুঘরিল কখনও কোনরকম সক্রিয় উদ্যোগ নেননি। কিন্তু আনাতোলিয়ার দক্ষিণ সীমান্তের তুর্কী সর্দারগণ বেশ খানিকটা তৎপর হয়ে উঠেন। দখল করে নেন কিছু অংশ। উল্লেখ্য,

এই সর্দারগণই পরবর্তীতে গাজী আমীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান রাজা পড়ে গেলেন উভয় সংকটে। রোমান অথবা তুর্কী সর্দার কারও সঙ্গেই বোঝাপড়া করার মত যোগ্যতা খ্রিস্টান রাজার ছিল না। ভেবে-চিন্তে, সলা-পরামর্শ করে তিনি তাউরুস পর্বতমালার সন্নিকটে একটি অঞ্চলের বিনিময়ে এই সাম্রাজ্যটি রোমান রাজার হাতে তুলে দেন। কৌশলগত দিক বিবেচনা করে তুঘরিল অথবা আল্‌প-আরসালান কেউ উত্তর দিকে রাজ্য সম্প্রসারণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। সেলজুক এবং রোমান সাম্রাজ্যের মাঝখানেই ছিল আর্মেনিয়া সাম্রাজ্য। দুই বৃহৎ রাজ্যের মাঝখানে আর্মেনিয়ার অবস্থা ছিল বাফারস্টেটের মত। সেলজুকরা এতে বেশ খুশী ছিল। কিন্তু আর্মেনিয়া সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে পূর্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হল। দু'দিন আগে অথবা পরে যখনই হোক না কেন উভয় শক্তির মধ্যে সংঘাত ও সংকট অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। ইতিমধ্যে সেখানে আরেক কাণ্ড ঘটে যায়। আর্মেনিয়ার যেসব অঞ্চলে তখনও রোমানরা শাসন কায়েম করেনি সেসব এলাকায় শাসন শূন্যতা প্রকট হয়ে উঠে। এই সুযোগে গাজী আমীর বা তুর্কী সর্দারগণ সেসব এলাকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করে। ১০৬৭ খ্রিস্টাব্দে তারা আর্মেনিয়া সাম্রাজ্যের প্রাক্তন রাজধানী সেবাসটিয়া (আধুনিক সিভাস) দখল করে নেয়।

গাজী আমীরদের উৎখাত করার জন্য রোমানরা তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নিতে পারল না। তাদের শাসন ক্ষমতার রদবদল ছিল এর প্রধান কারণ। ১০৬৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট দশম কনসটানটেইন মারা যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে তারই পুত্র অষ্টম মাইকেলকে বসান হল সম্রাটের সিংহাসনে। কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। তার মাতা ইউডোসিয়া তার পক্ষ হয়ে শাসন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মাত্র এক বছরের মাথায় রোমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রোমেনাস ডিওজেনেসকে তিনি বিয়ে করেন। এবং সেই সূত্রে রোমেনাস হলেন সাম্রাজ্যের সহ-সম্রাট। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা এবং নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। কিন্তু তিনি যে পরিস্থিতির মধ্যে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, সে পরিস্থিতিতে দেশের জন্য একজন প্রতিভাবান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসকের খুব বেশী প্রয়োজন ছিল।

রোমেনাস অত্যন্ত সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার সাথে অবস্থার মুকাবিলা করলেন। রোমানদের ঐতিহ্যগত ধারায় তিনি কূটনৈতিক খেলা শুরু করলেন। সেলজুক সাম্রাজ্যভুক্ত উত্তর সিরিয়ায় বেশ কিছু ফাতেমীয় বসবাস করত। রোমেনাসের প্ররোচনায় তারা বিদ্রোহ করল। যথাসময়ে আল্‌প-আরসালান জেনে গেলেন এই বিদ্রোহের কথা। বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি সহসা ছুটে এলেন আলেপ্পোতে। তিনি যখন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, ঠিক তখন তিনি এগিয়ে আসছেন 'লেকভেন'-এর দিকে। পূর্ব আনাতোলিয়া দখলের কোন ইচ্ছাই হয়ত আল্‌প

আরসালান-এর ছিল না। কিন্তু যে অঞ্চলটি রোমানরা দখল করে নেবে-আল্‌প আরসালানের তা ভাল লাগল না। তাছাড়া সেলজুক সালতানাতের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুর আক্রমণ থেকে সালতানাতকে রক্ষা করার জন্য সেলজুক এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যকার সীমারেখা উত্তর ইরাকের পর্বতমালার অপর প্রান্তে নির্ধারিণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। এর ফলে সীমান্ত থেকে বাগদাদের অবস্থানও হবে অধিকতর নিরাপদ। রোমানরা দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়া দখল করে নিল, তুর্কী সালতানাতের জন্য সেটা হল খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ, সোজা দক্ষিণ দিকে অভিযান চালিয়ে তারা দিন কয়েকের মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে পারবে। ফলে সিরিয়া রোমান এবং ফাতেমীয়দের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে যাবে। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্রোহী ফাতেমীয়দের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য রেখে আল্‌প আরসালান লেকভেন -এর দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

রোমেনাস বাইজানন্টাইনের সামরিক সড়ক ধরে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করলেন। আর্মেনীয় অঞ্চলে অনেকগুলো সামরিক দুর্গ ছিল। দক্ষিণ সীমানা থেকে তুর্কী বাহিনীর আগমনের পূর্বেই এই দুর্গগুলো করায়ত্ত করা এবং আরও সুসজ্জিত করাই ছিল তার লক্ষ্য। পরিকল্পনা অনুসারে ইউফ্রেটিস নদীর উজানে দক্ষিণ তীর ধরে তিনি চলে এলেন আর্মেনিয়ায়। মানজিকার্ট-এর কাছাকাছি এসে তিনি তাঁর বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। একটি দল নিয়ে তিনি চলে এলেন মানজিকার্টে। অন্য দলটি পদাতিক সেনাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তাদেরকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন লেকভেন-এর নিকটবর্তী শহর আখলাতে। আগে থেকে সেখানে কিছু রোমান সৈন্য অবস্থান করছিল। এদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা নিলেন। মানজিকার্টে এসে রোমেনাস এবার খানিকটা দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে যান। মানজিকার্টে থেকে তিনি খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে আসেন। এককভাবে তুর্কী বাহিনীর মুকাবিলা না করে লেকভেনে অবস্থানরত বাহিনীর সমন্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু রোমেনাসের চেয়ে আল্‌প-আরসালানের গতি ছিল অধিকতর দ্রুত। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই আল্‌প আরসালান পৌঁছে গেলেন যথাস্থানে। সেলজুক সেনারা রোমানদের গতিরোধ করে দাঁড়ান। বাধ্য করল মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে।

ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে মানজিকার্টের এই যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে দুই লাখ অশ্বারোহী সৈন্য অংশ নেয়। সেলজুকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর অর্ধেক।

কিন্তু এই তথ্যের উপর বড়-একটা নির্ভর করা যায় না। স্পষ্টতই এতে যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। আধুনিককালের ঐতিহাসিকগণের হিসাব অন্য রকম। তারা মতপ্রকাশ করেন যে, সম্রাট নিজে কোন বাহিনীর অধিনায়কত্ব করলে যে বাহিনীতে মোটামুটিভাবে সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য অংশ নিত। তারা আরও মন্তব্য করেছেন যে, মানজিকার্টের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রোমানদের বাহিনীটি ছিল খুবই বড়।

যুদ্ধের বিপক্ষ দল অর্থাৎ তুর্কী বাহিনী অবশ্যই আরও ছোট ছিল এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমত আল্‌প-আরসালান শুধুমাত্র প্রতিরক্ষার জন্য এসেছিলেন। আক্রমণের জন্য নয়। দ্বিতীয়ত তাঁকে আসতে হয়েছিল অল্প সময়ের নোটিশে এবং খুবই তাড়াহুড়া করে। ফলে সালতানাতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত সিরিয়ায় ফাতেমীয় বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কিছু সৈন্য রেখে আসতে হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পায়। তাই বলা যেতে পারে যে, মানজিকার্টের এই যুদ্ধে রোমেনাস বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের সমস্ত সামরিক শক্তি দিয়ে সেলজুকদের শক্তিশালী একটি বাহিনীর সঙ্গে লেকভেন-এর কাছে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

বলতে গেলে উভয় বাহিনী সম্পূর্ণ রূপে অশ্বারোহী সৈন্যদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে রোমান বাহিনীর সকলেই ছিল ভারী অশ্বারোহী সৈন্য। তারা মাথায় লোহার টুপি পরত। গায়ে দিত আত্মরক্ষামূলক লম্বা জামা। তাছাড়া হাতে এবং পায়ে সুদীর্ঘ আবরণ ব্যবহার করত। এমনকি তাদের ঘোড়াগুলো চমৎকারভাবে সাজান হত। গলায় থাকত স্টীলের ললাট-বন্ধন। যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ছিল প্রশস্ত তলোয়ার, ধারাল ছোরা, ধনুক ও তীর এবং লম্বা বর্শা। হাতাহাতি যুদ্ধের জন্য অশ্বারোহীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কুঠার সঙ্গে রাখত। কিন্তু আল্‌প-আরসালানের দলে কোন ভারী অশ্বারোহী সৈন্য ছিল না। তারা সবাই ছিল হালকা অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত। দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী তীরন্দাজদের দক্ষতাই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন এবং শক্তির প্রধান উৎস। আল্‌প-আরসালানের যুদ্ধ কৌশল ছিল অতি সাধারণ। সমুদ্রের ঢেউ যেমন একটির উপর আরেকটি আছাড় খায়, একটি আরেকটিকে অনুসরণ করে, বিরামহীনভাবে সেলজুক অশ্বারোহী তীরন্দাজরাও তেমনিভাবে রোমান বাহিনীর উপর অবিরাম আক্রমণ চালায়। সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তো। পরক্ষণেই নিরাপদে ডানে-বামে সরে পড়ত। রোমানরা তাদের আক্রমণ করার ফুরসত পর্যন্ত পেত না। তুর্কীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে

আক্রমণ চালাত। তাদের গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। তারা হঠাৎ করে শত্রুর উপর চড়াও হত, আবার সরে পড়ত চোখের পলকে। তাদের লক্ষ্য ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু তাদের নিশানা ব্যর্থ হত না। তীরগুলো স্থির দাঁড়িয়ে থাকা শত্রুসেনাদের উপর ঠিকই আঘাত হানত। ভারী অশ্বারোহী রোমান সেনারা সেলজুকদের হালকা অশ্বারোহী দলকে আক্রমণ করেও সুবিধা করতে পারত না। শত্রুসেনাদের মধ্যে খানিকটা শৈথিল্য দেখা দিলেই সেলজুকরা স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হত। আক্রমণ এবং পশ্চাদপসরণ কৌশল অবলম্বন করে ভারী অশ্বারোহী সেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। শত্রুসেনারা যখন দুর্বল হয়ে পড়ত, বাহিনীর মধ্যে দেখা দিত বিশৃঙ্খলা, সেলজুকরা তখন আরও প্রবলবেগে আক্রমণ চালাত। মানজিকার্টের যুদ্ধে আল্‌প-আরসালান এই সহজ কৌশলটি অবলম্বন করে চমৎকার সুফল পেয়েছিলেন।

অশ্বারোহী তীরন্দাজদের আক্রমণের মুখে রোমেনাস মস্তবড় সমস্যায় পড়ে যায়। কিছু একটা বিকল্প বের করা জরুরী হয় পড়ে। একটু যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করলে রোমেনাস অবশ্য সহজ পথ পেয়েও যেতে পারত। স্বনামধন্য লিও-এর রচনাতেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সেলজুকদের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত সামরিক ম্যানুয়েলে উল্লেখ করেছেন যে, গুপ্ত বাহিনী এবং আকস্মিক আক্রমণের ব্যাপারে সাবধান থেক, প্রান্তদেশ অথবা পশ্চাদভাগকে অরক্ষিত রেখে কখনও যুদ্ধ করো না। যতদূর সম্ভব যুদ্ধে পদাতিক সেনাদের ব্যবহার করবে, সেনাবাহিনীকে কখনও বিভক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না।

রোমেনাস অবশ্যই একজন সাহসী এবং অভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন উগ্র স্বভাবের। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি পদাতিক সেনাদের হেয় প্রতিপন্ন করে ভুল করেছেন, দুর্বল করে দিয়েছেন রোমান শক্তিকে। আর্মেনিয়া অঞ্চলের আখলাতেই ছিল সেলজুকদের সর্বশেষ ঘাঁটি। সেই ঘাঁটি দখল করার জন্য তিনি তাঁর পদাতিক সেনাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আর্মেনিয়া থেকে পদাতিক সেনাদের মানজিকার্টে ডেকে পাঠান। কিন্তু তাদের যুদ্ধের ময়দানে আসার পূর্বেই আল্‌প-আরসালান তার বাহিনীসহ রোমেনাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেবলমাত্র অশ্বারোহী বাহিনী নিয়েই রোমেনাস সেলজুকদের মুকাবিলা করতে বাধ্য হয়।

ঝানু দাবা খেলোয়াড়রা যেমন চমৎকার নৈপুণ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে বসে, রোমেনাস এবং আল্‌প-আরসালানও তেমনি অসম সাহসিকতা এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কখন কিভাবে যুদ্ধ করতে হয় তাঁরা তা জানতেন। তাঁরা জানতেন পরস্পরের কলা-কৌশল, সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। দাবা খেলায় খেলোয়াড়ের ব্যক্তিত্ব যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনিভাবে যুদ্ধের ময়দানে অধিনায়কের উপর যুদ্ধের ফলাফল অনেকখানি নির্ভরশীল। রোমেনাস অন্যায়ভাবে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। সর্বোপরি, সম্রাট

মানজিকারটের যুদ্ধ
১০৭১
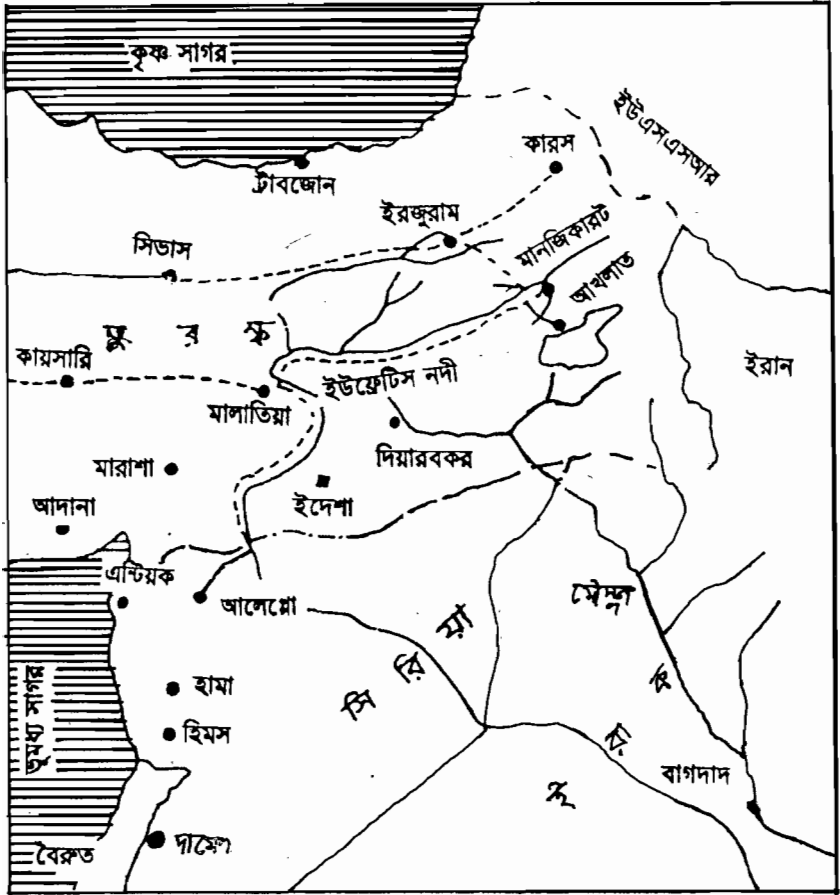
১ ইঞ্চি=১২৫ মাইল

কনস্টান্টটাইনের বিধবা পত্নীকে বিয়ে করে রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। কনস্টানটাইনের নাবালক পুত্র মাইকেল-এর অভিভাবক এবং সহযোগী হিসেবে রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেন। রোমেনাস যেভাবে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন, দেশের আরও অনেকের সেভাবে রাজদণ্ড গ্রহণ করার মত যোগ্যতা ছিল। ফলে অন্যান্য যোগ্য যুবরাজরা তাকে অবজ্ঞা এবং ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করে। সেকারণেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার জন্য প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করা তার জন্য জরুরী ছিল। রোমেনাস ভালভাবেই জানতেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে তার সুখ-স্বপ্নেও হয়ত নেমে আসবে বিপর্যয়। ফলে সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকেই তাকে অবিরাম সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েই কেটে যায় তার তিনটি বছর।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে আল্‌প-আরসালানের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর এ ধরনের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। ইসলামের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। আব্বাসীয় খলিফা তার চাচা তুঘরিলের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেলজুকদের একটি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণেই আব্বাসীয় খিলাফতে সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং আল্‌প-আরসালান এত দ্রুতগতিতে মানজিকার্টের ময়দানে হাযির হন যে রোমেনাস তার পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অবকাশ পায়নি। রোমেনাসের বিরুদ্ধে আল্‌প-আরসালানের এটাই ছিল প্রথম বিজয়। তাছাড়া বড় রকমের বিজয় অর্জনের কোন পরিকল্পনা নিয়ে আল্‌প-আরসালান যুদ্ধের মাঠে আসেননি। আর্মেনীয় সীমান্তকে অরক্ষিত রেখে উত্তর সিরিয়ার বিদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি আর্মেনীয় সীমান্তকে বিপদমুক্ত করার জন্য মানজিকার্টে ছুটে আসেন। যুদ্ধের ময়দানে এসেই তিনি শান্তির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু রোমেনাসের চিন্তা-ভাবনা ছিল অন্যরকম। রাজধানী থেকে যুদ্ধযাত্রার সময় থেকেই তিনি অনেক উচ্চবাচ্য করেন, নানাভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করার চেষ্টা করেন। নিজের মান-সম্মানের খাতিরেই বড় রকমের একটি বিজয় খুবই জরুরী ছিল। বিশেষ করে আল্‌প-আরসালানের বাহিনীর সংখ্যাল্পতা দেখে তাঁর সে আশা আরও বেড়ে যায়। এ ধরনের একটি সহজ বিজয়কে তিনি কোনভাবেই হাতছাড়া করতে চাইলেন না। সুতরাং তিনি অত্যন্ত দাম্ভিকতার সঙ্গে আল্‌প-আরসালানের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

আপোস প্রস্তাব বিফলে যাওয়ায় আল্‌প আরসালান যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সংখ্যার বিচারে তাঁর বাহিনী ছোট হলেও সেলজুক অশ্বারোহী তীরন্দাজেরা ছিল ভীষণ চঞ্চল ও চতুর। তারা ঘোড়ায় চড়ে শত্রুশিবিরে আক্রমণ চালায়। অবিরামগতিতে তীর-বর্শা নিক্ষেপ করে। এবং শত্রুসীমানার মধ্যে না গিয়ে পরক্ষণেই নিরাপদ দূরত্বে

সরে আসে। রোমান বাহিনীতে বেসিলেসিয়াস নামের একজন গভর্নর ছিল। সেলজুক তীরন্দাজের এ ধরনের আক্রমণের জন্য তিনি ভীষণভাবে উত্তেজিত হন। তড়িঘড়ি করে একটি বাহিনী গঠন করে সে তুর্কীদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। দ্রুতগতি সম্পন্ন সেলজুক অশ্বারোহীরা পেছনের দিকে সরে যায়। ভারী রোমান অশ্বারোহীরা তবু থামল না। তারাও তুর্কীদের পিছু ধাওয়া করে। এভাবে মাইল কয়েক যাওয়ার পর হঠাৎ করেই বেসিলেসিয়াস দেখতে পেল যে অশ্বারোহী তীরন্দাজেরা ছুটছে না, লড়ছে না। তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। ছুটোছুটি কমিয়ে দিয়ে সে অশ্বারোহী সেনাদের গুছিয়ে নিল। তৈরী হল চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য। বেসিলেসিয়াস এবং তার বাহিনীর যেন আর বিলম্ব সইছিল না। তাদের যেন কি এক উন্মাদনায় পেয়ে বসল। আক্রমণের জন্য তারা ওঁৎ পেতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। চারদিক থেকে রোমান অশ্বারোহীদের উপর তীর-বৃষ্টি শুরু হয়। তীরগুলো যেন নির্দয়ভাবে বেছে বেছে অশ্বারোহীদের গায়ে বিঁধতে থাকে। সম্রাট রোমেনাস সহজেই বেসিলেসিয়াসের অবস্থা অনুধাবন করতে পারেন। বিলম্ব না করে তাকে সাহায্য করার জন্য একটি উদ্ধারকারী দল পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তারা গিয়ে দেখে যে রোমানরা যেখানে ওঁৎ পেতে বসেছিল, তা একটি শবশয্যায় পরিণত হয়েছে। মৃত ঘোড়া এবং নিহত সৈনিকেরা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এমনকি উদ্ধারকারী দলও অব্যাহতি পেল না। তারাও সেলজুকদের আক্রমণের শিকার হল। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ফিরে আসতে হল মূল ঘাঁটিতে। এটা ছিল মানজিকার্টের যুদ্ধে আল্‌প-আরসালানের দ্বিতীয় বিজয়।

পরদিন প্রত্যূষে রোমেনাস তার বাহিনীকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে সাজালেন। বাহিনীর পশ্চাদভাগের সাথে সেনাছাউনির নিবিড় সংযোগ রাখার ব্যবস্থা রাখলেন। কেপাডোসিয়ান, আর্মেনিয়ান এবং চার্চিনিয়ানস-এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল রোমান বাহিনীর দক্ষিণ প্রান্ত। বাম প্রান্তে ছিল ইউরোপীয় সেনারা। মধ্যভাগে ছিল তার নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং রাজধানী অঞ্চলের সৈনিকেরা । এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন রোমেনাস নিজে। পশ্চাদভাগে ছিল অর্থলোভী, বেতনভোগী জার্মান ও নরম্যান সৈনিকেরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পূর্ব সীমান্তের অতিরিক্ত সেনারা। ডিউকাসাক নিয়োগ করা হল এই বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে। বলা বাহুল্য, একজন যোগ্য সেনানায়ক হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

তুর্কী অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে বিরাট একটি অর্ধচন্দ্রের আকারে অবস্থান নিল। সুলতান আল্‌প-আরসালান দাঁড়ালেন সবার মাঝখানে। সেলজুকদের যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তারা রোমান সেনাদের বিভিন্ন স্থানের উপর অবিরাম তীর ছুঁড়তে শুরু করে। শত্রুসেনারা খুবই সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। একটি সুযোগের

জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু আক্রমণের জন্য তেমন কোন সুযোগ তারা পেল না। আসলে রোমান বাহিনীতে হালকা অশ্বারোহী এবং খণ্ডযুদ্ধ করার মত পর্যাপ্ত সৈন্য ছিল না। ফলে সেলজুকরা একতরফাভাবে তীর বৃষ্টি অব্যাহত রাখল। অত্যন্ত নির্মম এবং অসহায়ভাবেই মারা গেল রোমান সৈনিকেরা। নিহত হল তাদের ঘোড়াগুলো। রোমেনাস এবং তার বাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে এই অসম যুদ্ধ অবলোকন করল। বুঝল যে এ-ভাবে সেলজুকদের মুকাবিলা করা অসম্ভব। এটা অসহ্য। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রোমেনাস গোটা বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রোমানদের গতিবিধি সম্পর্কে তুর্কীরাও ছিল সচেতন। রোমানদের এগিয়ে আসতে দেখেই তুর্কীরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে পেছনের দিকে সরে যায়। কিন্তু তারা তীর-বৃষ্টি অব্যাহত রাখে এবং রোমান বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তারা রোমানদের ভারী অশ্বারোহীদের কখনও পাল্টা আক্রমণ চালানোর মত কাছাকাছি আসতে দেয়নি। আবার নিজেরাও এতটা পেছনে সরে যায়নি যাতে করে রোমান বাহিনী তাদের আক্রমণ সীমার বাইরে চলে যায়। এমনি সন্দিগ্ধ এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সুসজ্জিত এবং নিপুণ দু'টি বাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এগিয়ে যায় মানজিকার্টের বিশাল বিস্তৃত সমতল ভূমির দিকে। রোমানদের ভারী অশ্বারোহীরা এক সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা অগ্রযাত্রায় বিরতি দেয়। তারা ঘোড়া থেকে নেমে আসে এবং সেনা ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার পথ ধরে।

রোমানরা পশ্চাদপসরণ শুরু করার সাথে সাথেই তাদের উপর নেমে আসে চরম বিপর্যয়। সারা দিনব্যাপী এই বিপর্যয় যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। যে অশ্বারোহী তীরন্দাজরা এতক্ষণ পেছনের দিকে সরে যাচ্ছিল, এবার তারা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অবিরাম তীর বর্ষণ করে রোমানদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সম্ভবত রোমেনাসের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। একই সময়ে তিনি সমস্ত যোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাহার করাতে পারেননি। মধ্যভাগের সেনাদের কাছে সর্বপ্রথম সেনা ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পৌঁছে এবং তদনুসারে তারা প্রত্যাহারের কাজ শুরু করে। প্রান্তভাগ এবং পশ্চাদভাগের সেনাদের কাছে রোমেনাসের নির্দেশ অনেক পরে পৌঁছে। ফলে শুরুতে তারা মধ্যভাগের সেনাদের গতিবিধি বুঝে উঠতে পারেনি। যখন তারা রোমেনাসের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এবং খুবই এলোমেলো এবং বিশৃঙ্খলভাবে তারা যাত্রা শুরু করে।

তুর্কীরা সুযোগের সন্ধানে ছিল। সেনাবাহিনীর আগে-পিছে প্রত্যাবর্তনের কাজ শুরু করার কারণে বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ ফাঁক সৃষ্টি হয়। তুর্কী তীরন্দাজরা অতর্কিত এই দুর্বল স্থানের উপর দুর্বার আঘাত হানে। রোমানরা এবার মস্তবড়

সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে রোমেনাস তুর্কী তীরন্দাজদের এই অতর্কিত হামলা প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে অবস্থানগতভাবেও রোমান বাহিনীতে বড় রকমের গরমিল দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের কাজ আরো পিছে শুরু হওয়ার কারণে ডিউকাসের নেতৃত্বাধীন পশ্চাদভাগ যাদের সবার আগে শিবিরে পৌঁছার কথা, তারা পড়ে যায় সবার পেছনে। আবার মূল অগ্রবর্তী বাহিনী যাদের সবার পরে শিবিরে পৌঁছার কথা, তারা চলে যায় সবার সামনে। প্রত্যাবর্তনের পথে নতুন করে তুর্কীদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত আসে। কিন্তু তুর্কীদের মুকাবিলার খবর সময়মত তার কাছে পৌঁছায়নি। ফলে ডিউকাস যেখানে শিবিরের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, এখনও সেভাবে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে।

এভাবে ডিউকাসের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ নিয়ে বহু তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রোমান ঐতিহাসিকদের মতে এটা ছিল ডিউকাসের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ। এবং জেনে-শুনেই সে এমনিটি করেছিল। আসলেও কি রোমান ঐতিহাসিকদের এই অভিযোগকে সত্য বলে ধরে নেয়া যায়? নাকি ডিউকাসের কাছে সময়মতো সিদ্ধান্তের খবর না পৌঁছার কারণেই এমনটি হয়েছিল? সম্ভবত শেষোক্ত অনুমানটি সত্য। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে রোমানদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল এবং অনুন্নত। শিবিরে প্রত্যাবর্তনকালে রোমান বাহিনীকে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা এবং গরমিল দেখা দিয়েছিল, তা থেকেই রোমানদের এই দুর্বলতার নজির মেলে। সকল অধিনায়কের সময়মত সিদ্ধান্তের কথা জানাতে না পারার কারণে রোমেনাস মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। অগ্রবর্তী বা পশ্চাদবর্তী দল বলে কিছু থাকল না। তুর্কী সেনারাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। অতর্কিতে তারা রোমান বাহিনীর প্রান্তভাগের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে রোমান সেনাদেররক। বাম প্রান্তের সেনাদের কাছেও তুর্কীদের মুকাবিলা করার সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছাইনি। ফলে তারাও প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেল না। তারা মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবু তারা এককভাবে তুর্কীদের মুকাবিলা করল। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস বিফলে গেল। অল্পতেই হার মানল তুর্কীদের কাছে। তুর্কীরা যুদ্ধের মাঠ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিল। অনুরূপভাবে তুর্কীরা রোমান বাহিনীর ডান প্রান্তের সৈন্যদেরকেও তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলল এবং নির্মূল করে দিল সম্পূর্ণভাবে। তুর্কী সেনারা এবার রোমান বাহিনীর মধ্যভাগের উপর দৃষ্টি দিল। রোমেনাস নিজে এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তুর্কীরা চার দিক থেকে এই দলকে ঘিরে ফেলেছিল। রোমেনাসের নেতৃত্বে তারা যে প্রতিরোধটুকু গড়ে তুলেছিল, তুর্কীদের দুর্বার আক্রমণের মুখে তাও ভেঙ্গে-চুরে খান খান হয়ে গেল। তুর্কীদের হাতে হতাহত হয় অনেকে। সেনাপতি রোমেনাসের ঘোড়াটিও নিহত হল। তিনি নিজে আহত হলেন। বন্দী হলেন তুর্কীদের হাতে। বন্দী হল আরও অনেকে।

রোমেনাসের নেতৃত্বাধীন মধ্যভাগের একটি লোকও পালিয়ে যেতে পারল না। হয় তারা তুর্কীদের হাতে বন্দী হল, নয়ত মারা গেল তলোয়ারের নিষ্ঠুর আঘাতে। অল্প সময়ের মধ্যেই মানজিকার্টের ময়দান দিয়ে বয়ে গেল রক্তের বন্যা। এমনি করুণ পরিণতির মধ্য দিয়েই ভারী অশ্বারোহী তীরন্দাজদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটল। পর্যুদস্ত হল রোমেনাসের শক্তিশালী রোমান বাহিনী। চূড়ান্ত যুদ্ধের এই দিনটি ছিল ১০৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট।

মানজিকার্টের এই যুদ্ধ ছিল কারহেই-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। ক্লেসাস-এর মতো রোমেনাসকেও এই যুদ্ধে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল তাকে মাশুল দিতে হয়েছিল উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রান্তের অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনীকে আক্রমণ করার কারণে। অথচ তার বাহিনীর প্রান্তভাগ অথবা পশ্চাদভাগের সেনারা ছিল সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। বস্তুতপক্ষে পদাতিক বাহিনীর জন্য অপেক্ষা না করে কেবল ভারী অশ্বারোহী দল নিয়ে যুদ্ধ করাটাই ছিল রোমেনাসের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। এর সুস্পষ্ট কারণও রয়েছে। রোমেনাসের দলে ছিল ভারী অশ্বারোহী বাহিনী। তার বিপক্ষে ছিল চঞ্চল এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন অশ্বারোহী তীরন্দাজরা। ভিন্ন প্রকৃতির এই দুই শক্তির মধ্যে কখনও সমানে সমানে যুদ্ধ হতে পারে না। কেবল পদাতিক সেনাদের পক্ষেই অশ্বারোহী তীরন্দাজদের মুকাবিলা করা সম্ভব। কারণ, প্রথমত অশ্বারোহী তীরন্দাজদের ধনুকগুলো হালকা ধরনের এবং এগুলো দিয়ে খুব বেশী দূর পর্যন্ত তীর নিপেক্ষ করা যায় না। অপরদিকে পদাতিক সেনারা উন্নতমানের ধনুক দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করতে পারে। ফলে সহজেই তারা অশ্বারোহী তীরন্দাজদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে, ঠেকিয়ে রাখতে পারত বহুদূর পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, তুর্কী সেনাদের পিছু ধাওয়া করে রোমেনাস মস্তবড় একটা ভুল করেছিলেন। অশ্বারোহীরা ছিল দ্রুত গতিসম্পন্ন। তাদের সঙ্গে থাকত হালকা জিনিস-পত্র। ফলে অনায়াসেই তারা যে কোন বাধাকে অতিক্রম করতে পারত। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারত অতি সহজে। যুদ্ধের ময়দানে ডিউকাস যে আচরণ দেখিয়েছে, তা আকস্মিক অথবা বিশ্বাসঘাতকাতপূর্ণ যাই হোক না কেন, তাকে কখনও যুদ্ধের একক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। বড়জোর বলা যেতে পারে যে, ডিউকাসের এই আচরণ রোমেনাসের নিশ্চিত পরাজয়কে ত্বরান্বিত এবং চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে মাত্র।

রোমেনাস অথবা আল্প-আরসালান কেউ তেমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। বরং তাদের লক্ষ্য ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা দাঁড়াল এর উল্টো। এই যুদ্ধে রোমানদের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল। মানবিতিহাসে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ল। আনাতোলিয়ায় তুর্কীদের অনুপ্রবেশ ঘটল। আনাতোলিয়াকে তারা গড়ে তুলল নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে।

এখানে তাদের শক্তি এতটা সুদৃঢ় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হল যে, আনাতোলিয়া থেকে ইসলামের ঝাণ্ডা সুদূর পোল্যান্ড এবং ভিয়েনা পর্যন্ত বিস্তার লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ করেই গোটা খ্রিস্টান জগত শঙ্কিত হয়ে পড়ে। মানজিকার্টের যুদ্ধের এই সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্মিলিতভাবে তারা মুসলমানদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দীর্ঘ তিন শতাব্দীব্যাপী চলতে থাকে এই যুদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রোমানদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই ফাতেমীয়রা সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের দমন করার জন্য আনাতোলিয়াকে রোমানদের প্রভাবমুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আল্‌প-আরসালান আনাতোলিয়ায় অভিযান চালিয়েছিলেন। রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিয়ে তিনি তাঁর সে উদ্দেশ্য হাসিলও করেছিলেন। পরে তিনি কতকগুলো সহজ শর্তে রোমেনাসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপন করেন। প্রথমত গাজী আমীরগণ ইতিমধ্যে যে সমস্ত অঞ্চল দখল করেছিলেন, তা সেলজুকদের অধিকারে থাকে। দ্বিতীয়ত উচ্চ মুক্তিপণ প্রদানের প্রেক্ষিতে বন্দী রোমেনাসকে মুক্তি দেয়া হয়। ফলে তুর্কী সাম্রাজ্য চীন সীমান্ত থেকে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আনাতোলিয়া রোমানদের প্রভাবমুক্ত হওয়ার পর আল্‌প-আরসালান সিরিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে ট্রান্সঅক্সিয়ানায় বড় রকমের বিদ্রোহের খবর এসে পৌঁছে। ফলে তিনি পূর্ব দিকে অভিযান চালাতে বাধ্য হন। এই অভিযান চালানোর এক বছর পর ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানায় ইন্তেকাল করেন।

আল্‌প-আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ্ শাসন ক্ষমতায় আসেন। তিনি কখনো রোমানদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করেননি। তাঁর এক চাচাতো ভাইয়ের নাম ছিল সোলেমান। সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আনাতোলিয়া শাসন করছিলেন। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই তিনি তার ভাগ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই রোমানদের সঙ্গে কোন বিবাদ-বিসংবাদকে তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন। এমনকি রোমান অধিকৃত আনাতোলিয়ায় যাতে গাজী আমীরগণ অনুপ্রবেশ না করে-সে দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু সোলেমান অথবা তাঁর পুত্র খিলজী-আরসালান খেলাফত অঞ্চলে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না। তারই প্রেক্ষিতে তারা আনাতোলিয়ায় স্থায়ীভাবে শাসনকার্য শুরু করেন। ইকোনিয়ামকে (আধুনিক কোনিয়া) গড়ে তোলেন রাজধানী হিসেবে। এখানকার শাসকগণ সেলজুক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও রোমের সুলতান হিসেবেই তাঁরা ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁরা শিক্ষা এবং শিল্পকলার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। স্বভাবগতভাবেই

তাঁরা ছিলেন শান্তি-প্রিয়। কিন্তু এরপরও একথা সত্য যে, রুমের সুলতান অথবা রোমানরা দানিশমন্দ, চকো, সেনগুজেক-এর মত গাজী আমীরদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেননি।

আনাতোলিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের অভিজাত শ্রেণী, সর্দার এবং পাদরীগণ ছিলেন খুবই স্বার্থপর এবং বিশাল সম্পদের অধিকারী। তাদের আত্মকেন্দ্রিক নীতির ফলে কৃষক সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা বাধ্য হয় অন্যত্র চলে যেতে। এই অঞ্চলটি পরিণত হয় মেষচারণ ক্ষেত্রে। মানজিকার্টের যুদ্ধের পরে এসব অঞ্চলে তুর্কী যাযাবরদের ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং তারা স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এখানকার গাজী আমীরগণের মধ্যে কোন প্রকার গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতা ছিল না। রোমের সুলতানগণও ছিলেন ধৈর্যশীল। তাদের প্রভাবে এসে স্থানীয় খ্রিস্টান অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তুর্কীদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আনাতোলিয়ার অধিবাসীদের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক বলেছেন যে, শুরুতে আনাতোলিয়া ছিল একটি খ্রিস্টান প্রভাবিত অঞ্চল, পরে তা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া এত অবাধে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় যে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে কেউ কষ্ট স্বীকার করেননি।

জালাকার যুদ্ধ

(১০৮৬ খ্রিস্টাব্দ)

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসে। উমাইয়া বংশের শেষ খলিফার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে যেখানে ছিল, তাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা হয়। নির্মূল করে দেয়া হয় সম্পূর্ণরূপে। ঘটনাচক্রে একজন যুবরাজ আব্বাসীয়দের নির্দয় হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান। দামেশকের মায়া ছেড়ে তিনি ভাগ্যের সন্ধানে স্বদেশ ত্যাগ করেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলে আসেন সুদূর উত্তর আফ্রিকায়। তার মা ছিলেন 'বারবার' গোষ্ঠীভুক্ত। মায়ের আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতায় তিনি প্রথমে কর্ডোভা এবং পরে গোটা স্পেন দখল করে নেন। এভাবেই স্পেনে (আরবরা বলত আন্দালুসিয়া) উমাইয়া শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। আব্বাসীয়দের নিষ্ঠুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে যে যুবরাজ এমন একটি অসাধ্য সাধন করলেন, তাঁর নাম আবদুর রহমান।

আবদুর রহমান অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে-সেখানে যে সব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, শক্ত হাতে তা দমন করেন। উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে পরাভূত করে উমাইয়া শাসনের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করেন। বস্তুতপক্ষে আবদুর রহমানের নেতৃত্বে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই স্পেনের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটে। প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কর্ডোভার বিশ্ববিখ্যাত মসজিদ, আজ-জাহিরা শহর, বিখ্যাত পাঠাগারসমূহ, কৃষি এবং সেচ ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং শিল্পকলা নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় মূলত এ সময়ের সৃষ্টি। স্পেন-কেন্দ্রিক উমাইয়া শাসকগণের অন্তর ছিল বড়। তাঁরা ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে আবী আমর-এর মত জ্ঞানী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা পেয়েছিলেন। এবং তাঁর নেতৃত্বেই স্পেন উন্নতির শিখরে পৌঁছে। খলিফা হিশামের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অত্যন্ত সাফল্য এবং গৌরবের সঙ্গে দীর্ঘ ২৬ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ২৬ বছরের শাসনামলে তিনি মোট ৫২ টি যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোন যুদ্ধে তিনি হার মানেননি। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ছিলেন অপরাজিত। আশপাশে যেসব খ্রিস্টান রাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেন।

১০০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তেকালের পরই মুসলিম স্পেনের সর্বত্র বিবাদ-বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত তীব্র আকারে দেখা দেয়।[১] অবশেষে এমন হল যে, আন্দালুসিয়া কতকগুলো ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল। প্রতিটি শহর এক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হল। মুসলমান সর্দারগণ নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা দিলেন। প্রত্যেকেই নামের শেষে চমৎকার কতগুলো উপাধি যোগ করলেন। এ সমস্ত শহর, রাষ্ট্র এবং স্বেচ্ছাচারী রাজাদের মধ্যে অনবরত কলহ-বিবাদ লেগেই থাকত। ইবনে আমি আমর যদি খ্রিস্টান রাজ্যগুলো নির্মূল করে না দিতেন, তা হলে মুসলিম স্পেনের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হত। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তারা গোটা আন্দালুসিয়া দখল করে নিতে পারত। অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা করতে পারত তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

স্পেনের উত্তরেই রয়েছে পার্বত্য অঞ্চল। সেখানে বসবাসকারী খ্রিস্টানরা যেমন নির্ভীক ও কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি তাদের মধ্যে রয়েছে ধর্ম-উন্মাদনা এবং দুঃসাহসিক কাজ করার মত যোগ্যতা। তারা স্পেনীয় মুসলমানদের কলহ-বিবাদ সম্পর্কে জানত এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। এ সময়ে লিও ক্যাসাইল এর রাজা ছিলেন প্রথম ফার্ডিন্যান্ড। তাঁর নেতৃত্বে ১০৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে খ্রিস্টানরা শক্তি সঞ্চয় করে। কোনরকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই তারা বেশ খানিকটা সুবিধা অর্জন করে। বলতে গেলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং সারাগোসা, বারমেলোনা, টলেডো, কর্ডোভা, বাদামোর এবং আরও কতগুলো মুসলিম রাষ্ট্র ফার্ডিন্যান্ডকে খাজনা দিতে থাকে। আসলে ফার্ডিন্যান্ড-এর কৌশলটি ছিল খুবই চাতুর্যময়। সে মুসলমান রাজাদের একজনের বিরুদ্ধে অপর জনকে সাহায্য করত। বিনিময়ে প্রত্যেক মুসলিম শাসককেই ফার্ডিন্যান্ডকে উচ্চ মূল্য প্রদান করতে হত। এই অর্থ দিয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করে। গড়ে তোলে বিরাট একটি বাহিনী। অর্থাৎ মুসলমানদের অর্থ দিয়েই মুসলমানদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ফার্ডিন্যান্ড-এর পুত্র ষষ্ঠ আলফানাসো ছিল আরও উচ্চাভিলাষী। সে মুসলমানদের নির্মূল করে দেয়া অথবা স্পেন অঞ্চল থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়।

১০৮২ খ্রিস্টাব্দে আলফানাসো স্পেনে বড় রকমের একটি অভিযান চালায়। এই অভিযান খ্রিস্টানদের জন্য মস্তবড় বিজয়বার্তা বয়ে আনে। কোন রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই খ্রিস্টান বাহিনী ক্যাসাইল থেকে চলে আসে তারিফায়। আশপাশের মেরুদণ্ডহীন রাজারা নির্বিবাদে তার বশ্যতা স্বীকার করে। আলফানসোর হাতে তুলে দেয় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে সে টলেডো দখল করে। এই টলেডো ছিল দামেশক-কেন্দ্রিক উমাইয়া শাসনের রাজধানী। টলেডোবাসীরা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আলাফানসো-এর কাছে নতি স্বীকার করল না। কিন্তু যখন তারা পুরোপুরি

অনাহারে কাটাতে লাগল তখন কতগুলো শর্তের ভিত্তিতে তারা আলফানসোর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এই সময়ে কোন মুসলিম শাসকই সাহায্য-সহযোগিতা করেনি। প্রকৃতপক্ষে স্পেনে খ্রিস্টানদের পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপর আলফানসো সারাগোসা অভিমুখে যাত্রা করে। শক্তি ও সামর্থ্যে সারাগোসা ছিল খুবই দুর্বল। আলফানসো রাজধানী অবরোধ করে এবং সহজেই দেশটি দখল করে নেয়। অবস্থার এত দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যে একাদশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই স্পেন থেকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শাসকদের শক্তি-সামর্থ্য যাই হোক না কেন, দু'টো ব্যাপারে আব্বাসীয়দের সঙ্গে তাদের চমৎকার মিল ছিল। প্রথমত, আব্বাসীয় খলিফাদের ন্যায় এসব শাসকও বিরাট বিরাট উপাধি ব্যবহার করত। দ্বিতীয়ত, তাদের প্রাসাদ ছিল নানা ধরনের শান-শওকত এবং জৌলুসে পরিপূর্ণ। অথচ এ সময়ে দেশের উন্নতি বা সমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র ছিল না। আলফানসোকে দিতে হত বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। প্রকৃতপক্ষে জনগণকেই এই অর্থের যোগান দিতে হত। ফলে দিনে দিনে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছিল। এমনি একটি অরাজকতাপূর্ণ অবস্থায় আলেম সমাজ নিঃস্ব নিপীড়িত জনগণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শাসকগণের বিরোধিতায় নেতৃত্ব তুলে নিলেন নিজেদের হাতে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সে আমলে স্পেনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ভিন্নরকম। মসজিদগুলো ব্যবহৃত হত স্কুল হিসেবে। আলেমগণই ছিলেন এসব স্কুলের শিক্ষক। তাছাড়া স্পেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিল শিক্ষিত। ফলে জনগণের উপর এসব আলেমের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা রাজা-বাদশাহগণের আচরণ এবং রীতিনীতির কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারলেন না। শাসক সম্প্রদায়ের উপর ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তাঁরা এবার আলমোরাভিদস্-এর আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন-এর শরণাপন্ন হন এবং তার কাছে আন্দালুসিয়ার ধ্বংস-প্রায় মুসলমানের মুক্তির আহবান জানান।

উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বারবার সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত। তখনকার দিনে এতদঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলো উপজাতি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এই উপজাতীয় লোকগুলো ছিল ভীষণ রকমের আত্মকেন্দ্রিক এবং অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা। নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে তারা মুসলমান হলেও ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল খুবই ভাসাভাসা। প্রাচীন নিউমিডিয়া-এর দক্ষিণে এবং সাহারার মরুঅঞ্চলে বসবাসকারী এ সমস্ত উপজাতীয়ের মধ্যে একটি গোত্রের যোদ্ধা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। যাযাবার শ্রেণীর অন্তভুক্ত হলেও তাদের এই সুনাম ছিল সেই স্মরণাতীত কাল থেকে। সুঠাম, সুস্থ, সুদর্শন লোকগুলো ছিল ভীষণ রকমের সাহসী এবং দুর্ধর্ষ। এমনকি যুদ্ধ নৈপুণ্যের দিক থেকে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাদের তুলনা চলত।

পুরুষেরা বোরখা পরত। তারা ছিল শক্তির প্রতীক। মহিলারাও ছিল অপরূপ সুন্দরী। তাদের আচার-আচরণও ছিল ভারী চমৎকার। এই উপজাতির নাম 'লামতুনাহ'।[২] এরা মূলত ইতিহাস বিখ্যাত 'সানহাজা' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণে সুদূর সেনেগাল পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ছিল 'লামতুনাহ'-দের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এমনকি আশপাশের নিগ্রোদেরকেও তারা নিজেদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ইয়াহিয়া বিন ইব্রাহীম আল জাদ্দালী নামে তাদের একজন গোত্র প্রধান ছিলেন। ১০৪৮-৪৯ সালে পবিত্র হজ্জ্ব উপলক্ষে তিনি মক্কায় যান। উপজাতির লোকজনকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য মক্কা থেকে তিনি একজন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। ধর্মপরায়ণ এই আলেমের নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন আল জুজুলি।

আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ তাঁর মহৎ প্রচেষ্টায় সফল হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি 'লামতুনাহ' উপজাতির লোকদেরকে ধর্ম সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান দান করেন। তাদের মধ্যে জাগিয়ে দিলেন দৃঢ় নৈতিকতাবোধ, গভীর ধর্মীয় অনুভূতি এবং সচেতনতা। নতুন প্রেরণায় এবার তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে ইয়াহিয়া-এর ভাই আবু বকর এবং পরে ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের নেতৃত্ব দেন। অল্প সময়ের মধ্যে তারা উত্তরে মধ্যসাগর এবং দক্ষিণে সেনাগাল নদী পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। ১০৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউসুফ বিন তাশফিন তাঁর সাম্রাজ্যকে সুসংহত এবং সুসংগঠিত করেন। সম্ভবত আলফানসো যখন তারিফায় অভিযান চালায় এবং টলেডোর পতন ঘটে, তখন তিনি মরক্কোয় অবস্থান করছিলেন। এবং সেখানে থাকতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আলফানসোর গতিবিধির খবরাখবর।

ইউসুফ বিন তাশফিন ছিলেন মাঝারি গড়নের সুঠাম পুরুষ এবং খুবই কষ্টসহিষ্ণু। এ সময় তিনি মধ্য বয়স পেরিয়ে গেছেন। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন ভারী চমৎকার। অমায়িক ব্যবহার এবং শিষ্টাচারের কারণে সহজেই তিনি সকলের মন জয় করতে পারতেন। তাঁর জীবনপ্রণালীও ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। বালি গোশত এবং উটের দুধ ছিল তাঁর নিত্যদিনের আহার। সাধারণ এবং দেশীয় পশমী পোশাক পরতেন। শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন খুবই বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। প্রজাসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় সারাক্ষণ বিভোর থাকতেন। তাছাড়া যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কেও ছিল তাঁর অসামান্য অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে একজন অসম সাহসী বারবারদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছিল গগনচুম্বী। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক। ধর্মীয় অনুশাসন এবং রীতি-নীতির আলোকে রাজ্য চালাতেন। সরকারী কার্যক্রমের ব্যাপারে ধর্মীয় নেতা বা আলেম সমাজের বুদ্ধি-পরামর্শের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। চিন্তা-চেতনা এবং আচরণ ও বস্তুগত দিক থেকে বিবেচনা করলে ইউসুফ ছিলেন একজন খাঁটি মুমিন মুসলমান। তিনি ছিলেন স্পেনের মাটিতে ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরার মত যোগ্যতম ব্যক্তি। সে কারণেই স্পেনের আলেমগণ বহু আশা নিয়ে

ইউসুফের দরবারে গিয়ে হাযির হন। তিনিও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের গ্রহণ করেন, মনোযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কথা শ্রবণ করেন। স্পেনে মুসলমানদের নিপীড়ন এবং নির্যাতনের কথা শুনে খুবই মর্মাহত হন। কিন্তু আলেমগণকে কোন রকম সহযোগিতা প্রদান অথবা মুসলমানদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজের অপরাগতার কথা প্রকাশ করেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, স্বেচ্ছায় এবং নিজ উদ্যোগে স্পেনের মাটিতে পদার্পণ করলে তিনি আক্রমণকারী বা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। এবং সেই কারণে মুসলমান শাসকগণ অনুরোধ না জানানো পর্যন্ত তিনি জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করতে পারবেন না।

এদিকে আলফনসোর অভিযান সম্পর্কে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। অবশ্য তারা এমন একটা আশাও পোষণ করছিল যে, আলফানসোর বশ্যতা স্বীকার করে নিলে হয়ত বা তারা কোন রকমে টিকেও যাবে। কিন্তু তাদের বড় ভয় ছিল মৌলবাদী বারবারদের নিয়ে। এ ব্যাপারে তারা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে, ইউসুফ তাদের রেহাই দিবে না। বেশী কিছু না হলেও অন্তত বারবারদের সহযোগিতায় আলেমগণ তাদের পরাভূত করবে। সে কারণেই এসব রাজা ইউসুফের চেয়ে আলফনসোর দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু সেভিলের শাসক 'মুতামিদ' সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। তিনি ছিলেন খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং একজন প্রতিভাবান স্বভাব কবি। মুতামিদ সহজেই অনুমান করতে পারছিলেন যে, সারাগেসো দখলের পরই আলফানসো সেভিলের দিকে হাত বাড়াবে। এ ধরনের একটা অশুভ কল্পনা মুতামিদকে খুবই অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দেয়। বিচার-বিবেচনা করে তিনি আলেমদের পরিকল্পনাকেই শ্রেয় মনে করেন এবং সেদিকে ঝুঁকে পড়েন। বস্তুতপক্ষে তার এই উপলব্ধিটুকু ছিল একটা বাস্তব সত্য। তিনি একটা কবিতার ছন্দে এই সত্যটিকে তুলে ধরেন-যদি আল্লাহ্র বিধান এরকমই হয়ে থাকে যে আমি রাজ্য হারাব, বঞ্চিত হব মসনদ থেকে, বাধ্য হব দাস জীবন-যাপন করত, তাহলে কেসাইল-এর শূকররক্ষক অপেক্ষা আফ্রিকার একজন উষ্ট্রচালক হওয়াই আমার জন্য উত্তম। মুতামিদের দেখাদেখি আরও বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান শাসক তার পদাংক অনুসরণ করে। ইউসুফ বিন তাশফিন-এর সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছে। সেভিলে, গ্রানাডা এবং বাদাজোজ-এর কাজীগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদলকে পাঠান হল ইউসুফের দরবারে। তারা আলফানসোর বিরুদ্ধে মুসলমান শাসকদের সাহায্য করার জন্য আকুল আবেদন জানায়। অবশ্য তারা এ শর্ত আরোপ করে যে, বিভিন্ন শাসকবর্গের সার্বভৌমত্বের উপর ইউসুফ বিন তাশফিন কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। হৃদয়বান মুসলিম শাসক ইউসুফ তাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তবে তিনিও শর্ত আরোপ করলেন যে, আলজেসিরাসাই হবে তার সামরিক ঘাঁটি। এখানে তিনি দুর্গ তৈরী করবেন। এখান থেকেই তিনি

আলফনসোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন।

দিন কয়েকের মধ্যেই ইউসুফের সেনাবাহিনী নিজেদের হাতে তুলে নেয় আলজিসিরাস-এর শাসন কর্তৃত্ব। ইউসুফ প্রথমেই দুর্গগুলোর সংস্কার ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করেন। শহরের চারপাশে গভীর পরিখা খনন করেন। সেনানিবাসে মওজুদ করেন প্রচুর রসদ সামগ্রী এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ। ইতিমধ্যে তার সমগ্র বাহিনী চলে আসে। আলজেসিরাস-এর সেনানিবাসে হাজার পাঁচেক সৈন্য মোতায়েন রেখে ১২০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি সেভিল-এর দিকে অগ্রসর হন। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তিনি দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এত মজবুত করতে চেয়েছিলেন কেন? আলজেসিরাস-এ ৫০০০ সৈন্যের এত বড় বাহিনী রেখে যাওয়ার অর্থ কি? তারিক যে পন্থায়, যেভাবে স্পেন দখল করেছিলেন, ইউসুফও কি অনুরূপভাবে স্পেন বিজয়ের আশা পোষণ করছিলেন? হয়ত বা তাই। তবে আলজেসিরাস-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে এতখানি সতর্ক হওয়ার পশ্চাতে আরও একটি কারণ ছিল। সম্ভবত ইউসুফের নিকট এই কারণটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা এই যে-মুসলমান শাসকদের আহবানে তিনি স্পেনে এলেও, তাদের আনুগত্য ও আন্তরিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। ফলে কৌশলগত কারণেই এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হয়েছিল।

যুদ্ধ শেষে একজন বিজয়ী বীর যেভাবে দেশে ফিরে আসে, ইউসুফ বিন তাশফিনও তেমনি আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে সেভিল-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রায়ও সাধারণ জনগণ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং অপরিসীম ভালবাসা নিবেদন করল। তারা ইউসুফকে গ্রহণ করল মুক্তিদূত হিসেবে। কিন্তু মুসলমান শাসকগণ তাকে বড় একটা পছন্দ করল না। ইউসুফের আচার-আচরণের মধ্যে কোন চমক ছিল না। তার কথাবার্তার মধ্যে শাসকগোষ্ঠী কোন চাতুর্যের ছাপ পায়নি। তাদের দৃষ্টিতে রাত্রিকালীন আমোদ-প্রমোদ বা সুরা পানোৎসবে কারও আসক্তি না থাকলেও হয়ত সেটাকে চোখে দেখা যায়। কিন্তু মনে রং ধরানোর মত মনোরম কবিতা, নৃত্য বা গান-বাজনা সম্পর্কে অজ্ঞতাকে কোন্ ক্রমেই সহ্য করা যায় না। এটা অভদ্রতা ও অপরাধের শামিল। ইউসুফ বিন তাশফিন-এর সম্মানার্থে একবার একটা সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কবিতা পাঠের ব্যবস্থা ছিল। হঠাৎ করেই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং ধৃষ্টতা সহকারে জনৈক শাসক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি কি কবিতার অর্থ বা বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছেন? প্রশ্নের জবাবে বারবার শাসক অত্যন্ত ঘৃণাভরে বলেছিলেন যে, দরিদ্র হতভাগা রুটি চায়।

আন্দালুসিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন আগে থেকেই কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষুদে মুসলমান শাসকরা তাঁর এ

কথায় আস্থা রাখতে পারেননি। এবং সে কারণেই তারা বারবার আমীরের সহানুভূতির আশায় উঠে-পড়ে লাগে। তার সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য হাজার রকমের ছলচাতুরী, কলা-কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। অনেকে আবার সুযোগ পেলেই ইউসুফ বিন তাশফিনকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত, হাসি-তামাশায় মেতে উঠত। কখনও আবার অতি সংগোপনে সলা-পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করত। আবার ইউসুফের মুখোমুখি হলে তোষামোদ ও মনোরঞ্জনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমান প্রজা সাধারণের বিরুদ্ধে অপকর্মের কীর্তি কাহিনী প্রকাশ করে দিত। ফাঁস করে দিত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল ইউসুফের সহযোগীদের বাস্তব চরিত্র। তারা প্রত্যেকেই ছিল পরস্পরের শত্রু। ইউসুফ জানতেন যে, যে কোন সময় এরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, সুযোগ পেলেই দখল করে নিতে পারে আলজেসিরাস-এর সামরিক ঘাঁটি। এতসব বিষয় বিবেচনা করেই তিনি পশ্চাদভূমিকে বিপদমুক্ত থাকার জন্য আলজেসিরাসকে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলে ঠিকই করেছিলেন।

ইউসুফ সেভিলীতে আট দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর বাহিনীকে গুছিয়ে নেন। আল মুতামিদ ৪০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী ইউসুফের নিকট হাযির করে। অন্য সহযোগীদের অবস্থা ছিল খুবই হতশাব্যঞ্জক। তারা সম্মিলিতভাবে মাত্র ৪০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করতে সমর্থ হয়। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা ১০০-এর বেশী সৈন্য দিতে পারেনি। সে যাই হোক, স্পেনের রাজাদের সরবরাহকৃত ৮০০০ সৈন্য নিয়ে তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল ২০,০০০। এবার তিনি আলফনসো-এর সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিশ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন উত্তরে বাদাজোজের দিকে। মদীনা আরটুক্স্রায় তিন দিন অবস্থান করলেন। আলফনসোর বাহিনী বাদাজোজ[৩]-এর দক্ষিণ-পূর্বে ১২ মাইল দূরে ছাউনি ফেলে। আল জালাকা থেকে তাদের দূরত্ব ছিল মাত্র তিন মাইল।

আলফনসো কিছু দিন ধরে সারাগোসা অবরোধ করে থাকার সময় আলজেসিরাসে ইউসুফের আগমন সংবাদ জানতে পারে। যথাশীঘ্র সম্ভব সে আলমোরাভিদদের সাথে মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ইউসুফ মিত্রদের সহযোগিতায় শক্তি বৃদ্ধি অথবা তার বাহিনীকে সুসংগঠিত করার সুযোগ পাবে না। কিন্তু আলফানসো সমস্যায় পড়ল সারগোসা নিয়ে। কারণ তখনও সারগোসা দখল করা সম্ভব হয়নি। বরং সারগোসাবাসীরা যেন নির্ভয়ে খ্রিস্টান সেনাদের প্রতিরোধ করছিল।

ধূর্ত আলফনসো এবার ভিন্ন পথে পা বাড়াল। সারগোসার আমীরের নিকট এই বলে প্রস্তাব পাঠাল যে, পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করলে খ্রিস্টান সেনারা অবরোধ

তুলে নিতে সম্মত আছে। ইতিমধ্যে আমীর এ সংবাদও জেনে গেল যে আলমোরাভিদরা স্পেনের মাটিতে সেনা ছাউনি ফেলেছে। সুতরাং আলফানসোর পক্ষে বেশীদিন সারগোসা অবরোধ করে থাকা সম্ভব নয়। অবিলম্বে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করা তার জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। এতসব জেনে-শুনে সে আলফানসোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। অস্বীকার করল কোন অর্থ প্রদান করতে। উপায়ান্তর না দেখে আলফানসো অবরোধ তুলে নিল। মিত্রদের সহযোগিতায় গড়ে তুলল বিরাট এক বাহিনী। জালাকা নামক ময়দানে সে ইউসুফের বাহিনীর মুখোমুখি হল। অবশ্য খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ এই স্থানটির নাম দিয়েছেন সেকরালিয়াস হিসেবে।

ইউসুফের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে স্পেনের খ্রিস্টান রাজারা এবং অসংখ্য ফরাসী নাইটারও আলফনসোর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আক্রমণকারী এই সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৮০,০০০। এরা সবাই অশ্বের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করত। অশ্বারোহী দলের যোদ্ধারাও ছিল ভীষণ রকমের তেজস্বী এবং দুর্ধর্ষ। একনাগাড়ে ৪০ বছর যাবত তারা মুসলমানদের নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত এবং বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তারা মাথায় লোহার টুপি পরত, আত্মরক্ষার্থে মোটা জামা গায়ে দিত এবং হাতে থাকত ক্ষুরধার লম্বা তলোয়ার। খ্রিস্টান সেনারা ছিল সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করত। সর্বাধিনায়ক হিসেবে তারা এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যার দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সর্বোপরি খ্রিস্টান সেনাদের মনোবলও ছিল অত্যন্ত দৃঢ় এবং অনমনীয়। তারা ভাবত, স্পেনের মাটিতে তাদের এটা কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়, এটা মূলত ধর্মযুদ্ধ। তারা যুদ্ধ করছে মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার এবং খ্রিস্ট ধর্মের অতীত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। তাছাড়া তারা এমন একটি জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করছে যারা সংখ্যা এবং শক্তিতে খুবই দুর্বল এবং হীনবল। ফলে আলফানসো বস্তুগত ও মনোবলের দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল।

এই যুদ্ধে সর্বসাকুল্যে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০,০০০। তন্মধ্যে ১২,০০০ ছিল বারবারদের সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা ছিল অতি উৎকৃষ্টমানের যোদ্ধা। আলমোরাভিদদের মধ্যে ১০ হাজার ছিল হালকা অশ্বারোহী এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ছিল পদাতিক সেনা। বারবাররা ধারাল তলোয়ার, ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা এবং জলহস্তীর চামড়া দিয়ে আবৃত ঢাল ব্যবহার করত। এরা যুদ্ধ করত অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে, আবার প্রয়োজনবোধে পায়ে হেঁটেও যুদ্ধ করত। বারবারদের বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করত। স্পেনের মুসলমান শাসকদের পক্ষ থেকে যে ৮ হাজার সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়, তার মধ্যে অশ্বারোহী এবং পদাতিক উভয় শ্রেণীর সৈন্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু আল মুতামিদের ৪ হাজার সেভিলীয় সৈন্য বাদ দিলে অবশিষ্ট স্পেনীয় সেনারা ছিল খুবই দুর্বল এবং হীনবল সম্পন্ন। যোদ্ধা হিসেবে তাদের উপর

জালাকাহ্‌এর যুদ্ধ
১০৮৬
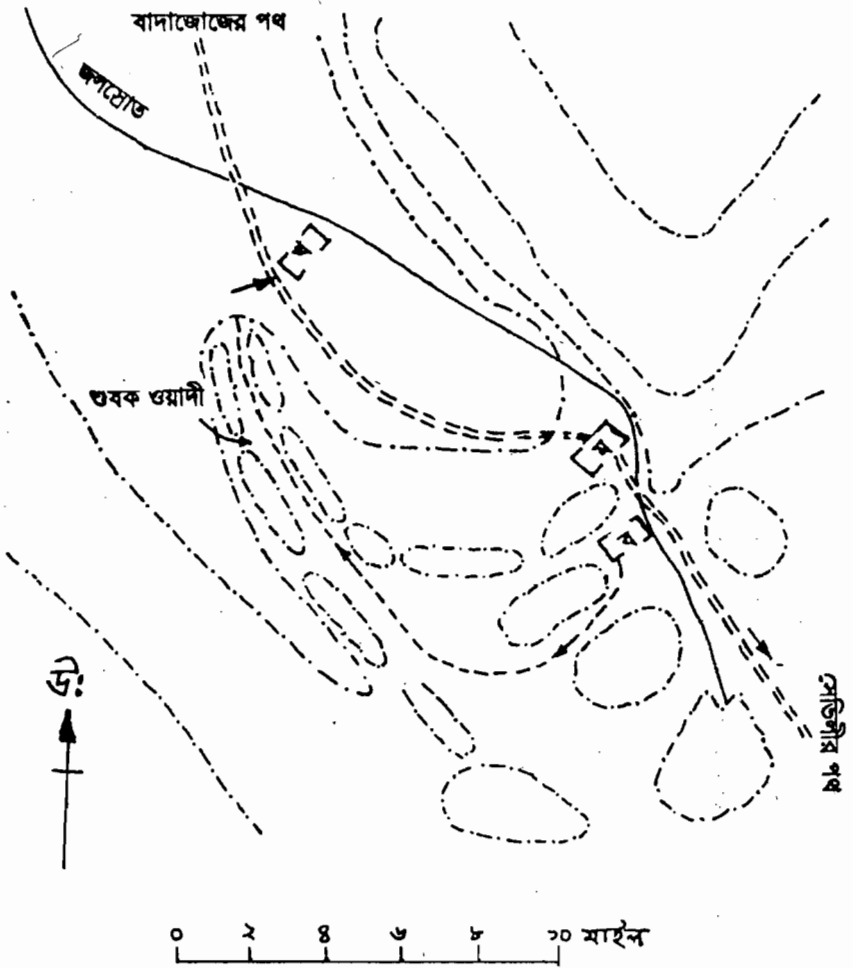
সংকেত চিহ্ন :

ব: বারবারদের সেনাছাউনী
ম: মুরদের সেনাছাউনী
খ: খৃষ্টানদের সেনাছাউনী

খুব বেশি একটা নির্ভর করা যেত না। তারা শিল্প-নির্মিত উন্নতমানের তলোয়ার ব্যবহার করত। এমনকি তাদের ঘোড়াগুলো ছিল জাঁকালো পোশাক দিয়ে আচ্ছাদিত। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যোদ্ধা হিসেবে তাদের জ্ঞান এবং নৈপুণ্য ছিল খুবই সামান্য।

মুসলিম বাহিনীর সংগঠন কাঠামো, মনোবল ও শৃংখলা ছিল নিম্নমানের। আলমোরাভিদদের বাদ দিলে মুসলিম বাহিনীর আর কারোই ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত মনোবল এবং প্রশিক্ষণ ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, স্পেনের মুসলিম শাসকদের মধ্যে যোদ্ধার মনোভাব ছিল না। তারা ছিল পরস্পরের শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা এত নীচ প্রকৃতির ছিল যে যুদ্ধের ময়দানে পরস্পরের বিপর্যয় এবং ধ্বংস দেখার জন্য উদগ্রীব থাকত। এমনকি তারা আলমোরাভিদ এবং স্থানীয় আলেম সমাজের বিপর্যয় প্রত্যাশা করছিল। আলফনসোর সহানুভূতি পাওয়ার আশায় ইউসুফের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তৈরী ছিল।

মুসলিম বাহিনী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে শিবির স্থাপন করে। স্পেনীয় সেনারা সম্মুখভাগে অবস্থান নেয়। কিন্তু এই দলটি দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না। স্পেনীয় সেনাদের মাইল খানেক পেছনেই ছিল বারবার সেনারা। খ্রিস্টান বাহিনী এবং তাদের মাঝখানে ছিল বিরাট পর্বতমালা। মুসলমান সেনারা এমনভাবে অবস্থান নেয় যে তারা পর্বতমালার পেছনে ঢাকা পড়ে যায়। জালাকার যুদ্ধের বিজয় সম্পর্কে আলফনসো এতটা নিশ্চিত ছিল যে, সে তার বাহিনীর প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

জালাকার যুদ্ধ মাঠটি ছিল বৃত্তাকারের একটি সমতল ভূমি। উন্মুক্ত প্রান্তরের উত্তরে ছিল খাড়া উঁচু পর্বত। দক্ষিণ প্রান্তের পর্বতটি তুলনামূলকভাবে নিচু ছিল। সমতল ভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তভাগ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমের অংশ বেশ খোলামেলা এবং উন্মুক্ত। দক্ষিণের পর্বতমালার মাঝামাঝি জায়গাটা টোল বা গহবরের মত। এখানে পর্বতমালা অনেকখানি নিচু। ঢালের এক দিকে রয়েছে খ্রিস্টান বাহিনীর প্রান্ত এবং পশ্চাৎভাগ। ঢালের দক্ষিণ দিকেই রয়েছে একটি উপত্যকা। এর পাশ দিয়েই বয়ে গেছে গুয়াডিয়ানার একটি শাখা নদী। গুয়াডিয়ানার আর একটি শাখানদী উত্তর-দক্ষিণে মুসলিম শিবির থেকে খ্রিস্টান শিবিরের দিকে চলে গেছে। উভয় বাহিনী এই নহরের পানি দিয়েই পিপাসা মিটাত।

ইসলাম ধর্মের রীতি অনুসারে ইউসুফ বিন তাশফিন যুদ্ধের শুরুতেই আলফনসোর নিকট দূত পাঠালেন। বলে দিলেন যে, "হয় তুমি ইসলাম কবুল কর, নয়ত জিযিয়া প্রদান কর।" আলফনসো অত্যন্ত নগ্ন এবং উগ্র ভাষায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বিশাল খ্রিস্টান বাহিনীর বিপুল শক্তির কথা বলে ইউসুফকে হুমকি দেয়। ইউসুফের স্পেনীয় সহযোগীরা আলফনসোর ঔদ্ধত্যের একটি লম্বা জবাব তৈরী করে। জবাবটি ছিল রসকৌতুক মিশিয়ে চমৎকার উপমা-অলংকরণে ভরা কবিতার ছন্দে লেখা একটি পত্র। পত্রটি আলফানসোর নিকট প্রেরণের পূর্বে চূড়ান্ত

অনুমোদনের জন্য ইউসুফের নিকট পেশ করা হয়। ভাল-মন্দ কিছু না বলে তিনি সরাসরি পত্রটি ছিঁড়ে ফেললেন। একজন সৈনিকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই আলফানসোর দেয়া পত্রের উপর সংক্ষিপ্তাকারে লিখে দিলেন-ঠিক আছে, দেখা যাবে কে নির্মূল হয়, আর কে টিকে যায়।

সে আমলে বিবদমান পক্ষ যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে পরস্পরের সুবিধা অনুসারে দিন-তারিখক্ষণ ঠিক করে নেয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। জালাকাহ্-এর প্রান্তরে খ্রিস্টান ও মুসলিম বাহিনীও অনুরূপভাবে সময় নির্ধারণের জন্য তৈরী ছিল। আলফনসো দূত মারফত জানিয়ে দিল যে, আগামীকাল শুক্রবার। এ দিনটি তোমাদের জন্য অতি পবিত্র। রোববার আমাদের জন্য পবিত্র। মাঝখানে শনিবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্য এক দিনের যুদ্ধ পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং আমার ধারণা, সোমবার থেকে যুদ্ধ শুরু করাটাই শ্রেয়। ইউসুফ বিন তাশফিন সরল মনে আলফানসোর এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

কিন্তু সেভিলীর রাজা আল-মুতামিদ আলফনসোর রীতি-নীতি এবং কলাকৌশলকে অনেক দিন থেকেই জানত। সে ভালভাবেই জানত যে আলফানসোকে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আল-মুতামিদের অন্তরে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হল যে, এ ধরনের প্রস্তাবের মধ্যে ধূর্ত আলফনসোর অবশ্যই কোন কুমতলব আছে। সে নিশ্চয়ই কোন ফন্দি এঁটে রেখেছে।

সর্বাধিনায়ক ইউসুফ বিন তাশফিন গভীর মনোযোগ দিয়ে আল-মুতামিদের সমস্ত কথা শোনলেন। এবং তাকে সদা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন। বলে দিলেন যে-খ্রিস্টান বাহিনীর সন্নিকটেই রয়েছে স্পেনীয় সেনাদের শিবির। আলফানসো যাতে অতর্কিতে মুসলিম শিবিরে হামলা চালাতে না পারে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিতে হবে তদনুসারে। সর্বাধিনায়কের পরামর্শ অনুসারে আল-মুতামিদ যথাযথ ব্যবস্থা নিলেন। নিজের চর, গুপ্তচর এবং স্কাউটদের শত্রুশিবিরের উপর কড়া দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিলেন। উপরন্তু, সেভিলীর বাহিনীকে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত থাকার হুকুম দিলেন। বলে দিলেন যে, তোমরা এমনভাবে তৈরী থাকবে যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে যুদ্ধের ময়দানে হাযির হতে পার।

আল-মুতামিদের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হল। দিনটি ছিল ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর মোতাবেক শনিবার। মুসলিম চরেরা লক্ষ্য করল যে, সেই সকাল থেকেই খ্রিস্টান শিবিরে কেমন যেন একটা ব্যস্ততা পড়ে গেছে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় কোন সেনা ছাউনিতে এ ধরনের ব্যস্ততা থাকার কথা নয়। অল্প সময়ের মধ্যে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, আলফনসো যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। প্রত্যূষেই সে মুসলিম শিবিরে আক্রমণ চালাবে। আল-মুতামিদ সেভিলীয় সেনাদের অবিলম্বে তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আন্দালুসিয়ার অন্য রাজাদের জানিয়ে দিলেন এই যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ

পরিস্থিতি সম্পর্কে ইউসুফ বিন তাশফিনকেও জানানো হল। গুপ্তচরেরা লক্ষ্য করল যে, রাতের আঁধারেই খ্রিস্টান সেনারা যাত্রা শুরু করেছে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আলফনসো এবং তার মিত্ররা এগিয়ে আসছে মুসলিম শিবিরের দিকে।

খ্রিস্টানরা যেখানে শিবির স্থাপন করেছিল তার চেয়ে খানিকটা উঁচুতেই ছিল আন্দালুসিয়া বাহিনীর শিবির। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে শিবির প্রান্তে দাঁড়িয়ে ৮০০০ স্পেনীয় সৈন্য বিশাল খ্রিস্টান বাহিনীকে দেখতে পাবে। তারা দেখবে যে ৮০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য অদম্য উৎসাহে ঢেউয়ের তালে তালে শিবিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। মনে হবে এ যেন একটা বিশাল তুষার স্তূপ। ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। এই দৃশ্য যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, এমনি একটি পরিস্থিতি মুসলিম সেনাদের অন্তরে অবশ্যই কাঁপন ধরাবে, টলমল করে উঠবে তাদের পদযুগল। শক্তিহীন করে দেবে তাদের পেশীকে, তাদের চিন্তার স্রোতকে।

পূর্ব গগনে সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানদের অশ্বারোহী সেনারা একযোগে স্পেনীয় শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতবড় আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য শিবিরে ছিল না। যে কয়জন ছিল, তাদের মধ্যেও শৃঙ্খলা এবং প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব ছিল। তবু তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই বহু সংখ্যক স্পেনীয় সৈন্য পশ্চাদপসরণ করল। গা–ঢাকা দিল যুদ্ধের ময়দান থেকে। মুসলিম শিবিরের ঠিক পেছনেই ছিল একটি পর্বতমালা। শত্রুপক্ষের ভারী অশ্বারোহী সেনাদের পক্ষে তাদের পিছু ধাওয়া করা বা পাহাড়-পর্বতে উঠা সম্ভব ছিল না। এই সুযোগে অধিকাংশ পলায়নপর সৈন্য পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিল। সম্ভবত পলায়নপর সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেওয়ার কারণে স্বল্প সংখ্যক সেভিলীয় সৈন্য একেবারে ভেঙে পড়েনি। তাদের বাহিনীতে দেখা দেয়নি বিশৃঙ্খলা। তারা রণে ক্ষান্ত না দিয়ে সাধ্যমত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। জীবনকে বাজি রেখে গিরিসংকটের প্রবেশপথকে নিজেদের দখলে রাখে।

রাজা হলেও আল-মুতামিদ ছিলেন একজন স্বভাবকবি। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কবিতার প্রতি তাঁর আজন্ম ভালবাসা, মদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি, প্রেয়সী রাণী রামিকিয়ার মোহনীয় রূপ-লাবণ্য মুতামিদের সহজাত তেজ এবং সাহসকে নির্মূল করে দিতে পারেনি। হঠাৎ করেই যেন তিনি বাল্য বয়সের সৈনিকের তেজ ফিরে পান। বিশাল খ্রিস্টান বাহিনীর দুর্বার আক্রমণের মুখে তিনি দৃঢ় অবস্থান নেন। সেভিলীয় সেনারাও দাঁড়িয়ে যায় তার পশ্চাতে। তিনি যুদ্ধ করলেন। সেভিলীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন। একই সময়ে তিনি প্রাণ-প্রিয় পুত্র আবু হাশিমের জন্য রোমাঞ্চকর কবিতা রচনা করলেন।

আল-মুতামিদের সেভিলীয় বাহিনী ছিল খুবই ছোট। তাদের তুলনায় আলফনসোর খ্রিস্টান বাহিনী ছিল বিশগুণ শক্তিশালী। আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধে

খৃস্টানদের বিজয় ছিল সুনিশ্চিত। এত কিছু জেনেও তারা যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকল। খ্রিস্টানদের তীব্র আক্রমণের মুখে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলল। মনে হল, এ যেন একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এই প্রাচীর ভাঙা দুষ্কর, ডিঙ্গানো অসম্ভব। আল-মুতামিদ যুদ্ধ করেছিলেন আর বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ইউসুফ বিন তাশফিনের সাহায্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি নিরাশ হলেন। আন্দালুসিয়ার পলায়নপর শাসক এবং তাদের অনুসারীদের ছাড়া আর কাউকে তিনি দেখতে পেলেন না। যুদ্ধে তার পরাজয় অত্যাসন্ন হয়ে উঠে। প্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য এক-একটি দুর্যোগের বার্তা বয়ে আনে। তিনি মাথায় আঘাত পেলেন, কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। শত্রুর আঘাতে তার হাত জখম হল। তবু তিনি আহত সিংহের মত বার বার শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত প্রতিকূলতার মাঝেও আল-মুতামিদ যুদ্ধের ময়দানে অসম সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। তবু যুদ্ধের গতি বিপক্ষে চলে যায়। আল-মুতামিদ যেন ধীরে ধীরে বিপর্যয়ের দিকে এগুতে থাকেন। বস্তুতপক্ষে শুধুমাত্র শত্রু সেনাদের সংখ্যাধিক্য মুতামিদ-এর পিছু হটতে বাধ্য করে। ধীর-মন্থর গতিতে তাকে ঠেলতে থাকে গিরিসংকটের গহ্বরের দিকে। খ্রিস্টান বাহিনীর ডান এবং বাম প্রান্তের সেনারা সামনের দিকে অগ্রসর হলে সেভিলীয়দের সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলতে পারত। তখনই ঘটল তাদের চরম বিপর্যয়। শত্রুসেনাদের চাপের মুখে সেভিলীয়রা গিরিসংকটের সংকীর্ণ পথের উপর এসে দাঁড়ায়। বলতে গেলে ডান ও বাম প্রান্তরে পাহাড়ের গা-ঘেঁষে মুসলমান বাহিনীর প্রান্তভাগের সৈন্যরা খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। অপরদিকে সেভিলীয় সেনাদের সম্মুখভাগ সংকীর্ণ। অশ্বারোহী বাহিনীকে কাজে লাগাতে পারলে সেভিলীয়দের প্রতিরোধ শক্তিকে সহজেই চুরমার করে দেয়া যেত। কিন্তু এই যুদ্ধ ময়দানের সংকীর্ণতার কারণে অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। ঠিক এমনি সময়ে একান্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিকভাবে বারবারদের ২ হাজার দুরন্ত পদাতিক সৈন্য প্রচণ্ড শোরগোল তুলে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। দক্ষিণ দিকের পর্বতমালার ঢাল বেয়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসে। তারা ঠিক পেছন দিক থেকে খ্রিস্টান বাহিনীর ডান প্রান্তের সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়। এতক্ষণে আল-মুতামিদ বুঝলেন মৌলবাদী ইউসুফ বিন তাশফিন কবিকে হতাশ করেনি।

দাউদ ইবনে আয়শা ছিলেন আক্রমণকারী বারবার পদাতিক দলের অধিনায়ক। ২ হাজার সৈন্যের এই দলটি পর্বতমালা ডিঙ্গিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমতল ভূমিতে নেমে আসে। অতর্কিতভাবেই তারা চলে আসে খ্রিস্টানদের আক্রমণ সীমান্তের মধ্যে। কিন্তু এ সময় আল-মুতামিদের ক্ষুদ্র অথচ দুর্দান্ত বাহিনীর প্রতি আলফনসোর দৃষ্টি

এতটা কেন্দ্রীভূত ছিল যে, বারবার পদাতিক সেনাদের যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি একদম টের পায়নি। গিরিসংকটের স্বল্প পরিসরে খ্রিস্টান বাহিনীর অশ্ব এবং অশ্বারোহীরা খুব নিবিড়ভাবে অবস্থান করেছিল। বলতে গেলে তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে অবিন্যস্ত অবস্থায়। যতখানি দ্রুততার সাথে আসন্ন সংকট তথা দাউদের পদাতিক সেনাদের মুকাবিলা করা দরকার ছিল, অবস্থানগত কারণে খ্রিস্টান সেনাদের পক্ষে তা সম্ভব হল না। বারবার পদাতিকেরা দুর্বার আঘাত হেনে খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ করে একান্ত সহজাত প্রেরণা থেকেই খ্রিস্টান সেনারা বারবার পদাতিক সেনাদের দিকে ফিরে দাঁড়ায় এবং তাদের মুকাবিলা করে। এতক্ষণ পর্যন্ত খ্রিস্টানদর সমস্ত শক্তি যেখানে আল-মুতামিদের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল, এবার তা ভাগাভাগি হল। আল-মুতামিদের উপর তীব্র চাপের সাময়িক উপশম হল। আলফনসো লক্ষ্য করল যে, আক্রমণকারী বারবারদের বাহিনীটি খুবই ছোট। আল-মোরাভিদ বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করছে। আলফনসো তখন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পরক্ষণেই তার মনে হল- ইউসুফ বিন তাশফিন কোথায়? সে কখন নির্মূল হল? কার আঘাতে নির্মূল হল? এসব প্রশ্নের কোন জবাবই আলফনসোর জানা ছিল না। প্রশ্নগুলো মনে আসতেই তার স্বস্তি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ পরে এই প্রথমবারের মত তার অন্তরে সংশয়ের দোলা লাগল। যুদ্ধের ময়দানে তবু সে স্থির থাকল। বাহিনীর ডান প্রান্তভাগকে বারবার সেনাদের মুকাবিলা করার হুকুম দিল। অবশিষ্ট বাহিনীকে সবেগে আল-মুতামিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। আলফনসো ভাবল-কখন কোন্ দিক থেকে ইউসুফ আবার আক্রমণ চালাবে তার ঠিক নেই। সুতরাং নতুন কোন বিপদ আসার পূর্বেই আল-মুতামিদকে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

অত্যন্ত সাহসিকাতার সঙ্গে জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধ করলেও আল-মুতামিদের পক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলা করা সম্ভব না। এককভাবে যুদ্ধ করতে করতে তার বাহিনী মুহূর্তের ব্যবধানে হয়ত পশ্চাদপসরণ করবে, পালিয়ে যাবে যুদ্ধের ময়দান থেকে। কিন্তু সে মুহূর্তেও আল-মুতামিদের বিশ্বাস-ধর্মপরায়ণ ইউসুফ তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেবে না। আল-সুরাভিদের আমীর হয়ত তৈরী হচ্ছে। হয়ত এখনই সে যুদ্ধের প্রান্তরে এসে হাজির হবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে খ্রিস্টানদের উপর। ঠিক তখনই তার চোখের সামনে পরপর দুটি ঘটনা ঘটে গেল। ক. আল-সুরাভিদের প্রায় হাজার খানেক অশ্বারোহী তার সাথে যোগ দিল। বাড়িয়ে দিল সেভিলীয়দের প্রতিরোধ শক্তি। খ. ঠিক তার পরক্ষণেই সে দেখতে পেল যে গিরিসংকটের প্রান্তদেশ থেকে মাইল তিনেক দূরে খানিকটা নিচু অংশে যেখানে

খ্রিস্টানরা সেনাছাউনি ফেলেছিল, সেখান থেকে আগুনের লেলিহান শিখা কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

জালাকাহ-এর প্রান্তরে খ্রিস্টান এবং মুসলিম বাহিনী শিবির স্থাপনের পর থেকেই ইউসুফ বিন তাশফিন-এর সময়গুলো খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। চরদের মাধ্যমে তিনি জেনে গেছেন, আলফনসোর বাহিনীর গঠন প্রণালী এবং তার সহযোগীদের আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। তাঁর স্কাউটরা যুদ্ধ ময়দান সম্পর্কে যথাযথভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছে। পর্যবেক্ষণ বাহিনী লক্ষ্য করেছে যে, দক্ষিণ দিকের পর্বতমালার দু'টি চুড়া সমান্তরালভাবে উত্তর দিকে চলে গেছে। দুই চুড়ার মাঝখানেই রয়েছে জলমগ্ন একটি রাস্তা। খ্রিস্টান সেনারা যেখানে শিবির স্থাপন করেছে, ঠিক তার পশ্চাৎ দিয়ে রাস্তাটি পানির উপরে উঠে এসেছে। জালাকার ভৌগোলিক অবস্থা এবং আলফনসোর বাহিনী সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নেয়ার পরই ইউসুফ বিন তাশফিন তার রণকৌশল ও যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে আলফনসো যখন যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক শনিবার সকালে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করছে, তার বহু পূর্বেই ইউসুফ যুদ্ধ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নিয়েছিলেন।

৮ হাজার অশ্বারোহীর একটি দলসহ ইউসুফ পাহাড়ের কুল-ঘেঁষে জালাকার রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। মুসলিম বাহিনীর এই অভিযান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জালাকার যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল এই অভিযানের উপর। এই বাহিনীর ৮ হাজার অশ্বারোহীর মধ্যে ৪ হাজার ছিল ইউসুফ বিন তাশফিনের নিজস্ব গোত্র লামতুনার অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্টরা এসেছিল বৃহত্তর সাহাজাহ বংশ থেকে। ইউসুফের এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল খুবই চাতুর্যপূর্ণ এবং তার মূল পরিকল্পনার একটি অংশ। তিনি আলফনসোর বাহিনীর পশ্চাদভাগের সেনাদের অবসরে না রেখে যুদ্ধে লিপ্ত করতে চেয়েছিলেন। আর সে জন্যই তিনি পশ্চাদভাগ দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্য তার এই পরিকল্পনার সফলতা নির্ভর করছিল স্পেনীয় বাহিনী শত্রুপক্ষের সম্মুখভাগের সেনাদের কতটুকু ব্যস্ত রাখতে পারে তার উপর। কিন্তু স্পেনীয় বাহিনীর সফলতা সম্পর্কে তিনি খুব বেশী নিশ্চিত ছিলেন না। এবং সে কারণেই সায়ের বিন আবূ বকরের নেতৃত্বে ২ হাজার অশ্বারোহী এবং ২ হাজার পদাতিক সৈন্যকে স্পেনীয় বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, সায়ের বিন আবূ বকর ছিলেন ইউসুফের চাচাত ভাই এবং একজন খ্যাতনামা সেনাপতি। তার এই পরিকল্পনা চমৎকার কাজ করল। আলফনসো ৮০ হাজার সৈন্যসহ সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে আটকা পড়ে গেল। সামনের দিকে সে আর এগুতে

পারছিল না। মুসলিম সেনারা প্রান্তভাগ দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এমনি একটি সংকটময় মুহূর্তে ইউসুফ বিন তাশফিন পেছন দিক থেকে অত্যন্ত সফলতার সাথে খ্রিস্টান বাহিনীর কাছাকাছি চলে এলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ১৬ হাজার সৈন্যের পক্ষে কি ৮০ হাজার সৈন্যকে ঘেরাও করে রাখা সম্ভব? তারা কি পারবে এই বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করতে? অথচ বিপক্ষ দলের সেনারা ছিল ভীষণ রকমের সাহসী এবং তেজস্বী। তাদের সঙ্গে ছিল উন্নতমানের সমস্ত রসদ সামগ্রী।

পেছন ফিরে তাকাতেই আলফনসো দেখল, শিবিরের সব কিছু বেহাত হয়ে গেছে। জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে সেনাছাউনি। সে আরও দেখল বারবারদের তাড়া খেয়ে হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য এবং খ্রিস্টান বাহিনীর অনুসারীরা জোরকদমে এদিকে ছুটে আসছে। বিলম্ব না করে আলফনসো তার বাহিনীর পশ্চাদভাগকে পেছন ফিরে বারবার অশ্বারোহীদের আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। কিন্তু যত সহজে সে হুকুম দিল, হুকুম তামিল করা ততখানি সহজ ছিল না। গিরিপথের সংকীর্ণ পরিসরে খ্রিস্টান সেনারা এত ঠাসাঠাসি অবস্থায় ছিল যে নাইটার নিজেদের গুছিয়ে নেয়ার ন্যূনতম সুযোগ পেল না। এবং ভাগ্যচক্রে সেনাবাহিনীর একটি দল যখন এই ঠাসাঠাসি অবস্থান থেকে নিজেদের কোন রকমে মুক্ত করে, ঠিক তখনই তাদের উপর আসে আরও দুর্যোগ। আশ্রিত লোকজন অনুসারী এবং পলায়নপর পদাতিক সেনারা দলে দলে সেখানে এসে জড়ো হতে থাকে। ফলে মূল বাহিনী বেসামাল অবস্থায় পড়ে যায়। এমনকি অগ্রবর্তী অশ্বারোহী দলের যুদ্ধ প্রস্তুতি চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। এবার খ্রিস্টান বাহিনীতে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। অজানা এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই যুদ্ধে খ্রিস্টানদের সংগঠন কাঠামো ছিল খুবই শক্তিশালী। খ্রিস্টান সেনাদের মনোবল ছিল খুবই দৃঢ়। এতক্ষণে তাদের সেই সুবিধাটুকুও হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আল-মুতামিদ এবং সায়ের বিন আবূ বকরের মিলিত শক্তির আক্রমণে মারা গেল অসংখ্য খ্রিস্টান সৈন্য।

সেনাপতি হিসেবে আলফনসো ছিল অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প এবং স্থির স্বভাবের মানুষ। অল্প সময়ের মধ্যেই সে চরম বিশৃঙ্খলার মাঝেও মোটামুটি নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হল। ইউসুফের অশ্বারোহী সৈন্যদের বিরুদ্ধে দলে দলে খ্রিস্টান অশ্বারোহী পাঠাল। কিন্তু আক্রমণকারী খ্রিস্টান অশ্বারোহীদের মধ্যে সমন্বয়ের বড় অভাব ছিল। বারবারদের হালকা অশ্বারোহী ছিল খুবই চঞ্চল এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন। বিপক্ষদলের ভারী এবং শ্রান্ত অশ্বারোহীরা সহজে তাদের কাবু করতে পারল না। ফলে আলফনসোর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বারবারদের অনেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করছিল। উটগুলো নজরে পড়তেই খ্রিস্টানদের ঘোড়াগুলো

একেবারে চমকে উঠে। ঘোড়াগুলোর দৃষ্টিতে উট ছিল একটা আজব প্রাণী। এর গন্ধও ছিল অপ্রীতিকর। উটগুলো দেখে ঘোড়াগুলো এত ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে উটের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নেয়া তো দূরের কথা তারা আরও দ্রুতগতিতে পেছন দিকে সরে আসে। অপরদিকে ইউসুফের অশ্বারোহী সেনারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর ঝটিকা আক্রমণ চালায়। নিবিড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা শত্রুসেনাদের উপর তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করে। কিন্তু শত্রুসেনাদের আক্রমণ সীমানার মধ্যে আসার পূর্বে ফিরে আসে নিরাপদ স্থানে। যুদ্ধ তখন তীব্র আকার ধারণ করে। হামলা-পাল্টা হামলার মধ্য দিয়ে কেটে যায় বেশ কয়েক ঘন্টা।

বিকালের পড়ন্ত বেলায় ইউসুফ বিন তাশফিন চূড়ান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। গোড়া থেকেই ইউসুফ চার হাজার অশ্বারোহীর একটি শক্তিশালী দলকে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। এরা ছিল লামতুনাহ এবং সালহাজা গোত্রের লোক। তিনি এই রিজার্ভ ফোর্সের সাহায্যে শত্রুসেনাদের উপর দুর্বার আক্রমণ চালালেন। সারাদিনের যুদ্ধশেষে আলফনসোর অশ্বগুলো খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। নিঃশেষ হয়ে আসছিল দৈহিক শক্তি। মুসলমানদের রিজার্ভ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুকাবিলা করার মত সামর্থ্য তাদের ছিল না। ঘোড়াগুলো ঠিকমত ছুটতে পারল না। ফলে মুসলমানদের তীব্র আক্রমণের মুখে অসংখ্য খ্রিস্টান সেনা অত্যন্ত অসহায়ভাবে নিহত হল। আহত হল অনেকে। অবশেষে তারা রণে ক্ষান্ত দিয়ে পেছন দিকে ছুটল।

আলফনসো যুদ্ধের ময়দানেই ছিল। একজন সেনেগাল সৈন্য ছোরা দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। পুরু মোটা পোশাকের কারণে সে জীবনে বেঁচে গেল। কিন্তু সে পায়ে বড় রকমের আঘাত পেল। ইতিমধ্যে তাঁর একান্ত অনুগত ৫০০ নাইট সেখানে এসে পড়ে। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখেও তারা আলফনসোকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আলফনসোর এটাই ছিল শেষ যুদ্ধ। জীবনে আর কখনও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস করেনি। জালাকার এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ২০ হাজার অশ্বারোহী এবং ১০ হাজার পদাতিক সেনা মারা যায়। মুসলমানদের হাতে বন্দী হল হাজার হাজার সৈন্য।

পরের দিন প্রত্যূষে সেনাপতি ইউসুফের কাছে কতগুলো দুঃসংবাদ এসে পৌঁছে। তিনি জানতে পারেন তার পুত্রের ইন্তেকালের খবর। স্পেনে আসার পূর্বে এই পুত্রের হাতেই তিনি উত্তর আফ্রিকার শাসনভার দিয়ে এসেছিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতি এবং পুত্রের মৃত্যুতে উত্তর আফ্রিকায় কতিপয় বারবার গোত্র গোলযোগ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। বিলম্ব না করে তিনি তাঁর বাহিনীসহ

স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। ৩ হাজার বারবার সৈন্যসহ সায়ের বিন আবূ বকরকে রেখে গেলেন স্পেনে। এই বাহিনীকে রেখে গেলেন স্পেনীয়দের চাহিদানুসারে তাদের সাহায্য করার জন্য। ইউসুফ বিন তাশফিন এই যে গেলেন, আর কখনও স্পেনের মাটিতে ফিরে আসেননি।

ইউসুফ বিন তাশফিন যদি তাঁরা গোটা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারতেন, পলায়নপর খ্রিস্টান নাইটদের পিছু ধাওয়া করে ভেঙে দিতে পারতেন তাদের মেরুদণ্ড, তাহলে এই যুদ্ধের ফলাফল আরও সুদূরপ্রসারী হত। তবু তাৎক্ষণিকভাবে খ্রিস্টানদের যে ক্ষতি হয়, বহু বছরেও তারা তা পুষিয়ে নিতে পারেনি। সর্বোপরি নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করতেই হবে যে, জালাকার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় না হলে ১০৯২ খ্রিস্টাব্দেই দেশটি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যেত। স্পেন চলে যেত খ্রিস্টানদের দখলে।

হাত্তিন-এর যুদ্ধ

(৪ জুলাই ১১৮৭)

"যীশুখ্রিস্টের সমাধিগৃহের পথে অগ্রসর হও। এই সমাধিকে রক্ষা কর দুরাত্মাদের কবল থেকে।" উত্তেজনাপূর্ণ এই কথাগুলো পোপ দ্বিতীয় আরবানের ভাষণের একটি অংশ। ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর ক্লেরমন্ট-এর একটি ধর্মীয় অধিবেশনে তিনি এই ভাষণটি দিয়েছিলেন। জন্মসূত্রে ফরাসী পোপ আরবানের এই বক্তৃতা মধ্যযুগীয় বিশ্বের জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পশ্চিম এবং প্রাচ্যের জনগণকে আকস্মিকভাবেই যেন হত্যার উন্মত্ততায় পেয়ে বসে। হানাহানির এই ধারা চলতে থাকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী।

তিনি এমন এক সময়ে এই ভাষণটি পেশ করেন, যখন স্পেনের ঘাঁটি থেকে মুসলমানরা উপর্যুপরি ফ্রান্সে অভিযান চালিয়েছিল এবং এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল ভিন্নতর। তাঁর এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা সহসা খ্রিস্টানদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। পোপ দ্বিতীয় আরবানের বক্তৃতার সূত্র ধরে সর্বত্র এ ধরনের একটি রব উঠে যে-"পোপ আরবান যা বলেছেন সেটাই প্রভুর ইচ্ছা, প্রভুর হুকুম।" বস্তুতপক্ষে শুধুমাত্র দক্ষিণ ফ্রান্সেই নয়, ইউরোপবাসীরাও এই বক্তব্যের সঙ্গে সুর মেলায়। পরস্পরে আঁতাত গড়ে তোলে। রাজা এবং ক্রীতদাস, যাজক এবং সাধারণ মানুষ, পুরুষ-মহিলা, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর সকল মানুষকেই অদ্ভুত রকমের একটা মানসিক ব্যাধিতে পেয়ে বসে। গোটা খ্রিস্টান জগতে দেখা দেয় এই ধর্ম উন্মাদনা। যেখানে দাঁড়িয়ে মুসলমানরা সত্যের ডাক দিয়েছিল, সেখান থেকে তাঁদের নির্মূল করার জন্য পাগলপারা হয়ে পড়ে। মানব ইতিহাসের কোন আন্দোলনই একটি মাত্র কারণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি। যে কোন আন্দোলনের পেছনেই থাকে একাধিক কারণ। অনুরূপভাবে ধর্মযুদ্ধের আবরণে ক্রুসেডের সূত্রপাত হলেও ধর্মকে একক কারণ, এমনকি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক এবং মানুষের কল্পনাপ্রবণ মনও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক নেতারা নিজেদের প্রয়োজনে নতুন নতুন রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্যে ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী মহল, বিশেষ করে ইটালীর জেনোয়া, ভেনিস এবং পিসা এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে। তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা হয়ত ছিল, তবুও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় এটা ছিল অনেকখানি নিষ্প্রভ। যারা কল্পনাবিলাসী চঞ্চল এবং দুঃসাহসিক অভিযান-প্রিয়-তারা

এমনিতেই যে কোন আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল। আবার যারা অপরাধী, যারা পাপী, তারা ক্রুসেডকে গ্রহণ করেছিল প্রায়শ্চিত্ত করা বা হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে। অপরদিকে ক্রুসেডের নামে ধনিক শ্রেণী যেমন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, দরিদ্র-নিঃস্বরাও তেমনি বসে থাকেনি। কিন্তু ক্রুসেডে অংশ নেয়ার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। ক্রুসেডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধনীরা যখন করভার থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল, সহায়-সম্বলহীন নিঃস্বরা তখন ক্রুসেডের চিহ্ন ব্যবহার করে নিজেদের উৎসর্গ করার পরিবর্তে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

১০৭১ সালে মানজিকার্টের যুদ্ধের পর থেকেই তুর্কী সেলজুকরা রোমান সম্রাটকে অবিরাম চাপের মুখে রেখেছিল। এই অবস্থার উত্তরণের আশায় রোমান সম্রাট পোপের সাহায্য প্রার্থনা করে। তখনকার দিনে রোমের সঙ্গে গ্রীক চার্চের সম্পর্ক ছিল শিথিল। বলতে গেলে উভয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। এমনি এক মুহূর্তে রোম সম্রাটের আবেদনকে পোপ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলেন। স্থির করলেন যে, এই সুযোগে রোম সম্রাটের সঙ্গে গ্রীক চার্চের মধ্যকার বৈরীভাবকে দূর করতে হবে। সুসংহত করতে হবে খ্রিস্টান শক্তিকে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সম্মিলিত খ্রিস্টান জগতের প্রধান হিসেবে।

অনুমান করা হয় যে, ক্রুসেডের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে খ্রিস্টান পুরোহিত বা যাজক ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। তাঁর এই উদ্যোগ নেয়ার পেছনে একটি রাজনৈতিক কারণও ছিল। এ সময় তাঁর অনুসারী জায়গীরদের মধ্যে অনবরত গৃহযুদ্ধ লেগে থাকত। বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে তিনি দেশের অভ্যন্তরে কলহ-কোন্দলকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। ইতিপূর্বে ধর্ম ছিল ধর্মযাজকগণের শক্তিশালী একটি হাতিয়ার। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা সহজেই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, দমন করতে পারতেন বাদ-বিসংবাদকে। কিন্তু পরবর্তীতে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ এবং পর্বতপ্রমাণ অসন্তোষের কারণে ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাতে করে জনগণের কাছে ধর্মীয় আবেদন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি পোপ এবং যাজকগণের এমনিতেই অসন্তোষ এবং ঘৃণার ভাব ছিল। বস্তুতপক্ষে এইসব বিষয় তাদেরকে একটা উগ্র আদর্শবাদের দিকে ঠেলে দেয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ধর্মযুদ্ধকে একমাত্র প্রতিষেধক হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ধর্মযুদ্ধের শুরুতেই নেতৃত্বদানকারী ধর্মযাজকগণ মস্তবড় একটি বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। এ ধরনের সমস্যায় নিপতিত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল- খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যার ব্যাপারে

মুসলমানগণ ছিলেন যথেষ্ট যত্নবান এবং সহনশীল। খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদেরও তারা সহৃদয়তার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং দেখাশোনা করতেন। কেবলমাত্র একাদশ শতাব্দীতেই ১১৭টি তীর্থযাত্রী দল পুণ্যভূমি সফর করে। তন্মধ্যে একটি দলের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ছিল এগার হাজার। পবিত্র স্থানসমূহে পরিদর্শনের ব্যাপারে তাদের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। এ জন্য. তীর্থযাত্রীদেরকে নামমাত্র খাজনা দিতে হত। বিনিময়ে তারা সব রকমের লুটতরাজ থেকে নিরাপত্তা পেত। অথচ সমসাময়িককালের ইউরোপে এ ধরনের নিরাপত্তা প্রাপ্তির বিষয়টি ছিল সত্যিকার অর্থে একটি দুর্লভ ব্যাপার।

কিন্তু ধর্মযুদ্ধ শুরু করার জন্য মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আজন্ম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এ কাজ করতে গিয়ে তাদের আজব সব কল্পনার আশ্রয় নিতে হল। তারা সত্য গোপন করে প্রচার করল বানোয়াট সব গল্পকাহিনী। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং জাতিগত বিভেদের কথা তুলে নানাভাবে মুসলমানদের কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হল। সম্ভাব্য সকল উপায়ে খ্রিস্টানদের নিকট আবেদন জানানো হল, উত্তেজিত করা হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। খ্রিস্টানদের প্রথম সারির লেখকগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিরাম কলম চালালেন। লিখে গেলেন হাজার রকমের অসত্য কথা, ন্যক্কারজনক সমস্ত কল্পকাহিনী। এমনকি তাদের লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগও উত্থাপন করা হল যে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে যে মরিচ রপ্তানী করা হয়, তাতে বিষ মিশানো থাকে। অথচ তাদের এই কথাটি ছিল একটা ডাহা মিথ্যা। এমনিভাবেই পোপের উদাত্ত আহবান এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সকলেই উত্তেজিত হল। প্রচারপত্র এবং বুলেটিন পৌঁছে গেল সকলের ঘরে ঘরে। জনশ্রুতি এবং পৌরাণিক কাহিনী সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হল। গদ্য কবিতায় ছেয়ে গেল সারাদেশ। তীর্থযাত্রীদের অসত্য মিশ্রিত চিঠিপত্র ঘুরে বেড়াল এক হাত থেকে আরেক হাতে। এমনকি তারা এ ধরনের চিত্র তৈরী করল যে একজন মুসলমান ক্রুসের উপর দিয়ে সজোরে হেটে যাচ্ছে, ক্রুসকে দলিত-মথিত করছে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে। বিভিন্ন শহরে এই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পোপের উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানরা তৈরী হয়ে যায়। ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে তারা প্যালেস্টাইনের পথে যাত্রা শুরু করে। ক্রুসেডে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল যাযাবার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুযোগ পেলেই লুটতরাজ করা, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এদের মজ্জাগত স্বভাব। ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও খ্রিস্টানরা এ অভ্যাসটি পরিত্যাগ করতে পারেনি। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই তারা লুটতরাজ, নিরীহ মানুষদের হত্যা এবং নারী নির্যাতনে মেতে উঠেছে। জেরুযালেমে পৌঁছার উদগ্র লিপ্সা নিয়ে ঘর ছাড়লেও অধিকাংশ ক্রুসেডার

কনস্টানটিনোপল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারল না। তাদের অন্যায় আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে সদ্য ধর্মান্তরিত লাভ এবং মেগিয়ারনরা ক্রুসেডারদের অনেককে হত্যা করল।

প্রকৃতপক্ষে ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দের বসন্তের শুরুতে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়। এ সময়ে ক্রুসেডাররা ছিল সত্যিকার অর্থেই সংগঠিত। প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার খ্রিস্টান এতে অংশ নেয়। এদের অধিকাংশই ছিল ফরাসী এবং নরম্যান। ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্দারদের নেতৃত্বে তারা স্থলভাগ দিয়ে কনস্টানটিনোপলের পথে যাত্রা শুরু করে। পূর্ববর্তী ক্রুসেডারদের মত এরা এতটা হিংস্র ও লুটতরাজপ্রিয় না হলেও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পর্কে রোমান সম্রাটের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সে কারণেই রোমান সম্রাট ক্রুসেডারদেরকে রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ না দিয়ে এশিয়ার মধ্য দিয়ে পথ চলার ব্যবস্থা করে। এমনিভাবেই ক্রুসেডের শুরু এবং পরবর্তী তিন শতাব্দীব্যাপী তা অব্যাহত থাকে।

মধ্যযুগের মুসলিম নৌবহর তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। ফলে ক্রুসেডাররা নৌ-পথে না এসে কয়েক দশক পর্যন্ত দীর্ঘ স্থলপথ দিয়েই যাতায়াত করত। পরবর্তীতে পিসা, ভেনিস এবং জেনোয়া সাধারণ তন্ত্রের নৌশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পরই তারা যাতায়াতের জন্য জলপথকে বেছে নেয়। রোমান সম্রাটের মতলব ছিল খানিকটা ভিন্ন। ক্রুসেডারদেরকে দিয়ে সে বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রুসেডারদের প্রতি রোমান সম্রাট আস্থা রাখতে পারছিল না। কেবলমাত্র কিছু কিছু অঞ্চল জয় করার প্রচেষ্টায় রোমান সম্রাট ক্রুসেডারদের সাহায্য করে। এর বাইরে তাদের সাহায্যের পরিমাণ ছিল খুবই সীমিত। অবশ্য তাদের সাহায্য করার বড় একটা সুযোগও ছিল না। কারণ, আনাতোলিয়া তুরস্ক সুলতানরা, বিশেষ করে রোম এবং দানিশমন্দের সুলতানরা সব সময় রোম ক্রুসেডারকে ব্যতি-ব্যস্ত রাখত। তবে একথা ঠিক যে রোমান সম্রাট যেমন ক্রুসেডারকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত না, তেমনিভাবে ক্রুসেডাররাও সম্রাটের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেনি।

যে সময়টাতে প্রথম ক্রুসেডের ডাক দেয়া হয়, তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতি ক্রুসেডের অনুকূলে ছিল না। সে সময়ে এশিয়া মহাদেশে সেলজুকরা বসেছিল ক্ষমতার আসনে। তাদের ক্ষমতার দাপট এত বেশী ছিল যে ক্রুসেডাররা সেখানকার মাটিতে পা রাখার সুযোগ পেল না। কিন্তু মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। বিশাল বিস্তৃত সেলজুক সাম্রাজ্য ছোট ছোট অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ লেগে থাকত। আনাতোলিয়ার পশ্চাৎভূমি ছিল রোমের সুলতানদের অধীনে। অনুরূপভাবে সিরিয়া এবং উত্তর প্যালেস্টাইনেও ছোট ছোট অসংখ্য রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। শক্তিসামর্থ্যে এরা ছিল খুবই দুর্বল। জেরুযালেমসহ দক্ষিণ প্যালেস্টাইন এবং মিশর ছিল শিয়া ফাতেমীদের দখলে।

শিয়া-সুন্নীর মধ্যকার ভ্রাতৃঘাতী বিবাদ চরমে পৌঁছে। গুপ্ত হত্যা, খুন-খারাবি নিত্য দিনের ঘটনায় পরিণত হয়। এমনি পরিস্থিতিতে ক্রুসেডাররা তাদের যাত্রাপথে খুব সামান্যই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হল। নিসাইয়া এবং দরিলিয়াম আনাতোলিয়ার দু'টি প্রধান শহর। নিসাইয়া ছিল রোম সুলতানের রাজধানী এবং দরিলিয়ামের সাম্প্রতিক নামকরণ করা হয়েছে এক্সকি শহর হিসাবে। প্রথমে ক্রুসেডাররা শহর দু'টি দখল করে। পরে তা রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। উত্তর সিরিয়ার অন্তর্গত 'এডেশা' ছিল আর্মেনীয় রাষ্ট্র। এডেশা প্রথমত ক্রুসেডার রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এতদতঞ্চলে প্যালেস্টাইনের অবস্থা ছিল সবচাইতে দুর্যোগপূর্ণ। এখানকার শহরগুলো ছিল খুবই অরক্ষিত। মাত্র এক হাজার মিশরীয় সৈন্য জেরুযালেম প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। অথচ আক্রমণকারী ক্রুসেডের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তন্মধ্যে নাইটের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। ফলে এই বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা মুষ্টিমেয় মিশরীয়দের পক্ষে জেরুযালেম রক্ষা করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রায় মাস খানেক শহরটি অবরোধ করে রাখার পর ক্রুসেডাররা জেরুযালেম দখল করে নেয়। তবু এ কথা সত্য যে জেরুযালেম দখল করতে গিয়ে ক্রুসেডারদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল এবং এই যুদ্ধকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচাইতে বড় এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জেরুযালেম দখলের পরই শান্তির 'দূতেরা' হত্যালীলায় মেতে উঠে। যাকে পায় তাকেই নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তাদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড থেকে ইহুদী-মুসলমান, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী কেউ রেহাই পেল না। নরবলি দিয়েই তারা চরম সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করল। জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই পালিত হল পবিত্র নগরী পুনরুদ্ধারের বিজয় উৎসব। আরব ঐতিহাসিকগণের মতে এ সময়ে সত্তর হাজারের বেশী লোক ক্রুসেডারদের নরবলির শিকার হয়। একজন আর্মেনীয় খ্রিস্টানের মতে এই সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি হাজার। রোমানদের বর্ণনা মতে, "সব কায়ার এবং রাজপথে নরহত্যের পাহাড় জমে উঠল।" অসহায় মুসলমানদের অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় পবিত্র সমাধি এবং আল-আকসা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে গিয়েও তারা রেহাই পেল না। ক্রুসেডারদের তলোয়ারের আঘাতে তাদের শির দ্বিখণ্ডিত হল। পবিত্র সমাধিতে জমে গেল হাঁটু পরিমাণ রক্ত। সেই রক্তেই তাদের দাফন সম্পন্ন হল। মুসলমানদের সহযোগিতা করার অপরাধে ক্রুসেডার ইহুদীদের প্রতিও ছিল ক্ষিপ্ত। উপায়ান্তর না দেখে তারা দল বেঁধে প্রধান ধর্মমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিল। শান্তির ভক্ত ক্রুসেডাররা বিজয় উল্লাসে ধর্মমন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানেই তাদের অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে। অন্যান্য শহরের অবস্থা এর চাইতে ভিন্নতর কিছু ছিল না। ক্রুসেডাররা যেখানে গেছে, সেখানেই ইহুদী এবং মুসলমানকে ভাসতে হয়েছে তাদেরই তাজা রক্তে।

প্যালেস্টাইন জয়ের পর ক্রুসেডাররা এখানে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এই রাষ্ট্র ল্যাটিন রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত। গডফ্রে ডি বার্ডলিন এই রাষ্ট্রের প্রথম শাসক। প্রধানত ফরাসীসহ অন্যান্য অভিজাত সর্দাররা অধিকৃত রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। কিন্তু রাজা হিসাবে গডফ্রে-এর অধীনতা স্বীকার করে নিল এবং তার প্রতি সম্মান দেখাল যথাযথভাবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ল্যাটিন রাষ্ট্র দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরও সম্প্রসারিত হল। এবং ১১১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ইহা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। তবু বিচার-বিশ্লেষণের নিরিখে সহজেই বলা যায় যে গোড়া থেকেই ক্রুসেডারদের এই বিজয় ছিল শূন্যগর্ভ বা অন্তঃসারশূন্য। ইচ্ছে করলে প্রথম ক্রুসেডের সময়ই ক্রুসেডাররা সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্‌ক দখল করতে পারত। এমনকি তার কিছুকাল পরে মুসলমানদের মধ্যে যখন চরম মতানৈক্য এবং দুর্বলতা দেখা দেয়, তখনও ক্রুসেডারদের পক্ষে দামেশক জয় করা বিচিত্র কিছু ছিল না। বস্তুতপক্ষে দামেশক জয় করার ব্যর্থতার মধ্যেই ক্রুসেডারদের ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল।

ল্যাটিন রাষ্ট্রের চারপাশেই ছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। সিরিয়া, ফ্রান্স, জর্দান অথবা মিসর থেকে দিন কয়েকের অভিযান চালিয়ে তারা ল্যাটিন রাষ্ট্রে পৌঁছাতে পারত। তন্মধ্যে সিরিয়া ছিল তাদের অতি নিকটবর্তী একটি দেশ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। পূর্ব সীমান্তে ক্রুসেডাররা খুব বেশীদূর অগ্রসর না হওয়ার কারণে সিরিয়া থেকে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। ফলে তারা ল্যাটিন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া বিষয়-সম্পদের দিক থেকে ক্রুসেডারদের চেয়ে মুসলমানদের প্রাচুর্য ছিল অনেক বেশী। জনসম্পদের দিক থেকেও তারা ছিল অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ ও মতানৈক্য থাকবে, নিজেরা লিপ্ত থাকবে আত্ম-কলহ ও বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে কেবলমাত্র ততদিন পর্যন্ত ল্যাটিন রাষ্ট্রের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব।

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নিকট প্রাচ্যে খণ্ড খণ্ড কতকগুলো মুসলমান অথবা খ্রিস্টান শাসিত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। ইরাকী সেলজুকেরা মোসেল, ইরাক এবং আলেপ্পো শাসন করত। অপরদিকে রোম কেন্দ্রিক সেলজুকেরা শাসন করত পশ্চিম আনাতোলিয়া। আরতোকিদ তুর্কীরা যখন দিয়ার বকর এবং সারদিন শাসন করত তখন মধ্য ও দক্ষিণ আলাতোলিয়া ছিল দানিশমান্দ তুর্কীদের শাসনাধীন। বারিদরা শাসন করত দামেশক। অপরদিকে মিশরে ক্ষয়িষ্ণু ফাতেমীয় (শিয়া) খলিফাদের শাসন বলবৎ ছিল। বেশ কিছু সংখ্যক আরব সর্দার সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। আসাসিনদের শাসন এবং অবস্থান ছিল খুবই সুরক্ষিত।

অপরদিকে খ্রিস্টান জগতের অবস্থা ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ মধ্য এবং পশ্চিম আনাতোলিয়া থেকে শুরু করে এন্টিয়ক পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের মধ্যে কনস্টানটিনোপল

দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ সিরিয়া
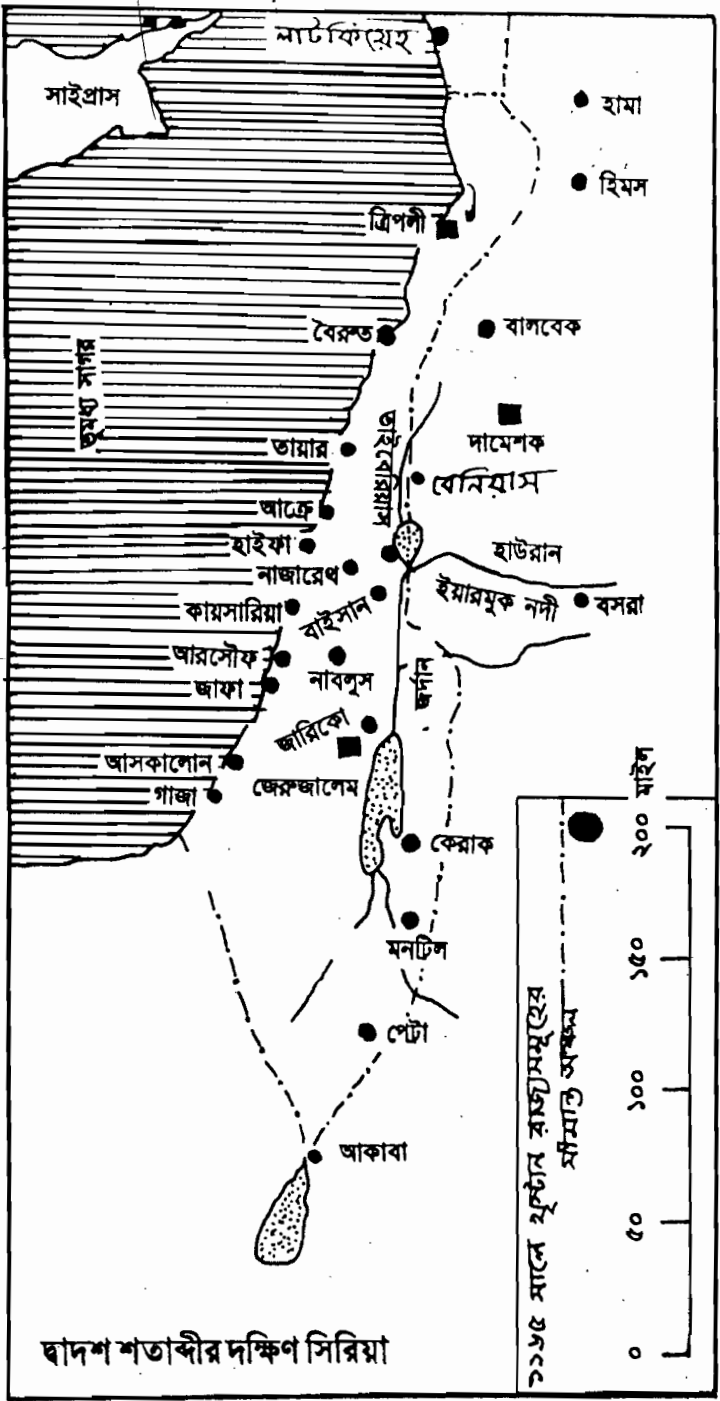
কেন্দ্রিক রোমান সম্রাটই ছিল সবচেয়ে বেশী শক্তিমান শাসক। জর্জিয়ার রাজারাও বেশ শক্তিশালী ছিল। পার্শ্ববর্তী উত্তর ইরাক, উত্তর ইরান এবং পূর্ব আনাতোলিয়ার মুসলমানদের সঙ্গে জর্জিয়ার রাজাদের বড় একটা তুলনা হত না। খ্রিস্টান আর্মেনীয়রা দক্ষিণ আনাতোলিয়া এবং উত্তর সিরিয়ার কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শাসন করত। দক্ষিণে ক্রুসেডারদের রাষ্ট্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এডেশা থেকে এন্টিয়ক এবং মিশরের সীমান্ত থেকে মৃত সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার কেরাক পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল ক্রুসেডারদের রাষ্ট্র।

মুসলমান শাসিত রাষ্ট্রগুলো সব সময় নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল তাদের জন্য নিত্য দিনের ঘটনা। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রায়শই তারা খ্রিস্টান শাসকদের সাহায্য-সহংযোগিতা গ্রহণ করত। খৃস্টান শাসকেরা যে একতাবদ্ধ ছিল তাও নয়। তাদের মধ্যেও বিরাজ করছিল যথেষ্ট মতানৈক্য। তবে প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ন্যায় খ্রিস্টানদের মধ্যকার বিবাদ বা মতানৈক্য এতটা প্রকাশ্য ছিল না।

মুসলমানদের মধ্যে ইমাদ-উদ্দীন জঙ্গী সর্বপ্রথম ক্রুসেডের বিরোধিতা করার গৌরব অর্জন করেন। ১১২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মোসুল-এর শাসনভার গ্রহণ করেন। পরের বছর তিনি আলেপ্পো দখল করে নেন। গাঢ় নীল চোখবিশিষ্ট এই তুর্কী সেনা ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যুদ্ধপ্রিয় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অমিততেজা ও নিবেদিতপ্রাণ একজন বীর পুরুষ। গোড়া থেকেই তিনি ক্রুসেডারদের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ও সজাগ ছিলেন। অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে তিনি তাঁর কর্মকৌশল ঠিক করে নিলেন। তিনি ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ক্রুসেডারদের রাষ্ট্র অবরোধ করার পূর্বে তাকে তিনটি কাজ অত্যন্ত যত্ন এবং নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমত, প্রতিদ্বন্দ্বী বারিদ রাজবংশ থেকে দামেশক পুনঃ দখল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আরেনটেস অঞ্চলে অবস্থিত ক্রুসেডারদের অগ্রবর্তী দুর্গগুলো দখল করতে হবে। তাহলে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই প্যালেস্টাইন এবং লেবাননের ক্রুসেডারদের আক্রমণ করা যাবে। তৃতীয়ত, উত্তর সিরিয়ার এডেশায় ক্রুসেডারদের যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নির্মূল করে দিতে হবে। নিজ রাজ্যের উত্তর সীমান্তকে বিপদমুক্ত করার জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া এডেশাকে অক্ষত অবস্থায় রেখে মোসুল, আলেপ্পো এবং দামেশকের মধ্যকার যোগাযোগ নিরাপদ ও নিশ্চিত করা যেত না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা দাঁড়াল অন্যরকম। প্রতিবেশী মুসলমান শাসকগোষ্ঠী তার পরিকল্পনাকে কন্টকাকীর্ণ করে তুলল। ইমাদ-উদ্দীন জঙ্গীর শক্তি বৃদ্ধিকে তারা কোনক্রমেই সহজভাবে নিতে পারল না। অহেতুকভাবে তারা জঙ্গীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। অকারণে যুদ্ধ বাঁধাল। ফলে ক্রুসেডের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ বিলম্বিত

দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর সিরিয়া
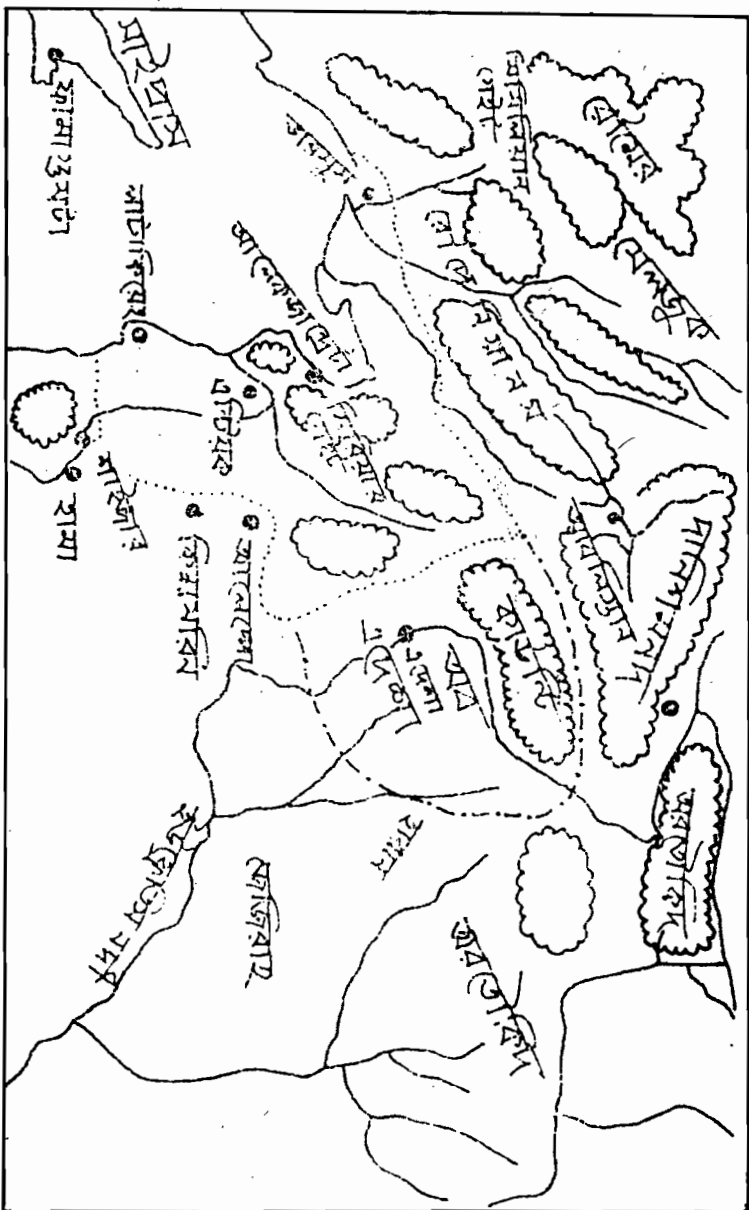
হল, বারবার বিপর্যস্ত হল তার সর্বাত্মক প্রয়াস। অবশেষে ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এডেশা দখল করতে সমর্থ হন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এডেশাতেই ক্রুসেডাররা প্রথম ল্যাটিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেখান থেকেই ক্রুসেডাররা সর্বপ্রথম নির্মূল হল। অতঃপর ইমাদ-উদ্দীন জঙ্গী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আরেনটেস এলাকার ক্রুসেডারদের অনেকগুলো দুর্গ দখল করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তিনি ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে দামেশকে অভিযান চালিয়েছিলেন। স্থানীয় 'সি বারিদ' শাসক ক্রুসেডারদের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সম্মিলিত শক্তি ইমাদ-উদ্দীন জঙ্গীর আক্রমণকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দে আবারো তিনি দামেশক দখলের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। একজন গৃহভৃত্যের হাতে তিনি নিহত হলেন। এ সময় ইউরোপ দ্বিতীয় ক্রুসেডের জন্য তৈরী হতে শুরু করল।

ইমাদ-উদ্দীন জঙ্গীর ইন্তেকালের পর তার আমীরাত ভাগাভাগি হয়ে যায়। বড় ছেলে মোসুল এবং দ্বিতীয় ছেলে নূরুদ্দীন আলেপ্পোর শাসনভার গ্রহণ করে। আমীরাত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পায়। ঠিক তখনই শুরু হয় দ্বিতীয় ক্রুসেড। ফ্রান্স এবং জার্মানীর রাজারাও দ্বিতীয় ক্রুসেডে যোগ দেয়। দুর্বল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এবার সম্মিলিত শক্তির মুকাবিলা করতে হল। শুরুতেই বিশাল খ্রিস্টান বাহিনী দামেশকে অবরোধ করে। এদিকে নূরুদ্দীনও চঞ্চল হয়ে উঠেন। পশ্চাৎদিক থেকে ক্রুসেডারদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। ক্রুসেডারদের তুলনায় তার বাহিনী ছিল খুবই ছোট। কিন্তু তাদের গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। নূরুদ্দীনের এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে ক্রুসেডাররা চার দিন পর অবরোধ তুলে নেয় এবং প্যালেস্টাইনে ফিরে আসে। অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত যে ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়েছিল, অত্যন্ত হীন এবং লজ্জাজনকভাবেই তার পরিসমাপ্তি ঘটল। এমনিভাবেই নূরুদ্দীন ক্রুসেডের বিরুদ্ধে ইসলামের দ্বিতীয় বীর সেনানী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় নূরুদ্দীন নতুন কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেননি। তিনি তাঁর পিতার রণকৌশল অবলম্বন করলেন। ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দামেশক দখল করেন। ক্রুসেডারদের তুলনায় বাহিনীর আর্থিক সঙ্গতি এবং জনশক্তি ছিল একান্তই অপ্রতুল। খ্রিস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক কোন অভিযান চালান অথবা চূড়ান্ত কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি ক্রুসেডারদের উপর অব্যাহত চাপ বজায় রাখলেন। ইতিমধ্যে ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী রাজা আমালরিক খুবই সচল হয়ে উঠে। ফাতেমীয় শাসনাধীন মিশরের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লাগে। রাজা আমালরিক তার প্রচেষ্টায় বেশ খানিকটা সফল হন। একজন মিশরীয় মন্ত্রীকে তিনি পদচ্যুত করেন। উপায়ান্তর না দেখে মন্ত্রী নূরুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করে। নূরুদ্দীনের সেনাবাহিনী এমনিতেই খুব বেশী বড় ছিল না। এবং সে কারণেই তাঁর বাহিনীর অংশ

বিশেষকে মিশর পাঠাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন।

সুলতানের সেনাপতির নাম ছিল শিরকুহ। অসম সাহসিকতার জন্য তাকে বলা হত 'পর্বতের সিংহ'। মিশরে সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে তাঁর ধারণা ছিল অন্য রকম। সুলতান নূরুদ্দীনকে বললেন-প্যালেস্টাইন থেকে ক্রুসেডারদের উৎখাত করার জন্য প্রয়োজন সম্পদ ও শক্তির। মিশরে রয়েছে সেই সম্পদসম্ভার। এমতাবস্থায় সিরিয়ার সঙ্গে মিশরের সেই সম্পদ রাশির সংযোগ না হলে ক্রুসেডারদের নির্মূল করার প্রচেষ্টা একটা দুরাশা মাত্র। শিরকুহ বারংবার সুলতানকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে সুলতান নূরুদ্দীন কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত না নিয়েই এলোমেলোভাবে কুরআন শরীফের পাতা উল্টালেন। এবং খোলা পাতার বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কর্মপন্থা ঠিক করে নিলেন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি ছোট অশ্বারোহী বাহিনী মিশর পাঠানোর ব্যবস্থা নিলেন। শিরকুহকে নিয়োগ করলেন এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে। খুব বেশী লম্বা না হলেও তিনি ছিলেন খুবই বলিষ্ঠ। তার চোখ ছিল একটি। মুখমণ্ডলের রং ছিল লাল টুকটুকে। সেনাপতি হিসেবেও যথেষ্ট প্রতিভাবান। নিজাম উদ্দীন আইয়ুব নামে শিরকুহ-এর একজন জেনারেল ছিলেন। তার ছেলের নাম সালাহ উদ্দীন। মিশর অভিযানের সময় তিনি সালাহ উদ্দীনকে সঙ্গে নিলেন। তখন সালাহ উদ্দীনের বয়স মাত্র ২৭ বছর। কিন্তু একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মিশরে যান। কারণ সৈনিক জীবনের প্রতি তার কোন আকর্ষণ বা আগ্রহ ছিল না। একজন ধর্মবিশারদ হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সে যাই হোক, মিশর অভিযানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সালাহ উদ্দীন ধর্মযুদ্ধের সবচাইতে খ্যাতিমান পুরুষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

শিরকুহ একাধারে তিন বছর মিশরে অভিযান চালান। ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডারদের মিশর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। শিরকুহ-এর এই নিরলস প্রচেষ্টায় সালাহ উদ্দীন ছিলেন সার্বক্ষণিক সহযোগী। ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডাররা আবার মিশর প্রবেশ করে। খবর পেয়ে শিরকুহ আলেপ্পো থেকে আবার ছুটে গেলেন মিশরে। ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ 'আশমুনেইন'-এর প্রান্তরে মুসলমানরা খ্রিস্টানদের মুখোমুখি হয়। ক্রুসেডার এবং মিশরীয়দের এই সম্মিলিত বাহিনী ছিল খুবই বড় এবং বেশ শক্তিশালী। দুঃসাহসী শিরকুহ স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এই বিরাট বাহিনীকে ঘিরে ফেলেন। যুদ্ধে খ্রিস্টানদের এক-দশমাংশ লোক নিহত হল। বস্তুতপক্ষে এই যুদ্ধে মুসলিম সেনারা অবিশ্বাস্য রকমের দৃঢ়তা এবং চমৎকার নৈপুণ্যের ও রণকৌশলের পরিচয় দেয়। যুদ্ধে এত লোক মারা যাওয়ার পরও সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলমানদের চাইতে বহুগুণ বেশী ও শক্তিশালী। অবশেষে সম্মিলিত বাহিনী মিশর ছেড়ে যেতে সম্মত হয় এবং এভাবেই

আশমুনেই-এর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

রাজা আমালরিক ছিল অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্পের মানুষ। বার বার মিশর থেকে বিতাড়িত হয়েও সে মিশর জয়ের আশা পরিত্যাগ করতে পারছিল না। ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে আবার সে মিশর অবরোধ করে। সুলতান নূরুদ্দীন ৮০০০ অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে শিরকুহকে পাঠিয়ে দিলেন মিশরে। তিনি নিজে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করলেন। আমালরিক এবার নিজের রাজ্য নিয়েই দুশ্চিন্তাই পড়ে যায়। অবরোধ তুলে নিয়ে সে অবিলম্বে ছুটে যায় জেরুযালেমে। শিরকুহ সহজেই মিশর দখল করে। ফাতেমীয় খলিফা শিরকুহকে নিয়োগ করলেন উজীর হিসাবে। কিন্তু উজীর হিসাবে বেশী দিন দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেলেন না। মাত্র এক বছর পর ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইতিহাসের পাতায় শিরকুহ-এর কীর্তি কাহিনী কোন উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে পারেনি। সুলতান নূরুদ্দীন এবং সালাহ উদ্দীনের চমৎকারিত্বের পাশে তার বিজয়গাঁথা ম্লান হয়ে যায়। তবু একথা সত্য যে, মুসলমানদের মধ্যে শিরকুহ যত স্পষ্টভাবে মিশর বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং এর কৌশলগত গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, অন্য কেউ তা পারেনি। তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মিশরে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ। মিশর জয় না করা পর্যন্ত প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। অথচ মিশর অভিযানের ব্যাপারে সুলতান নূরুদ্দীনের প্রচুর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় ছিল। তবু সেনাপতি শিরকুহ তাঁর প্রচেষ্টায় অটল থাকেন। বস্তুতপক্ষে সালাহ উদ্দীন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি শিরকুহ-এর অবিশ্রান্ত উদ্যোগের ফসল কুড়িয়েছেন।

শিরকুহ-এর ইন্তেকালের পর সালাহ উদ্দীনকে নিয়োগ করা হল মিশরের উজীর হিসেবে। ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নূরুদ্দীনের বড় রকমের একটি অসুখ হয়। সে সময় থেকেই তিনি ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে খুব বেশী ঝুঁকে পড়েন। নিয়োগপ্রাপ্তির পর তিনি সালাহ উদ্দীনকে নির্দেশ দিলেন যে, মিশরকে অবিলম্বে বাগদাদকেন্দ্রিক সুন্নী খলিফাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু সালাহ উদ্দীন ভাবলেন অন্য কথা। তখন তিনি কায়রো[১] কেন্দ্রিক ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিনিধি এবং জায়গীর হিসেবে মিশর শাসন করছিলেন। এমনি পরিস্থিতিতে মিশরকে বাগদাদের অন্তর্ভুক্ত করাটা তাঁর কাছে অসম্মানজনক মনে হল। ফলে তিনি নুরুদ্দীনের নির্দেশকে এড়িয়ে গেলেন। এরপর থেকেই সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে নূরুদ্দীনের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটল। নিজাম উদ্দীন আইয়ুব ছিলেন সুলতান নূরুদ্দীনের অত্যন্ত অনুগত। অথচ তাঁরই ছেলে হয়ে সালাহ উদ্দীন সুলতানের অবাধ্য হয়ে গেলেন। তবু নূরুদ্দীন এই মতপার্থক্য ও বিবাদকে জানাজানি হতে দিলেন না। ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার জন্য মিশর জয় করা যেমন জরুরী

ছিল, তেমনি মিশরে অভিযান চালানোর ব্যাপারে নূরুদ্দীনের দ্বিধা-সংকটও ছিল প্রচুর। অথচ মিশরে যখন মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে এবং নূরুদ্দীনের পক্ষে সিরিয়া ও মিশরের মিলিত শক্তিকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা সম্ভব হল না।

১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নূরুদ্দীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্ব নিয়ে দামেশকের গভর্নর এবং আলেপ্পোর আমীরের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এদিকে সালাহ্ উদ্দীনও নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্বের ন্যায্য হকদার বলে দাবী করেন। আলেপ্পোর আমীর ছিল নাবালক রাজার চাচা। অভিভাবকত্ব নিয়ে বিবাদের মাঝে এক ফাঁকে নাবালক রাজা দামেশক থেকে আলেপ্পোয় পালিয়ে যায়। এতে করে দামেশকের স্থানীয় রাজার অন্তরে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে এবং ক্রুসেডাদের সহযোগিতায় আলেপ্পো আক্রমণের পাঁয়তারা শুরু করে।

ঘটনাপ্রবাহ এবার অন্যদিকে মোড় নিল। গভর্নরের এমন আচরণে স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা সালাহ্ উদ্দীনকে এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। দামেশক দখল করে নেয়ার পর থেকেই সালাহ্ উদ্দীন নাবালক রাজাকে পিতৃ রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। কিন্তু নাবালক রাজার চাচা এবং আলেপ্পো ও মোসুলের আমীররা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বরং তারা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। নূরুদ্দীনের জাতশত্রু ক্রুসেডার এবং 'এসাসিনদের' সহযোগিতায় সালাহ্ উদ্দীনের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হল।

সালাহ্ উদ্দীনের একার পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে মিলিত শক্তির মুকাবিলা করার খুব বেশী উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ১১৮০ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডারদের সঙ্গে দু'বছরের জন্য যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদন করলেন। এই ফাঁকে উত্তর সিরিয়ায় নিজের অবস্থানকে আরও সুসংহত করার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু শান্তিচুক্তি বেশী দিন কার্যকর হল না। চেটিলানের রেজিনাল্ড শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করল। সে ছিল কেরাকে ক্রুসেডারদের অধিপতি। ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে সে একটি হজ্জ যাত্রী দলের উপর আক্রমণ চালায়। লুটপাট করে নিয়ে যায় তাদের সবকিছু। বিষয়টি সম্পর্কে রাজা বলডুইনকে বলা হল। রেজিনাল্ড-এর এই অপরাধের কথা তিনি স্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি এই অপরাধের কোন বিহিত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

ইতিমধ্যে খ্রিস্টানদের একটি জাহাজ বায়ুতাড়িত হয়ে মিশরের ডেমিয়েটা পোতাশ্রয়ে চলে আসে। এই জাহাজের যাত্রীসংখ্যা ছিল ১৫০০। রেজিনাল্ডের অপরাধের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সালাহউদ্দীন সকল যাত্রীকে বন্দী করলেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। চুক্তিভঙ্গের অপরাধে তিনি প্যালেস্টাইন অবরোধ করেন। কিন্তু

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধেই সালাহউদ্দীন তেমন কোন বিজয় লাভ করতে পারলেন না। তবে একথা ঠিক সে, দুর্বার আক্রমণ চালিয়ে তিনি খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

রাজা বলডুইন এবং তার সহযোগীরা আবারো যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব পাঠায়। রাজা বলডুইনের এই প্রস্তাব ছিল দুরভিসন্ধিপূর্ণ। আসলে সে পোপ এবং পশ্চিম ইউরোপের রাজাদের সহযোগিতায় আরেকটি ক্রুসেড আয়োজনের কথা ভাবছিল। এদিকে সালাহ্ উদ্দীনের অবস্থাও খুব সন্তোষজনক ছিল না। তিনি লক্ষ্য করছিলেন অচিরেই হয়ত যুদ্ধ একটি চূড়ান্ত ফয়সালার রূপ নেবে। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি বলডুইনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৪ বছরের জন্য উভয় বাহিনীর মধ্যে আবারো যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হল।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে রাজা বলডুইন তৎপর হয়ে উঠে। পবিত্র নগরী জেরুযালেমের যাজক, হসপিটালারস এবং টেপমলার-এর নাইটদের প্রতিনিধিদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হল ইউরোপে। তারা সেখানে ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সালাহ উদ্দীনও তার অবস্থানকে সুসংহত করার প্রতি মনোযোগ দেন। ইতিমধ্যে তিনি দক্ষিণ সিরিয়া, উত্তর ট্রান্স জর্দান, আরব উপদ্বীপ, ইয়ামন, মিশর এবং সিরেনানিকায় নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সবাইকে গ্রথিত করলেন একই সুতায়। দিয়ারবাকির মৌসুল এবং হিমসের সর্দারেরা তার বশ্যতা স্বীকার করলেও তাদের উপর বড় একটা নির্ভর করতে পারছিলেন না। যুদ্ধ বিরতিকালীন সময়ের মধ্যে সালাহ উদ্দীন এ সমস্ত অবাধ্য রাজার দমন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

চার বছরের এই শান্তিচুক্তি বেশীদিন কার্যকর হল না। প্রত্যাশিত সময়ের অনেক পূর্বেই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। এবারও চেটিলানের রেজিনাল্ড প্রথম চুক্তি ভঙ্গ করে। ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে মিশর থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করে। কাফেলার প্রহরায় যারা নিয়োজিত ছিল তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে। বাণিজ্য সম্ভারসহ ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারবর্গকে ধরে নিয়ে যায় কেরাকে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সালাহ উদ্দীন রেজিনাল্ডের নিকট দূত পাঠালেন। কিন্তু রেজিনাল্ড দূতকে প্রত্যাখ্যান করল। অস্বীকার করল তার সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করতে। কেরাকে সুবিধা করতে না পেরে দূত চলে গেল জেরুযালেমে। রাজা গুয়েকে বলল সমস্ত কথা। রাজা খুব মনোযোগ দিয়ে অভিযোগের কথা শোনলেন। রেজিনাল্ডকে ক্ষতিপূরণ নেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু রেজিনাল্ড গুয়েকে ভালভাবেই চিনত। সে জানত যে, তার সহযোগিতা পেয়েই গুয়ে সিংহাসনে বসেছে। ক্ষমতায় টিকে আছে তার সহায়তায়। সুতরাং সে রাজার নির্দেশকে অবহেলায় উড়িয়ে দিল। রাজা গুয়ে এই অবাধ্যতাকে হজম করল অতি নীরবে। হুকুম পালন করার ব্যাপারে রেজিনাল্ডকে বাধ্য করতে সে ব্যর্থ হল। এমনি

ন্যক্কারজনকভাবে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করার মধ্য দিয়েই খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ অবধারিত দেখা দিল।

উত্তর সীমান্তে ক্রুসেডারদের অধিকৃত একটি রাষ্ট্র এন্টিয়ক। এন্টিয়কের শাসক রোমান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এবং অঞ্চলটিকে গ্রহণ করা হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে। ১১৫১ খ্রিস্টাব্দে এন্টিয়কের বিধবা কাউন্ট পত্নী রেজিনাল্ডকে বিয়ে করে। অসামান্য সাহসের অধিকারী রেজিনাল্ড ছিল ভীষণ রকমের লোভী। তাঁর বিন্দুমাত্র নীতিজ্ঞান ছিল না। একবার সে এন্টিয়কের ধর্মযাজককে তার সমস্ত বিষয়-সম্পদ হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মযাজক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। রেজিনাল্ড এবার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। ধর্মযাজককে গ্রেফতার করে, মাথা ন্যাড়া করে মধু ঢেলে দেয়। প্রখর রোদ্রের মধ্যে তাকে দুর্গের ছাদে বেঁধে রাখে। আশেপাশের সমস্ত কীট-পতঙ্গ এসে তাকে ঘিরে ধরে। পরের দিন সকালে যখন একইভাবে শাস্তি দেয়ার প্রস্তুতি চলছিল, বৃদ্ধ ধর্মযাজক তখন তার সমস্ত ধন-সম্পদ রেজিনাল্ডের হাতে তুলে দেয়। জুলুম করে দখল করা এই সম্পদ দিয়ে সে নতুন করে সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নেয়। সে সময়ে সাইপ্রাস ছিল রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ । আর্মেনীয় রাজার সহযোগিতায় রেজিনাল্ড সমুদ্রবেষ্টিত এই দ্বীপটি আক্রমণ করে। অবলীলাক্রমে দেশটির উপর দিয়ে হত্যাকাণ্ড চালায়। যাকে পায় তাকেই মারে-কাটে হত্যা করে। কেড়ে নেয় জনগণের বিষয়-সম্পদ। লুটপাট করে ইচ্ছামত। সমগ্র দ্বীপটি পরিণত হয় একটি নরকরাজ্যে। তিন সপ্তাহব্যাপী চলতে থাকে এই নির্যাতন-নিপীড়ন। রেজিনাল্ডের এই নৃশংসতা যেন হুন ও মঙ্গোলদেরকেও হার মানায়।

১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে রেজিনাল্ড যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিম অধিকৃত সিরিয়ায় অভিযান চালায়। কিন্তু সুলতান নূরুদ্দীনের কাছে সে ভীষণভাবে পরাজিত এবং বন্দী হয়। হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে আলেপ্পোয় নিয়ে আসে। এখানেই শুরু হয় তার বন্দী জীবন। এমনিভাবেই কাটতে থাকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। আলেপ্পোর গভর্নর গোমশতগিন ক্রুসেডারদের সঙ্গে হাত মিলায়। সালাহ উদ্দীনের বিরুদ্ধে ক্রুসেডাররা গোমশতগিনকে সাহায্য করে এবং এই সাহায্যের স্বীকৃতস্বরূপ গোমশতগিন ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে রেজিনাল্ডকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়। ইতিমধ্যে এন্টিয়কের কাউন্ট পত্নী মারা যায় এবং রেজিনাল্ড কেরাকের উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করে।

১১৮১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির সময়ে রেজিনাল্ড চুক্তি ভঙ্গ করে। মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করে। কেড়ে নেয় তাদের মাল-পত্র, অথচ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই বাণিজ্য কাফেলাটি মক্কার দিকে যাচ্ছিল। রেজিনাল্ড বার বার মদীনা আক্রমণের পাঁয়তারা শুরু করে। সর্বত্র ঘোষণা দেয় যে-রাসূল পাকের

মৃতদেহ মদীনা থেকে কেরাকে স্থানান্তর করা হবে এবং অর্থের বিনিময়ে রাসূল (সা)-এর পবিত্র দেহ মুসলমানদের দেখান হবে। যথাসময়ে সালাহ উদ্দীন জানতে পারলেন রেজিনাল্ডের প্রস্তুতির খবর। তিনি তখন মিশরে ছিলেন। অবিলম্বে ভাইপোর নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন রেজিনাল্ডের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের যুদ্ধযাত্রার খবর পেয়ে রেজিনাল্ড দ্রুত ফিরে আসে কেরাকে।

রেজিনাল্ড এবার ব্যাপক প্রস্তুতির কাজে মন দিল। ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করল অনেকগুলো জাহাজ। গঠন করল বিরাট একটি নৌবহর। মৃত সাগরে ভাসিয়ে জাহাজগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখল। অবশেষে একটা একটা করে এগুলো পাঠিয়ে দিল লোহিত সাগরে। এই নৌবহর দিয়েই সে মিশর এবং আরবের বাণিজ্য পথে দস্যুবৃত্তি শুরু করল। ডুবিয়ে দিতে লাগল হজ্জযাত্রীদের জাহাজগুলো। এই নৌবহর দিয়েই সে মক্কা ও মদীনার সমুদ্রবন্দরগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। সালাহ উদ্দীন তখন উত্তর সিরিয়ায় ব্যস্ত থাকায় মিশরের গভর্নর এবং সালাহ উদ্দীন ভ্রাতা মালিক-উল আদিল রেজিনাল্ডকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা নিলেন। এডমিরাল হাসান উদ্দীন লুলুকে একটি নৌবহর নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন লোহিত সাগরে। হাসান উদ্দীন লুলু রেজিনাল্ডের জলদস্যু বাহিনীকে পরাস্ত করল। ধ্বংস করে দিল তার বিশাল নৌবহরকে। নৌসেনাদের প্রায় সবাই ধরা পড়ল। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল সকল বন্দীকে। পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা আক্রমণ করার কারণে সালাহ উদ্দীন ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হলেন। নির্মল হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে রেজিনাল্ডকে কখনো কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা যাবে না। উপযুক্ত শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। বস্তুতপক্ষে ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে রেজিনাল্ড দ্বিতীয়বারের মত যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করে সালাহ উদ্দীনকে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার অর্গল খুলে দিল। উন্মুক্ত করে দিল ল্যাটিন বা ক্রুসেডারদের সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথকে।

নিকট প্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক রোমান সম্রাটের সঙ্গে ক্রুসেডারদের অনেক ব্যাপারেই মতপার্থক্য ও ভুল বোঝাবুঝি ছিল। কিন্তু যখনই ক্রুসেডাররা বড় রকমের কোন বিপদে পড়েছে, মুসলমানদের আক্রমণে টলমল করে উঠেছে তাদের ভিত্তি, রোমানরা তখনই ক্রুসেডারদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সহযোগিতা দিয়েছে সার্বিকভাবে। ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে এমনি একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রুম এবং দানিশমনন্দের সেলজুক সুলতানদের অবিরাম আক্রমণের কারণে সম্রাট স্যামুয়েল ভীষণভাবে বিরক্ত হয়। সে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে আনাতোলিয়ার তুর্কী শাসকদের সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে সুলতান খিজলী আরসালানকে শায়েস্তা করার জন্য বিরাট একটি বাহিনী পাঠায়। সম্রাটের চাচাতো ভাই এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। আরসালানও শক্ত হাতে তলোয়ার ধরেন। নির্মূল করে দেন শক্তিশালী রোমান বাহিনীকে।

এদিকে সম্রাটের নেতৃত্বে বিশাল এক মূল বাহিনী আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর

হতে থাকে। সম্রাটের আগমনের সংবাদ পেয়ে আরসালান দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে চলে যায়। সম্রাটের বিশাল বাহিনী আরসালানের পিছু ধাওয়া করে। তাদের সঙ্গে ছিল ভারী জিনিসপত্র এবং বিশাল রণসম্ভার। পাহাড়ী পথে একটি গিরিসংকট অতিক্রম করার সময় তুর্কী বাহিনী রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রাতের আঁধার নেমে না আসা পর্যন্ত রোমানদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে। সম্রাট ম্যানুয়েল ভাগ্যচক্রে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। পরবর্তী সময়ে সে যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছিল যে, মানজিকার্টের যুদ্ধে খ্রিস্টানরা যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, শত বর্ষে পরে তুর্কীদের হাতে খ্রিস্টানদের অনুরূপ একটি বিপর্যয় বরণ করতে হল।

রোমানদের পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করেছিল, তুর্কীরা সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। এগুলো পুনরায় তৈরী করতে গেলে কয়েক বছর লাগত। কিন্তু রোমানদের পক্ষে এগুলো আর কখনও পুনঃনির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। সিরিয়ায় রোমান সম্রাটের এটাই ছিল শেষ অভিযান। ক্রুসেডার এবং মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধে আর কখনও তারা নিজেদের জড়িয়ে ফেলেনি।

এদিকে ল্যাটিন রাষ্ট্রগুলোর অবস্থাও দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে লুসিগনানের গুইয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে। সে ছিল খুবই দুর্বল এবং অস্থিরচিত্তের মানুষ। দেখা গেছে যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিবেশনগুলোতে সে কথা বলত সবার শেষে, অথবা যে গলা ফাটিয়ে চীৎকার দিয়ে কথা বলতে পারে তার বক্তব্য যতই অর্থহীন হোক না কেন, গুইয়ে তাকেই সমর্থন করত। পাশ্চাত্যের বেরনরা ছিল অধিকতর গোয়ার এবং ধর্মোন্মত্ত। কিন্তু যে সমস্ত বেরন প্রাচ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, এখানকার আলো-বাতাসে বড় হয়েছে, তারা ছিল অন্যরকম। সচরাচর পাশ্চাত্যের বেরনদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারত না। টেম্পালার এবং হসপিটালার-এর নাইটেরা খ্রিস্টান জগতের অর্ধেকটা নিয়ন্ত্রণ করছিল। তাদের আনুগত্য ছিল পোপের প্রতি। রাজার প্রতি তারা কখন কতটা অনুগত থাকবে, তা নির্ভর করত তাদের ইচ্ছার উপর।

ত্রিপোলীর কাউন্ট রেমন্ডের সঙ্গে স্থানীয় রাজার কোন ঐকমত্য ছিল না। বরং রাজার সঙ্গে তার বিরোধিতার সম্পর্ক ছিল। সালাহ উদ্দীনের ক্রমবিকাশমান শক্তির মুকাবিলায় ল্যাটিন বা ক্রুসেড রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা যে কত ভয়াবহ ও অনিশ্চিত ছিল, বিচক্ষণ রেমন্ড তা ভালভাবেই জানত। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা পঞ্চম বলডুইনের অভিভাবক হিসেবে ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে সে সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে রেজিনাল্ড এই চুক্তি ভঙ্গ করায় রেমন্ড স্বতন্ত্রভাবে এগোয়। নিজের রাজ্য ত্রিপোলী এবং তাইবেরিয়াস অঞ্চলে স্ত্রী এশিডার জায়গীরের ব্যাপারে রেমন্ড সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করে। রাজা গুইয়ের দৃষ্টিতে এ ধরনের উদ্যোগ ছিল বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। সে স্থির করল যে, সালাহ উদ্দীনের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পূর্বেই

রেমন্ডকে নিঃশেষ করে দিতে হবে। কিন্তু রাজার বিজ্ঞ পরিষদ এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য রাজাকে প্ররোচিত করল। বরং রাজার প্রতি রেমন্ডের পূর্ণ এবং সক্রিয় আনুগত্য ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালায়। এমনকি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আলাপ আলোচনার জন্য একটি রাজপ্রতিনিধি দলকে পাঠিয়ে দেয় রেমন্ডের কাছে। টায়ার-এর আর্চবিশপ এবং টেম্পালার ও হসপিটালদের অভিভাবকেরা ছিল এই দলে।

রাজা গুইয়ের বিশেষ দূতেরা যখন তাইবেরিয়াস-এর দিকে আসছিল ঠিক তখনই শত্রুরাজ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সালাহ উদ্দীন একটি শক্তিশালী অশ্বারোহী দল প্রেরণ করেন। ত্রিপোলীর মধ্য দিয়েই অধিকতর দ্রুত এবং নিরাপদে শত্রুরাজ্যে যাওয়া যেত। এই পথ দিয়েই পর্যবেক্ষণকারী দলের যাতায়াতের জন্য কাউন্ট রেমন্ডের অনুমতি চাওয়া হল। রেমন্ড অনুমতি দিল। তবে শর্ত আরোপ করল যে, সূর্য উঠার পর পর্যবেক্ষণকারী বাহিনী জর্দান নদী অতিক্রম করবে। তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে ঐ দিনই সন্ধ্যার পূর্বে এবং কোন রকম জীবননাশ বা সম্পদের অনিষ্ট করা চলবে না।

সালাহ উদ্দীন রেমন্ডের শর্তাবলী মেনে নিলেন। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের পহেলা মে আমীর কুকুবরী-এর নেতৃত্বে মামলুকদের একটি অশ্বারোহী দল যাত্রা শুরু করে। বেলা উঠার পরই তারা জর্দান নদী অতিক্রম করে, ফিরেও আসে যথাসময়ে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে পর্যবেক্ষণকারী অশ্বারোহীদের বর্শার মাথায় টেম্পালার নাইটদের অনেকগুলো মস্তক ঝুলানো ছিল। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল রেমন্ডের দেয়া শর্তের বরখেলাফ। অবশেষে তদন্ত করে দেখা গেল যে-নাইটদের ধৃষ্টতা, রক্তপিপাসা এবং ধর্মোন্মত্ততার জন্য এই অঘটন ঘটেছে। মামলুকদের আগমনের সংবাদ পেয়ে টেম্পালার এবং অধ্যক্ষ জেরার্ড তাড়াহুড়া করে ২০০ নাইটের একটি বাহিনী গঠন করে। টেম্পালার-এর সেনাপতি এবং হসপিটালার-এর অধ্যক্ষের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সে পর্যবেক্ষণকারী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। মুসলিম সেনারা তখন ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। উভয় পক্ষ মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও মূলত এটা ছিল বধ্যভূমির একটি হত্যাকাণ্ড। দু'জন নাইটসহ জেরার্ড কোন রকমে পালিয়ে গেল। রেমন্ড ভালভাবেই বুঝতে পারল যে, এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনার জন্য মুসলমান সেনাদের কোন রকমেই দায়ী করা যায় না। তবু এ ধরনের একটি সুযোগ করে দেয়ার কারণে রেমন্ড সমঝোতার বিলুপ্তি ঘটায়। প্রত্যাহার করে নেয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি। সে পুনরায় গিয়ে যোগ দেয় ক্রুসেডারদের সঙ্গে। ফলে তাদের মধ্যকার বাদ-বিসংবাদ দূরীভূত হল। ক্রুসেডারদের শিবিরে আবারো প্রতিষ্ঠিত হল পূর্ণ ঐক্য।

১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে সালাহ উদ্দীন সেনেবরার নিকট দিয়ে জর্দান নদী অতিক্রম করলেন। পরের দিন পৌঁছে গেলেন গ্যালিলি সাগরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে

হাত্তিনের যুদ্ধ
১১৮৭
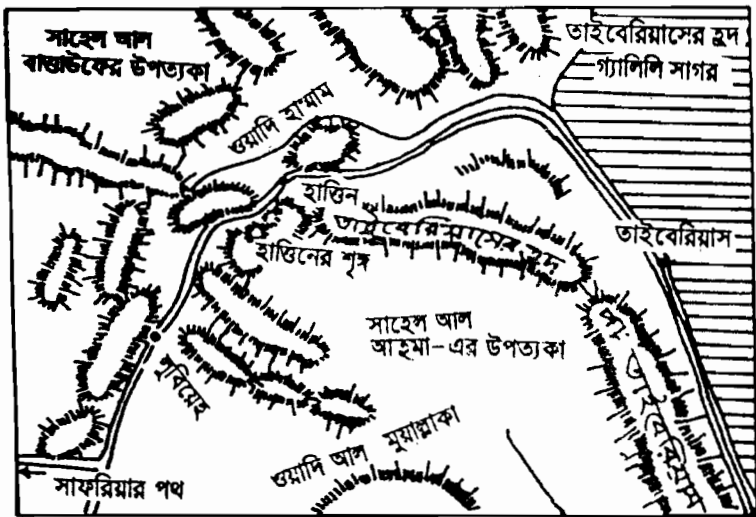
স্কেল: ১ ইঞ্চি = ২ মাইল

১ ½ ০ ১ ২ ৩ ৪ মাইল
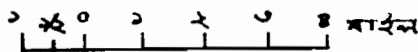
'কাফর সাবত' নামক একটি পার্বত্য এলাকায়। এখানে এসে তিনি তাঁর বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগ সেখানেই শিবির স্থাপন করল। অবশিষ্ট সেনারা বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাইবেরিয়াসের উপর। মাত্র ঘন্টাখানেক যুদ্ধের পরই শহরটি সালাহ উদ্দীনের হস্তগত হয়। কাউন্ট রেমন্ড তখন রাজা গুইয়ের সঙ্গে তায়ারে অবস্থান করছিল। পত্নী এচিভা দূত মারফত তাইবেরিয়াসের অবস্থা সম্পর্কে রেমন্ডকে জানিয়ে দেয়। এবং নিজস্ব বাহিনীসহ সে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেয়। রাজা গুইয়ে এবং তার বাহিনী যখন সাফারিয়ায় শিবির স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে, ঠিক তার পরক্ষণেই সে জানতে পারে তাইবেরিয়াস-এর পতনের সংবাদ।

সাফারিয়ার ঘটনাপ্রবাহ খ্রিস্টানদের ভীষণভাবে শঙ্কিত করে তোলে। রাজ্যের যেখানে যত সামর্থ্যবান এবং সক্ষম যোদ্ধা ছিল, সবাই এসে জড়ো হতে শুরু করে। অধীনস্থ রাষ্ট্র এবং রাজ্যগুলো নির্ধারিত পরিমাণের চেয়েও বেশী পরিমাণ কর এবং সৈন্য সরবরাহ করতে থাকে। তীর্থযাত্রীদের আহবান করা হল। খ্রিস্টান জগত নিজেদের মধ্যকার সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের কথা ভুলে গেল। ঐক্যবদ্ধ হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। পবিত্র সমাধির গির্জা থেকে খ্রিস্টধর্মের প্রতীক ক্রুশ নিয়ে এল। ক্রুশকে স্থাপন করা হল সবার সামনে। লাইডার বিশপকে রাখা হল ক্রুশের দায়িত্বে। ২০০০ নাইট এবং ১৮০০০ পদাতিক সেনার সমন্বয়ে গড়ে উঠল ক্রুসেডারদের বিশাল বাহিনী। তাছাড়া তুর্কীদের অনুসরণে গঠিত কয়েকশত অশ্বারোহী তীরন্দাজও এই দলে যোগ দিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০০০। সৈন্যসংখ্যা কম হলেও মুসলমানদের হালকা অশ্বারোহী বাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী। যে কোন মুসলিম সৈনিকের চেয়ে খ্রিস্টান নাইটেরা ছিল দক্ষ এবং উন্নতমানের যোদ্ধা। কিন্তু হালকা অশ্বারোহীদের অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। সম্ভবত তুর্কোপোলদের তুলনায় হালকা অশ্বারোহীরা ছিল ভাল যোদ্ধা। নির্দিষ্ট স্থানে শিবির স্থাপন করে যুদ্ধে লিপ্ত হলে ক্রুসেডারদের ভারী অশ্বারোহী বাহিনীকে সহজে সামাল দেয়া যেত না। কিন্তু চলমান যুদ্ধে মুসলমানদের হালকা অশ্বারোহী বাহিনী ছিল ভারী চমৎকার এবং কার্যক্ষম।

নাজেরেতের তিন মাইল উত্তরে ঝরনা-প্লাবিত একটি উচ্চ উপত্যকা অঞ্চলে সাফারিয়া অবস্থিত। সাফারিয়ার ঠিক পূর্বদিকেই তাইবেরিয়াস; দূরত্ব মাত্র ১৮ মাইল। দু'টি স্থল পথ দ্বারা শহরটি সংযুক্ত। পথ দু'টি চলে গেছে গ্যালিলিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের সবচেয়ে নির্জন জেলাগুলোর মধ্য দিয়ে। উত্তর দিকের পথ ধরে সাফারিয়া থেকে তাইবেরিয়াসে যাওয়ার সময় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি মালভূমি এবং হাতিন পাহাড়। পাহাড়ের দু'টি উঁচু শৃঙ্গকে বলা হয় হর্নস অব হাতিন অথবা হাতিনের শিং। পাহাড় থেকে রাস্তাটি খাড়াভাবে ঝরনা-প্লাবিত সবুজ-শ্যামল উপত্যকার দিকে নেমে গেছে। এই উপত্যকাটির নাম ওয়াদি আল মুয়ালাকাহ। অবশেষে হাতিন নামক গ্রামের

মধ্য দিয়ে পথটি সোজা চলে গেছে গ্যালিলি সাগরের তীর পর্যন্ত। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে তাইবেরিয়াস-এর দূরত্ব মাত্র এক মাইল। সাফারিয়ায় ক্রুসেডাদের সমবেত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সালাহ উদ্দীন যুদ্ধ কৌশল ঠিক করে নিলেন। সাফারিয়া থেকে হর্নস অব হাতিন পর্যন্ত ১২ মাইলের এ নির্জন রাস্তার মাঝে মাঝে বেশ কতকগুলো ঝরনা এবং জলক্ষেত্র ছিল। সালাহ উদ্দীনের হালকা অশ্বারোহী বাহিনী কৌশলগত কারণে কতকগুলো ঝরনা ধ্বংস করে দেয়। নষ্ট করে ফেলে কতকগুলো তৃণক্ষেত্র। সাফারিয়া থেকে তাইবেরিয়াসে যাওয়ার পূর্ব দিকের পথটি শুষ্ক মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সেনাবরা হয়ে গ্যালিলি সাগরের পশ্চিম তীর পর্যন্ত চলে গেছে।

যুদ্ধের কলাকৌশল নিরূপণের জন্য সাফারিয়ায় খ্রিস্টান অধিপতিদের পরামর্শ সভা বসে। সভ্যদের মধ্যে তিক্ততা এবং কটুবাক্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরামর্শ সভার সমাপ্তি ঘটে। অভিজাতদের অনেকে খুবই সতর্কতার সাথে যুদ্ধ করার পক্ষে অভিমত দিল। তারা বলল- সাফারিয়া ঝরনা-প্লাবিত অঞ্চল। খাদ্যের কোন অভাব নেই। সালাহ উদ্দীনের বাহিনী না আসা পর্যন্ত এখানে প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়। সাফারিয়া থেকে যুদ্ধ করার সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, মুসলিম বাহিনীকে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে নির্জন পাহাড়ী পথ ধরে ১৪ মাইল হাঁটতে হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন ক্রুসেডারদের পক্ষে মুসলিম সেনাদের কাবু করা সহজতর হবে। কিন্তু চার্টিলানের রেজিনাল্ড এবং টেম্পালার-এর অধ্যক্ষসহ অন্যরা ভিন্নমত পোষণ করল। তারা ব্যাখ্যা দিয়ে বলল- মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎভাগেই রয়েছে গ্যালিলি সাগর। কৌশলগত বিচারে এ ধরনের অবস্থান মোটেই সন্তোষজনক নয়। প্রভু সহায় থাকলে হয়ত এমনও হতে পারে যে, ভারী অশ্বারোহী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে সালাহ উদ্দীন তার বাহিনীসহ সাগরবক্ষে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হবে। ক্রুসেডাররা তাদের শক্তি-সামর্থ্য এবং বিজয় সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত ছিল যে, উপস্থিত অভিজাতদের মধ্যে কেউ তাদের বিরোধিতা বা সন্দেহ পোষণ করতে পারল না। কাউন্ট রেমন্ডও পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিল, অবশ্য তার স্ত্রী তখনও তাইবেরিয়াসে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। সালাহ উদ্দীনের না আসা পর্যন্ত সাফারিয়ায় প্রতীক্ষা করার পক্ষে সে অভিমত ব্যক্ত করল। উপস্থিত সকলকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলল যে, মুসলিম বাহিনীর অবরোধের মুকাবিলায় তাইবেরিয়াস দুর্গ কম করে হলেও কয়েক সপ্তাহ টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সালাহ উদ্দীনের পক্ষে গ্যালিলীয় জনশূন্য পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। কিন্তু অন্যরা তাকে থামিয়ে দিল। তাকে চিহ্নিত করল ধর্মযুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। এমনিভাবেই যুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রস্তাব সকলের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যা পেল।

সেনাবরা হয়ে তাইবেরিয়াস যাওয়ার পথটি ছিল মুসলমানদের প্রভাবাধীন অঞ্চল। এবং সে কারণে রাজা গুইয়ে লুবিহ এবং হাতিন হয়ে উত্তর দিকের পথ ধরে

অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিল। ক্রুসেডারদের এই সিদ্ধান্তের খবর জানতে পেরে সালাহ উদ্দীন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত মাইল পাঁচেক পথ এগিয়ে গেলেন। দখল করে নিলেন হাতিন নামের গ্রাম এবং পাহাড়। রাতের আঁধারে হালকা অশ্বারোহী সেনারা চলে আসে সাফারিয়ার খুব কাছাকাছি অঞ্চলে।

১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুলাই ক্রুসেডাররা সদলবলে সাফারিয়া থেকে তাইবেরিয়াসের পথে অগ্রসর হয়। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল কাউন্ট রেমন্ড। পশ্চাদভাগে রেজিনাল্ডের বাহিনী, টেম্পালার এবং হসপিটালার-এর নাইটেরা। ক্রুসেডারদের আগমন সংবাদে সালাহ উদ্দীন তৎপর হয়ে উঠেন। কাউন্ট রেমন্ড অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে সাফারিয়া থেকে মাইল পাঁচেক আসার পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর হালকা অশ্বারোহীরা তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। হালকা অশ্বারোহী সেনারা আক্রমণ সীমানার মধ্যে না এসেই তারা অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদভাগের সেনাদের উপর অবিরাম তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করে। মুসলমান সেনাদের এভাবে আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি ঃ প্রথমত, গোড়া থেকেই শক্তিশালী ক্রুসেডারদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। দ্বিতীয়ত, শত্রুপক্ষের অগ্রযাত্রাকে যথাসম্ভব বিলম্বিত করা।

সালাহ উদ্দীন তাঁর প্রচেষ্টায় সফল হলেন। দিবাবসানে ক্রুসেডাররা লুবিহ-এর দক্ষিণে রাস্তার সংযোগস্থল পর্যন্ত অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অবসাদের কারণে তারা ভীষণ রকম অস্থির হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর এই দুর্ভোগের কথা জেনেও রেমন্ড অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিল। সে বলল– আশপাশে কোথাও পানি নেই। সমস্ত এলাকাটি নির্জন। এমনি পরিবেশে যাত্রায় বিরতি দিলে সেটা হবে ক্রুসেডারদের পক্ষে খুবই দুর্যোগপূর্ণ। বরং ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক না কেন গ্যালিলি সাগরের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতেই হবে।

কিন্তু ক্রুসেডারদের অধিনায়ক রাজা গুইয়ের ধারণা ছিল অন্যরকম। সে দেখল তার বাহিনী অক্ষমতার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। তাদের পক্ষে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আরও একটা বিষয়ে সে ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল- মুসলমান অশ্বারোহী তীরন্দাজরা প্রধানত খ্রিস্টানদের পশ্চাৎভাগকে লক্ষ্য করেই আক্রমণ চালাচ্ছিল। তারা এতটা চাপের মুখে ছিল যে, যে কোন সময় তারা অগ্রবর্তী বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারত। তখন হয়ত তাদেরকে অনিবার্য ধ্বংসকেই বরণ করে নিতে হত। এত সব ভেবে-চিন্তে গুইয়ে যাত্রাবিরতির সিদ্ধান্ত নিল। রাস্তার সংযোগস্থলের উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিল। যখন যাত্রাবিরতির রণভেরী বেজে উঠল, তখন রেমন্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল-হায় প্রভু, এখানেই যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটল। আমাদের সবাইকে তুলে দেয়া হল মৃত্যুর হাতে, দেশটি ধ্বংস হয়ে গেল চিরতরের জন্য।

সর্বাধিনায়কের নির্দেশ মত ক্রুসেডাররা ছাউনি ফেলল। ঠাসাঠাসি করে পাহাড়ের কোলে রাত কাটাল। তাদের সঙ্গে সামান্য খাদ্য-খাবার ছিল। পানি ছিল না এক ফোঁটাও। এমনকি তাদের পক্ষে একটুও বিশ্রাম করা বা ঘুমান সম্ভব ছিল না। অশ্বারোহী তীরন্দাজরা শত্রুশিবিরের খুব কাছাকাছি চলে এল। বিরামহীনভাবে তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করল। মুসলমান সেনারা আরও একটি মারাত্মক ব্যবস্থা নিল। যেদিক থেকে খ্রিস্টান শিবিরের দিকে বাতাস বইছিল সেদিকে অনেকগুলো শুকনো খড়কুটো জড়ো করে তারা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের গাঢ় কালো ধোঁয়া স্তূপের আকারে খ্রিস্টান শিবিরের দিকে ভেসে আসতে থাকে। ধোঁয়ার কারণে খ্রিস্টান সেনারা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সম্মুখীন হল। এমনিভাবে চলতে থাকল সারা রাত। ক্রুসেডারদের এই নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিল যে, প্রভু খ্রিস্টান সেনাদের চোখের পানির তৈরী রুটি খাওয়ালেন, পান করার জন্য রেখে দিলেন পেয়ালা ভর্তি অপরিসীম অনুতাপ। প্রাতঃকালীন দুর্যোগ এবং মনঃকষ্ট না আসা পর্যন্ত এমনি অস্থিরতার মধ্যে কাটতে লাগল প্রতিটি মুহূর্ত।

৪ঠা জুলাই ছিল শনিবার। এই দিনটি ক্রুসেডারদের জন্য খুবই মনস্তাপ এবং মনঃকষ্টের দিন। সারারাত সৈনিকেরা একটুও ঘুমাতে পারেনি। পায়নি একফোঁটা পানি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অবসাদে সৈনিকরা সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। পদাতিক সেনাদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশী সংকটজনক। খ্রিস্টান সেনারা যেখানে শিবির স্থাপন করেছিল সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরেই ছিল অনন্তকাল থেকে প্রবহমান মিষ্টি পানির একটি স্রোতধারা। ইতিহাসের পাতায় এটা 'ওয়াদি হামান' নামে পরিচিত। রাজা গুইয়ে স্থির করল, যে করেই হোক তার বাহিনীকে ওয়াদি হামান যেতেই হবে। সে তার সৈন্যদের উত্তেজিত করতে লাগল। কিন্তু বড় অসময়ে গুইয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করল। হয়ত রাতের বেলায় তাদের পক্ষে তিন মাইল পথ অতিক্রম করা সম্ভব হত। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। খ্রিস্টান সেনারা, বিশেষ করে পদাতিক সেনারা, তখন এত ক্লান্ত-শ্রান্ত যে, শারীরিকভাবেই তারা তিন মাইল পথ চলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

সালাহ উদ্দীনের ভাইপো তাকিউদ্দীন শক্তিশালী একটি তীরন্দাজ বাহিনী নিয়ে গিরিসংকটের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। আসলে তারা ক্রুসেডারদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। রাজা গুইয়ে দলবলসহ 'হর্নস অব হাতিনে'র কাছাকাছি আসতেই সালাহ উদ্দীন খ্রিস্টানদের প্রান্তভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসময়ে এমন দুর্বার আঘাত তারা সইতে পারল না। আকস্মিকভাবেই তাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গেল। পদাতিক সেনারা অশ্বারোহী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তারা গিয়ে আশ্রয় নিল পাহাড়ের উঁচু চুড়ায়। ধপ করে মাটিতে বসে তারা ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল। রাজা গুইয়ে নানাভাবে হুমকি দিল, ভয় দেখাল। অনুরোধ-উপরোধ করল

হাজার বার। পাহাড়ের চুড়া থেকে উত্তর এল- আমরা নিরুপায়। আমরা অক্ষম। আমরা আর অস্ত্র হাতে নিতে পারছি না, পারছি না যুদ্ধ করতে।

হাত্তিনের বিপর্যয়কারী যুদ্ধে যেন মানজিকার্টেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। পদাতিক সেনারা রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেছে। রেমন্ডের নেতৃত্বাধীন মুষ্টিমেয় পদাতিক সৈন্য তখনও অশ্বারোহীদের সঙ্গে ছিল। রেমন্ড যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আঁচ করতে পেরেছিল। সুযোগ আসতেই নিজস্ব সৈন্যসহ উত্তর-পশ্চিম দিকে নিরাপদে সরে পড়ে। পালিয়ে যায় যুদ্ধের ময়দান থেকে। ভারী অশ্বারোহী সেনারা বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রইল যুদ্ধের ময়দানে। সালাহ উদ্দীন যেন ওঁৎ পেতে ছিলেন। পদাতিক সৈন্যরা চলে যেতেই তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন।

তাকিউদ্দীনের ধারালো তলোয়ারের আঘাতে ক্লান্ত সৈন্যদের অনেকে জীবন দিল। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তাদের সবাইকে বন্দী করা হল। এদিকে ভারী অশ্বারোহী সেনারা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সালাহ উদ্দীনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করল। কিন্তু বিফলে গেল তাদের সমস্ত প্রয়াস। রাজা এবং নাইটেরা অনিবার্য পরিণতির কাছে নতি স্বীকার করল। অবসাদগ্রস্ত এবং ক্লান্ত পদাতিক সেনারা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসেছিল, অশ্বারোহী সেনারাও ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নিশ্চল বসে পড়ল। অবসন্ন অবস্থায় সালাহ উদ্দীনের মুকাবিলা করতে এসে সামান্য সংখ্যক নাইট নিহত অথবা আহত হল। নাইটের বর্মগুলোই তাদের রক্ষা করল তাদের আহত অথবা নিহত হওয়ার হাত থেকে। শুধুমাত্র ক্লান্তি এবং তৃষ্ণা ক্রুসেডারদের অনুভব শক্তিকে নিঃশেষ করে দিল। সম্পূর্ণরূপে নির্জীব করে দিল তাদের দেহ-মনকে। মুসলমানরা যখন তাদের বন্দী করল, তখন মনে হল মানুষের ছদ্মাবরণে ওরা সবাই যেন নির্জীব জড়পিণ্ড।

জেরুযালেমের রাজা গুইয়ে ডিলুসিগনান-এর নেতৃত্বে যুদ্ধবন্দীরা এগিয়ে চলল। মহানুভব এবং নির্ভীক সুলতান যথাযথ মর্যাদা এবং সম্মানের সঙ্গে রাজাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেরাকের লর্ড রেজিনাল্ডকে খুবই করুণ পরিণতি বরণ করতে হল। যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন, হজ্জ ও বাণিজ্য কাফেলা এবং হেজাজ অবরোধের অপরাধে রেজিনাল্ডকে অভিযুক্ত করা হল। তাকে বিচার করা হল তার কর্মফল অনুসারে। রাজা গুইয়ের উপস্থিতিতে সুলতান সালাহ উদ্দীন নিজ হাতে রেজিনাল্ডকে হত্যা করলেন। এই দৃশ্য দেখে রাজার হৃদকম্পন শুরু হল। সে ভাবল, এবার নিশ্চয়ই তাকে হত্যার পালা। সে বেতস পাতার মত কাঁপতে লাগল থরথর করে। কিন্তু গুইয়ের কাঁধে হাত রেখে সুলতান তাকে আশ্বস্ত করলেন। অভয় দিলেন ভয় পেয়ো না। একজন রাজা আরেকজন রাজাকে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু এ নরাধমের ঔদ্ধত্য এবং বিশ্বাসঘাতকতা সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সুলতান সালাহ উদ্দীন গুইয়েকে আজাদ করে দিলেন। অবশ্য মুক্তিপ্রাপ্তির শর্ত

হিসেবে তাকে এই ওয়াদা করতে হল যে, আগামীতে আর কোন দিন সে সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরেই গুইয়ে তার ওয়াদার বরখেলাপ করে। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ডের নেতৃত্বে সে আবার সালাহ্ উদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। 'আক্রো' দখলের পর অসহায় মুসলমান নাগরিকদের অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

হাত্তিনের যুদ্ধ ক্রুসেডারদের মেরুদণ্ডকে চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে দেয়। এই যুদ্ধের পর খ্রিস্টানদের অধিকৃত শহরগুলো সহজেই মুসলমানদের পদানত হল। পবিত্র নগরী জেরুযালেম চলে এল মুসলমানদের দখলে। শহরে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দেয়া হল। মুক্তিমূল্য প্রদানের বিনিময়ে সৈন্যদেরকে ৪০ দিনের মধ্যে জেরুযালেম ত্যাগের অনুমতি দেয়া হল। সদাশয় সুলতান নিজের অর্থ থেকে দশ হাজার সৈন্য এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের মুক্তিমূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন। সুলতানের আত্মীয়-স্বজন এবং আমীরগণ উদার মনের পরিচয় দিলেন। তারাও স্বেচ্ছায় হাজার হাজার বন্দীর মুক্তিমূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। বস্তুতপক্ষে বন্দীদের প্রতি বিজয়ী মুসলমানদের আচরণ ছিল অত্যন্ত পরিশীলিত এবং মানবিক। অথচ ৮০ বছর পূর্বে ক্রুসেডাররা যখন জেরুযালেম জয় করে, তখন তারা মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। দেশজুড়ে বইয়ে দেয় রক্তের বন্যা। অথচ ৮০ বছর পর সেই জেরুযালেম পুনরুদ্ধারকালে একটি বাড়িও লুণ্ঠিত হল না। আহত হল না একজন মানুষ।

হাত্তিনের যুদ্ধে খ্রিস্টানরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলেও ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল না। হাতিনের যুদ্ধের পরেও প্রায় ২০০ বছর ক্রুসেডের যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড ছিল পশ্চিম ইউরোপের দু'টি শক্তিশালী স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। রাষ্ট্র দু'টির নেতৃত্বে খ্রিস্টানরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের পক্ষে ফিলিপ আগাস্টে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়। জার্মানীর রাজা ফ্রেডারিক বারবোমাও অন্যান্যের সঙ্গে হাত মিলায়। তৃতীয় ক্রুসেডের ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সালাহ্ উদ্দীন আবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

ফ্রেডারিক বারবোমা স্থলপথে জার্মান থেকে জেরুযালেমের দিকে আসছিল। কিন্তু পথিমধ্যে আনাতোলিয়ায় একটি নদী পার হতে গিয়ে সে ডুবে মারা যায়। রিচার্ড এবং ফিলিপ আগস্টে আসছিল সমুদ্রপথে। নির্ভীক রিচার্ডের নেতৃত্বাধীন এই সম্মিলিত বাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী। সমুদ্রপথে তাদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। অগণিত সৈন্য এবং উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনীর সঙ্গে এককভাবে সালাহ উদ্দীনের পক্ষে মুকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। সুলতান সালাহ্ উদ্দীন খলিফা

এবং অন্যান্য মুসলমান রাজা-বাদশাহগণের সাহায্য চেয়ে আবেদন করলেন। কিন্তু ইসলামের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে কেউ তার আবেদনে সাড়া দিল না।

এবার শুরু হল ক্রুসেডারদের বিজয় অভিযান। দীর্ঘদিন অবরোধের পর ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড 'আক্রে' দখল করে। দুর্গ প্রহরারত তিন হাজার বীর মুজাহিদকে শান্ত মস্তিষ্কে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। নিষ্ঠুর হাতে শহরের মুসলমান বাসিন্দাদের গলায় ছুরি চালায়। এভাবেই রিচার্ড মসিলিপ্ত করে তোলে তার বিজয় গৌরবকে। 'আক্রে'-তে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিয়ে রিচার্ড এগিয়ে যায় আসকালন-এর দিকে। পথিমধ্যে আরসৌফ নামক স্থানে সুলতান সালাহ্ উদ্দীনকে পরাজিত করে। সুলতান সহজেই অনুধাবন করতে পারলেন যে, তার পক্ষে রিচার্ডের নিষ্ঠুর হাত থেকে আসকালন রক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি বিকল্প ব্যবস্থা নিলেন। শহর থেকে মুসলমান জনসাধারণকে অন্যত্র সরিয়ে নিলেন। নিজ হাতে শহরটি ধ্বংস করে দিলেন, মিশিয়ে দিলেন মাটির সঙ্গে।

সুলতান সালাহ্ উদ্দীন ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ইতিপূর্বেকার যুদ্ধে অশ্বারোহী তীরন্দাজেরা রিচার্ডের বাহিনীর খুব কাছাকাছি এসে যুদ্ধ করেছিল। ফলে রিচার্ডের সৈন্যরা সহজেই তাদের বিপর্যস্ত করে দেয় এবং আরসৌফ-এর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের এটাই ছিল প্রধান কারণ। এরপর থেকে অশ্বারোহী তীরন্দাজেরা আর কখনও ক্রুসেডারদের আক্রমণ সীমানার মধ্যে এল না। বরং নিরাপদ দূরত্বে থেকে রিচার্ডের আক্রমণকারী বাহিনীর প্রান্তভাগের উপর আক্রমণ চালাত।

ইতিমধ্যে রাজা রিচার্ডের মনোজগতে বিস্ময়কর একটি ঘটনা ঘটে যায়। ক্রুসেডে লিপ্ত থাকাকালে হঠাৎ করেই সে একবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অসুস্থতার খবর পেয়ে সুলতান সালাহ্ উদ্দীন নিজের ডাক্তারকে রিচার্ডের চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। ডাক্তারের পরামর্শ মতে লেবাননের পর্বতশৃঙ্গ থেকে বরফ সংগ্রহ করেন। প্রয়োজনীয় ফল-মূলসহ তা পাঠিয়ে দেন রিচার্ডের শিবিরে। অথচ এই সালাহ্ উদ্দীনই তাঁর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ করে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। সুলতানের এমন অদ্ভুত আচরণে রিচার্ড সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। যুদ্ধে লিপ্ত সালাহ্ উদ্দীনের মধ্যে সে আরেকটি মানুষের সন্ধান পায়। তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে চার্চ এবং ধর্মযাজকদের মিথ্যা প্রচারের অসহায়তার কথা। রিচার্ড সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, মুসলমানরা ধর্মের নামে উন্মাদ বা গোঁড়া কোন জাতি নয়। বরং তাঁরা একান্তভাবেই সহনশীল, সদাশয় এবং নির্ভীক। তারা ভদ্র এবং সভ্য। মুসলমানদের এই চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যের কথা

খ্রিস্টান জগতের সম্পূর্ণরূপে অজানা। মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্যে সে এতটা অভিভূত হল যে, নিজের বোনের সঙ্গে সালাহ উদ্দীনের ভ্রাতা মালিক-উল-আদিলের বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং নবদম্পতির কাছে 'একরে' এবং জেরুযালেমের শাসনভার হস্তান্তরের অনুরোধ জানায়। সুলতান সালাহ উদ্দীন রিচার্ডের এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। ধর্মোন্মত্ত পরামর্শদাতাদের প্ররোচনায় রিচার্ড তার মত পাল্টে ফেলে।

শত চেষ্টা করেও রিচার্ডের পক্ষে জেরুযালেম জয় করা সম্ভব হল না। এমনকি জেরুযালেম আক্রমণ সীমানার মধ্যেও সে পৌঁছাতে পারল না। অবশেষে বাধ্য হয়েই সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করল। সদলবলে ফিরে গেল ইংল্যান্ডে। সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে চুক্তির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. সমুদ্রের উপকূলভাগ খ্রিস্টানদের দখলে থাকবে।

খ. অভ্যন্তরভাগ শাসন করবে মুসলমানরা।

গ. পবিত্র নগরী জেরুযালেমর তীর্থযাত্রীদের কোনভাবেই উৎপীড়ন করা চলবে না। এই শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়েই রিচার্ড এবং সালাহ উদ্দীনের মধ্যকার বিবাদের সমাপ্তি ঘটে।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে ক্রুসেডকে বলা যেতে পারে তুর্কী অশ্বারোহী তীরন্দাজ এবং পশ্চিম ইউরোপের নাইটদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের তীব্র সংঘাত। নাইটেরা সুশিক্ষিত এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। অপরদিকে তীর-ধনুক এবং একটি ঘোড়াই ছিল একজন তীরন্দাজের প্রধান অবলম্বন। তবু ভিন্ন চরিত্রের দুটি বাহিনীর মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অশ্বারোহী তীরন্দাজরা বেশী সাফল্যের পরিচয় দেয়। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে প্রধানত তিনটি রণকৌশল অনুসরণ করায় তুর্কী তীরন্দাজদের সাফল্য হয়েছিল। এবং যতদিন পর্যন্ত তারা এই তিনটি কৌশল নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছে ততদিন পর্যন্ত তারা ক্রুসেডের যুদ্ধে আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল।

প্রথমত, কেবলমাত্র প্রশস্ত-উন্মুক্ত ময়দানে থেকেই তারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করত। আবার অবস্থা বুঝে যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে সরে পড়ত অবাধে এবং স্বাধীনভাবে। কিন্তু যেখানে বাধা আছে, শত্রুদ্বারা বেষ্টিত হয়ে যাওয়ার কোন আশংকা আছে সেখানে থেকে তারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হত না।

দ্বিতীয়ত, নিরাপদ দূরত্বে থেকে তারা শত্রুর উপর আক্রমণ চালাত। শত্রু সেনাদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা এবং অনিয়ম দেখা না দেয়া পর্যন্ত তারা কখনও ক্রুসেডারদের কাছাকাছি এসে যুদ্ধ করত না।

তৃতীয়ত, শত্রুপক্ষের ভারী অশ্বারোহী পদাতিক সেনারা সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে তীরন্দাজদের মুকাবিলা না করলে মুসলমানদের সহজে কাবু করতে পারত না। অশ্বারোহী এবং পদাতিকেরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে মুসলমানরা সবেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

এই তিনটি কৌশল সযত্নে অনুসরণ করেছিল বলেই হাতিন এবং মানজিকার্টের যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীর পক্ষে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখনই তারা এই রণনীতিকে অবহেলা করেছে, ভুলে গেছে তাদের সীমাবদ্ধতার কথা, তখনই তাদের উপর নেমে এসেছে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। আরসৌফের যুদ্ধে তাদের বিপর্যয়ের এটাই ছিল প্রধান কারণ।

এর পরেই আসে যুদ্ধ আয়োজনের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ। প্রশাসনকে ক্রুসেডের যুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই যুদ্ধে ক্রুসেডারদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং হতাশাব্যঞ্জক। আগা-গোড়া সর্বত্র তাদের অমনোযোগিতা এবং অযত্নের ছাপ ফুটে উঠে। ভারী অশ্বারোহী এবং পদাতিক সেনাদের দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার জন্য ক্রুসেডাররা রীতিমত অহংকার করতে পারত। এরাই ছিল তাদের শক্তির প্রধান উৎস। অথচ তাদের প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা তথা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাবে ক্রুসেডারদের মূল ঘাঁটি সাফারিয়া থেকে যাত্রা করে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে ১০ ঘন্টা। এই সময়ের মধ্যে সৈন্যরা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় এতখানি কাতর হয়ে পড়ে যে, তারা অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করা তো দূরের কথা, তারা অস্ত্র হাতে নিতে পর্যন্ত অস্বীকার করে। বস্তুতপক্ষে তাদের এই ব্যর্থতার মূলে ছিল ক্রুসেডারদের অমনোযোগিতা।

এ প্রসঙ্গে সিরিয়ায় মরুভূমির মধ্য দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এই অভিযানের সময় খালিদকে একটানা ৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি সৈন্যবাহিনী এবং উট ও ঘোড়াগুলোর আহার এবং পানীয় জলের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা সত্যিই চমৎকার। বলতে গেলে অতুলনীয়। ক্রুসেডের যুদ্ধের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিমত পোষণ করতে গিয়ে একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক বলেছেন যে-

> নিরন্তর যুদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই খ্রিস্টান নাইটেরা সুনিপুণ এবং নির্ভীক যোদ্ধার মর্যাদা লাভ করেছে। যুদ্ধের ময়দানে তাদের অতুলনীয় সাহসিকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়তার ব্যাপারে কারও মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

এমনকি সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তারা অর্জন করেছিল অবিশ্বাস্য রকমের নৈপুণ্য এবং দক্ষতা। কিন্তু ক্রুসেডের যুদ্ধে ঔদ্ধত্য এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদের দীর্ঘদিনের অর্জিত সামরিক গুণগুলো ম্লান হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে তারা সামান্যতম বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা পরিণত হয় অবজ্ঞা এবং উপহাসের পাত্রে। রণকৌশলের প্রাথমিক নীতিগুলো অবজ্ঞা করার কারণে ক্রুসেডারদের পাঁচটি বিশাল বাহিনী বলতে গেলে একজন মাত্র মুসলমান সেনানায়কের কাছে নির্মূল হয়ে যায়। এমনকি হাতিনের চূড়ান্ত যুদ্ধে কোন শক্তির পরীক্ষা হল না। শোনা গেল না অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি। শুধুমাত্র ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দীর্ঘদিনের ক্রুসেডের জয়-পরাজয় ফয়সালা করে দিল।

নিকট-প্রাচ্যের সংকটময় রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে হয়ত ক্রুসেডারদের রাষ্ট্র জেরুযালেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু স্থানীয় মুসলমান জনগণের উপর ক্রুসেডারদের নৃশংস আচরণ সেই সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। বস্তুতপক্ষে চার্টিলানের রেজিনাল্ড, টেম্পালা এবং হসপিটালার-এর কর্তাব্যক্তিদের ন্যায় স্থানীয় রাজারা ছিল ভীষণ রকমের উগ্র স্বভাবের। যখনই তারা সুযোগ পেয়েছে, খানিকটা আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে মুসলমানদের উপর, তখনই তারা স্থান-কাল নির্বিশেষে মুসলমানদের হত্যা করেছে। তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। পরবর্তীতে যারা ধর্মযুদ্ধের নামে পাশ্চাত্য জগত থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে এতদঞ্চলে আসে, তারাও স্থানীয় শাসকদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাদের মধ্যেও ছিল প্রবল ধর্ম-উন্মাদনা এবং রক্তপিপাসা। তাদের নির্দয় আচরণ এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড স্থানীয় জনগণের অন্তরে অপূরণীয় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টানদের নামে তাদের মধ্যে দেখা দেয় চরম আতংক এবং বিভীষিকা। তারই ফলে ল্যাটিন রাষ্ট্রকে তারা নিকট-প্রাচ্যের রাজনীতিতে বিদেশী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে।

মুষ্টিমেয় ক্রুসেডার নেতা অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করল। বিশেষ করে যারা প্যালেস্টাইনের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে, লালিত-পালিত হয়েছে এখানকার আলো-বাতাসে, তারা খানিকটা মধ্যপন্থা গ্রহণের পক্ষে মত দিল। তারা বলল, খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অস্ত্র হিসেবে জেরুযালেমকে ব্যবহার করা যাবে না। জেরুযালেমকে কাজ করতে হবে স্থানীয় রাষ্ট্র হিসেবে। অন্যথায় একটি রাষ্ট্র হিসেবে জেরুযালেম টিকে থাকতে পারে না। বস্তুতপক্ষে স্থানীয় এই ক্রুসেডার নেতাদের ধারণা ছিল বাস্তবধর্মী। কিন্তু উগ্র নেতৃবৃন্দের কাছে মধ্য পন্থীদের ক্ষীণ কণ্ঠ ম্লান হয়ে গেল। তারা চিহ্নিত হল কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। উগ্র নেতৃত্ববৃন্দ রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ থেকে

কোন শিক্ষা নিল না। অত্যন্ত ঘৃণাভরে এবং একগুঁয়েমির সাথে তারা বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করল। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে জাগিয়ে দিল ধর্ম-উন্মাদনা এবং প্রতিশোধ স্পৃহা। এমনিভাবেই তারা ক্রুসেডার রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলল।

ক্রুসেডের যুদ্ধের আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এ কথা অত্যন্ত নির্মম হলেও সত্য যে, এ সময়ে আরব মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের মনোভাব সক্রিয় ছিল না।

অথচ ক্রুসেডের বাঁচা-মরার যুদ্ধে আরব মুসলমানদের পক্ষ থেকে তেমন একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ইমাম উদ্দীন জংগী এবং নূরুদ্দীন অপেক্ষাকৃত বিশাল সাম্রাজ্যের ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য শাসন করতেন। সে তুলনায় ল্যাটিন রাষ্ট্রের আকার-আয়তন ছিল অনেক ছোট। এতদসত্ত্বেও জংগী অথবা নূরুদ্দীন ক্রুসেডারদের মত অতবড় বাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি। যারা এসেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত দুঃসাহসিক লোক এবং দাস। সুলতান সালাহ উদ্দীনের অবস্থাও এর চাইতে ভিন্নতর কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন ইয়ামন এবং মরু সাহারার প্রান্তদেশ থেকে তাইগ্রীস নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। অথচ, হাতিনের মত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি মাত্র ১৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তখনও মুসলমানদের মধ্যে সহনশীলতার মনোভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করছিল। এবং সে কারণেই দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসনাধীনে থেকেও প্যালেস্টাইন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্থানীয় জনগণের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান। এদিক থেকে বিবেচনা করলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুরস্কের সুলতানকেও ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুরস্কের সুলতানকে তখন অপেক্ষাকৃত ছোট এলাকা আনাতোলিয়া এবং পূর্বাঞ্চল থেকে বিশাল বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। এটাকে অবশ্যই সৌভাগ্য বলতে হবে যে, নিকোপোলিস– যা নাকি ছিল ক্রুসেডের সবচাইতে বড় যুদ্ধ, সেখানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লোকের পরিবর্তে দানিয়ুব অঞ্চলের লোকেরা খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করছিল। হাত্তিনের যুদ্ধে সালাহ উদ্দীনকে যেখানে ১৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ কাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল, সেখানে নিকোপোলিস-এর যুদ্ধে ইয়েলদ্রিস বায়াজিদ সংগ্রহ করেছিলেন ৮০,০০০ সৈন্য। সুশৃঙ্খল এবং বিস্তর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তুর্কী গাজীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই বাহিনী। তারা মুকাবিলা করেছিল ধর্মোন্মাদ ১,২০,০০০ খ্রিস্টানের সঙ্গে।

মুসলমান হিসেবে সালাহ্ উদ্দীন ছিলেন খুবই ধার্মিক। অথচ খ্রিস্ট ধর্মের জীবনধারার প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এমনকি খ্রিস্টানদের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও তাদেরকে তিনি যথাযথ মর্যাদা দিতেন। কারও সঙ্গে কোন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে, কখনও তা ভঙ্গ করতেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারেও তিনি এই নিয়মটি মেনে চলতেন। এখানেই রয়েছে খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে তার মস্তবড় পার্থক্য। ধর্মের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল বলেই তাঁর আচার-আচরণের মধ্যে একটা বিনয় নম্রভাব প্রকাশ পেত। একজন বিজয়ী এবং বিচারক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু ও ক্ষমাপরায়ণ। আবার একজন অধিনায়কের সহনশীলতা এবং সহানুভূতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর আচরণের মধ্যে।

তাঁর দেহের গড়ন ছিল অতি সাধারণ। চোখে-মুখে সব সময় একটা চিন্তা ও বিষণ্নতার ছাপ থাকত। কিন্তু তাঁর মিষ্টি হাসিতে সহসাই যেন বিষণ্নতা দূরীভূত হত। চোখ-মুখ জ্বল জ্বল করে উঠত নতুনের সম্ভাবনায়। তাঁর ব্যবহার ছিল অতিশয় মার্জিত এবং ভদ্রজনোচিত। তাঁর স্বাদ-আহলাদ এবং রুচি ও পছন্দগুলো ছিল অতি সাধারণ। কোনরকম রুঢ়তা বা জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। মুক্ত বাতাস এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রচুর লেখাপড়া ছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় তিনি খুবই তৃপ্তি পেতেন। অবশ্য মুক্ত-চিন্তার লোকদের তিনি ভীতির চোখে দেখতেন। সর্বোপরি ক্ষমতা ও বিজয়ের গৌরব থাকা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র এবং শান্ত। ক্রুসেডের ইতিহাস এই ভাবপ্রবণ ব্যক্তিত্বকে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ 'সালাদিন' বলে চিহ্নিত করেছেন।

একজন সমরনায়ক হিসেবে সালাহ্ উদ্দীনের সংকল্প ছিল স্থির। কর্তব্য-কর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সতর্ক এবং দৃঢ়। তবু এ কথা সত্য যে তাঁকে প্রথম কাতারের সেনানায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। মহান সমরনায়কগণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই লক্ষ্য করা যায়, সালাহ্ উদ্দীনের অভিযানগুলোর মধ্যে সেই ধী-শক্তির ছাপ ফুটে উঠেনি। অবশ্য তিনি যথার্থভাবেই ইসলামের একজন মহান বীর সেনানি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছেন। সমসাময়িককালের মুসলমান শাসকগণের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সুদীর্ঘ ২৫ বছরের শাসনামলে তিনি স্থানীয় শাসকগণের সঙ্গে যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী। অথচ ক্রুসেডারদের তুলনায় সালাহ্ উদ্দীনের সামরিক শক্তি এবং সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক কম।

সালাহ্ উদ্দীনের সাফল্য এবং কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। শতধাবিচ্ছিন্ন মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ এবং সমন্বিত করে আক্রমণকারী

পশ্চিমা শক্তিকে পবিত্র নগরী থেকে বিতাড়িত করার যে উদ্যোগ নূরুদ্দীন গ্রহণ করেছিলেন, সালাহ উদ্দীন সুচারুরূপে তা সম্পন্ন করেন। যদি এমন হত যে সালাহ উদ্দীনের ইন্তেকালের পর তার উত্তরাধিকারীরাও তার মত ধী-শক্তিসম্পন্ন এবং মেধাবী হতেন, তা হলে যে সামান্য কাজটুকু অসম্পূর্ণ ছিল সেটুকু শেষ করা তেমন কঠিন কিছু ছিল না।

সালাহ উদ্দীনের ঐতিহাসিক বিজয়গুলোর পশ্চাতে একাধিক কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে। হতে পারে যে ইসলামের প্রতি সহজাত অনুভূতি থেকেই সালাহ উদ্দীন আক্রমণকারী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। অথবা ২৫ বছরের এই সাধনার মূলে ছিল তাঁরই পূর্বপুরুষ ইমাদ উদ্দীন জংগী, নূরুদ্দীন এবং শিরকুহ-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তাগিদ। এমনও হতে পারে যে, ক্রুসেডারদের নিবুদ্ধিতা অথবা সালাহ উদ্দীনের বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বই তাঁকে ক্রুসেডের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। তবে এতসব কারণ ছাপিয়ে ক্রুসেডের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তা এই যে, ইসলামের প্রতি সালাহ উদ্দীনের সহজাত অনুভূতি এবং প্রেরণা ছিল খুবই প্রবল। প্রথম ক্রুসেডে বিজয় লাভের পর খ্রিস্টানরা যেভাবে মুসলমানদের অপমান অপদস্থ করেছিল, হাত্তিন এবং জেরুযালেম বিজয়ের মধ্য দিয়ে সালাহ উদ্দীন তারই উপযুক্ত বদলা নিয়েছিলেন। একজন মহৎপ্রাণ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির বীরপুরুষ যে কিভাবে তার বিজয় উৎসব পালন করে, সুলতান সালাহ উদ্দীন এ সময়ে তারও উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

তারৌরীর যুদ্ধ
(১১৯২ খ্রিস্টাব্দ)

আরবের চতুর্সীমানার বাইরে ইসলামের যখন প্রথম প্রসার ঘটে, ঠিক তখনই পাক-ভারত উপমহাদেশের (বর্তমানে পাক-ভারত-বাংলাদেশ) ইসলামের সংস্পর্শে আসে। ঐতিহাসিক দলিলপত্র অনুসারে খলিফা ওমর (রা)-এর আমলে ৬৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতে অভিযান চালান হয়। এই দলটি ওমান থেকে সমুদ্রপথে ভারতে এসেছিল। ইরানে অভিযান চালানোর সময় খলিফা (রা) যেমন কাউকে আক্রমণ করার অথবা কারও সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছিলেন, তেমনিভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রেরিত অভিযাত্রী দলের উপরও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। কিন্তু খলিফার পক্ষে বেশীদিন অনাক্রমণ নীতি মেনে চলা সম্ভব হল না। ইরানীরা বার বার সদ্য-অধিকৃত ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ফলে অল্পকালের মধ্যেই খলিফা বাধ্য হয়ে সমগ্র ইরান দখল করে নিলেন। ইরানের অপর প্রান্তেই ছিল ভারতের সিন্ধু এবং মারকান অঞ্চল। ইরান দখলের পরপরই মুসলমানদের সাথে মারকান ও সিন্ধু অঞ্চলের রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

৬৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন রাবি ইরানের সিসতান এবং কিরমান প্রদেশ দখল করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক তখনই ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ বাধে। এবং আবদুল্লাহ বিন আমর সাফল্যের সঙ্গে তাদের পরাস্ত করেন। মুসলমানদের হাতে ভারতীয় বাহিনীর এটাই ছিল প্রথম পরাজয়। অবশ্য ভারতের বিরুদ্ধে মুসলমান বাহিনীর সংগঠিত আক্রমণ শুরু হয় আরও পরে; হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আমলে। কুফার শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় করার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরান এবং আফগানিস্তানের বৃহত্তর অংশে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরই তিনি ভারত অভিযানের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তারই উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় নির্ভীক কুতায়বাহ ৭০৫ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মধ্য-এশিয়া থেকে শুরু করে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত ছুটে বেড়ান।

ইরানের মাকরান উপকূল দিয়ে চলাকালীন বাণিজ্য জাহাজগুলোর উপর সিন্ধু জলদস্যুরা যখন-তখন আক্রমণ চালাত। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। উপরন্তু ভারতীয় অংশের বেলুচিস্তানের আদিম উপজাতিগুলো মাঝে-মধ্যেই ইরানের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ত। এসব কারণে ভারতীয়দের প্রতি হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ

ছিলেন। অবশেষে একদল জলদস্যু কর্তৃক সিন্ধু নদের মোহনায় একটি হজ্জ যাত্রীবাহী জাহাজ লুটতরাজ হওয়ার পরই হাজ্জাজের অসন্তোষ চরমে পৌঁছে। সে সময়ে দাহির ছিল সিন্ধুর রাজা বা শাসক। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দাহিরকে অবিলম্বে মুসলমান নারী ও শিশুদের ছেড়ে দিতে এবং অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।

রাজা দাহির হাজ্জাজের এ সব কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না। দাহিরের এ ধরনের আচরণে হাজ্জাজ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এবং সিন্ধু অঞ্চলে একটি অভিযান চালান। কিন্তু হাজ্জাজের এই অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নতুন উদ্যমে হাজ্জাজ আর একটি বাহিনী গঠন করেন। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে এই বাহিনী ইরানের মাকরান অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করেন। মাকরানের গভর্নর মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক।

মুহম্মদ বিন কাসিমের অভিযান সফল হল। তিনি দখল করে নিলেন সিন্ধু প্রদেশ। বস্তুতপক্ষে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল জিহাদের ইতিহাসে মুসলমানদের সিন্ধু বিজয় সবচাইতে রোমাঞ্চকর কাহিনী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধু অভিযানে আসেন তখন তাঁর বয়স বিশ বছর অতিক্রম করেনি। সুদর্শন চেহারার এই যুবক এত অল্প বয়সেই একজন সেনাপাতি এবং রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলী অতি চমৎকার এবং নিখুঁতভাবে অর্জন করেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দক্ষিণ বেলুচিস্তানের প্রস্তরময় পতিত অঞ্চল আক্রমণ করেন। রাজা দাহির এবং তার সেনাপাতিদেরকে একাধিক যুদ্ধে পরাস্ত করে তিনি সিন্ধু প্রদেশ এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব দখল করে নেন। অল্প সময়ের মধ্যে সদ্য অধিকৃত অঞ্চলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ন্যায়নীতির শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরই মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা। তাঁর প্রতিভার বিকাশের শুভ লগ্নেই দেখা দেয় অমানিশার অন্ধকার। হঠাৎ করেই উত্তর ও দক্ষিণ আরবের মধ্যে দেখা দেয় অতীতের জাতিগত বিবাদ। সর্বনাশা বিবাদের খড়গহস্ত মুহাম্মদ বিন কাসিমের মত প্রতিভাবান যুবককেও মুক্তি দিল না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ইন্তেকালের পর তাঁর বিরোধী পক্ষ ক্ষমতার মসনদ দখল করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অনুগত হওয়ার অযৌক্তিক অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হল। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নীরবে সরিয়ে দেয়া হল পৃথিবীর বুক থেকে।

বিজয়ী বীর মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর পরই ভারতে ইসলামের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হল। মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলটি সহসা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। একটি অংশ মানসুরাহ এবং অপরটি মুলতান হিসেবে চিহ্নিত হল। দু'টি রাজ্যই একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখত। কখনও আবার পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়ত। বিশাল ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশে মুসলমানদের পদচারণা শুরু হয়েছিল। গোটা ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর এর প্রভাব ছিল খুবই

সামান্য। ভারতে ইসলাম প্রচারের যে অপূর্ব সুযোগ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল, সহসা তা আর ফিরে এল না। বস্তুতপক্ষে অনুরূপ একটা সুযোগের জন্য মুসলমানদেরকে দীর্ঘ পাঁচশত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী বাহিনী হিসেবে মুসলমানদের অগ্রযাত্রার সমাপ্তি ঘটে। বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসীয় খলিফাদের সময় মুসলমানদের বিকাশ ঘটে ভিন্ন পথে। তাদের না ছিল আরবী মেজাজ, না ছিল সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের মনোযোগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার প্রতি। খলিফা হারুন-অর-রশীদের উত্তরাধিকারীদের পতন এবং মধ্য-এশিয়ার তেজোদ্দীপ্ত তুর্কীদের ইসলাম গ্রহণের পর অবস্থা নতুন মোড় নেয়। আবারো শুরু হয় বিজয়ী বাহিনী হিসেবে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা। সম্প্রসারিত হতে থাকে মুসলমানদের সাম্রাজ্য।

আলেপতাগিনের নেতৃত্বে সুদূর আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হল গজনী সাম্রাজ্য। অথচ আলেপতাগিনের জীবন শুরু হয়েছিল তুর্কী দাস হিসেবে। তাঁর মৃত্যুর পর সবুক্তগীন নামে আরেকজন তুর্কী দাস ক্ষমতায় আসে। এর পরই ক্ষমতায় আসে মাহমুদ নামে সবুক্তগীনের এক খ্যাতিমান ছেলে। গজনীর পূর্বপ্রান্তেই ছিল হিন্দু-শাসিত একটি রাজ্য। জয়পাল ছিলেন এখানকার রাজা। গজনীতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিকে সে সুনজরে দেখতে পারেনি। মুসলমানদের উৎখাত করার লক্ষ্যে সবুক্তগীনের আমলে জয়পাল গজনীতে একটি অভিযান চালায়। জয়পালের এই হঠকারিতা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে এই বিবাদ। জয়পালের প্রথম পরাজয় ঘটে সবুক্তগীনের হাতে। সবুক্তগীনের পরে সুলতান মাহমুদ তাকে দুবার পরাস্ত করেন। জয়পালের মৃত্যুর পর তার উত্তরসুরিদের মধ্যে আনন্দ পাল এবং ত্রিলোচন পাল মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসে মাহমুদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। মাহমুদ ৯৯৭ থেকে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৩ বছর গজনীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর শাসনামলের গোটা সময়টাই অতিবাহিত হয় যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে। কখনও তাঁকে গজনীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কীদের সাথে, কখনও আবার ভারতের হিন্দুরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। ১০০১ থেকে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সর্বমোট ১৭ বার ভারতে অভিযান চালান। সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়ান উত্তর, মধ্য এবং পশ্চিম ভারতের সর্বত্র।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন মধ্য এশিয়ার শক্তিশালী শাসকদের মধ্যে অন্যতম। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন একজন বীর সেনানী এবং সফল নেতা। শৌর্য, বীরত্ব, ঔদার্য এবং মানসিক দৃঢ়তার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাঁর আকস্মিক অভিযান, বিশেষ করে সোমনাথ মন্দির আক্রমণের মধ্য দিয়েই

সুলতান মাহমুদের পরিকল্পনার দৃঢ়তা, শত প্রতিকূলতার মাঝেও অদম্য সাহসিকতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের স্বাক্ষর মেলে। প্রধানত তুর্কী সেলজুকদের কবল থেকে স্বদেশকে রক্ষা করার কাজেই তাঁকে অধিক সময় ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। সে কারণেই তিনি ভারতের বিশাল ভূখণ্ড দখল করলেও সেখানে মুসলিম শাসন কায়েম করেননি। কেবলমাত্র উত্তর পাঞ্জাবকে তিনি গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এবং সে কারণেই সমসাময়িককালের ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে সুলতান মাহমুদ ছিলেন একটি উজ্জ্বল ধূমকেতুর মত। তাঁর আগমনবার্তা সকলের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করত। রাজা-বাদশাহদের জন্য বয়ে আনত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস।

সুলতান মাহমুদের উত্তরসুরিরা শাসনকার্যে পূর্বপুরুষদের মত বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেনি। ফলে সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের মাত্র সাত বছরের মধ্যে সেলজুকরা সমরখন্দ, বুখারা, ট্রান্স-অক্সিয়ানা এবং উত্তর ইরান দখল করে নেয়। শুধুমাত্র পাঞ্জাব এবং আফগানিস্তানে গজনীর সুলতানদের শাসন বলবৎ থাকে। এমনকি মাহমুদের ইন্তেকালের অনতিকালের মধ্যেই খোদ আফগানিস্তানের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঘোরী পরিবার[১] তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এমনকি তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। সাইফুদ্দীন সুরী ছিল ঘোরী পরিবারের প্রধান। একটি যুদ্ধে সাইফুদ্দীন সুরীর হাতে গজনীর সুলতান বাহরাম পরাস্ত হয়। হঠাৎ করেই বাহরাম আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং সাইফুদ্দীনকে বন্দী করে। বন্দী সাইফুদ্দীনকে গজনীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরায় এবং অবশেষে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে।

সাইফুদ্দীনের এমন অপমানজনক মৃত্যুতে ঘোরী পরিবারের মধ্যে প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলে উঠে। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তারা এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। সাইফুদ্দীনের তৃতীয় ভ্রাতা আলাউদ্দীন সদলবলে বাহরামকে আক্রমণ করে। বাহরাম পরাস্ত হল, যুদ্ধের ময়দানে তার এক ছেলে নিহত হল। আলাউদ্দীন এবার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হল। রাজধানী গজনীতে বেপরোয়াভাবে লুটপট চালাল, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল সমস্ত ঘর-বাড়ী, ইমারত ও প্রাসাদ। এমনকি মাহমুদের হাতে-গড়া সমৃদ্ধ পাঠাগারগুলোও আলাউদ্দীনের প্রতিহিংসার আগুন থেকে অব্যাহতি পেল না। এখানেই সে ক্ষান্ত হল না। মাহমুদ এবং আরও দুজ'ন সুলতানকে বাদ দিয়ে কবর খুড়ে গজনীর অন্যান্য সুলতানদের মৃতদেহ টেনে বের করল। মৃতদেহগুলোকে অপমান-অপদস্থ করে আলাউদ্দীন তার ঘৃণ্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল। এ ধরনের নৃশংসতার জন্যই আলাউদ্দীনকে বলা হত 'জাহান সুজ' অর্থাৎ 'পৃথিবী দগ্ধকারী'। ১১৬১ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তার উত্তরাধিকারীও মারা গেল। অতঃপর রাজ্যের শাসনভার চলে গেল তারই চাচাত ভাই গিয়াস উদ্দীনের হাতে। ঘুজতুর্কোম্যানদের মুকাবিলায় গিয়াস উদ্দীন সাম্রাজ্যকে সুসংহত

করল। সুদৃঢ় করল শাসন ক্ষমতাকে। এই ঘুজতুর্কোম্যানরাই ইতিপূর্বে সেলজুকদের পরাস্ত করেছিল, বিপর্যস্ত করে তুলেছিল 'পৃথিবী দগ্ধকারী' আলাউদ্দীনকে। গিয়াস উদ্দীন পুনরায় গজনী দখল করে। গজনীর শাসনভার ছোট ভাই শিহাবউদ্দীন মুহাম্মদ-এর উপর ন্যস্ত করে সে ফিরে আসে মাতৃভূমি ঘুর-এ।

শিহাবউদ্দীন মুহাম্মদই পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদ ঘোরী নামে ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই অসাধারণ। সুলতান আলাউদ্দীনের প্রতি তিনি পূর্ণ আনুগত্য এবং বশ্যতা মেনে চলতেন। ভাইয়ের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। দেশের জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিরক্ষা দুর্গের মত। শক্ত হাতে তিনি আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রুকে প্রতিরোধ করেন। এমনকি ভারতের মূল ভূখণ্ড দখল করার পরও তিনি ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা বা আনুগত্য এবং তার সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করেননি।

অথচ সেই আমলে এ ধরনের নিদর্শন এবং আনুগত্য বা ভালবাসার প্রসঙ্গটি ছিল একান্তই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। তিনি ছিলেন ভীষণ রকমের সাহসী, অধ্যবসায়ী এবং কষ্টসহিষ্ণু। সামরিক নৈপুণ্য এবং কলাকৌশলগুলোও আয়ত্ত করেছিলেন পুরোমাত্রায়। গজনীর সুলতান মাহমুদ যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন অনুরূপ সাফল্য অর্জনের জন্য মুহাম্মদ ঘোরীও স্থির সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি থাকতেন গজনীতে। পূর্বপুরুষগণের ভারত অভিযানের কাহিনী শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়তেন। তখন তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে কৃতিত্ব অর্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন।

১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী 'ভাটি রাজপুতদের' নিকট থেকে 'উচ' দখল করেন। তার অল্পকাল পরেই ইসমাইলী শাসকদের নিকট থেকে দখল করেন সিন্ধু এবং মুলতান। ইতিপূর্বে 'বিশ্ববিদগ্ধকারী' হিসেবে নিন্দিত আলাউদ্দীনের কাছে হেরে যাওয়ার পর গজনীর সুলতান বাহরাম লাহোরের পথে পালিয়ে যায়। কিন্তু লাহোর পর্যন্ত সে পৌঁছাতে পারেনি, পথিমধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করে। অতঃপর গজনীর সুলতান হিসেবে খুসরু মুল্‌ক লাহোরের শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু শাসক হিসেবে সে ছিল ভীষণ দুর্বল এবং আরামপ্রিয়। বস্তুতপক্ষে মোহাম্মদ ঘোরীর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হত না। ১১৮৬ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী অনায়াসেই খুসরু মুল্‌ককে পরাস্ত করে পাঞ্জাব দখল করে নেয়। ফলে মুহাম্মদ ঘোরীর সাম্রাজ্য এবার হিংস্র রাজপুতদের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বছর কয়েক পূর্বে মুহাম্মদ ঘোরী পশ্চিম ভারতের গুজরাটে একবার বাগিলা রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি রাজপুতদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অবশ্য সেই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘোরীকে চরম বিপর্যয় বরণ করতে হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের যোদ্ধাদের মধ্যে রাজপুতদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। কিন্তু

তাদের উৎস বা অতীত ইতিহাস খুবই রহস্যাবৃত্ত রয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যখন ভারত থেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদকে উৎখাত করে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পায়, ঠিক তখনই রাজপুতদের আবির্ভাব ঘটে। চতুর ব্রাহ্মণরা যুদ্ধ-প্রিয় রাজপুতদের সহায়তায় শান্তি-প্রিয় অহিংস এবং জাতিভেদ মুক্ত বুদ্ধদের বিপাকে ফেলে। ব্রাহ্মণদেরকে পুনরায় বসান হয় ঈশ্বরের প্রতিনিধির আসনে। কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও তাদের পৃষ্ঠপোষকদেরকে যথাসম্ভব উচ্চ মর্যাদা দিতে ভুলল না। রাজপুতদের গোড়ার ইতিহাসকে তারা দেবতাদের সঙ্গে যোগ করে দিল। তারা ঘোষণা দিল যে, রাজপুতরা হল সূর্যদেবতা এবং চন্দ্রদেবতাদের অধস্তন পুরুষ। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য থেকে এটা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে, রাজপুতরা মূলত স্কাইলিয়ান, শ্বেতহুন এবং মধ্য-এশিয়ার তাতারদের বিভিন্ন যাযাবর গোত্রের বংশধর। খ্রিস্টপূর্ব দুই শত বছর পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশে তাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে।

দেবতাদের সঙ্গে রাজপুতদের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি কল্পনাপ্রসূত হলেও এই সুবাদ তারা নিজেদের উচ্চ বংশীয় বলে দাবী করত। এ নিয়ে তাদের বড়াইয়েরও অন্ত ছিল না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বীরত্ব এবং অসীম সাহসিকতার জন্য রাজপুতেরা যোদ্ধা জাতি হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যেই তারা জন্মগ্রহণ করত, বড় হত। যুদ্ধের মাঝেই কেটে যেত তাদের জীবন। যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের ব্যাপারটি ছিল তাদের চিন্তার বাইরে। এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা কখনও আত্মসমর্পণ করত না। রাজপুতেরা ছিল শৌর্য ও শক্তির প্রতীক। তাদের আত্মমর্যদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল।

রাজপুতদের মধ্যে যেমন চমৎকার কতকগুলো গুণ ছিল, তেমনিভাবে তাদের কতকগুলো মারাত্মক এবং অমার্জনীয় দোষও ছিল। স্বভাবগতভাবেই তারা ছিল ভীষণ রকমের চঞ্চল, আবেগপ্রবণ এবং গোত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল । আফিমের প্রতি আসক্তি এবং গোত্রীয় কলহ-বিবাদের জন্য তারা কখনও শত্রুর মুকাবিলায় সম্মিলিত প্রতিবোধ গড়ে তুলতে পারত না। এতসব কারণেই সমশক্তিসম্পন্ন শত্রুর মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে খুবই দুষ্কর হয়ে পড়ত। তারা দুধের শিশুকে হত্যা করত। বিশেষ করে অভিজাত পরিবারগুলোর কন্যা, শিশুরা বলতে গেলে আঁতুরঘর থেকেই বিদায় নিত। রাজপুতদের মধ্যে বহুবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। রাজ পরিবারগুলোতে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীদেরকেও অকালে মৃত্যুবরণ করতে হত। রাজপুতদের মধ্যে এই প্রথার এত ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যে, সাধারণ ঘরের মহিলারাও কখনও কখনও স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় নিজেকে উৎসর্গ করত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতা এবং গোত্রের লোকজনেরা জোর করে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় তুলে দিত। বস্তুতপক্ষে সহমরণকে কেন্দ্র করে একটা মিথ্যা কৌলিন্য এবং আভিজাত্যবোধ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।
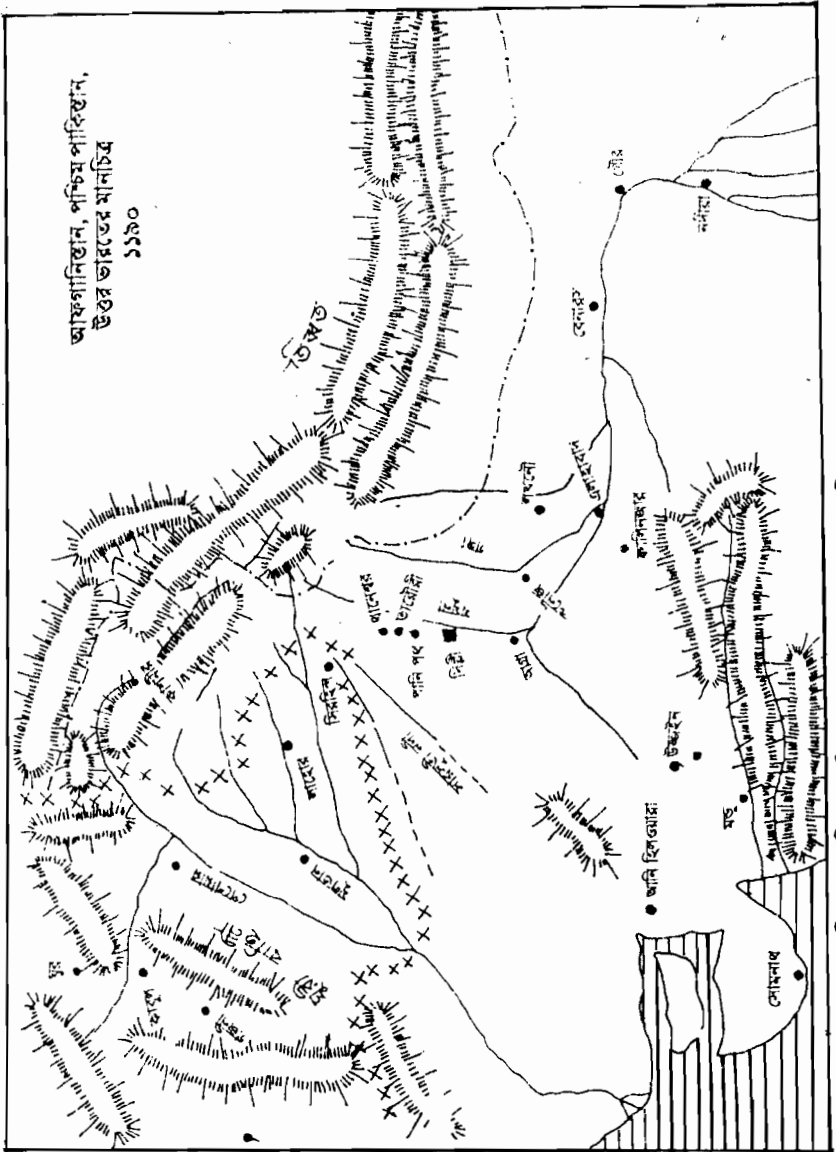
আফগানিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের মানচিত্র (১১৯০) ২৫১

রাজপুতদের শাসনব্যবস্থা সামন্ত প্রথার ধারায় পরিচালিত হত। গোটা সাম্রাজ্য অনেকগুলো জায়গীরে বিভক্ত ছিল। জায়গীরদারেরাই ছিল এসব জায়গীরের মালিক অবশ্য কখনও কখনও এমন হত যে, একই পরিবারে একাধিক জায়গীরদার রয়েছে। দেশের শক্তি এবং নিরাপত্তা মূলত জায়গীরদারদের আনুগত্য এবং দৃঢ়তার উপর নির্ভর করত। রাষ্ট্রের 'খালসা' জমিগুলো সরাসরি রাজার তত্ত্বাবধানে থাকত। রাজাই এগুলো দেখাশোনা এবং পরিচালনার ব্যবস্থা করত। রাজ্যের সমস্ত রাইয়ত বা সামন্ত আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক একটা শ্রেণীর জন্য কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি ও বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করা ছিল। এই প্রথা বা রীতিনীতিগুলো স্মরণাতীতকাল থেকেই সমাজের বুকে চলে আসছিল। প্রতিটি সামন্ত নির্বাচিত প্রথাগুলোকে মেনে চলত খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে। 'খালসা' জমিগুলো ছিল রাজ্যের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আরোপিত কর থেকেও বেশ কিছু রাজস্ব আয় হত। জায়গীরদার বা সামন্তপ্রভুরা সংশ্লিষ্ট রাজাকে ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। রাজার তরফ থেকে যখন ডাক পড়ত, তখন এই জায়গীরদারেরাই সৈন্য যোগান দিত, গড়ে তুলত সেনাবাহিনী । হৃষ্টচিত্তে গিয়ে হাযির হত যুদ্ধের ময়দানে। বস্তুতপক্ষে রাজার আহবানে যুদ্ধের ময়দানে হাযির হওয়ার ব্যাপারে জায়গীরদারদের উপর একটা অলিখিত বাধ্যবাধকতা ছিল। রাজার বিপদ বা দুর্যোগকালে প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা প্রকাশের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকত। কোনরকম লোভ-প্রলোভন বা ভয়-ভীতি তাদেরকে রাজার আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। তাদেরকে নেয়া যেত না রাজার বিরোধী শিবিরে।

সে সময় চারটি রাজপুত বংশ উত্তর ভারত শাসন করত। টোমারসরা দিল্লী, চৌহানরা আজমীর, রাথোররা কনৌজ এবং 'বাঘিলাসরা' গুজরাট শাসন করত। দিল্লীর সর্বশেষ টোমার রাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। অবশ্য তার কন্যাদের ঘরে ছেলে ছিল। তন্মধ্যে চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ আজমীর এবং রাথোর বংশীয় জয় চান্দ কনৌজ-এর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। দু'জনের মধ্যে চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের প্রতি টোমার রাজার বেশী দুর্বলতা ছিল এবং তাকেই নির্বাচন করা হল টোমার রাজার উত্তরাধিকারী হিসেবে। এতে করে শক্তিশালী টোমারস এবং চৌহান বংশ একই পতাকা-তলে সমবেত হল। কিন্তু রাথোররা এই মিলিত শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে পৃথ্বীরাজের আমরণ শত্রু মুহাম্মদ ঘোরী যখন হিন্দু ভারত আক্রমণ করে, তখন রাথোররা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে হাত মিলায়নি। বরং এই বিবাদ থেকে তারা সযত্নে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে।

পশ্চিম এশিয়ার বিশাল সেলজুক সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ারিজমের রাজারা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠে। সেলজুক সাম্রাজ্য দখলের ব্যাপারে তাদের মধ্যে দেখা দেয় ব্যাপক তৎপরতা। বস্তুতপক্ষে লাহোর দখলের পর

পরই মুহাম্মদ ঘোরীকে খাওয়ারিজমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে কেটে যায় গোটা ৫টি বছর। অবশেষে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে ঘোরী দিল্লীর দিকে যাত্রা করার অবকাশ পান। অনায়াসেই তিনি সিরহিন্দ দখল করে নেন। পৃথ্বীরাজ যথাসময়ে জেনে যায় মুহাম্মদ ঘোরীর আগমন ও বিজয় সংবাদ। সেও যথা-সময়ে তৈরী হয়ে যায়। এবং তারৌরী নামক একটি গ্রামের সন্নিকটে উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। থানেশ্বর থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে এবং দিল্লীর উত্তরে মাত্র ৮ মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। তারৌরীর এই বিশাল বিস্তৃত প্রান্তরেই ভারতের ভাগ্য বারবার নির্ধারিত হয়েছে।

তারৌরী-এর এই যুদ্ধে রাজপুতদের পক্ষে ২,০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৩০০০ যুদ্ধহস্তী অংশ নেয়। পদাতিক সৈন্য সংখ্যাও ছিল অগণিত। অপরদিকে অশ্বারোহী সৈন্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ঘোরীর বাহিনী ছিল খুবই ছোট। রাজপুতদের এই বিশাল বাহিনীর পদচারণা ঘোরীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না। বরং পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সংখ্যাধিক্যকে তিনি ঘৃণাভরে অবহেলা করলেন। পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঘোরীর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর মধ্যবর্তী দল হিন্দু বাহিনীর মধ্যভাগের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ব্যতিব্যস্ত করে তোলে পৃথ্বীরাজকে। কিন্তু এদিকে বিপুল সংখ্যক রাজপুত সৈন্য মুসলিম বাহনীর দুই প্রান্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য মুসলিম সৈন্য আহত বা নিহত হল। অবশিষ্টদের তাড়িয়ে দিল যুদ্ধের ময়দান থেকে। হিন্দু বাহিনীর প্রান্ত সীমার সৈন্যরা আর খানিকটা পথ এগিয়ে এসে মুহাম্মদ ঘোরীর মধ্যবর্তী দলকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে। ঘোরী ভালভাবেই আন্দাজ করতে পারলেন যে, রাজপুতেরা তার ছোট্ট দলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তিনি অবস্থান করছেন একটি বৃত্তের মধ্যে। তবু তিনি ঘুণাক্ষরেও যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয়ার বা পৃষ্ঠপ্রদর্শনের চিন্তা করলেন না। বরং তিনি বুঝতে পারলেন যে, যদি তিনি হিন্দুদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে পৃথ্বীরাজের নিকট পৌঁছাতে পারেন, তাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন পরপারে, কেবলমাত্র তাহলেই বিশাল হিন্দু সেনাদের পরাস্ত করা সম্ভব। কিন্তু বাছা বাছা দুর্ধর্ষ রাজপুতেরা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পৃথ্বীরাজকে ঘিরে ছিল। ঘোরী পৃথ্বীরাজের কাছে পৌঁছাতে পারলেন না। কিন্তু তিনি পৃথ্বীরাজের ভাই দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি গোবিন্দরাজকে পেয়ে গেলেন নাগালের মধ্যে। তিনি একটি বর্শা দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তার দাঁতগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

মুহাম্মদ ঘোরীর এমন দুঃসাহসিক আক্রমণ রাজপুতদের অন্তরে বিন্দুমাত্র কাঁপন ধরাতে পারল না। তারাও পাল্টা আক্রমণ চালাল। ঘোরীকে তাক করে সবেগে একটি বর্শা ছুঁড়ে মারল। বর্শা এসে লাগল তার বাহুতে। আহত হলেন মুহাম্মদ ঘোরী। যুদ্ধজয়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা নিরাশার অতলে তলিয়ে গেল। এমনি সংকটময়

মুহূর্তে ঘোরীর অন্তরে দেখা দিল আরেক আতংক। তিনি ভাবলেন এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে অনুগত সমস্ত সৈন্যই হয়ত হিন্দু বাহিনীর হাতে মারা পড়বে। অথচ এই যুদ্ধে রাজপুতদের জয় সুনিশ্চিত। এবার তিনি রণে ক্ষান্ত দিয়ে যুদ্ধ-ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে মুহাম্মদ ঘোরীর অবস্থাও সংকটজনক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে। মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মুহাম্মদ ঘোরী তখন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর পক্ষে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই কষ্টকর। এমনকি তার চৈতন্য লোপ পাওয়ার উপক্রম হল। পাশেই ছিল একজন খিলজী যুবক। অত্যন্ত প্রখর ছিল তার উপস্থিত বুদ্ধি। ঘোরীর এই অসুস্থ অবস্থা তার দৃষ্টি এড়াল না। বুঝতে বাকি রইল না যে মুহাম্মদ ঘোরী যুদ্ধের ময়দান প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খিলজী যুবক নিজের ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে ঘোরীর ঘোড়ায় গিয়ে বসে। শক্তভাবে সেনাপতিকে আঁকড়ে ধরে। মুসলমান সেনারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে রাজপুতদের বৃত্ত ভেদ করে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়ে। রাজপুতেরা এবার মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করল। তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল দীর্ঘ ৪০ মাইল পথ। তবু তারা মুসলমান সেনাদের বশে আনতে পারল না। অন্যন্যাপায় হয়ে রাজপুতেরাও পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত থাকল।

তারৌরীর রণাঙ্গনে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে সেনাপতি মুহাম্মদ ঘোরী আহত হলেন। পরাস্ত হয়ে ফিরে এলেন গজনীতে। বলতে গেলে তাঁর বাহিনী নির্মূল হয়ে গেল। ভেঙ্গে গেল তাদের মনোবল। অগ্রগামী রাজপুতদের হাত থেকে সিরহিন্দ রক্ষার জন্য মাত্র ২০০ সৈন্য অবশিষ্ট থাকল। এমনিভাবেই তারৌরীর প্রথম যুদ্ধে চৌহানের অপূর্ব বিজয় সূচিত হল।

তারৌরীর বিপর্যয়ের পর থেকেই ঘোরী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। কিন্তু রাজপুতদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার মত সুযোগ তখন তাঁর ছিল না। তারৌরীর যুদ্ধে তার সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য খানিকটা সময়ের দরকার ছিল। তাছাড়া বিক্ষুব্ধ খাওয়ারিজমদের উপরও তাঁর দৃষ্টি ছিল যে, সিরহিন্দ দুর্গের প্রতিক্ষায় নিয়োজিত ২০০ সৈন্যের সাহায্যের জন্য অতিরিক্তি কোন সৈন্য তিনি পাঠাতে পারলেন না। অথচ রাজপুতরা তখনও সিরহিন্দ অবরোধ করেছিল। অবশ্য সংখ্যায় স্বল্প হলেও মুসলিম সেনারা অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সাথে অবরোধকারী রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যও তারা রাজপুতদের নিকট মাথা নত করার অথবা আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করেনি। এমনিভাবে অবরোধ এবং প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে কেটে যায় দীর্ঘ ১৩টি মাস। অবশেষে রাজপুত সেনারা মুসলিম বাহিনীর অপূর্ব তেজ এবং যুদ্ধ স্পৃহাকে সশ্রদ্ধ ছালাম জানায়। কোনরকম বাধা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সিরহিন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল মুসলমানদের জন্য মস্তবড় একটা গৌরব এবং গর্বের বিষয়।

বছর খানেকের মধ্যে মুহাম্মদ ঘোরী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করে নিলেন। ১১৯২ খৃস্টাব্দে আবার তিনি ফিরে এলেন যুদ্ধের ময়দানে। এবারে তাঁর বাহিনী ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। ৪০ হাজার হালকা অশ্বারোহী এবং ১২ হাজার ভারী অশ্বারোহী সৈন্য ছিল তাঁর দলে। ছোট-খাট একটা পদাতিক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া অনুসারী বা স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যাও ছিল অগণিত। ঘোরীর প্রস্তুতির খবর পেয়ে রাজপুতেরাও তৈরী হল। আবারো তারা তারৌরীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করে। তারৌরীর পশ্চিমেই ছিল সিরহিন্দ। রাজপুতদের শক্তিশালী একটি বাহিনী সিরহিন্দে অবস্থান করছিল। অবরোধকারী বাহিনী যাতে স্থলযুদ্ধে শরীক হতে না পারে, সেজন্য সিরহিন্দ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে মুহাম্মদ ঘোরী তারৌরীর দিকে যাত্রা করলেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে যে পথে তারোরী এসেছিলেন, সে পথের পরিবর্তে আরও দক্ষিণ দিকের পথ ধরে তিনি অগ্রসর হলেন। সামনেই ছিল সারসুতি নদী। এই নদী অতিক্রম করেই তারৌরী যেতে হয়। নদীর তীরে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে নদীর পূর্বপ্রান্ত রাজপুতেরা দখল করে নিয়েছে। ফলে পশ্চিম তীরে তিনি শিবির স্থাপন করে নদী অতিক্রম করার জন্য সুবিধাজনক স্থান অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

পদাতিক বাহিনীর উপর শিবির প্রহরার দায়িত্ব ন্যস্ত করে ঘোরী অশ্বারোহী বাহিনীসহ সাঝ-সকালে নদী অতিক্রম করলেন। নদীর অপর প্রান্ত থেকে রাজপুত সেনারা মুসলমানদের বাধা দিল। সম্ভবত রাজপুতদের এই দলটি ছিল বেশ ছোট। প্রধানত শত্রুসেনাদের উপর দৃষ্টি রাখার জন্যই তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। মুসলমান সেনাদের প্রথম আঘাতেই রাজপুতদের পর্যবেক্ষণকারী এই দলটি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। তারা ফিরে গেল তারৌরীর সন্নিকটে রাজপুতদের মূল শিবিরে। পৃথ্বীরাজকে জানিয়ে দিল মুহাম্মদ ঘোরীর আগমন সংবাদ। ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যায়। রাজপুত সেনারাও শিবির থেকে বেরিয়ে আসে। শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায় যুদ্ধের ময়দানে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে তারৌরীর এই যুদ্ধে রাজপুতদের ৩,০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৩০০০ যুদ্ধহস্তী অংশ নেয়। তাছাড়া পদাতিক সৈন্য এবং স্বেচ্ছা-অনুসারীদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। ছোট-বড় মিলিয়ে ১৫০ রাজপুত রাজা নিজ নিজ বাহিনীসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের হিসেবে রাজপুতদের সৈন্য সংখ্যা অনেকখানি বাড়িয়ে বলা হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, জাত যোদ্ধা হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপুতরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তারা যুদ্ধ করছিল দিল্লীর নিকটবর্তী তারৌরীর ময়দানে। অপর দিকে মুসলমানরা এসেছিল সুদূর আফগান অঞ্চল থেকে। সে কারণেই ঘোরীর তুলনায়

পৃথ্বীরাজের সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক অনেক বেশী। তাছাড়া পৃথ্বীরাজ্যের হস্তীবাহিনী ছিল বেশ বড় এবং এই বাহিনী ছিল তার শক্তির একটি প্রধান উৎস।

কিন্তু রাজপুত বাহিনীর এমন কতগুলো সহজাত ত্রুটি ছিল, যেগুলো তাদের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বকে সম্পূর্ণরূপে ম্লান করে দেয়। প্রথমেই আসে তাদের বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোর কথা। অনেকগুলো স্বাধীন সৈন্যদলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এই বাহিনী। ফলে তাদের মধ্যে একক নেতৃত্বের বড় অভাব ছিল। অভাব ছিল সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বিত নিয়ম-পদ্ধতির ব্যাপারে। তাছাড়া যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। পৃথ্বীরাজ এবং তার সেনাপতিরা যুদ্ধকে গ্রহণ করেছিল শৌর্য এবং বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটা উন্নতমানের ক্রীড়া। যে কোন শত্রু, সে যত বিশাল বা শক্তিশালী হোক না কেন, রাজপুতেরা তাদের মুকাবিলা করতে পারত। তারা কখনও পশ্চাদপসরণ করতে জানত না। তারা জানত শত্রুর আক্রমণের বিপরীতে আরও শক্ত আঘাত হানতে। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে নৈপুণ্য সহকারে সৈন্য এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার মত প্রশিক্ষণ তাদের ছিল না। এদিক থেকে মুসলমানদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মুহাম্মদ ঘোরী এবং সেনাপতিরা যুদ্ধকে মারামারি-কাটাকাটির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা যুদ্ধকে একান্তভাবেই মানবীয় আচরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু তারৌরীর যুদ্ধে রাজপুতদের পক্ষে বিভিন্ন দল বা ডিভিশনে মেধাবী কোন সেনাপতি ছিল না। সেনাপতি হিসেবে যারা নিয়োজিত ছিল, তাদের সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর আইবেক, ইখতিয়ার খালজী, কুবাচা, ইয়েলদিজ-এর কোন তুলনাই হত না।

তারৌরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিন মাইল দূরেই বিশাল বিস্তীর্ণ একটি সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমিতেই পরস্পর বিরোধী বাহিনী শক্তির মুকাবিলায় অবতীর্ণ হল। হালকা অশ্বারোহী সেনারা শত্রুর উপর আক্রমণ চালিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে অবাধে এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিরাপদে সরে যেতে পারত। চৌতাং নামে এখানে একটি জলস্রোত ছিল। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটাছুটিতে তেমন অসুবিধা ছিল না। এতসব বিষয় বিবেচনা করেই ঘোরী এই স্থানটিকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে এখান থেকে মাইল কয়েক দক্ষিণের একটি ময়দানে রাজপুতদের হাতেই ঘোরী অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করেছিলেন।

মুহাম্মদ ঘোরী ১১৯১ খ্রিস্টাব্দের বিপর্যয়কে নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন বিপর্যয়ের কারণগুলোকে। তিনি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি রাজপুতদের সুবিধা এবং দুর্বল দিকগুলো পর্যালোচনা করে দেখেননি। এবং এই ব্যর্থতাই রাজপুতদের বিজয় অর্জনে সাহায্য করেছিল। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তারৌরী যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সামরিক শক্তিকে অবজ্ঞা

শিবির

রাজপুত বাহিনী

পদাতিক বাহিনী

হালাকা এবং ভারী
অশ্বারোহী বাহিনী

অগ্রবর্তী বাহিনী

হালকা অশ্বারোহী বাহিনী

পশ্চাৎ বাহিনী

ভারী অশ্বারোহী বাহিনী

আফগান বাহিনী

৫০ ০ ১০০ ২০০ ৩০০

স্কেলঃ ১ ইঞ্চি–১৬০ মাইল
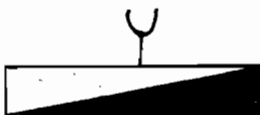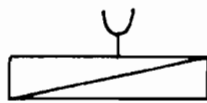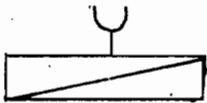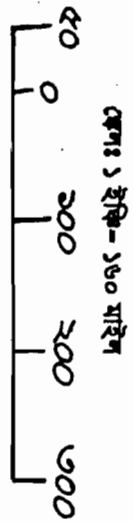
করে তিনি গোটা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, মুসলমান সৈন্যের তীব্র আক্রমণের মুখে রাজপুতদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে যাবে এবং সহসাই বিপর্যস্ত হবে গোটা বাহিনী। কিন্তু রাজপুত সেনারা সাহসিকতার সঙ্গে ঘোরীর তীব্র আক্রমণের মুকাবিলা করল, প্রতিহত করল তার অগ্রযাত্রাকে। অবশেষে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করল। ঘোরী স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন যে, রাজপুতদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে হলে প্রথমে রাজপুত সৈন্যদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিতে হবে। এর পরই সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর উপর। এই পরিকল্পনা অনুসারে ঘোরী সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিলেন, তাদের শিখালেন যুদ্ধের নৈপুণ্য ও কৌশলগুলো। বস্তুতপক্ষে তাঁর পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যে কত নিখুঁত এবং চমৎকার ছিল, যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা এবং ঘটনাপ্রবাহ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তারৌরীর ময়দানে বিশাল এলাকা জুড়ে পৃথ্বীরাজ শিবির স্থাপন করেছিলেন। শিবিরের সামনেই রাজপুত সেনারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়। পৃথ্বীরাজ ছিল এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। একটি জাঁকাল যুদ্ধ-হাতীর কারুকার্য শোভিত হাওদায় গিয়ে সে বসল। বাছা বাছা অসীম সাহসী যোদ্ধা এবং রাজপুত সরদ্দাররা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাঁর হাতীটি দাঁড়িয়েছিল বিশাল বাহিনীর ঠিক মাঝখানে। বেশ জোরের সঙ্গে পৃথ্বীরাজ দাবী করত যে, গোটা রাজপুত সাম্রাজ্যের মধ্যে সে হল অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর সেনানী।

মুহাম্মদ ঘোরী সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে তার বাহিনীকে সাজালেন। হালকা অশ্বারোহীদের ডান এবং বামে রেখে ১২০০০ ভারী অশ্বারোহী মাঝখান বরাবর একেবারে পেছনে অবস্থান নিল। এরা দাঁড়িয়েছিল শত্রুসেনাদের থেকে অনেক দূরে। যুদ্ধের শুরুতে শত্রুসেনারা যাতে এই দলকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে চলে, সেজন্যই তিনি এই ব্যবস্থা নিলেন। ডান দিকের প্রান্তভাগে ছিল ২০ হাজার হালকা অশ্বারোহী। এরা সমান দু'টি দলে এবং দুই লাইনে দাঁড়ায়। দু'টি দলকেই মধ্যবর্তী দলের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে মোতায়েন করেন। বাম প্রান্তের ২০ হাজার হালকা অশ্বারোহীও অনুরূপভাবে অবস্থান নেয়।

মধ্য সকালের দিকে মুহাম্মদ ঘোরী প্রথম আক্রমণ চালালেন। ডান এবং বাম প্রান্তভাগের সম্মুখের দু'টি দল যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। দুটি দলের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। তারা শত্রুপক্ষের মূল বাহিনীর উপর কোন আক্রমণ না চালিয়ে ছোট ছোট কতকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে প্রান্তভাগের সেনাদের কাছাকাছি চলে এল। তাদের উপর আগে থেকেই নির্দেশ ছিল যে, তারা অতি দ্রুতগতিতে শত্রুসেনাদের কাছাকাছি চলে যাবে, তীর বর্ষণ করবে বিরামহীনভাবে। কিন্তু শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার সুযোগ না দিয়ে সরে যাবে নিরাপদ দূরত্বে। নির্দিষ্ট কোন দল বা স্থানের উপর তারা

আক্রমণ চালায়নি। এক এক সময় এক এক অংশকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছে। রাজপুত সেনারা আক্রমণকারী মুসলমানদের উপর তীর নিক্ষেপ করলেও মুসলমান সেনাদের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না। কিন্তু রাজপুতেরা দাঁড়িয়েছিল খুবই নিবিড়ভাবে। ফলে মুসলমান সেনাদের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। বরং নিশ্চিতভাবেই সেগুলো কোন না কোন রাজপুত সেনার গায়ে বিঁধল। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল তুর্কীদের একটা সাধারণ রণকৌশল এবং তুর্কীদের এই কৌশল সম্পর্কে ভারতীয় সেনারা আগে থেকেই জানত।

নির্ভীক এবং উগ্র মেজাজের রাজপুত সেনারা মুসলমান সৈন্যদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্য উসখুস করছিল, কিন্তু সর্বাধিনায়ক পৃথ্বীরাজ এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ জারি করা থেকে বিরত থাকলেন। রাজপুতদের দৃষ্টিতে এটা ছিল পৃথ্বীরাজের ব্যর্থতা এবং সে কারণেই তারা পৃথ্বীরাজের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হল। সম্ভবত দুটি কারণে পৃথ্বীরাজ পাল্টা আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেননি।

প্রথমত, পৃথ্বীরাজ ভালভাবেই জানতেন যে, স্বাধীন প্রকৃতির ছোট ছোট কতকগুলো দলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তার বাহিনী। একবার তারা নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করলে বাহিনীর মধ্যকার সংহতি এবং সমঝোতা বিপন্ন হবে। কারণ তাদের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল দুর্বল। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানে দ্রুত স্থান পরিবর্তন করার মত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ তাদের নেই। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বেকার সংঘর্ষ থেকে তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে মুহাম্মদ ঘোরী প্রচণ্ড রকমের উগ্র এবং বেগবান একজন অধিনায়ক। স্বল্প সংখ্যক সেনা নিয়ে সে বৃহত্তর বাহিনীর অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়তে দ্বিধা করে না। পৃথ্বীরাজ ধরে নিয়েছিলেন যে, এবারের সংঘর্ষে ঘোরী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি বাহিনী নিয়ে তারৌরীর যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে গোটা বাহিনী নিয়ে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবং তখনই সে মুসলিম বাহিনীকে বাগে নিয়ে আসবে।

অগ্রবর্তী হালকা অশ্বারোহী সেনারা 'আক্রমণ এবং পশ্চাদপসরণ' নীতিতে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। এমনিভাবে কেটে গেল ঘন্টা তিনেক সময়। অতঃপর মুসলিম বাহিনীর প্রান্তভাগের সৈন্যরা সামনের দিকে এগুতে শুরু করেন। পৃথ্বীরাজ তখন নিশ্চয়ই এই ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিল যে, তার অনুমান বৃথা যায়নি। মুহাম্মদ ঘোরী তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা দাঁড়াল অন্য রকম। মুহাম্মদ ঘোরী ব্যাপক কোন আক্রমণ চালালেন না। প্রান্তভাগের সৈন্যদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছিল একটি কৌশল মাত্র। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল ঘোরীর যুদ্ধ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়।

ডান এবং বাম প্রান্তভাগ থেকে অগ্রসরমান হালকা অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল ২০,০০০। এতক্ষণ যারা যুদ্ধ করছিল এবার তারা পেছনের দিকে সরে আসে।

মধ্যভাগের ভারী অশ্বারোহীদের পশ্চাতে রেখে তারা অবস্থান নেয়। হালকা অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বিতীয় দলটি এবার নতুন তেজে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ এবং পশ্চাদপসরণ কৌশলে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এমনিভাবে অতিবাহিত হয় আরও দু'ঘন্টা সময়। এতক্ষণে পৃথ্বীরাজ অস্থির-চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে মুহাম্মদ ঘোরীকে মূল বাহিনীসহ যুদ্ধের ময়দানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবং ঘোরীর মতলব সম্পর্কে অনুমান করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অবশ্যই তিনি হতাশ হয়েছিলেন। এদিকে মুসলমান বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালানোর নির্দেশ বা অনুমতি না দেয়ার কারণে সর্বাধিনায়কের প্রতি রাজপুতদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। স্পষ্টতই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাপারে এতক্ষণ তারা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। অনন্যোপায় হয়ে পৃথ্বীরাজ এবার তার বিশাল বাহিনীকে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

পর্বতপ্রমাণ অধৈর্য এবং অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাজপুত বাহিনীর যাত্রা শুরু হল। উন্মোচিত হল মুহাম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায়। আফগানদের হালকা অশ্বারোহী বাহিনীর যে দলটি রাজপুতদের বেষ্টন করেছিল, আক্রমণ করছিল অবিরত, এবার তারা দ্রুত প্রান্তভাগের দিকে সরে আসে। রাজপুতেরা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পশ্চাৎ এবং প্রান্তভাগের উপর আবার আক্রমণ শুরু করে। পৃথ্বীরাজ তার বাহিনীসহ আফগানদের স্থলবাহিনীর কাছাকাছি আসতেই মুহাম্মদ ঘোরীর অদ্ভুত আচরণে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। সে দেখতে পায় যে মুহাম্মদ ঘোরী আফগানদের প্রতিরোধ করার পরিবর্তে মধ্যভাগের ভারী অশ্বারোহী এবং প্রান্তভাগের হালকা অশ্বারোহী দলসহ পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে নিজেদের অবস্থান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারটি ছিল ঘোরীর রণকৌশলের একটি অংশ। কিন্তু পৃথ্বীরাজের দৃষ্টিতে এটা ছিল মুহাম্মদ ঘোরীর ভীতির লক্ষণ এবং তিনি ঘোরীকে কাপুরুষ বলে ঠাওরালেন।

পর্বতের উঁচু শৃঙ্গ থেকে বিশাল তুষার পিণ্ড যেমন সব কিছু দুমড়ে মুচড়ে ঢালের দিকে নেমে আসে, তেমনি ভয়াল গতিতে, তীব্র তেজে রাজপুতেরা এগিয়ে চলল সামনের দিকে। কিন্তু কিছুদূর আসার পর হঠাৎ করেই তারা থমকে দাঁড়ায়। অথচ ঘোরী তাদের চলার পথে কোন প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তুলে ধরেনি। অথবা তিনি প্রস্তুতি নেননি তাদের মুকাবিলা করার। বরং অহংকারী রাজপুতদের থেমে যাওয়ার কারণ ছিল অন্য কিছু। হঠাৎ করেই তারা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে যে তাদের শিবির যেন একটি নরকে পরিণত হয়েছে। সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আকাশ ছেয়ে গেছে কালো ধোঁয়ায়। যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রাজপুত সৈনিকেরা স্পষ্ট শুনতে পায় শিবিরে অবস্থানকারী নারী-পুরুষের হাহাকার ও করুণ কান্নার চিৎকার ধ্বনি।

এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টির মূলে ছিল আফগানদের হালকা অশ্বারোহী বাহিনী। পৃথ্বীরাজ যখন সদলবলে মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়, ঠিক তখনই যুদ্ধরত অশ্বারোহীদের একটি অংশ শত্রুশিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলতে গেলে রাজপুতদের সেনা ছাউনি ছিল একেবারেই অরক্ষিত। ফলে সহজেই তারা সেনা ছাউনি তছনছ করে দেয়। ছোট-বড় প্রায় সকল রাজপুত সরদারেরাই স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসেছিল। তারাই মূলত অবস্থান করছিল সেনা শিবিরে। স্বভাবগতভাবেই রাজপুতেরা ছিল রমণীর মনোরঞ্জনের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। শিবিরে অবস্থানরত মহিলাদের এই দুর্যোগ তাদের অস্থির-চঞ্চল করে তুলল। তারা মুহাম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে নারীকুলের জীবন এবং সম্মান রক্ষা করাকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করল। পৃথ্বীরাজের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তারা রণে ক্ষান্ত দিয়ে ছুটে গেল শিবিরের দিকে। ফলে শক্তিশালী রাজপুতদের মধ্যে দেখা দিল চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। সর্বাধিনায়কের আদেশ বা নির্দেশ বলতে সেখানে কোন কিছু অবশিষ্ট রইল না। যুদ্ধরত হালকা অশ্বারোহী আফগানদের দৃঢ় এবং অব্যাহত আক্রমণ রাজপুতদের আরও বিপাকে ফেলল। অত্যন্ত ভয়াবহ করে তুলল গোটা পরিস্থিতিকে।

রাজপুতদের অগ্রযাত্রা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ ঘোরীও দাঁড়িয়ে গেলেন। পেছন ফিরে এবার তিনি শত্রুর মুখোমুখি হলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ক্ষেত্র এতক্ষণে তৈরী হল। আফগানদের হালকা অশ্বারোহীর দু'টি দল আগে থেকেই রাজপুতদের পশ্চাৎ এবং প্রান্তভাগ বরাবর আক্রমণ চালিয়ে আসছিল। হালকা অশ্বারোহীর অবশিষ্ট দুটি দল এবার সম্মুখভাগ দিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হল। ফলে পৃথ্বীরাজের গোটা বাহিনী আফগান সেনাদের বেষ্টনীর মধ্যে চলে আসে। হালকা অশ্বারোহীর যে দল দু'টি এতক্ষণ পেছনের দিকে সরে আসছিল, তারাও শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে পৃথ্বীরাজের রাজপুত বাহিনী অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম, চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়। অতঃপর মুহাম্মদ ঘোরীও তার ভারী অশ্বারোহী দল নিয়ে সচল হয়ে উঠেন। শত্রুপক্ষের মধ্যভাগে যেখানে পৃথ্বীরাজ বসেছিলেন, ঠিক সেই স্থান বরাবর আক্রমণ চালান। রাজপুত সৈন্যরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের সেই প্রয়াস। স্থির সংকল্প এবং অদম্য উৎসাহের মাঝে ভারী অশ্বারোহী দলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রইল। অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে গেল রাজপুত সেনাদের সংগঠিত প্রতিরোধ।

উষ্ণতার সান্নিধ্যে এলে হীম-শীতল বরফ যেমন গলতে শুরু করে, মুসলমানদের মুকাবিলায় নির্ভীক এবং অমিততেজা হিন্দু শক্তিও তেমনি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে

যায়। তারা রণে ক্ষান্ত দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। ফারিশ্‌তার ভাষায়-জাত যোদ্ধা হিসেবে রাজপুতদের শক্তি ও প্রতিভা সত্যি বিস্ময়কর। কিন্তু একবার তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখে দিলে আর কথা নেই। গগনচুম্বী সুবিশাল ইমারত ধসে পড়ার পূর্বে যেমন থর থর করে কেঁপে উঠে, রাজপুতদের অবস্থাও ঠিক তাই হল। তারা হারিয়ে গেল তাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

তারৌরীর সমতল প্রান্তরে রাজপুতদের পরাজয় ঘটল। বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতদের গৌরব এবং ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গিয়ে অনেককে উচ্চমূল্য দিতে হল। শীর্ষস্থানীয় অনেক রাজপুতকে বরণ করে নিতে হল অকালমৃত্যু। গোবিন্দ রায়ও ছিল এই দলে। কিন্তু রাজপুতদের আদর্শ এবং বীরত্বের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত পৃথ্বীরাজ আগেভাগেই এবং অতি সন্তর্পণে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তাড়াহুড়ার মধ্যে ধীরগতিসম্পন্ন এবং স্পষ্টত দৃশ্যমান যুদ্ধহস্তীর পরিবর্তে দ্রুতগতিসম্পন্ন একটা ঘোড়া নেয়ার অবসর পেল না। যখন সে বাহন পাল্টাল, হাতীকে বাদ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হল তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

এদিকে মুসলিম অশ্বারোহী সেনারা ছিল খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন। পলায়নপর শত্রুকে তারা কখনও হাতছাড়া করত না। সুযোগ দিত না নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার। বস্তুতপক্ষে এ ব্যাপারে তারা বেশ একটা সুনামও অর্জন করেছিল। পৃথ্বীরাজের বেলায়ও তাই হল। ঘোড়া ছুটিয়ে আজমীরের দিকে ছুটে গেলেও মুসলমানদের হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। সারসুতি নদীর সন্নিকটে পৌঁছাতেই মুসলমান অশ্বারোহীরা তাকে ধরে ফেলল। তলোয়ারের আঘাতে নিঃশেষ করে দিল তার ইহলীলা। শিহাবউদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী জীবনে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। তন্মধ্যে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তারৌরীর বিজয় ছিল সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই পাক-ভারতের মাটিতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ছয়শত বছরের জন্য এই উপমহাদেশের সর্বময় ক্ষমতা চলে যায় মুসলমানদের হাতে।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণ অবশ্য তারৌরীর এই যুদ্ধে হিন্দু শক্তির পতনের জন্য কনৌজের রাথোর রাজা জয় চাঁদকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার মূলে ছিল জয় চাঁদের ছল-চাতুরী এবং বিশ্বাসঘাতকতা। তারা জয় চাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, জয় চাঁদই ভারত অবরোধ করার জন্য ঘোরীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই তথ্যের সমর্থন মেলে না। পৃথ্বীরাজ এবং জয় চাঁদ ছিল উত্তর ভারতের দু'জন ক্ষমতাবান শাসক। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোনরকম মতৈক্য ছিল না। তাদের মধ্যে বিরাজমান মতদ্বৈধতাই মুহাম্মদ ঘোরীকে ভারত অবরোধে অনুপ্রাণিত করেছিল। আক্রমণকারী মুসলমানদের মুকাবিলায় জয় চাঁদ অবশ্য পৃথ্বীরাজকে সাহায্যের জন্য

এগিয়ে আসেনি। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এ জন্য জয় চাঁদকে দায়ী করা যায় না। সানজোগতা নামে জয় চাঁদের এক কন্যা ছিল। কন্যার 'স্বয়ম্ভর' উৎসবের সময় পৃথ্বীরাজ বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে। জয় চাঁদের জন্য এমনি ধরনের একটি ঘটনা ছিল খুবই অপমানজনক। রাজা জয় চাঁদকে বাদ দিলেও আত্মসচেতন কোন মানুষই এ ধরনের একটি অপমানকে ভুলতে বা ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং পৃথ্বীরাজের দুর্যোগ মুহূর্তে জয় চাঁদের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ না করাই স্বাভাবিক। এবং এ জন্য দায়ী মূলত পৃথ্বীরাজ নিজে। সে যাই হোক, জয় চাঁদ অনুমান করেছিল যে, বিজয় লাভের পর সুলতান মাহমুদ যেমন গজনী ফিরে গিয়েছিল, তেমনিভাবে পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করার পর মুহাম্মদ ঘোরীও হয়ত ফিরে যাবে স্বদেশে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোরী সম্পর্কে তার সেই অনুমান ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হল এবং জয় চাঁদের উপরও নেমে এল চরম দুর্যোগ।

কৌশলগত দিক থেকে দিল্লী এবং আজমীর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল দুটিতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য যে কোন স্থানে অভিযান চালান তাদের পক্ষে সহজ হয়ে পড়ে। পরের বছর মুহাম্মদ ঘোরী আবার ফিরে আসেন ভারতে। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ে কনৌজের উপর। মুসলমান বাহিনী এত দ্রুত কনৌজের পথে অগ্রসর হল যে, রাজা জয় চাঁদ মিত্রদের সঙ্গে পর্যন্ত যোগাযোগ করে উঠতে পারল না। জয় চাঁদ এককভাবেই চান্দওয়ারায় মুসলমান সৈন্যদের বাধা দেয়। কিন্তু আফগানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রথম আঘাতেই কনৌজের বাহিনী বিপর্যস্ত হল। হাতাহাতি লড়াইয়ে মারা গেল রাজা জয় চাঁদ।

ইতিমধ্যে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা। তুর্কী এবং 'তাজিক'রা আফগানিস্তান আক্রমণ করে। স্বদেশ রক্ষার্থে ঘোরীকে ফিরে যেতে হয় আফগানিস্তানে। দিল্লীতে নিযুক্ত কুতুবউদ্দীন আইবেক ছিলেন মুহাম্মদ ঘোরীর যোগ্য প্রতিনিধি। ঘোরীর অনুপস্থিতিতে কুতুবউদ্দীনের নেতৃত্বে ভারতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। দিল্লীর দক্ষিণ ও পশ্চিমে সুদৃঢ় বিন্দাচল পর্বতমালা পর্যন্ত মুসলমান বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে যায়। এদিকে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেনাপতি ইখতিয়ার বিহার, উত্তর বাংলা এবং দক্ষিণ আসাম দখল করে নেয়।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে শিহাবউদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যের প্রতি মনোনিবেশ দেয়ার পূর্বেই ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে খোখার উপজাতিদের নিষ্ঠুর হাতে সিন্ধু নদের তীরে মুহাম্মদ ঘোরী নিহত হলেন। অতঃপর ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আইবেক ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। এবং এভাবেই ভারত চলে গেল দাস বংশের কর্তৃত্বে। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের শাসন কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভারতে যখন এভাবে ক্ষমতা বদলের পালা চলছিল, ঠিক তখনই মিশরেও

একটি দাস বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানকার দাস বংশের (মামলুক) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আইবেক নামের একজন মুক্ত তুর্কী দাস।

তারৌরীর ময়দানে রাজপুতদের যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই সাধারণ। ফলে এই যুদ্ধের কৌশলগত বিষয়গুলো আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের প্রসঙ্গ এসে যায় এবং আলোচনাটি হয়ে পড়ে একপক্ষীয়। বস্তুতপক্ষে গোটা যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের ভূমিকা ছিল খুবই নৈরাশ্যজনক। সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি কোনরকম নৈপুণ্য বা দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেননি। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুহাম্মদ ঘোরী যে দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের কোন তুলনাই হয় না। একজন যোদ্ধা হিসেবে গোবিন্দ রায়ের কাছে পৃথ্বীরাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নিষ্প্রভ এবং অনুজ্জ্বল। এমনকি যে প্রস্তুতি এবং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাও ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং অবিবেচনাপ্রসূত।

পৃথ্বীরাজ বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেও তার শিবির ছিল একেবারেই অরক্ষিত। মুহাম্মদ ঘোরীর ন্যায় তিনিও যদি শিবিরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতেন, তা'হলে যুদ্ধের ফলাফল হয়ত অন্যরকম হত। অন্তত এত দ্রুত তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হত না, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও হত অনেক কম। তার এই পরাজয়ের জন্য রাজপুতদের মধ্যকার মতানৈক্য অথবা ঘোরীর সঙ্গে জয় চাঁদের কল্পনাশ্রিত ষড়যন্ত্রের দোহাই দেয়া নিরর্থক।

সংখ্যার বিচারে মুহাম্মদ ঘোরীর তুলনায় পৃথ্বীরাজের বাহিনী ছিল অনেক বড়। সৈন্যরাও ছিল নির্ভীক এবং দক্ষ। যদি তার বাহিনী উপযুক্ত নেতৃত্ব পেত, তাহলে মুসলমানদের উপর বিপর্যয় নেমে আসা অসম্ভব কোন ব্যাপার ছিল না। এবং সেই বিপর্যয় প্রতিরোধ করাই হয়ত মুসলমানদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ত। মুহাম্মদ ঘোরী ইতিপূর্বেকার পরাজয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে চমৎকার বিজয় অর্জন করলেন। ভারী এবং হালকা অশ্বারোহী দলকে পরিচালনা করলেন পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসেবে। অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে মুসলমান বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার সমূহ সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করলেন। অথচ মুহাম্মদ ঘোরীর পরিকল্পনার মুকাবিলায় পৃথ্বীরাজ রাজপুতদেরকে বিকল্প কোন পরিকল্পনা বা উপযুক্ত কোন নির্দেশ প্রদানে ব্যর্থ হলেন। বছর দুয়েক পূর্বে মুহাম্মদ ঘোরী যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এবারে তিনি একই কৌশল অবলম্বন করবেন, আবারো তিনি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দ্রুতবেগে প্রবেশ করবেন রাজপুতদের মধ্যে এবং এই সুযোগে রাজপুতেরা তাকে নির্মূল করে দেবে-এ ধরনের একটি ক্ষীণ সম্ভাবনার উপর পৃথ্বীরাজ নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ঘোরী পূর্বের কৌশলের পরিবর্তে নতুন কৌশল অবলম্বন করায় পৃথ্বীরাজ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অত্যন্ত অসহায়ভাবে তিনি

যুদ্ধের ময়দানের মর্মস্পর্শী দৃশ্যগুলো অবলোকন করলেন। যুদ্ধ করলেন ঔদাসীন্যের সঙ্গে। এমন কি উপযুক্ত সময় আসার পূর্বেই তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেন। পৃথ্বীরাজের পক্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমরনায়ক হিসেবে গৌরব অর্জনের সম্ভাবনা এভাবেই বিলীন হয়ে গেল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীরা পৃথ্বীরাজকে একজন অবিসংবাদী নেতা এবং মহান বীর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের মতে, ভারতে ইসলামের প্রসার প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টায় পৃথ্বীরাজই প্রথম বাধার প্রাচীর গড়ে তোলেন। কিন্তু তার যুদ্ধ পরিচালনা পদ্ধতি এবং নৈপুণ্যের বিচারে তাকে এতবড় মর্যাদা দেয়া যায় না। কিন্তু পৃথ্বীরাজ একজন হিন্দু এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন, কেবলমাত্র এই যোগ্যতাবলেই তিনি হিন্দু জাতির একজন প্রাতঃস্মরণীয় বীর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

মানসুরার যুদ্ধ

(ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ)

১১93 খ্রিস্টাব্দে সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের ইন্তেকালের পর তাঁর রাজ্য ছেলেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। পরস্পরের মধ্যে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। কিন্তু কোন পুত্রই পিতার মত এতটা মেধাবী এবং ধী-শক্তিসম্পন্ন ছিল না। অবশেষে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধের পর সালাহ্ উদ্দীনের ভ্রাতা মালিক আল-আদিল বিশাল সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে মালিক আল-আদিলের ইন্তেকালের পর রাজ্যের অখণ্ডতা আবার বিপন্ন হল। ছেলেদের মধ্যে রাজ্যটি আবার ভাগাভাগি হয়ে গেল। মালিক আল-কামিল মিসর এবং মালিক আল-মুয়াজ্জিম দামেশকের শাসনভার গ্রহণ করেন।

উত্তরাধিকারীগণের মধ্যকার বিভেদ এবং মতানৈক্যের সুযোগে খ্রিস্টানরা আবার তৎপর হয়ে উঠে। হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নতুনভাবে পাঁয়তারা শুরু করে। জেরুযালেমের রাজা ১ জন ব্রিয়েনীর নেতৃত্বে ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে তারা মিশর আক্রমণ করে। অবরোধ করে ডামিয়েটা। মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অবরোধ প্রতিরোধ করে। খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারাও সহজে হাল ছাড়ে না। দীর্ঘ ১৮ মাসেরও বেশী সময় ধরে চলতে থাকে এই অবরোধ। এদিকে দুর্গরক্ষাকারীরা অসুখ-বিসুখে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং অবস্থার এত অবনতি ঘটে যে, তাদের পক্ষে দুর্গ রক্ষা করা বাস্তব অর্থেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দুর্গ অতিক্রম করে ক্রুসেডাররা মিশরের অভ্যন্তরভাগের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাহার আস-সগির নামে নীল নদের একটি শাখা নদীর কাছে আসতেই সুলতান আল-কামিল মিশরীয় বাহিনী নিয়ে ক্রুসেডারদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। অপর দিকে দামেশকের সুলতান মালিক আল-মুয়াজ্জিম তার বাহিনীসহ অতর্কিতে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করেন। এমনিভাবে সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পঞ্চম ক্রুসেড সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হল।

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই ভ্রাতৃদ্বয় আবার বিবাদে লিপ্ত হয়। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এই বিবাদে মালিক আল-কামিলের জয় হল। তার নেতৃত্বে আইয়ুবী সাম্রাজ্য আবার ঐক্যবদ্ধ হল। কিন্তু এই পুনর্মিলন বেশী দিন স্থায়ী হল না। ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দে মালিক আল-কামিলের ইন্তেকালের পর রাজ্যময় আবার দেখা দিল গৃহবিবাদ। এই বিবাদে বিভিন্ন পক্ষে নেতৃত্ব দিলেন মরহুম সুলতানের বড় ছেলে সুলতান আল সালেহ আইয়ুব। তার ছোট ভাই এবং চাচা মালিক আল-মুয়াজ্জিম। এই সুযোগে

নাভারের রাজা চামপাগণের তিবালদ আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। ধর্মযুদ্ধের ছদ্মাবরণে সে মিশর আক্রমণ করে। গৃহযুদ্ধের পাশাপাশি সুলতান সালেহ আইয়ুবকে খ্রিস্টান রাজার মুকাবিলা করতে হয়। অবশেষে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটে। চাচা মুয়াজ্জিমও পরাজিত হলেন সালেহ-এর হাতে। ফলে দামেশক চলে এল সুলতানের দখলে। কিন্তু আলেপ্পো, হিম্‌স এবং কেরাকের প্রতিদ্বন্দ্বী আইয়ুবী যুবরাজদের বিরোধিতা অব্যাহত থাকল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল নামে শক্তিশালী আরেকটি রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। মঙ্গোলেরা চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে জাপান এবং কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলে অভিযান চালায়। ১২১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস করে দেয় খাওয়ারিজমের মুসলিম সাম্রাজ্য। ১২৩১ থেকে ১২৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণে আনাতোলিয়া, জর্জিয়া এবং পারস্যে অভিযান চালায়। উত্তরেও তাদের অপ্রতিরোধ্য অভিযান অব্যাহত থাকে। হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড এবং দক্ষিণ ও মধ্য রাশিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলে তারা নির্বিচারে লুটতরাজ ও নির্যাতন চালায়। কেড়ে নেয় তাদের সমস্ত বিষয়-সম্পদ। ১২৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চেঙ্গিস খানের পুত্র ওগোদাই খানের মৃত্যুতে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। তুর্ক-মঙ্গোল জাতির নেতৃত্বের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ সৃষ্ট হল। ফলে কয়েক বছরের জন্য মঙ্গোল জাতির অগ্রযাত্রায় ছেদ পড়ে। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার মুসলমানদের উপর তাদের চাপ অব্যাহত থাকে।

মঙ্গোলরা ছিল শামানিস্ট বা প্রেত-পূজারী। অন্য ধর্মের লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বশ্যতা বা আনুগত্য মেনে চলত, ততক্ষণ পযন্ত মঙ্গোলরা ঐ সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল থাকত। অপরদিকে মঙ্গোলদের অনেক যুবরাজ কেরাটের খ্রিস্টান গোত্রের রাজকুমারীদের বিয়ে করে। সে কারণেই তারা খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে চলত। তাছাড়া ইউরোপে এ ধরনের একটা কথা চালু ছিল যে, কোন এক সময়ে প্রেস্টার জন নামে একজন খ্রিস্টান রাজা মধ্য-এশিয়া শাসন করত। ফলে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক আরও ঘনীভূত হয়। ধর্মযাজকগণ মঙ্গোলদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের এই সদ্ভাবকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান।

পোপ আবার ক্রুসেডের ডাক দেন। ইউরোপের খ্রিস্টান জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন ধর্ম-উন্মাদনা। একই সময়ে মঙ্গোলদের রাজদরবারে প্রতিনিধি পাঠালেন। নিকট-প্রাচ্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ পরিচালনার জন্য আকুল আবেদন জানালেন। কিন্তু মঙ্গোলরা তখন আভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দলে লিপ্ত ছিল। পোপের আহবানে তারা কোন সাড়া দিল না। পোপ এবং ক্রুসেডাররা মঙ্গোলদের সহযোগিতার ব্যাপারে ছিল খুবই আশাবাদী। তবু তারা ফ্রান্সের রাজা নবম লুই-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালায়।

বিগত এক শতাব্দীব্যাপী ক্রুসেডের যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনী সরাসরি সিরিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারেই তাদের সেই আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তারই আলোকে নবম লুই নতুনভাবে আক্রমণ কৌশল রচনা করে। বস্তুতপক্ষে তৃতীয় ক্রুসেডের পর ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সিরিয়ায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের কাবু করা যাবে না। নিকট-প্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে মিশর দখল করতে হবে। মিশরের স্থানীয় অধিবাসীরা তেমন একটা যোদ্ধা নয়। তাছাড়া স্থানীয় কপটিক অধিবাসীরাও খ্রিস্টানদের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। দেশটিও প্রাচুর্যে ভরা। দেশটির প্রান্তভাগ অথবা পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ মিশরকে ঘাঁটি করে নিরাপদে এবং অনায়াসে অন্যত্র আক্রমণ চালানো যায়। অবস্থানগত দিক থেকেও দেশটি গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশের সীমান্তেই এর অবস্থান। বলা যেতে পারে যে, মিশর হল উভয় মহাদেশের সেতুমুখ। ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর জুড়ে রয়েছে মিশরের সমুদ্র উপকূল।

নবম লুই যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছিল, তখন সমুদ্র উপকূল বরাবর প্যালেস্টাইনের একটি সংকীর্ণ অঞ্চল খ্রিস্টানদের দখলে ছিল। এখানকার প্রতিরক্ষা দুর্গ এবং স্থানীয় বাহিনী ছিল বেশ মজবুত। জেনোয়া এবং ভেনটিয়ান নৌবহরের সহযোগিতায় যে কোন আক্রমণকে কয়েক মাসের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারত।

ইতিপূর্বে জন ডি ব্রিয়েনী-এর নেতৃত্বে মিশরের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলেও রাজা লুই হতোদ্যম হলেন না। তিনি আবারও মিশর অবরোধের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সাইপ্রাসকে বেছে নিলেন সামরিক অভিযানের ঘাঁটি হিসেবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কাজে এখানে কাটিয়ে নিলেন গোটা একটি বছর। অবশেষে ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে বিশাল একটি নৌবহর নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন ডামিয়েটার পথে। বড় আকারের ১২০টি জাহাজ ছিল এই বহরে। সুলতানের বৃদ্ধ উজির ফখর উদ্দীন ডামিয়েটারের দুর্গ থেকে ক্রুসেডারদের বাধা দেন। মুসলিম বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে ৫ জুন তারিখে ক্রুসেডাররা ডামিয়েটারের মাটিতে পদার্পণ করে। উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ফখর উদ্দীন সুবিধা করতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

মিশরের প্রধান শহর কায়রো। এবং মিশরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কায়রো দখল করা জরুরী হয়ে পড়ে। প্রধানত তিনটি পথে ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভাগ থেকে কায়রো যাওয়া যেত। প্রথম পথটি আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট দিয়ে চলে গেছে কায়রোর দিকে। এটিকে বলা হয় পশ্চিমের পথ। নেপোলিয়ান এই পথেই কায়রো এসেছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে অবতরণ করে নীল নদের পশ্চিম প্রান্তের

মানসুরার যুদ্ধ
১২৫০
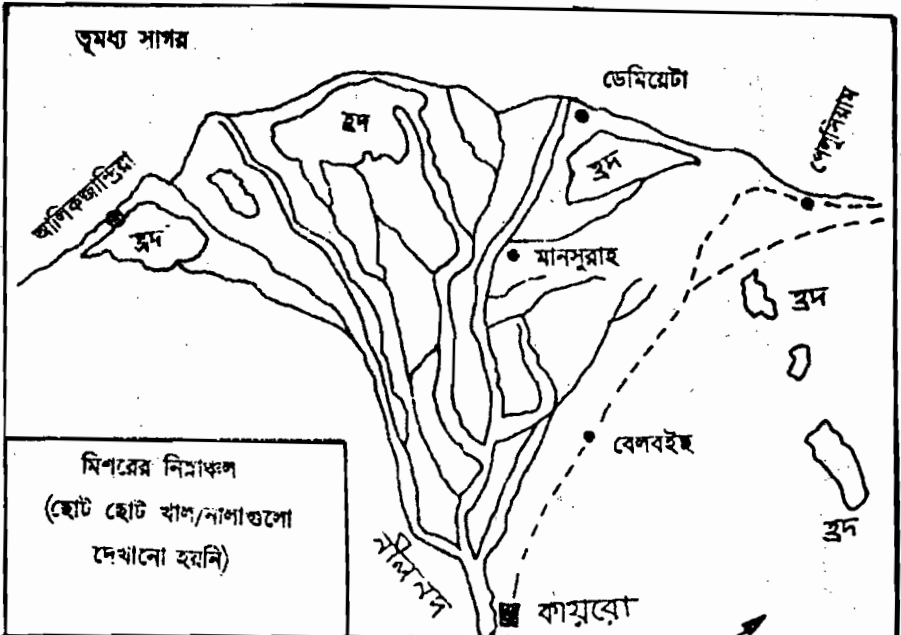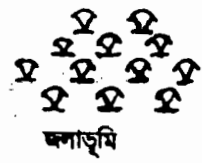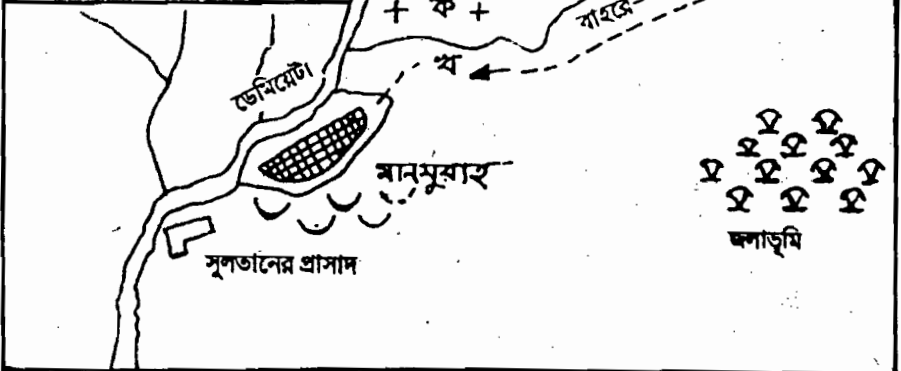
শাখা নদী ধরে কায়রোর দিকে অগ্রসর হন। কায়রোর প্রান্ত সীমানা দিয়ে বয়ে গেছে নীল নদের মূল স্রোত। এই নদী অতিক্রম করেই কায়রো যেতে হয়। নদী অতিক্রম করার এই কাজটি ছিল খুবই দুরুহ এবং দুর্যোগপূর্ণ। দ্বিতীয় পথটি পূর্বাঞ্চলীয় পথ হিসেবে পরিচিত। ইতিহাসের বর্ণনা মতে আলেকজান্ডার এই পথেই মিশরে অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি উপকূলীয় শহর পলুসিয়েম থেকে 'সালাহিয়ে' ও 'বেল বয়েস' হয়ে এবং নীল নদের পূর্ব দিকের শাখা নদীকে ডান দিকে রেখে কায়রোর দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু এই পথে অভিযান চালাতে গিয়ে আলেকজান্ডারকে দু'টি বড় রকমের সমস্যায় পড়তে হয়। ক. এখানে যোগাযোগের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারোপযোগী কোন বন্দর ছিল না। খ. কায়রো যাওয়ার পথে এমন্ কোন শহর ছিল না, যেখান থেকে স্বচ্ছন্দে অভিযান চালানো যায়। তৃতীয়টিকে বলা হয় বদ্বীপ পথ। এ পথটি উপকূলবর্তী শহর ডামিয়েটা থেকে সোজা চলে গেছে কায়রোর দিকে এবং ডামিয়েটাকে ব্যবহার করা যেত চমৎকার একটি ঘাঁটি হিসেবে। কিন্তু এ পথের মাঝে মাঝে রয়েছে অসংখ্য খাল এবং নীল নদের প্রধান চারটি শাখানদী। এই নদী-নালাগুলোর কারণে কায়রোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনেকখানি সুদৃঢ়। ক্রুসেডের অভিযানের সময় নবম লুই এই বিষয়টির প্রতি একদম আমল করলেন না। গুরুত্ব দিলেন না জন-এর দুঃখজনক অভিজ্ঞতার প্রতি। তিনি কায়রো শহরে অভিযান চালানোর জন্য সবচেয়ে বেশী দুরূহ এই পথটিকে বেছে নিলেন।

লম্বা গড়ন এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী রাজা লুই ছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষ। তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু, সদাশয় এবং ধার্মিক। খ্রিস্ট ধর্মের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সহকর্মীরা তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত, জনগণ তাঁকে ডাকত সাধু পুরুষ বলে। খ্রিস্ট ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা স্বদেশ ছেড়েছেন, ক্রুসেডের জন্য যাঁরা জীবনকে নিবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সের রাজা লুই ছিলেন সবচাইতে আদর্শবান পুরুষ।

লুই'র মিশর অভিযানের সময় আরটয়েস-এর কাউন্ট রবার্ট এবং 'আনজোর' কাউন্ট চার্লস অংশ নিয়েছিলেন। এরা দু'জনেই ছিলেন লুই-এর সহোদর ভাই। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছিলেন বুরগুন্ডির ডিউক এবং বৃটেনীর কাউন্ট। রাজ্যের অভিজাত পরিবারসমূহের আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তাছাড়া আর্ল অব সেলিসবারীর উইলিয়ামের নেতৃত্বে ইংরেজদের শক্তিশালী একটি দল লুই-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এমন কি ক্রুসেডে অংশ নেয়ার মত নিম্নতম যোগ্যতাসম্পন্ন কোন পুরুষ সেদিন ঘরে বসে থাকতে পারেনি। লুই-এর পরিচালনাধীন এই অভিযানে প্রত্যেককেই অংশ নিতে হয়েছিল। খ্রিস্টানদের এই বিশাল বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণের মতে ক্রুসেডারদের বাহিনী ছিল খুবই বড়; তাদের গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য।

অপরদিকে সুলতান সালেহ আইয়্যুবের মা ছিলেন একজন নিগ্রো দাস। দেহের গড়ন এবং চেহারাও তেমন সুন্দর ছিল না। উপরন্তু তিনি ছিলেন দীর্ঘ দিনের যক্ষ্মা রোগী। তিনি সমাজ ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অবিশ্রান্ত যোদ্ধা। একটি শয্যাযুক্ত শিবিকায় আরোহণ করে তিনি রাজ্যময় ঘুরে বেড়াতেন। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ করতেন জীবনকে বাজি রেখে। এভাবেই তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক এবং সামরিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলেন।

সুলতান সালাহ উদ্দীনের অনুকরণে মুক্ত দাসদের নিয়ে তিনি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। তুরস্ক, ককেশিয়া, আরমেনিয়া এবং সিরকাছিয়ার অল্পবয়সী দাসেরাই ছিল এই বাহিনীর সদস্য। নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলের একটি দ্বীপে স্থাপন করা হল তাদের সেনানিবাস। সেই থেকে তাদের নামকরণ করা হল 'বাহিনী মামলুক' অথবা 'দ্বীপের দাস' হিসেবে। বস্তুতপক্ষে এই বাহিনী ছিল সুলতান আস-সালেহর একটি নতুন সৃষ্টি এবং এদের নিয়েই গঠিত হল রাজকীয় বাহিনী। কঠোর নিয়ম-শৃংখলা এবং উপযুক্ত শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তুললেন। তারই ফলে অল্প সময়ের মধ্যে "বাহরি মামলুকেরা" সে আমলে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দুর্ধর্ষ এবং নির্ভীক নাইটদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টানদের বাহিনী। কিন্তু তাদের মধ্যে শৃংখলাবোধের প্রচুর অভাব ছিল। মিশরের বদ্বীপ অঞ্চলে অবতরণ করার পর পরই লুই শক্তিশালী 'বাহরি মামলুকদের' মুখোমুখি হন। তাদেরকে তিনি দেখতে পান সুসজ্জিত অবস্থায়। অবশ্য রাজা লুই কখনও সুলতান আস-সালেহ-এর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পাননি।

সুলতান আস-সালেহ যখন সিরিয়ার বিদ্রোহ দমন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে তিনি জানতে পারলেন ক্রুসেডারদের অভিযান সংবাদ। তিনি জানতে পারলেন যে, প্যালেস্টাইনের পরিবর্তে মিশরকে তারা বেছে নিয়েছে লক্ষ্যস্থল হিসেবে। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি অবিলম্বে ফিরে এলেন কায়রোয়। ডামিয়েটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ইতিপূর্বে সুদৃঢ় করা হয়েছিল। সুযোগ্য সেনাপতি ফখর উদ্দীন ছিলেন এখানকার সর্বাধিনায়ক। আরবের কিন্নাহ গোত্রের লোকেরা অনিয়মিত সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ফরাসী বাহিনীকে হয়রানী করার জন্য তিনি কিন্নাহ গোত্রের সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন সেখানে।

ইতিমধ্যে ফরাসী বাহিনী মিশরের মাটিতে অবতরণ করে। ফখর উদ্দীন সুলতানের শারীরিক অসুস্থতার খবর জানতেন। তিনি ফরাসী বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কায়রোয় সুলতানের নিকট পর পর তিনটি পত্র পাঠান। কিন্তু সুলতান আস-সালেহ ততক্ষণে ডামিয়েটার পথে কায়রো ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে ফখর উদ্দীনের প্রেরিত সংবাদ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতে পারলেন

না। এদিকে সুলতানের নিকট থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ফখর উদ্দীন অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, যে কোন কাজের ব্যাপারে সুলতান যেমন দ্রুত তেমনি দক্ষ। এমতাবস্থায় সুলতানের নিকট থেকে সময় মত জবাব না আসায় গোটা ব্যাপারটিকে তিনি উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি ধরে নিলেন যে, সুলতান নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। ফরাসী বাহিনীর মুকাবিলা করা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হল। তিনি ডামিয়েটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত ডামিয়েটাবাসীরাও তাকে অনুসরণ করল। ফলে ক্রুসেডাররা কোন রকম বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ঢুকে পড়ল শহরের মধ্যে। দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে অটুট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছিল, অক্ষত অবস্থায় ক্রুসেডাররা তা দখল করে নিল।

ডামিয়েটার পথে মানসুরা পৌঁছে সুলতান এই খবর জানতে পারলেন। তিনি ক্ষিপ্ত হলেন ভীষণভাবে। এ ধরনের মস্তবড় ভুল এবং ক্ষতির জন্য যারা দায়ী, বেছে বেছে তেমনি চল্লিশ জন সর্দারকে তিনি ফাঁসির হুকুম দিলেন।

ইতিমধ্যে সুলতান সালেহ-এর জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে মুসলিম শিবিরে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। এই ঘটনার তিন দিন পর অর্থাৎ ২৬ নভেম্বর ক্রুসেডাররা ডামিয়েটা থেকে কায়রোর পথে যাত্রা শুরু করে।

অতি সহজে এবং কোনরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়া ডামিয়েটা বিজয়ের ফলে ফরাসীদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তাদেরকে পেয়ে বসে অন্ধ দাম্ভিকতা। এই দুর্বলতাই ফরাসী বাহিনীর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারত। তাদেরকে নিক্ষিপ্ত করতে পারত চরম দুর্যোগের মধ্যে। ডামিয়েটা বিজয়ের পর পরই ফরাসী বাহিনীতে দেখা দেয় মতানৈক্য। ডামিয়েটা দখলের পর রাজা লুই অল্প সময়ের জন্য যাত্রার বিরতি টানেন। এর পশ্চাতে প্রধান কারণ ছিল দুটি। প্রথমত রাজার তৃতীয় ভ্রাতা এবং পয়েটার কাউন্ট আলফনসোর অতিরিক্ত বাহিনীসহ মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা ছিল। দ্বিতীয়ত, বর্ষা শেষে নীল নদের স্রোতের প্রখরতা হ্রাস পেলে সেনাবাহিনীর চলাচল অনেকখানি সহজতর হত। কিন্তু ইত্যবসরে ক্রুসেডারদের মধ্যকার মতানৈক্য আরও তীব্র এবং ব্যাপক আকার ধারণ করে।

যাহোক, আলফনসো অতিরিক্ত বাহিনীসহ ডামিয়েটায় হাযির হল। তৎপর হয়ে উঠল ফরাসী বাহিনী। যুদ্ধ উপদেষ্টাদের মধ্যে কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে, প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করতে হবে ঘাঁটি হিসেবে। কিন্তু রাজার অন্য ভ্রাতা আরটয়েসের কাউন্ট দ্বিমত পোষণ করল। শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করল এই প্রস্তাবকে। সে বলল-বিষাক্ত সাপকে মারতে হলে প্রথমে তার মাথাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কায়রো মিশরের রাজধানী। সুতরাং আমাদের অভিযানের মূল লক্ষ্য হবে কায়রো।

অন্যত্র অভিযান চালানো একান্তই নিরর্থক। রাজা লুই, যিনি নাকি একজন সাধু পুরুষ এবং ব্যতিক্রমধর্মী অধিনায়ক, তিনি ভাইয়ের রাজোচিত পরামর্শকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করলেন। অবশেষে ফরাসী বাহিনী ২০ নভেম্বর বদ্বীপের পথ ধরে কায়রোর দিকে যাত্রা করে।

যাত্রাপথে কিন্‌নাহ গোত্রের অনিয়মিত হালকা অশ্বারোহীরা ক্রুসেডারদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বিঘ্নিত করে তাদের অগ্রযাত্রাকে। ডামিয়েটা থেকে বাহরি-আস্-সাগিরের দূরত্ব মাত্র ৫০ মাইল। এই পথটুকু অতিক্রম করতে তাদের সময় লাগে দীর্ঘ ৪ সপ্তাহ। এবং ২১ ডিসেম্বর তারা বাহরি আস-সাগিরের উত্তর তীরে এসে উপস্থিত হয়। এখানে এসে তারা মিশরীয় বাহিনীকে নদীর অপর প্রান্তে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখতে পায়।

ফরাসীরা যে প্রস্তুতি নিয়ে মিশরে এসেছিল, তাতে বড়জোর দু'মাস অভিযান চালান যেত। ডামিয়েটা দখল করার পর খাদ্যসামগ্রীর বিপুল ভাণ্ডার তাদের হস্তগত হয়। আসলে এটা ছিল ফরাসী বাহিনীর প্রতি বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু এদিকে মিশরে তাদের অভিযান দু'মাসের স্থলে ছয় মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হল। ফলে তাদের রসদ সামগ্রীর সরবরাহ পরিস্থিতি খুবই খারাপ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে। এই অভিযানকে সফল করে তোলার জন্য অবিলম্বে কায়রো দখল করা জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া সময় এবং পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল তাদের প্রতিকূলে। কিন্‌নাহ গোত্রের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীরা তাদের পেছনে লেগেছিল। যুদ্ধে বিরতি দিলেই অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারত। উপরন্তু খাদ্যের অভাবে তাদের দিন কাটাতে হত অর্ধাহারে-অনাহারে।

সুলতান আস-সালেহ-এর স্ত্রী শারজাহ-উদ-দার ছিলেন খুবই রূপবতী, বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ। আরমেনীয় ক্রীতদাসী হলেও অদ্ভুত কতকগুলো গুণের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার মধ্যে। তার মধ্যে উদ্যোগের-উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। কথিত আছে যে, শারীরিকভাবে পঙ্গু এবং রুগ্ন সুলতানের ব্যাপক কর্মতৎপরতার মূলে ছিল এই বিদূষী রমণীর উৎসাহ এবং প্রেরণা। সুলতানের ইন্তেকালের পর তুরান শাহ ছিল সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন সুদূর মেসোপটেমিয়ায়। ফলে শাসন ক্ষমতায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাতে করে দেশের সর্বত্র এবং সর্বস্তরে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। নেহায়েত কল্পনার উপর ভিত্তি করে ফখর উদ্দীনের ডামিয়েটা পরিত্যাগের মধ্য দিয়েই সেই সম্ভাবনার স্বাক্ষর মেলে।

দেশের একটি সংকটময় মুহূর্তে শারজাহ-উদ-দার সচল হয়ে উঠেন। সেনাবাহিনী প্রধান 'খোজা'কে নিয়ে নিলেন বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে। তুরান শাহের ফিরে না আসা পর্যন্ত ফখর উদ্দীনকে নিয়োগ করেন অভিভাবক হিসেবে। এমনকি

সুলতানের মৃত্যু সংবাদকে সকলের কাছে গোপন রাখলেন। সুলতান আস-সালেহ সঙ্গী-সাথীদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতেন। সুলতানের এই অভ্যাসটি তাঁর মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখতে সাহায্য করল। সুলতানের জীবিত অবস্থা প্রমাণের জন্য নিয়মিত তাঁর ঘরে খাবার সরবরাহ করা হত। সুলতানের দরবার থেকেই যথানিময়ে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালিত হতে থাকল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে ফরমান জারি হল সুলতানের স্বাক্ষরে। বলা বাহুল্য, শারজাহ-উদ-দার নিজেই এসব আদেশ-নির্দেশ লিখতেন এবং সুলতানের হয়ে তিনি এগুলোতে জাল সই করতেন। শারজাহ-উদ-দার এসব কাজের আঞ্জাম দিতেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এবং সংগোপনে। এমনকি বাহরি মামলুকদের যে দলটি সুলতানের তাঁবু পাহারা দিচ্ছিল, তারাও এসব কার্যকলাপের সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতে পারল না। মিশরীয় বাহিনীকে পূর্বের মত সুশৃঙ্খল অবস্থায় রাখা হল। ক্রুসেডাররা ভাবল এবার তারা সুলতানের মুখোমুখি হয়েছে।

দীর্ঘদিন এই গোপনীয়তা রক্ষা করা গেল না। এক সময়ে জানাজানি হয়ে গেল সুলতানের মৃত্যুসংবাদ। ততদিনে অবশ্য গোটা পরিস্থিতি চলে গেছে শারজাহ-উদ-দার এবং ফখর উদ্দীনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। কেটে গেছে তাদের সংকটাবস্থা। কিন্তু ক্রুসেডাররা যখন জানতে পারল যে, মুসলমানদের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন সাধারণ মহিলা, তাদের বিশাল বাহিনীর মুকাবিলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এমন একজন বৃদ্ধ উজির যিনি ইতিপূর্বে একান্ত অনুগতের মত দুর্ভেদ্য ডামিয়েটা পরিত্যাগ করে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন, তখন তারা আনন্দে মেতে উঠল। ফেটে পড়ল বিজয় উল্লাসে।

ক্রুসেডাররা বাহ্‌রি-আস-সাগির অতিক্রম করা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল। নদীটির আশেপাশে কোথাও কোন সেতু ছিল না। অথবা পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে ক্রুসেডাররা নদীতে বাঁধ নির্মাণের কাজে লেগে গেল। কিন্তু নদীর অপর প্রান্ত থেকেই মিশরীয় বাহিনী তাদের নির্মাণ কাজে বাধা দিল। বাঁধ নির্মাণকারী দলের উপর তীর বর্ষণ শুরু করল। তীরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ক্রুসেডাররা একটি চালা তৈরী করল। এই চালার আবডালে থেকে তারা চালিয়ে গেল বাঁধ নির্মাণের কাজ। পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য মুসলিম বাহিনীর রণাঙ্গনে ১৬টি যুদ্ধ ইঞ্জিন নিয়ে এল। কামানের সাহায্যে যেমন গোলাগুলি নিক্ষেপ করা হয়, তেমনিভাবে মুসলমান সেনারা এই যুদ্ধ ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করল মিসাইল হিসেবে। ক্রুসেডারদের প্রতিরক্ষা চালার উপর পাথর এবং তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল।

এমনিভাবে উভয় বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। অবশ্য যুদ্ধ সীমিত থাকল ইঞ্জিনিয়ারদের কারিগরি কলাকৌশলের মধ্যে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। ক্রুসেডারদের পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের নেতৃত্ব দিলেন হসেলিন ডি

করনাট। অবশ্য মুসলমানদের পক্ষে এই যুদ্ধে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান হিসেবে কে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তা ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ ইঞ্জিনের মুকাবিলায় ক্রুসেডাররা ভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করল। নির্মীয়মাণ বাঁধের দু'পাশে তৈরী করল দু'টি ভ্রাম্যমাণ টাওয়ার। টাওয়ারের উপরে বসিয়ে দিল তীরন্দাজ সৈন্যদেরকে। তাদের ছত্রছায়ায় থেকে ক্রুসেডারদের বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। মুসলমানদের সেনারাও এবার ভিন্ন পথে এগুলো। তারা নদীর তীর কাটতে শুরু করে। অবস্থা এ রকম দাঁড়াল যে, ক্রুসেডাররা বাঁধ নির্মাণ করে যতই সামনের দিকে এগোয়, নদীর তীর ততই দূরে সরে যায়। নদীর এক প্রান্তে বাঁধ দেয়ার কারণে অপর প্রান্তের স্রোত বেড়ে যায়। ফলে বাঁধ নির্মাণের চেয়ে নদীর তীর কাটার কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হতে থাকে।

মুসলমান বাহিনীর কীর্তিকলাপ দেখে ক্রুসেডাররা হতভম্ব হয়ে যায়। মুসলমানদের পক্ষে যারা নদীর তীর কাটার কাজে নিয়োজিত ছিল, ক্রুসেডাররা এবার তাদের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। মিশরীয় ইঞ্জিনিয়াররাও পাল্টা ব্যবস্থা নিলেন। উপযুক্ত প্রতিশোধ নিলেন তাদের আক্রমণের। দূরে নিক্ষেপণযোগ্য একটি যন্ত্র স্থাপন করলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্রুসেডারদের উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। যন্ত্রটি কামানের মত কাজ দিল। যন্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা বক্র পথে গিয়ে সরাসরি প্রতিরক্ষা চালার উপর আঘাত হানল। এ অবস্থা লক্ষ্য করে বাঁধ নির্মাণকারী ফরাসী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে হকচকিয়ে যায়। একই সময় তারা ১৬টি যুদ্ধ ইঞ্জিনের সাহায্যে টাওয়ারের মাথায় গোলা বর্ষণ করল। গোলার মাথায় বেঁধে দিল জ্বলন্ত রজ্জ। এক সময়ে কাঠের তৈরী টাওয়ারে আগুন ধরে গেল। জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তীব্র আক্রমণের মুখে ক্রুসেডারদের কর্মী বাহিনী সেখান থেকে চলে গেল অন্যত্র। এমনিভাবেই মিশরীয় যন্ত্রগুলো ক্রুসেডারদের নির্মীয়মাণ বাঁধকে নিয়ে আসে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে।

যে সম্ভাবনা নিয়ে ক্রুসেডাররা মিশরের মাটিতে পদার্পণ করেছিল এবার তা সুদূরপরাহত হল। মজুদ কাঠের গুড়ি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে তাদের সরবরাহ । ফলে নতুন করে টাওয়ার নির্মাণ করা দুরূহ হয়ে পড়ল। যাদের নিকট পরিবহন জাহাজ ছিল, কাঠের গুড়ি সরবরাহ করার জন্য রাজা লুই তাঁর আহবানে সাড়া পেলেন। পরিবহন জাহাজগুলো রাজার নিকট হস্তান্তর করা হল। বস্তুতপক্ষে খ্রিস্ট ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ধরনের উদগ্র আকাজ্ক্ষা নিয়েই খ্রিস্টানরা ক্রুসেডে অংশ নিয়েছিল। জাহাজগুলো ভেঙ্গে সেই কাঠ দিয়ে নতুন করে নির্মাণ করা হল টাওয়ার। টাওয়ারকে বাঁধের সন্নিকটে স্থাপন করতেই মুসলমান বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার সচল হয়ে উঠেন। যুদ্ধ ইঞ্জিন থেকে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে টাওয়ারটিকে পুনরায় পুড়িয়ে ফেলেন।

খ্রিস্টান সেনারা এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে নিশ্চিত বিপর্যয়ের করুণ চিত্র। তাদের বাঁধ নির্মাণ প্রচেষ্টা বিফলে গেল। সরবরাহ জাহাজগুলো ভেঙ্গে ফেলার আয়োজন নিরর্থক হল। এমনিভাবে হতাশার মধ্যে ক্রুসেডারদের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেল। অসহায় রাজা লুই ডামিয়েটায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিলেন। ক্রুসেডাররা যখন এমনি দুর্যোগের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল, বিপর্যয়ের গ্লানি কাঁধে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল ডামিয়েটায়, ঠিক সেই মুহূর্তে একান্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবেই তারা এই করুণ পরিণতি থেকে অব্যাহতির পথ পেয়ে যায়।

স্থানীয় কপটিক গোত্রের একজন অধিবাসী ধর্মীয় অনুভূতি এবং অর্থের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে সে অতি সংগোপনে খ্রিস্টান শিবিরে গিয়ে হাযির হল। মাত্র ৫০০ স্বর্ণমুদ্রার লোভে সে ক্রুসেডারদের কাছে ফাঁস করে দিল একটি গোপন তথ্য। জানিয়ে দিল যে, ক্রুসেডাররা যেখানে বাঁধ নির্মাণ করেছে সেখান থেকে নীল নদের ভাটিতে মাত্র তিন মাইল দূরেই রয়েছে নদী পার হাওয়ার মত একটি পথ। এই পথটি সম্পর্কে জনসাধারণের তেমন একটা চেনা-জানা নেই। এখানে পানির গভীরতা একটু বেশী এবং নদী পার হওয়াটা কষ্টদায়ক হলেও অশ্বারোহী বাহিনীর অপর পাড়ে যাওয়ার জন্য এটাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ।

ক্রুসেডাররা মানসুরার প্রান্তরে ৬ সপ্তাহের বেশী সময় আটকা পড়েছিল। লুই আবারো তার ভাগ্যকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। কিছু সংখ্যক প্যালেস্টাইনী বেরোনেট এবং গোটা পদাতিক বাহিনীকে শিবির প্রহরার কাজে নিয়োজিত রেখে রাতের আঁধারে নদী অতিক্রম করার উদ্যোগ নিলেন। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম দলের নেতৃত্বে থাকলেন লুই-এর ভ্রাতা আরটয়েস এর রবার্ট। টেম্পালারের নাইটেরা ছিল এই দলে। দ্বিতীয় দলের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হল লুই-এর অপর ভ্রাতা আনজোঘ্র চার্লসের উপর। তৃতীয় দলটিকে রাজা নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিলেন।

এবারে রাজা লুই-এর যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল মোটামুটি এরকম তিনটি দল একে-একে নদী অতিক্রম করে যাবে। তারা সংগঠিত হবে নদীর দক্ষিণ প্রান্তে। সেখান থেকেই তারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে মুসলিম বাহিনীর উপর। নাইটেরা মুসলমানদের যুদ্ধ ইঞ্জিনগুলো ধ্বংস করে দেবে এবং উত্তর প্রান্তের পদাতিক সেনারা পুনরায় বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করবে। অবশ্য লুই-এর গোটা পরিকল্পনার কার্যকারিতা নির্ভর করছিল ক্রুসেডারদের কঠোর শৃঙ্খলা, দৃঢ়চিত্ততা এবং আকস্মিকতার উপর এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এবার যেন ভাগ্যবিধাতা ক্রুসেডারদের সপক্ষে।

১২৫০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি। আরটয়েসের অগ্রবর্তী দলটি যেখান দিয়ে নদী পার হওয়া যায় সেখানে এসে হাযির হল। এই স্থানটি তখন সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। অগ্রবর্তী দলটি তেমন কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাক ছাড়াই সাঝ-সকালে নদী পার হতে শুরু করে। হঠাৎ করেই কোত্থেকে যেন বেদুইনদের হালকা অশ্বারোহীর ছোট্ট একটি দল সেখানে এসে পৌছে। ক্রুসেডারদের নদী পার হতে দেখে এবং আসন্ন বিপদাশংকার কথা চিন্তা করে তাদের ভেতরটা কেঁপে উঠে। তারা সাধ্যমত ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আরটয়েসের দলের সৈন্য সংখ্যা ছিল অগণিত। ফলে বেদুইনরা ভারী অশ্বারোহীদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না। উপায়ান্তর না দেখে তারা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল মুসলমান শিবিরে। তাদের জানিয়ে দিল আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে।

যে আকস্মিকতা এবং দ্রুততার সঙ্গে ক্রুসেডাররা নদী পার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এসেছিল, আরটয়েসের নদী অতিক্রম করার পর তাদের সেই তীব্রতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। অবস্থার প্রেক্ষিতে আরটয়েসের তাৎক্ষণিক এবং একক সিদ্ধান্ত নিতে হল। তীব্র গতিতে সে বেদুইনদের পিছু ধাওয়া করল। অনায়াসেই দখল করে নিল মিশরীয় বাহিনীর অরক্ষিত যুদ্ধ ইঞ্জিনগুলো। এ দিকে ফরাসী বাহিনী নদী অতিক্রম করার সময় দক্ষিণের তীর সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিল। পথটি ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় দলটির জন্য খাঁড়া ঢাল বেয়ে উপরে উঠা খুবই দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের আকস্মিকতা হ্রাস পায়। বিলম্বিত হয় তাদের অগ্রযাত্রা। বস্তুতপক্ষে আরটয়েসের জন্য এটা ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা। তার একার পক্ষে কি মুসলমান সেনাদের মুকাবিলা করা সম্ভব। অতিরিক্ত বাহিনী না আসা অবধি সে কি পারবে এই স্থানটি ধরে রাখতে। এমনি পরিস্থিতিতে কেবল মাত্র সময়ের উপর সমস্ত ঘটনা প্রবাহের ফলাফল নির্ভর করছিল। সন্ধিক্ষণের ঘটনার নায়ক আরটয়েস আকণ্ঠ উদ্বেগের সঙ্গে একবার দক্ষিণে, আরেকবার পূর্ব দিকে তাকায়, ভাবে এখনই হয়ত পূর্ব দিক থেকে অতিরিক্ত বাহিনী এসে যোগ দেবে তার সঙ্গে। পরক্ষণেই তার মনে হয় এই বুঝি মিশরীয়রা সসৈন্যে তার উপর চড়াও হল। এদিকে কোনরকম বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই খ্রিস্টানদের পদাতিক সৈন্যরা দ্রুত গতিতে বাঁধ নির্মাণ করে যাচ্ছিল। আরটয়েস পশ্চাৎ দিক থেকে তাদের আগমন প্রত্যাশায় অস্থির হয়ে পড়েছিল।

ক্রুসেডারদের আগমন সংবাদ পেয়ে মিশরীয়রা অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটি দল চলে যায় যেখান দিয়ে ক্রুসেডাররা নদী অতিক্রম করেছিল সেখানে। অপর দলটি বাঁধ নির্মাণ স্থলে গিয়ে সমবেত হয়। কিন্তু এ সময়ে মিশরীয়রা ছিল খুবই অসংগঠিত এবং অগোছালো। তবু তারা বীরবিক্রমে আরটয়েসের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তীর বর্ষণ করতে থাকে বিরামহীনভাবে। নাইটেরা বর্ম পরিহিত

থাকায় মিশরীয়দের আক্রমণ তাদের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না। কিন্তু অরক্ষিত ঘোড়াগুলো সহজেই এই আক্রমণের শিকার হল। এমনি পরিস্থিতিতে আরটয়েস মুসলমান তীরন্দাজদের উপর পাল্টা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু টেম্পালারের নাইট এবং ইংরেজ বেরনরা তাকে বাধা দিল। চেষ্টা করল পাল্টা আক্রমণ থেকে আরটয়েসকে বিরত রাখতে। কিন্তু অভিযানের শুরুতে সহজ বিজয়গুলো তাকে এতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল যে, অন্যান্যের অভিমতকে উপেক্ষা করে সে সব শক্তি নিয়ে তীরন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংগঠিত তীরন্দাজ বাহিনী আরটয়েসের দুর্বার আক্রমণের মুখে টিকতে পারল না। অনেকেই নিহত হল খ্রিস্টানদের তলোয়ারের আঘাতে। এর পরেই মিশরীয় শিবিরের সর্বত্র আতংক ছড়িয়ে পড়ল। সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিল ভয়-বিহবলতা।

মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফখর উদ্দীন তখন শ্বেত, শুভ্র দাড়িতে লাল রঙ দিচ্ছিলেন। তীরন্দাজ বাহিনীর বিপর্যয়ের কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে উত্তেজিত হলেন। নির্ভীক এই বৃদ্ধ এক লাফে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন। এমনকি যুদ্ধ-বস্ত্র পরিধানের সময় পর্যন্ত পেলেন না। এক দমে তিনি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে হাযির হলেন। খ্রিস্টানরা তাকে চিনতে পারেনি। অন্যান্যের মত তিনিও খ্রিস্টানদের তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দিলেন। একের পর এক বিজয় লাভ করে আরটয়েসের উচ্চাশা আরও বেড়ে গেল। অতিরিক্ত বাহিনীর অপেক্ষায় না থেকে এবার সে মানসুরাহ দখলের উদ্যোগ নিল। সিদ্ধান্ত নিল মিশরীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয়ার।

১২৪৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। আলেপ্পো, দামেশক এবং কেরাকের আইয়ুবী যুবরাজদের সহযোগিতায় ক্রুসেডাররা বিশাল একটি বাহিনী গড়ে তোলে। হঠাৎ করেই গাজার নিকটবর্তী একটি মিশরীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। মিশরীয় এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫,০০০। তন্মধ্যে ১০,০০০ ছিল খাওয়ারিজম এবং অবশিষ্টরা ছিল মামলুক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মামলুক বংশীয় রুকন উদ্দীন বেবারস আল বন্দুকদারী ছিলেন এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তাঁর চমৎকার নেতৃত্ব গুণে ক্ষুদ্র মিশরীয় বাহিনী সম্মিলিত শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয়। তাদের বাধ্য করে যুদ্ধ ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে।

সেই রুকন উদ্দীন এবার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলেন। মানসুরার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করলেন তার সৈন্যদেরকে। আরটয়েস এবং তার বাহিনীকে খোলা পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিলেন। এই অবসরে মামলুকেরা পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ চালায়। বিপর্যয়ের মুখে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নাইট নীল নদের দিকে ছুটে পালায়। কিন্তু সেখানে গিয়েও তাদের শেষ রক্ষা হল না। নীল নদেই তাদের সলিল সমাধি ঘটে। হাতে গোনা কয়েকজন সৈন্য

মিশরীয় সৈন্যদের বজ্রমুষ্ঠি থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। অবশিষ্টরা যুদ্ধের ময়দানে নিহত হল। আরটয়েসের কাউন্ট, সেলেসবারীর 'আরল'ও ছিল এই দলে। ২৯০ জন টেম্পালারের নাইটদের মধ্যে মাত্র ৫ জন প্রাণে বেঁচে যায়। এমনিভাবেই আরটয়েসের অহমিকাবোধ নিশ্চিত বিজয়কে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

মুসলিম বাহিনী বিজয়ের একটি ধাপ অতিক্রম করল। লুই যেখান দিয়ে নদী পার হচ্ছিল, বিজয়ী সেনারা এবার সেদিকে ঘোড়া ছুটায়। কিন্তু ততক্ষণে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলটি নদী অতিক্রম করে দক্ষিণ প্রান্তে চলে এসেছে। এবং কিন্‌নাহ গোত্রের হালকা অশ্বারোহীদের অব্যাহত আক্রমণের মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে যায় নির্মীয়মাণ বাঁধের দিকে। ইতিমধ্যে ফরাসীদের পদাতিক বাহিনী বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে ফেলে এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সেতু মুখে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সহসাই তাদের সমস্ত সাধ্য-সাধনা পণ্ডশ্রম বলে প্রমাণিত হল। মাত্র কয়েকশ' গজ দূরেই তারা মুসলিম বাহিনীকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পায়। সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে আমলের সেরা যোদ্ধা বাহরি মামলুকেরা। তাদের সংখ্যাও ছিল প্রায় ১০,০০০ -এর মত। চমৎকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং উৎকৃষ্টমানের মিশরীয় ঘোড় সওয়ারদের দেখে পাশ্চাত্যের অহংকারী নাইটদের মনে হল তারা যেন দুঃসপ্ন দেখছে।

বাহরি-আস-সাগিরের প্রান্তরে ক্রুসেডারদের সাধ্য-সাধনার অন্ত ছিল না। এত কিছুর পরে তারা কেবল যুদ্ধের মূল স্রোতকে নদীর উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে স্থানান্তর করতে সমর্থ হল। যুদ্ধ ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণের জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। অথচ, ফরাসী সেনারা তখন এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, বাহরি মামলুকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার মত শক্তি তাদের নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। একান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবেই তারা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকল। অলৌকিকভাবেই যুদ্ধের ময়দানে কোন ঘটনা ঘটবে, যুদ্ধের গতি আবার ফিরে যাবে তাদের পক্ষে; হয়ত এ ধরনের কোন সম্ভাবনার জন্যই তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তেমন কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটল না, অথবা লক্ষণ মাত্র দেখা গেল না। মিশরীয় বাহিনী যুদ্ধ কৌশল ঠিক করে নিল। স্থির করল যে, শত্রুসেনাদের উপর সম্মুখভাগ দিয়ে আক্রমণ করে কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। বরং অপ্রতিরোধ্য অবরোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তাদের আত্মসমর্পণের জন্য বাধ্য করতে হবে। বস্তুতপক্ষে এ সময়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল মিশরীয়দের অনুকূলে।

সুলতান আস সালেহ-এর উত্তরাধিকারী তুরান শাহ ২৮ ফেব্রুয়ারি মেসোপটেমিয়া থেকে মানসুরাহ এসে পৌঁছালেন। তিনি অনেকগুলো নৌকা তৈরী করলেন। উটের পিঠে বসিয়ে নৌকাগুলো নিয়ে গেলেন নীল নদের ভাটিতে। মানসুরাহর রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের খাদ্য খাবার এবং অন্যান্য রসদ-সামগ্রী

আসতো ডামিয়েটা থেকে। রসদ-সামগ্রী আনা হতো নদীপথে জাহাজ বোঝাই করে। মুসলিম সেনারা তাদের নৌবহরের সাহায্যে মাল পরিবহনকারী ফরাসী জাহাজগুলোর উপর আক্রমণ চালান। অল্প সময়ের মধ্যেই আটক করল ৮০টিরও বেশী জাহাজ। এমন কি এক দিনেই (১৫ মার্চ) ফরাসীদের ৩২টি জাহাজের একটি বহর বেদখল হয়ে গেল। ক্রুসেডাররা এবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হল। সেনা ছাউনিতে দেখা দিল টাইফয়েড, আমাশয় এবং নানারকমের অসুখ।

সর্বাধিনায়ক লুই তবু নিরাশ হলেন না। ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে, যে কোন আইয়ুবী রাজার ইন্তেকালের পর পরই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দেখা দেয় বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ। লুই এমনি একটি পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মিশরীয় শিবিরে তেমন কোন বিশৃঙ্খলার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা গেল না। ফলে ডামিয়েটায় ফিরে যাওয়া ব্যতীত তাঁর সামনে বিকল্প আর কোন পথ থাকল না। এমনি ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই রাজা লুই-এর দীর্ঘ দিনের আয়োজন এবং ক্রুসেডের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল।

কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, ইচ্ছা করলেই যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। এখানেও সামরিক নৈপুণ্য এবং কলা-কৌশলের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। প্রয়োজন পড়ে অপূর্ব দক্ষতা, উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং স্থিরচিত্ততার সৈন্য বাহিনীর সংগঠন কাঠামো, কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং উন্নত মনোবলও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মানসুরার রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ফরাসী বাহিনী এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছে যে, এ সকল গুণের কোনটিই তাদের মধ্যে ছিল না। তাদের নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটেছিল, মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল সম্পূর্ণরূপে। সর্বাধিনায়ক হিসেবে লুই কখনও একক সিদ্ধান্তে সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। তদুপরি তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমনি একটি অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ৫ এপ্রিল ক্রুসেডাররা পশ্চাদপসরণ শুরু করে। কিন্‌নাহ গোত্রের বেদুইন অশ্বারোহীরা যেন তৈরী ছিল। পশ্চাদপসরণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বেদুইন অশ্বারোহীরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যতিব্যস্ত করে তোলে ফরাসী বাহিনীর ডান প্রান্তের সেনাদলকে। ফরাসী পদাতিক সৈন্যরা বেদুইন তীরন্দাজদের প্রতিহত করতে পারল না। ভারী অশ্বারোহীরা এতটা অবসাদগ্রস্ত ছিল যে, তারাও বেদুইনদের তাড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হল। চলমান এই যুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যেই ফরাসী বাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হল। ৬ এপ্রিল বাহরি মামলুকেরা পশ্চাদপসরমান শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল ক্রুসেডারদের সমরসজ্জাকে। অবশেষে তারা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। রাজা লুই বন্দী হল। বন্দী হল গোটা ফরাসী বাহিনী।

মানসুরা যুদ্ধে বিবদমান পক্ষের প্রকৃত সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

তবে অনুমান করা হয় যে, সংখ্যার বিচারে উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল সমান। বাহরি মামলুকেরা ছিল সুলতানের পেশাদার নিয়মিত বাহিনী। এদের মোট সংখ্যা ছিল ১০,০০০। তাছাড়া স্থানীয় সৈন্য এবং অনিয়মিত বেদুইন অশ্বারোহীরাও যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। প্রবল ধর্ম উন্মাদনা নিয়ে বিশাল বাহিনীসহ যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেও এই যুদ্ধে খ্রিস্টানদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে এই যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর ৭,০০০ সৈন্য মারা যায়। বন্দী হয় ২০ হাজার সৈন্য। তাছাড়া মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং অসুস্থতার কারণেও অনেক সৈন্য মারা যায়। এমনকি আশমুম এলাকা দিয়ে বাহরি-আস সগির অতিক্রম করতে গিয়েও অসংখ্য ক্রুসেডারের সলিল সমাধি ঘটে। এই সমস্ত মৃতের সংখ্যা যোগ করলে যে চিত্র দাঁড়ায় তা সত্যি বেদানায়ক এবং লোমহর্ষক।

মানসুরার যুদ্ধে ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটল। তাদের এই বিপর্যয়ের মূলে ছিল দুর্বল নেতৃত্ব এবং শৃঙ্খলার অভাব। বদ্বীপ এলাকা দিয়ে মিশর অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে লুই মস্তবড় ভুল করেছিলেন। আশমুম এলাকা দিয়ে নদী অতিক্রম করার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাও ছিল হতাশাব্যঞ্জক। যুদ্ধের ময়দানে নীরবে এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অমার্জনীয় অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। অথচ রাজা লুই এই ভুলটি করেছিলেন। সেতু মুখে একাধারে দু'মাস অতিবাহিত করলেন। এ সময়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার মত শক্তি তার ছিল না। মানসুরা জয় করার মত ক্ষমতা অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ মিশরীয় তীরন্দাজ এবং অশ্বারোহীরা অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে ক্রুসেডারদের অশেষ ক্ষতি সাধন করছিল। যেখানে বিজয়ের আশা বহু পূর্বেই তিরোহিত হয়ে গেছে, সেখানে মিশরীয় বাহিনীর অবরোধের মুখে অতিরিক্ত বাহিনী আসার সম্ভাবনা নেই, সেখানে কেন তিনি এত দীর্ঘ সময় কালক্ষেপণ করলেন? কেন তিনি মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপে খ্রিস্টান বাহিনীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে এতখানি বিপন্ন হওয়ার সুযোগ দিলেন? তার তো বহু পূর্বেই রণাঙ্গন ছেড়ে ডামিয়েটার পথে প্রত্যাবর্তন করা উচিত ছিল।

এমনকি রাজা লুই-এর পশ্চাদপসরণের আয়োজনটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মত। যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করলেও সর্বাধিনায়ক লুই ক্রুসেডারদের নির্মিত সেতুটি ধ্বংস করে যাননি। ফলে ফরাসী বাহিনী নদী অতিক্রম করে যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মুসলমান সেনারা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। অথচ তিনি যদি এই কৌশলগত ভুলটি না করতেন, পশ্চাদপসরণকালে ভেঙ্গে ফেলতেন সেতুটি এবং আশমুম এলাকা দিয়ে মুসলিম বাহিনী যাতে নদী অতিক্রম করতে না পারে সেজন্য অশ্বারোহীদের ছোট্ট একটি দলকে নিয়োগ করতেন, তাহলে ব্যাপারটা হয়ত অন্যরকম দাঁড়াত। তিনি নিরাপদে পশ্চাদপসরণের জন্য অনেক বেশী সময় পেতেন।

আরটয়েসের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের প্রথম দলটি বাহরি আস-সগির অতিক্রম করে এল ঠিকই, কিন্তু এই দলটি ছিল উচ্ছৃঙ্খল। আরটয়েসের মধ্যেও সামরিক নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতার প্রচুর অভাব ছিল। যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টের উপর সঁপে দেয়। কেবল দৈব ঘটনা বা সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে সে অভিযান চালায়। মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ না চালিয়ে যদি সে সেতু মুখে অবস্থান নিত, অপেক্ষা করত ভাইয়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটির জন্য, তাহলে ফরাসীরা অন্তত অন্তর্বর্তীকালীন একটি বিজয় অর্জন করতে পারত। এমনকি মানসুরা দখল করাও অসম্ভব কোন ব্যাপার ছিল না। সে ক্ষেত্রে মানসুরাকে তারা ব্যবহার করতে পারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে।

মানসুরার এই যুদ্ধে বাহরি মামলুকেরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুলতান আস-সালেহ আইয়ুব এবং ফখর উদ্দীনের ইন্তেকালের পর বাহরি মামলুকেরাই রাজা লুই-এর বিজয়ের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সামনে কোন নেতৃত্ব নেই। সুলতান বা সর্বাধিনায়ক দু'জনেই অনুপস্থিত। তবু তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে। যুদ্ধ করে অত্যন্ত নৈপুণ্য এবং দক্ষতার সঙ্গে। সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল এই বাহিনী নির্মূল করে দেয় ফরাসীদের মিশর বিজয়ের স্বপ্নকে। বন্দী করে ফ্রান্সের রাজা নবম লুইকে। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল তাদের যোগ্যতা এবং চমৎকারিত্বের উপযুক্ত পুরস্কার।

অল্প সময়ের মধ্যে তুরান শাহ চরম নৈরাশ্যের পরিচয় দেয়। অবিবেচক এবং অকৃতজ্ঞের মত শারজাহ-উদ-দারকে প্রত্যাখ্যান করে। বরখাস্ত করে অন্যান্য মন্ত্রীকে। তদস্থলে মেসোপটেমিয়ার অনভিজ্ঞ এবং অল্প বয়সী বন্ধুদের বসিয়ে দেয় ক্ষমতার আসনে। অথচ এই বরখাস্তকৃত ব্যক্তিরাই অত্যন্ত বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সঙ্গে এতদিন কাজ করেছে। বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে, যে যোগ্যতা এবং স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এতকাল তারা দায়িত্ব পালন করেছে, সেই যোগ্যতাই হয়ত এতদিন পরে তাদের কাল হয়ে দাঁড়াবে। তাদের ঝুলান হবে ফাঁসির কাষ্ঠে। অথবা নিক্ষেপ করা হবে কায়রোর কোন অন্ধকার পাতাল পুরীতে।

অপদার্থ তুরান শাহ তাদেরকে বাধ্য করল শত্রুর কাতারে শামিল হতে। ক্ষমতাচ্যুত মন্ত্রীরা তুরান শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। সম্ভবত শারজাহ-উদ-দারও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু মিশরের মূল শক্তি ছিল বাহরি মামলুকেরা। তাদের সহযোগিতা ব্যতীত ক্ষমতাচ্যুত মন্ত্রীদের কিছু করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য বাহরি মামলুকদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে তাদের খুব বেশী বেগ পেতে হল না। সুলতান আস-সালেহ আইয়ুব যে দ্বীপে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, যেখানে বাহরি মামলুকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মন্ত্রীরাও সেখান থেকে প্রশিক্ষণ

নিয়েছিলেন। সে সূত্রে ক্ষমতাচ্যুত মন্ত্রীরাও ছিল তাদের সমগোত্রীয়। এদিকে সুলতান তুরান শাহের দুর্বলতা এবং ভীরুতার কারণে বাহরি মামলুকেরাও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে বন্দী রাজার সঙ্গে শান্তির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে এবং শর্তাবলী চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত সকলে অপেক্ষা করতে লাগল। স্থির হল যে বন্দী ক্রুসেডারদের মুক্তিপণ হিসেবে দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হবে। এবং রাজা লুই-এর মুক্তির বিনিময় হিসেবে ফরাসীরা ডামিয়েটা ছেড়ে চলে যাবে। বস্তুতপক্ষে এভাবেই ক্রুসেডের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের নিষ্পত্তি হল।

এবারে তুরান শাহ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। অত্যন্ত নগ্নভাবে সে দাবী করল যে-সুলতান আইয়ুবের ইন্তেকালের পর থেকে যে অর্থকড়ি খরচ হয়েছে, শারজাহ-উদ-দারকে তার পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ হিসাব দিতে হবে। তুরান শাহের এ ধরনের দাবীতে বাহরি মামলুকেরা খুবই কষ্ট পেল এবং অপমান বোধ করল। তারা নির্ভীক রানী শারজাহ-উদ-দারের পক্ষ অবলম্বন করল। তারই ফলে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তুরান শাহ নিহত হন।

তুরান শাহের মৃত্যুর পর শারজাহ উদ-দারকে সিংহাসনে বসান হল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর শাসনাধীনে থেকে মামলুকদের নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং দুরন্তপনা হ্রাস পাচ্ছে। অবস্থার প্রতিকারের জন্য ইজ-উদ-দীন আইবেক নামে নেতৃস্থানীয় একজন মামলুক আমীরকে তিনি বিয়ে করেন। শারজাহ-উদ-দার এভাবেই রাজ্যের মূল প্রতিরক্ষা শক্তিকে শাসনক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। ব্যক্তিগত জীবনে আইবেক ছিল বেশ শক্তিমান এবং কঠোর স্বভাবের মানুষ। তার এই কঠোরতার কারণে বেবারসের মত সৈনিকও দামেশকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে চলে যায়। কিন্তু ইজ-উদ-দীনও বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারল না। শারজাহ-উদ-দারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য শারজাহকেও চরম মূল্য দিতে হল। নিহত আইবেকের মামলুক বন্ধুরা শারজাহকে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নিল।

ইজ-উদ-দীন আইবেকের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়েই মিশরে দাস বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বাহরি মামলুক এবং পরে বুরজি মামলুকদের মধ্য থেকে শাসক নির্বাচিত হয়। একাধারে ৩৫০ বছর দাস বংশের এই দখলের মধ্য দিয়ে এখানে দাস বংশের দীর্ঘ দিনের শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দিল্লীর দাস বংশ এবং মিশরের দাস বংশ মোটামুটিভাবে একই সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উভয় শাসন ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাতা আইবেক নামের আমীর বাহরি মামলুক সুলতানদের মধ্যে বেবারস, কালাউন এবং আল-আশরাফ ছিলেন শক্তিশালী শাসক। তাদের সফল প্রচেষ্টার ফলেই ক্রুসেডাররা নিকট প্রাচ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়।

মিশরেই ছিল নিকট প্রাচ্যে খ্রিস্টানদের শেষ প্রত্যক্ষ অভিযান। সে কারণেই ক্রুসেডের ইতিহাসে মানসুরার যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অবশ্য ধর্মযাজকগণ অব্যাহতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বার বার ক্রুসেডের ডাক দেয়। কিন্তু এ সময় থেকে তাদের অভিযানগুলো নিকট প্রাচ্যের পরিবর্তে তিউনিস এবং আনাতোলিয়ার দিকে পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে দুটি ক্রুসেডই ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা লুই খ্রিস্টানদের বিশাল একটি বাহিনী নিয়ে আবারো অভিযান চালান। তিনি অতি স্বাচ্ছন্দ্যে তিউনিসের মাটিতে পদার্পণ করেন। কিন্তু মুসলমানদের এবার আর যুদ্ধ করতে হয়নি। খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে মহামারী লেগে যায়। লুই নিজেও মহামারীর শিকার হন। মহামারীর কারণেই তাদের সে অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে সাইপ্রাসের রাজা পিটার মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী একটি বাহিনী গঠন করে। সফল আক্রমণ চালিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে এত বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী তারা লুণ্ঠন করে, যার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। দ্রব্যসামগ্রী হস্তগত হওয়ার পরই তারা পবিত্র যুদ্ধের মূল লক্ষ্যকে ভুলে যায়। অর্থহীন হয়ে পড়ে ধর্মযুদ্ধ। অবিলম্বে লুণ্ঠিত সম্পদরাশি স্বদেশে প্রেরণের জন্য তারা অস্থির হয়ে পড়ে এবং সুলতানের আগমনের বহু পূর্বেই লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে নিরাপদে সাগরের বুকে পাড়ি জমায়।

রানসিম্যান আধুনিক যুগের ক্রুসেডারদের একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক। আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টান বাহিনীর কীর্তিকলাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যে বর্বরতা এবং নৃশংসতার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টানরা আলেকজান্দ্রিয়ার বিজয় উৎসব পালন করে, মানবেতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। দীর্ঘ আড়াই'শ বছরের ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডারদেরকে মানবতার কিছুই শেখাতে পারেনি। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে জেরুযালেম বিজয় এবং ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে কনস্টানটিনোপলের যুদ্ধের পর খ্রিস্টান জগৎ যে গণহত্যা চালায়, আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পরও তারা সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পাশ্চাত্য ক্রুসেডগুলো প্রধানত তুর্কীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এ সময় তুর্কীরা দারদানেলেস অতিক্রম করে এবং আধুনিক বুলগেরিয়ার পূর্ব 'থেরেস' অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু পশ্চিমাদের তুলনায় তুর্কী মুসলমানরা অধিকতর শক্তি এবং সাহসের পরিচয় দেয়। তুর্কী সালতানাতের দশজন অমিততেজা গাজী সুলতান পর পর ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন। তাঁরা ছিলেন খুবই প্রতিভাবান, দক্ষ প্রশাসক এবং মস্তবড় যোদ্ধা। তাঁরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ক্রুসেডারদের মুকাবিলা করেন। তাঁরা দারদানেলেস থেকে যাত্রা শুরু করে অনায়াসে পৌঁছে যান পোল্যান্ড এবং ভিয়েনার অভ্যন্তরভাগে। কৃষ্ণসাগর এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে সংযুক্ত করে দেন তুর্কী সাম্রাজ্যের সঙ্গে।

আয়েন জালুতের যুদ্ধ

(৩ সেপ্টেম্বর ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ)

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ওনন নদীর তীরে মোঙ্গল জাতির লোকেরা বসবাস করত। তাদেরই একজন গোত্রপতির নাম ইয়েসুগাই। সালাহ উদ্দীনের জেরযালেম বিজয়ের ২০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই গোত্রপতির ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বাবা-মা ছেলের নাম রাখলেন তেমুজিন। কিন্তু বয়সকালে এই তেমুজিন চেঙ্গিস খান (শক্তিশালী সর্দার) হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। সেই বাল্যবয়স থেকেই তিনি ছিলেন ভীষণ রকমের নির্দয় এবং নিষ্ঠুর। একজন নেতা হিসাবেও তিনি ছিলেন দক্ষ এবং বিচক্ষণ। ১২১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব দিকে দুর্ধর্ষ তাতার গোত্রগুলোকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের তুর্কী, তানগুত, কেরাইট, নাইযান, উইঘুর এবং কাবা খিতাই গোত্রগুলোকেও বশে নিয়ে এলেন। এদিকে কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন এবং উত্তর তিব্বতও চলে এল তাঁর দখলে।

চারদিকে চেঙ্গিস খানের যখন জয়-জয়কার অবস্থা, সুলতান মাহমুদ তখন মধ্য-পশ্চিম এশিয়া, ইরান এবং আফগানিস্তান শাসন করছিলেন। তুর্কো মোঙ্গল জাতির অধিপতি হিসেবে চেঙ্গিস খান সুলতান মাহমুদের আনুগত্য এবং বশ্যতা দাবী করেন। সুলতান মাহমুদ সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। চেঙ্গিস খান ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি সফল অভিযান চালিয়ে সুলতান মাহমুদের খাওয়ারিজমশাহীকে পরাস্ত করে। পদদলিত করে সমরখন্দ, বুখারা, আফগানিস্তান, ইরান, ককেশিয়া এবং দক্ষিণ রাশিয়া।

চার ছেলেকে রেখে চেঙ্গিস খান ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। চার ছেলের নাম ছিল-জুজি, জাগাতাই, ওগোদাই এবং তুলুই। জীবনের প্রথমাবস্থায় চেঙ্গিস খান যখন বন্দী জীবন অতিবাহিত করছিলেন তখন জুজি জন্মগ্রহণ করে। সে কারণে তার জন্মসূত্রের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ফলে, জুজির সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। অপরদিকে উগ্র মেজাজ এবং আবেগপ্রবণ হওয়ার কারণে জাগাতাই-এর পক্ষে বিচক্ষণ হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। অবশেষে ওগোদাইকে নির্বাচন করা হল চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারী হিসেবে।

১২৩১ থেকে ১২৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওগোদাইয়ের সেনাপতিরা আফগানিস্তান এবং ইরানকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। জর্জিয়া, আরমেনিয়া এবং দক্ষিণ

আনোতোলিয়ায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী এবং ক্রোটিয়া থেকে শুরু করে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে সফল অভিযান চালিয়ে ব্যাপকভাবে লুটতরাজ চালায়। ১২৪১ খ্রিস্টাব্দে (ডিসেম্বর) ওগোদাইর মৃত্যুর পর মোঙ্গলেরা পূর্ব ইউরোপ থেকে সরে আসে। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। এ সময়ে মোঙ্গলদের ক্ষমতার শীর্ষে ছিল ওগোদাইর পুত্র গুযুক। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে গুযুকের মৃত্যুর পর তুলুইর বড় ছেলে 'মনগ্‌কা' সিংহাসনে আরোহণ করে।

জন্মসূত্রে মনগ্‌কার মাতার সঙ্গে কেরাইটের খ্রিস্টান তুর্কী গোত্রের আত্মীয়তা ছিল। সে ছিল একজন ধর্মনিষ্ঠ খ্রিস্টান। মনগ্‌কা এবং ছোট ভাই 'আরিকবোগা' মধ্য এশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। অন্য দুই ভাইয়ের মধ্যে কুবলাইর উপর চীন এবং হালাগুর উপর আফগানিস্তান ও ইরানের শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। অপর দিকে জুজির ছেলে বাটু দক্ষিণ রাশিয়ার শাসনভার লাভ করে।

হালাগু খান ছিল মৃগী রোগী। কিন্তু পূর্বপুরুষদের নৃশংসতা এবং বর্বরতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অর্জন করেছিল। তার মেজাজ সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই আন্দাজ করা যেত না। সে বিয়ে করেছিল কেরাইট গোত্রের তেজস্বী মহিলা দকুজ খাতুনকে। সে ছিল খ্রিস্টান এবং খুবই ধর্মনিষ্ঠ। দেশের শাসনকার্যে তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বাগদাদে মোঙ্গলদের কীর্তিকলাপের ব্যাপারে দকুজ খাতুনের প্ররোচনাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাগু খান বাগদাদে অভিযান চালায়। খ্রিস্টানদের বাদ দিয়ে সমস্ত বাগদাদবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। উত্তর-পশ্চিম ইরানের উরমিয়া হ্রদের সন্নিকটেই ছিল তার রাজধানী। বাগদাদে ব্যাপক লুটতরাজের পর হালাগু খান ফিরে আসে রাজধানীতে। সেনাপতি কিতবুগাহ ছিল বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ। তার উপর বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং অন্যান্য এলাকায় অভিযান চালানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল। মোঙ্গলেরা অত্যন্ত নির্মমভাবে মুসলমানদের বড় বড় শহরগুলো ধ্বংস করে দেয়, বিনষ্ট করে ফেলে আবাদী জমিগুলো।

এখানেই দুর্যোগের শেষ হল না। পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান শাসিত অঞ্চলগুলো আরও ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হল। মোঙ্গল এবং খ্রিস্টানদের মিলিত শক্তি মুসলমানদের সমূলে এবং চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তৈরী হল। ইতিপূর্বে বাগদাদে নরহত্যা চালানোর সময় জর্জিয়া এবং আরমেনিয়ার খ্রিস্টান রাজারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল। কিতবুগার নেতৃত্বে মোঙ্গল এবং জর্জিয়া ও আরমেনিয়ার বাহিনী এবার সিরিয়ায় অভিযান চালায়। বাগদাদের ন্যায় সিরিয়ার মুসলমানদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুধু রেহাই পেল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। বস্তুতপক্ষে এভাবে মুসলমানদের মৃত্যু এবং খ্রিস্টানদের মুক্তির মধ্য দিয়েই আগামী দিনের ঘটনাপ্রবাহ যে কোন দিকে মোড় নেবে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। মুসলমানদের

বিরুদ্ধে মোঙ্গল ও খ্রিস্টানদের মধ্যে আঁতাত গড়ে উঠে এবং মোঙ্গলরাই ছিল এর প্রথম প্রস্তাবক।

অতিদর্পী মোঙ্গলেরা সবচেয়ে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও তাদের রাজনৈতিক দর্শন ছিল খুবই সাধারণ। যারা মোঙ্গলদের অধীনতা স্বীকার করে নেবে, মেনে নেবে তাদের আনুগত্য, তারাই হবে মোঙ্গলদের বন্ধু। কিন্তু যারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে না, তারাই চিহ্নিত হবে তাদের শত্রু হিসেবে। জর্জিয়া এবং আরমেনিয়ার রাজারা মোঙ্গলদের অধীনতা স্বীকার করে। ফলে, সহজেই তাদের সঙ্গে মোঙ্গলদের মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠে।

কিন্তু খ্রিস্টান বেরনেরা বশ্যতা স্বীকার করার শর্ত সাপেক্ষে মোঙ্গলদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলার জন্য তৈরী ছিল না। তারা লক্ষ্য করল যে, প্রকৃত অর্থেই মোঙ্গলরা পূর্ব ইউরোপ জয়ের জন্য আগ্রহী। এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যে নৃশংসতা এবং বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে, খ্রিস্টান বেরনদের বেলায় তার তিল মাত্র ব্যতিক্রম হবে না। তারা আরও লক্ষ্য করল যে, মোঙ্গল রাজকুমার এবং রাজকুমারীদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী তারা মূলত নেসটোরিয়ান চার্চের অনুসারী। রাজনৈতিক কারণেই তারা রোমান ক্যাথলিক চার্চের মুকাবিলায় গ্রীক কেন্দ্রিক চার্চের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল। খ্রিস্টান বেরনরা মোঙ্গলদের খুব নিকট থেকে দেখার ও চেনার সুযোগ পেয়েছিল। সহজেই বুঝতে পেরেছিল মোঙ্গলদের দুরভিসন্ধি এবং মনোভাব। ইতিপূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা মোঙ্গলদের সঙ্গে যে আঁতাত গড়ে তুলেছিল এবার তারা সেই আঁতাতের চতুর্সীমানা থেকে চলে আসে।

জার্জিয়া, আরমেনিয়া এবং এন্টিয়কের খ্রিস্টান রাজাদের সহযোগিতায় মোঙ্গলেরা সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে অভিযান চালায়। স্থানীয় খ্রিস্টানরাও আক্রমণকারী বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে। সপ্তম শতাব্দীর পর এই প্রথমবারের মত মুসলমানরা এতদঞ্চলে নিজেদেরকে নিপীড়িত এবং নিষ্পিষ্ট সংখ্যালঘু হিসেবে দেখতে পায়। আক্রমণকারী বাহিনী এবার মুসলমানদের উপর চরম প্রতিশোধ নেয়। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সবকিছু ছারখার করে দেয়।

সংখ্যা এবং শক্তিতে তুচ্ছ হলেও মুসলমানরা নিরাশ হল না। মিশরে তখনো মুসলমানদের শাসন বলবৎ ছিল। মামলুক বংশীয় সাইফ-উদ-দীন কুতুব ছিলেন এখানকার অবিসংবাদী রাজা। পলায়নপর উৎপীড়িত মুসলমানরা মিশরে আশ্রয় নিল। গোত্রপতি, সৈনিক এবং সাধারণ মানুষ সবাই এসে ঠাঁই নিল মিশরের মাটিতে। কিন্তু এ সমস্ত ভাসমান মানুষ কি নিশ্চিত এবং নিরাপদ কোন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে? নাকি তারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর হৃদয়ের মোঙ্গলদের এতদঞ্চলে আহবান করছে? এবং নিশ্চিত করে তুলছে নিকট প্রাচ্যের মুসলমান শাসিত সর্বশেষ রাজ্যটিকে ধ্বংস করে দেয়ার সমূহ সম্ভাবনাকে?

বাহরি মামলুকদের আইবেক ছিলেন মিশরে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজত্ব করেন ১২৫০ থেকে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর ইন্তেকালের অল্পকাল পরেই ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে কুতুজ নামে আরেকজন বাহরি মামলুক ক্ষমতায় আসেন। সুলতান আস-সালেহ আইয়ুব নীল নদের বদ্বীপ এলাকায় যে সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কুতুজ সেখানে থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অসম সাহসী, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। জাতযোদ্ধা কুতুজকে ভয়-ভীতি কখনও স্পর্শ করতে পারত না। বেবারস আল-বন্দুকদারী নামে একজন নির্ভীক এবং তেজস্বী বাহরি মামলুক ছিলেন তার প্রধান উপদেষ্টা।

কুতুজ পলায়নপর সমস্ত মানুষকে মিশরে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু কাপুরুষ গোত্র প্রধানদের প্রতি কুতুজ অথবা বেবারসের বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা বা শ্রদ্ধা ছিল না। অবশ্য পালিয়ে আসা সৈন্যদের তাদের দরকার ছিল। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে মামলুক সৈন্যরা ছিল ধারাল ছুরির মত। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল অতিসামান্য। এমনি পরিস্থিতিতে অবিলম্বে তাদের সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো জরুরী হয়ে পড়ে। সিরিয়া থেকে আগত সৈন্য, এমনকি সুদূর খাওয়ারিজমের সৈন্যদের তারা নিজেদের ব্যারাকে নিয়ে নিল। কুতুজের সন্দেহ ছিল হতোদ্যম এবং হীনমনা সর্দারদের নিয়ে এবং সে কারণেই সাধারণ সৈন্যরা যাতে সর্দারদের সংস্পর্শে না আসতে পারে সেই ব্যবস্থা নিল। এ ভাবেই কুতুজের দ্রুত প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলল। মোঙ্গলরা যদি এতদঞ্চলে এসেই পড়ে, তা হলে সাফল্যের সঙ্গে তাদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য তৈরী হতে থাকল।

কুতুজ যে সময়ে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রত্যাশা করছিল, তার বহু পূর্বেই তারা সদলবলে মিশরের দ্বারপ্রান্তে এসে হাযির হল। বলতে গেলে পলায়নপর সৈন্যদের পিছু পিছু হালাগু খানের দূতেরা চলে এল মিশরে। অত্যন্ত অভদ্র এবং ন্যক্কারজনকভাবে তারা হালাগু খানের নিকট মিশরের আনুগত্য দাবী করল। কুতুজ পরামর্শ সভা ডাকলেন। নাসির উদ্দীন কায়মারী নামে একজন সিরীয় যোদ্ধাও যোগ দিল পরামর্শ সভায়। সে মোঙ্গলদের বেশ ভালভাবেই জানত এবং সে যুদ্ধ করার পক্ষে অভিমত পোষণ করল। বেবারস নাসির উদ্দীনের অভিমতকে সমর্থন করল। যারা নির্ভরযোগ্য নয়, যাদের উপর বিশ্বাস করা যায় না, তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কুতুজকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হল।

কুতুজ এবং বেবারস এবার একান্তে আলোচনায় বসলেন। তাদের সামনে একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল ঃ যুদ্ধের ময়দানে মোঙ্গলদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিরীয়রা কি তাদের মনোবল এবং অমিততেজ ধরে রাখতে পারবে? অসময়ে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না তো? এ ব্যাপারে কুতুজের মনে ছিল পর্বত-প্রমাণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অবশেষে তারা একমত হল যে, যে করেই হোক সিরীয় সৈন্যদের যুদ্ধ ময়দান পরিত্যাগ করতে

আইনে জালুতের পথ
১২৬০

সাফেদ
হাত্তিন
তাইবেসিয়াস হ্রদ
হাইফা
ভূমধ্য সাগর
লুবিয়েহ
তাইবেরিয়াস
সেনাবরা
নাজ্জারেথ
জর্দান নদী
ইসড্রেলনের সমতলভূমি
তুবানিয়া
মেজ্জিডো
নহরে জুলুত
ইয়ারমুক নদী
কায়সারিয়া
গিলবোয়া পাহাড়
বায়সান
কিশন নদী
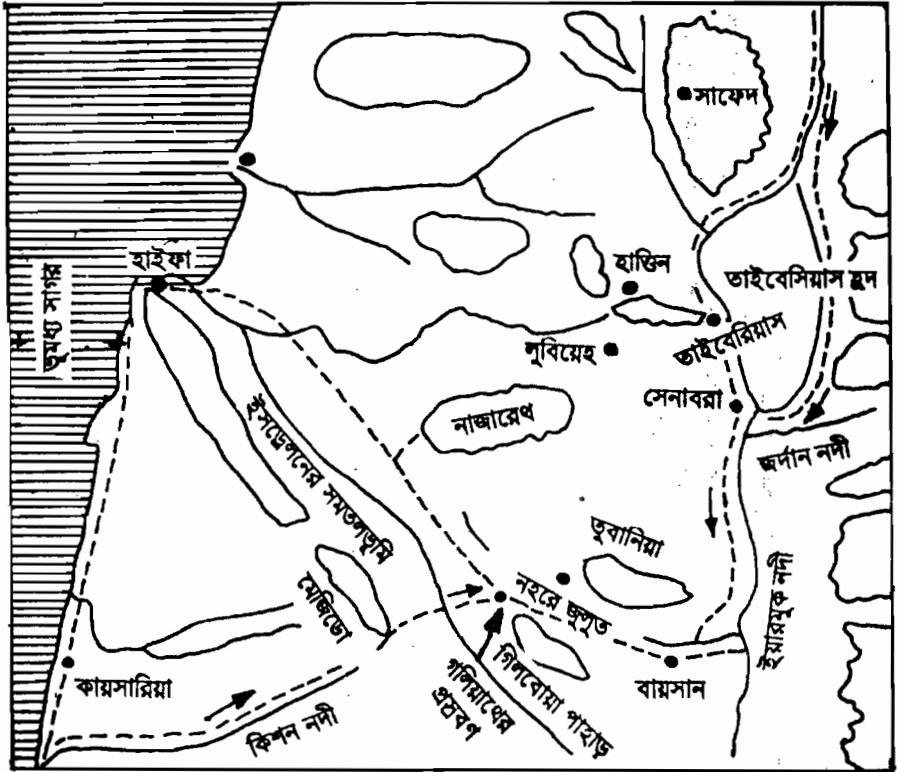
দেয়া যাবে না। অনেক আলোচনা করে দু'জনে একটি উপায় স্থির করে নিল। কুতুজ মোঙ্গল দূতদের হত্যা করল। শহরের ৪ কোণায় ঝুলিয়ে দিল চারটি মৃতদেহ। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সিরীয় ও মিশরীয়রা দেখতে পেল লোমহর্ষক এই দৃশ্য। তারা বুঝল মোঙ্গলদের প্রতি কুতুজের এটা মস্তবড় একটা চ্যালেঞ্জ। সিরীয় সৈন্যদের এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে বাকী রইল না যে, তারা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। এবারে মোঙ্গলরা সুদূর আটলান্টিক পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করবে। তাদের সামনে বিকল্প আর কোন পথ নেই। সুতরাং যা হবার, যেটা অনিবার্য, সেটাকেই তারা বরণ করে নিল। সিদ্ধান্ত নিল নির্ভীক মামলুকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার। স্বাগত জানাল কুতুজের সিদ্ধান্তকে।

কিন্তু সিরিয়ায় আশ্রিত সর্দাররা এতটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, তাদের মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হল। কুতুজ তাদেরকে মিশন ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। বলে দিলেন যে, সময় থাকতে তোমরা দক্ষিণ অথবা পশ্চিম, যে কোন দিকে পালিয়ে যেতে পার। কিন্তু তোমাদের যেতে হবে এককভাবে, কেউ কোন সৈন্য সঙ্গে নিতে পারবে না।

কুতুজ দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সে অশ্বারোহী বাহরি মামলুকদের নিয়ে গঠিত অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন বেবারস। অবশিষ্ট মামলুক সৈন্যদের নিয়ে কুতুজ তাকে অনুসরণ করলেন। 'অকসাস' থেকে শুরু করে মধ্য সাগরীয় অঞ্চলের যে সমস্ত সৈন্য মিশরে আশ্রয় নিয়েছিল, তারাও নানা বর্ণের পোশাক পরে কুতুজের সঙ্গে অগ্রসর হল। কিন্তু মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছেই আশ্রিত সৈন্যরা বেঁকে বসল। এবার তারা অগ্রসর হতে অস্বীকার করল। ক্রোধে-আক্রোশে কুতুজ চীৎকার করে উঠলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বললেন, তোমরা কেন এসেছিলে? মিশরের কাছাকাছি থেকে তোমরা মোঙ্গলদের সঙ্গে বোঝাপড়া করনি? কুতুজ অগ্রসর হওয়ার পক্ষে যুক্তি দিলেন। উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন সাধ্যমত। কখনও আবার ধমক দিলেন, ভয় দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, প্রয়োজনবোধে তিনি এককভাবেই ইসলামের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে কারও অনীহা থাকলে সে স্বাধীন মত যথেচ্ছা চলে যেতে পারে। অতঃপর মামলুক সৈন্যদের নিয়ে কুতুজ রওয়ানা হলেন। আশ্রিত সৈন্যদের মনোভাব আবার পাল্টে গেল। কেউ লজ্জায় পড়ে, কেউ আবার অভ্যাসবশত কুতুজকে অনুসরণ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই কুতুজের বাহিনী পৌঁছে গেল গাজার সম্মুখ ভাগে।

ইতিপূর্বে পরিচালিত সমস্ত অভিযানেই প্রতিপক্ষের তুলনায় মোঙ্গলদের গতি ছিল অধিকতর দ্রুত এবং ক্ষিপ্র। কিন্তু কুতুজ এবার মোঙ্গলদের হার মানালেন। প্রমাণ দিলেন অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্রতা এবং দ্রুততার। মিশরীয় বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে স্থানীয় মোঙ্গল নেতা 'বাইডার' গাজা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ

করে। অবিলম্বে সে গিয়ে মিলিত হয় মোঙ্গলদের মূল বাহিনীর সঙ্গে। ক্রুসেডারদের অনুমতি নিয়ে তাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে কুতুজ অগ্রসর হলেন। উপকূলের পথ ধরে তিনি চলে গেলেন কোসাারিয়া পর্যন্ত। এখানে গতিপথ পরিবর্তন করে 'কিশন' নদীর তীর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ বরাবর এগিয়ে যান। নদীর তীরে মেগিডো নামের একটি সমতল ভূমির অপর প্রান্তে ছিল একটি জলাশয়। জলাশয়টি অতিক্রম করে তিনি পৌঁছে যান নহরে জালুতের প্রান্তরে।

বেবারসের দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহীরা অতর্কিতে মোঙ্গল শিবিরে আক্রমণ চালায়। নহরে জালুতের অন্তরীপ আয়েনে জালুতের পূর্বদিকেই ছিল মুসলমানদের নিজ বাহিনী। অশ্বারোহীরা মোঙ্গলদের কিছুটা ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে ফিরে আসে নিজেদের শিবিরে। মোঙ্গল নেতা কিতবুগা সিরিয়ার বালবাকে ছিল। লেবাননের পার্বত্য অঞ্চল ধরে সে চলে আসে 'সাফেদে'। জর্দান নদীর তীরে ধরে নহরে 'বেসান'-এর নিকট পৌঁছে। বেসানে অনেকগুলো জলাশয় থাকায় অশ্বারোহী বাহিনীর ছোটাছুটি স্বাভাবিকভাবেই বিঘ্নিত হত। ফলে সে এই স্থানটি যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত মনে করল। নহরে বেসানের পশ্চিমে রয়েছে আয়েনে জালুত। মুসলমান সেনারা এখানেই অবস্থান করেছিল। মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য কিতবুগা এবার বেসানকে পশ্চাতে রেখে পশ্চিমের দিকে পা বাড়ায়। দক্ষিণে সিলবোয়া পর্বত এবং উত্তরে আয়েনে জালুত দিয়ে ঘেরা একটি সংকীর্ণ উপত্যকা অঞ্চলে মোঙ্গল এবং মুসলিম বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলরা ছিল বিশ্বের বিভীষিকা। ডজন খানেক সাম্রাজ্য তারা দখল করেছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিল অগণিত শহর-বন্দর। অদম্য উৎসাহ এবং অপ্রতিরোধ্য গতির জন্য তাদের খ্যাতি ছিল সর্বত্র। তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল অত্যন্ত প্রবল। অপর দিকে মামলুকেরা ছিল সুলতান আস-সালেহ-এর সাক্ষাৎ মানসপুত্র। তারা ছিল ইসলামী জগতের সেরা সৈনিক। যেমন তাদের প্রশিক্ষণ, তেমনি তাদের শৃঙ্খলাবোধ। ভয়-ভীতি কাকে বলে মামলুকেরা কখনও তা জানত না। তাদের উদ্যম-উৎসাহে কখনো ঘাটতি পড়ত না। এই মামলুকেরাই ছিল মিশরীয় মুসলিম বাহিনীর প্রাণশক্তি। কিন্তু এই যুদ্ধে মামলুকদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১২,০০০। মোঙ্গল বাহিনীর অগণিত সৈন্যের তুলনায় এই সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য এবং তুচ্ছ। মনে হচ্ছিল যে, এক দলবদ্ধ পাগল যেন আত্মহত্যার জন্য মোঙ্গলদের মুখোমুখি হচ্ছে।

মোঙ্গলদের সামরিক ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই সাধারণ। বলা যেতে পারে যে, এটা ছিল তাদের ঐতিহ্যগত জীবনধারার একটি সংস্করণ মাত্র। সেই আদিকাল থেকেই তারা যাযাবরের ন্যায় জীবন-যাপন করত। মধ্য এশিয়ার শত শত মাইলের বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকায় তারা মেষ চরাত। ঘুরে বেড়াত স্বাধীনভাবে। পনির এবং দুধ ছিল

তাদের নিত্য দিনের আহার। প্রকৃতির কোলে তারা জন্মগ্রহণ করত, বড় হত। ফলে প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি যে কি মোঙ্গলরা তা জানত না। চামড়ার মধ্যে বায়ুপূর্ণ করে অনায়াসে তারা পার হয়ে যেত নদ-নদীগুলো। তাদের বড় রকমের কোন প্রত্যাশা ছিল না, চাওয়া-পাওয়াগুলো ছিল সাধারণ। সৈনিক হিসেবেও যাযাবর অশ্বারোহীরা ছিল আত্মনির্ভরশীল। সৈন্য হিসেবে তাদের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটিও ছিল অতি সহজ। চেঙ্গিস খান মোঙ্গলদের এই জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

মধ্য এশিয়ার এই মোঙ্গলরা যখন যাযাবর জীবনের পরিবর্তে সৈনিক জীবনে ফিরে আসে, তখন তারা তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন বাহিনী হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তাদের জীবন শুরু হয় যে কোন যুদ্ধের বিজয়ী বীর হিসেবে। জনসংখ্যার দিক থেকে মোঙ্গলেরা নেহায়েত কম ছিল না। এবং নিদিষ্ট কোন পথেই এতটা পর্যাপ্ত উর্বর ভূমি ছিল না, যা এই বিপুল সংখ্যক যাযাবরের ভরণ-পোষণের নিশ্চয়তা দিতে পারে। ফলে মোঙ্গলেরা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এই শক্তিশালী দলগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায়। শত্রুকে সহজেই তারা দিশেহারা করে দেয়। ফেলে দেয় ভয়-বিহ্বলতার মধ্যে। ইচ্ছামত পশ্চাৎ এবং প্রান্তভাগ থেকে আক্রমণ করে। এমনিভাবে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাছাড়া দ্রুতগতির জন্য সহসা তারা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হতে পারত। সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করে দিয়েই আবার তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

মোঙ্গলদের রণকৌশলটিও ছিল সাধারণ। জন্মগতভাবেই মোঙ্গলরা ছিল দক্ষ অশ্বারোহী। নিজেদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহ-বিসংবাদের সময় তারা তীর-ধনুক ব্যবহার করত। ফলে অশ্বারোহী তীরন্দাজ হিসেবে তাদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। তাছাড়া তুলনামূলভাবে তাদের তীর-ধনুকগুলো ছিল বেশ লম্বা এবং এগুলো বহুদূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যেত। সে কারণেই নিরাপদ দূরত্বে থেকেও অনায়াসেই তারা শত্রুর উপর আক্রমণ চালাতে পারত, তীর নিক্ষেপ করতে পারত শত্রুপক্ষের অভ্যন্তরভাগে। শত্রুপক্ষের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিত, কেবলমাত্র তখনই তারা শত্রুর কাছাকাছি যেত এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী এই অশ্বারোহী তীরন্দাজেরা যখন প্রচণ্ড বেগে বিশৃঙ্খল শত্রুবাহিনীর পিছু ধাওয়া করত, তখন তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে মোঙ্গলদের মুকাবিলা করার সময় পেত না।

মোঙ্গলদের প্রত্যেক অশ্বারোহীর একটি করে অতিরিক্ত অশ্ব থাকত। অতিরিক্ত এই অশ্ব যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উপরকণ সামগ্রী এবং মালপত্র বহন করত। একটি ঘোড়া নিহত বা আহত হলে, অথবা খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে দ্বিতীয় ঘোড়ার উপর সওয়ার হত। কখনও তেমন কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে ঘোড়ার মাংস দিয়েই তারা খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা করত।

আইনে জালুতের যুদ্ধ (১২৬০) ২১৯
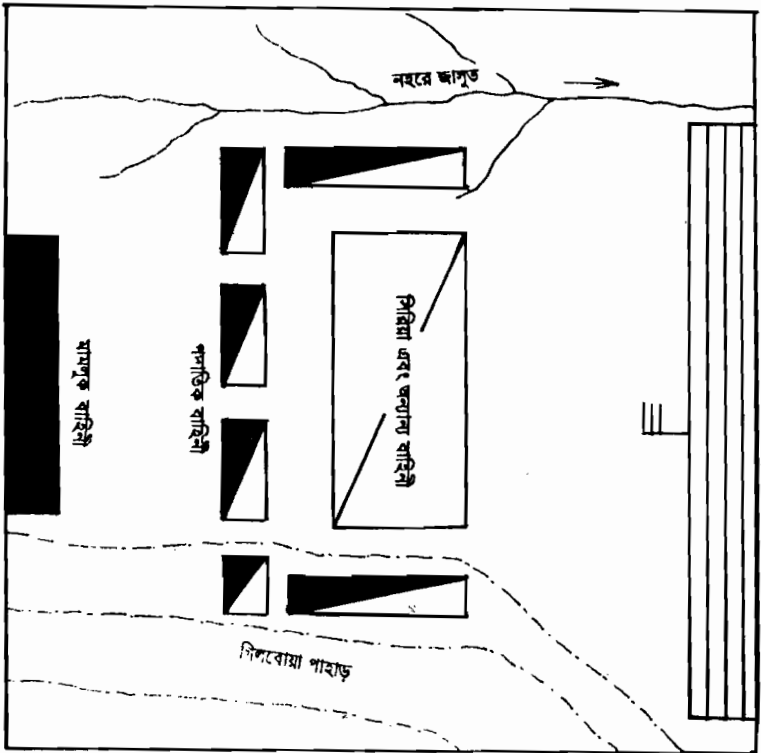
এই কৌশলগুলো মোঙ্গলদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু অন্য কারও পক্ষে এত চমৎকার এবং সাবলীলভাবে এই কৌশলগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। এই কৌশলগুলো করার প্রথম এবং প্রধান শর্ত এই যে, অশ্বারোহণে তাকে অবশ্যই নিখুঁত এবং পারদর্শী হতে হবে। বস্তুতপক্ষে যারা জন্মগতভাবে অশ্বারোহী নয়, লালিত-পালিত হয়নি মোঙ্গলদের পরিবেশে, তাদের পক্ষে একই সময় ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া এবং অতিরিক্ত অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা, ঘোড়া বদল করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া দূরপাল্লার তীর নিক্ষেপের জন্য প্রয়োজন ছিল শক্ত মাংসপেশীর। কেবল শিশু বয়স থেকে চর্চা করলেই এই যোগ্যতা অর্জন করা যায়। কয়েক মাসের নিবিড় এবং কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্যে যে তীরন্দাজ তৈরী করা যায়, মোঙ্গলদের অশ্বারোহী তীরন্দাজদের সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই চলে না। জন্মসূত্রে যারা অশ্বারোহী, তীর ছোঁড়ার মধ্যে দিয়েই যারা বেড়ে উঠে, কেবল তাদের পক্ষেই মোঙ্গলদের মুকাবিলা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জাপান সাগর থেকে শুরু করে সুদূর অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত এ ধরনের বিশেষ গুণে গুণান্বিত কোন দল বা সম্প্রদায়কে দেখা যায় না।

ঘটনাক্রমে কেবল কুতুজের অধীনেই এ ধরনের কিছু লোক ছিল। সালেহ আইয়ূবের অধীনস্থ মামলুকেরা ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত। পূর্বাঞ্চলীয় ভাইদের ন্যায় তারাও ছিল যাযাবর। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ঘোড়ার পিঠেই তারা জন্মগ্রহণ করত, তীর-ধনুক ব্যবহার করত সেই ছোটবেলা থেকে। তারা বসবাস করত মধ্য এশিয়ার অনুর্বর অঞ্চলে। উপরন্তু তাদের ছিল উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং কঠোর শৃঙ্খলাবোধ। চেঙ্গিস খান যেমন মোঙ্গলদের অস্ত্র-শস্ত্রে কোন সংস্কার করেননি, তেমনিভাবে সালেহ আইয়ূবও তুর্কীদের দেশজ তীর-ধনুকগুলো অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। মোঙ্গলদের তীর-ধনুকের তুলনায় তুর্কী মামলুকদের ধনুকগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। এগুলো দিয়ে বেশী দূর পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করা যেত না। তাছাড়া তীরগুলোও ছিল ছোট আকারের। তবে তীরগুলো ছিল ভারী, শক্ত; এর গতি ছিল তীব্র। মামলুকদের এই দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতার কারণেই মোঙ্গলদের কৌশলগুলো সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা যেত। সহজেই নিষ্ফল করে দিতে পারত মামলুকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলাকে।

মোঙ্গল অধিপতি কিতবুগার দৃষ্টিতে কুতুজ ছিল নেহায়েত একগুঁয়ে এবং আত্মঘাতী মানুষ। আসলে কিতবুগার এ ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং কুতুজ ছিলেন যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী। মামলুকদের দুর্বলতা এবং মোঙ্গলদের যোগ্যতার বিষয়টি তার দৃষ্টি এড়াল না। বলা যেতে পারে, অন্য আর যে কারো চেয়ে তিনি বিষয়টি ভালভাবেই বিবেচনা করে দেখেছিলেন। যা হোক, এই দুর্বলতা এবং সুবিধা নিয়েই মধ্য এশিয়ার অনুর্বর এলাকার দুই গোত্র প্রধান জালুতের সংকীর্ণ

উপত্যকায় পরস্পরের মুখোমুখি হল। তারা লিপ্ত হল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। জালুত উপত্যকাটি প্রায় ৩৫ মাইলের মত লম্বা। দক্ষিণ-পূর্বে এটা জর্দান উপত্যকার সঙ্গে মিশে গেছে। উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তের এক দিকে রয়েছে জলস্রোত, অপরদিকে 'গিলবোয়া' পাহাড়। এখানে উপত্যকাটির প্রশস্ততা মাত্র দু' মাইল। এই গিরিসংকটেই মোঙ্গলরা মামলুকদের মুখোমুখি হল। এবং প্রশস্ততায় গিরিসংকটটি এত সংকীর্ণ ছিল যে মামলুকদের ক্ষুদ্র বাহিনী এটা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। মোঙ্গলদের অসংখ্য সৈন্যের জন্য এই স্থানটি ছিল একান্তই অপর্যাপ্ত। স্বল্প পরিসর স্থানেই তারা ঠাসাঠাসি-গাদাগাদি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানে থেকে তারা সমর প্রস্তুতি বা কৌশলের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার কোন সুযোগ পেল না।

কৌশলগত দিক থেকে এই স্থানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গিরিসংকটের সংকীর্ণ পথে মামলুকেরা অবস্থান নেয়ায় মোঙ্গল অশ্বারোহীরা প্রান্তভাগ দিয়ে তাদের আক্রমণের কোন সুযোগ পেল না। অপর দিকে কিতবুগা মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনীকে অনায়াসে নিষ্পিষ্ট করে দেয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। ফলে, সে তার বাহিনীর পার্শ্বভাগকে বিস্তৃত করার ব্যাপারে সামান্যতম উদ্যোগও নেয়নি। অথচ সামান্য উদ্যোগ নিলেই সে মুসলিম বাহিনীর পার্শ্বভাগ অতিক্রম করে মোঙ্গলদের পার্শ্বভাগকে বিস্তৃত করতে পারত। শত্রুকে প্রতারণা করার কৌশল হিসেবে মোঙ্গলেরা কখনো কখনো পালিয়ে যাওয়ার ভান করে। এ কৌশলটির জন্য মোঙ্গলদের যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। যদিও জালুতের প্রান্তরে এ ধরনের কোন উদ্যোগ তারা নিল না।

কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে গেলে এ সমস্ত উদ্যোগ না নেওয়ার অপরাধে মোঙ্গল অধিনায়ককে কোনক্রমেই দোষারোপ করা যায় না। কারণ গিরিসংকটটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। ফলে মামলুকেরা এ পথ দিয়ে অগ্রসর হলেও সহজে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত না। দ্বিতীয়ত, এত সংকীর্ণ পথে মোঙ্গলরা মুসলিম বাহিনীর প্রান্ত ভাগের উপর আক্রমণ করার কোন সুযোগ পেত না। তৃতীয়ত, তাদের পশ্চাতেই ছিল 'বারসানের' জলাভূমি। প্রতারণাপূর্বক পলায়নের উদ্যোগ নিলে মোঙ্গলদের জন্য তা আরও সংকটজনক হত।

কুতুজ অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে মুসলিম বাহিনীকে সাজালেন। যুদ্ধ-ময়দানের সম্মুখভাগে দাঁড়াল সিরীয় এবং খাওয়ারিজমের সৈন্যরা। তাদের দু'পাশে ছিল মামলুকদের শক্তিশালী দু'টি পদাতিক বাহিনী। মামলুকদের অবশিষ্ট পদাতিক সেনারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে দ্বিতীয় সারিতে অবস্থান নিল। প্রত্যেকটি দলের মাঝখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খালি জায়গা ছিল। বেবারসের নেতৃত্বে বাহরি মামলুকদের শক্তিশালী অশ্বারোহীরা দাঁড়াল সবার পেছনে। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে কুতুজ এবং মোঙ্গলদের পক্ষে কিতবুগা সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর রণসজ্জা নিয়ে সিরীয় আমীরদের মধ্যে সংশয় দেখা দিল। তারা ভাবল মোঙ্গলদের আক্রমণের মুকাবিলায় সিরীয় এবং খাওয়ারিজমের সৈন্যদের নিয়ে গঠিত দুর্বল দলটিকে সামনের কাতারে দিয়ে মস্ত বড় ভুল হয়েছে। বলা বাহুল্য, পরিকল্পিতভাবেই তাদের সামনের সারিতে দেয়া হয়েছিল। কুতুজ এবং বেবারস-এর মধ্যকার দীর্ঘ আলোচনা, সযত্ন সিদ্ধান্ত এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই মুসলিম বাহিনীকে উপরোক্তভাবে সাজানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ।

চিরাচরিত অভ্যাস মত মোঙ্গলরাই প্রথম যুদ্ধ শুরু করে। দলে দলে অশ্বারোহী তীরন্দাজরা প্রচণ্ড বেগে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম সেনাদের লক্ষ্য করে তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করে। কিন্তু মুসলমান তীরন্দাজদের আক্রমণ সীমানার মধ্যে আসার পূর্বেই তারা পাশ ফিরে ঘোড়া ছুটিয়ে সরে পড়ে। মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী সৈন্যরা এমনিতেই মোঙ্গলদের নামে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তারা প্রতি-আক্রমণ চালাতে ব্যর্থ হল। বরং শত্রুপক্ষের অবিরাম তীর-বর্ষণে তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হল। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ বার বার টলমল করে উঠে। তেজোদ্দীপ্ত কিছু কিছু সর্দার প্রতি-আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের সেই প্রয়াস। তারা শুধুমাত্র ভীত-সন্ত্রস্ত অগ্রবর্তী বাহিনীকে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধের ময়দানে ধরে রাখতে সমর্থ হল। অবশেষে তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল।

অগ্রবর্তী পদাতিক বাহিনী বিশৃঙ্খলভাবে পেছনের দিকে ছুটতে শুরু করে। তাদের পালিয়ে যাওয়ার কারণে পশ্চাদভাগে অবস্থানরত মামলুক পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল না। দুই দলের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা ছিল, সেই পথ দিয়েই তারা ছুটে পালায়। অগ্রবর্তী পদাতিক সেনাদের এভাবে পালাতে দেখে কিতবুগা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। সে এবার গোটা বাহিনীকে বিশৃঙ্খল এবং পলায়নপর মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়। মোঙ্গলেরা উন্মাদের মত গলা-ফাটা চীৎকারের সোরগোল বাধিয়ে দেয়। অপ্রতিরোধ্য গতিতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের তীব্র আক্রমণে পলায়নপর পদাতিক বাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। কিতবুগা ভাবল, যুদ্ধের ফলাফল এসে গেছে তার পক্ষে। জালুতের এই যুদ্ধে তারই জিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এমনি একটি ভাবনার মধ্যেই ছিল কিতবুগার দীর্ঘ দিনের সামরিক জীবনের প্রথম এবং শেষ আঘাত। সহসা সে নিজেকে এমন একটি ভয়াবহ ফাঁদের মধ্যে আবদ্ধ দেখতে পেল, যেখান থেকে তার মুক্তির আর কোন পথ নেই ।

যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনী যেখানে অবস্থান নিয়েছিল তার ডানদিকে ছিল 'গিবোয়া' পাহাড় এবং বামদিকে নহরে জালুত। এই পাহাড় এবং নদী মূলত

প্রান্তভাগের মামলুক পদাতিক দলের প্রতিরক্ষা বাঁধ হিসেবে কাজ করছিল। সিরীয় এবং খাওয়ারিজমের পদাতিক সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের কারণে মোঙ্গল বাহিনীর গতি খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সারির পদাতিকেরাও কুতুজের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের মুকাবিলা করল। ফলে তাদের গতি এবার রুদ্ধ হল। মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী পদাতিক সেনারা যুদ্ধ ময়দান ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ডান-বাম এবং দ্বিতীয় সারির মামলুক পদাতিকেরা তখনও যথাস্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছিল। ফলে তাদের সম্মুখভাগে গহ্বরের মত বিরাট একটি ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। পশ্চাদপসরমান সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে মোঙ্গল অশ্বারোহীরা বিপুল সংখ্যায় এই গহ্বরের মধ্যে এসে পড়ে। তিন দিক থেকে মুসলিম সেনারা দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের আটকে ফেলে। সংকীর্ণ স্থানে তারা এত ঠাসাঠাসিভাবে দাঁড়ায় যে মোঙ্গল অশ্বারোহীরা নড়াচড়া করতে পারছিল না। সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছিল না তাদের তীর-ধনুক। কেবল সংখ্যাধিক্য এবং কিতবুগার উন্মত্ততার কারণে মোঙ্গল বাহিনী খোলা পথ দিয়ে সরে যেতে পারল না। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে গাদাগাদিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে তাদের শরীর যেন সেদ্ধ হয়ে আসছিল। এ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ঠিক এমনি সময়ে মামলুকেরা অবিরাম বর্ষণের ধারায় মোঙ্গলদের উপর তীর ছুড়তে শুরু করে। অত্যন্ত দৃঢ় এবং চাতুর্যপূর্ণ কৌশলের মাধ্যমে কুতুজ মোঙ্গলদের এমন এক স্থানে আটকে ফেললেন যে, নিকট পাল্লার তীর-ধনুক দিয়েই তাদের কাবু করা সম্ভব হল। মধ্যযুগীয় সমস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে মোঙ্গলদের গতি ছিল সবচেয়ে বেশী দ্রুত এবং ক্ষিপ্র। অথচ কুতুজ অতি সুকৌশলে তাদের সেই ক্ষিপ্রতাকে স্তব্ধ করে দিলেন সম্পূর্ণরূপে।

এদিকে পলায়নপর সিরীয় মুসলিম সেনারা লক্ষ্য করল যে, কেউ তাদের হত্যা অথবা পিছু ধাওয়া করছে না। এখন তারা দাঁড়িয়ে গেল। সাহস সঞ্চয় করে ফিরে এল যুদ্ধের ময়দানে। মামলুকদের ঠিক পশ্চাদভাগেই তারা অবস্থান নিল। মোঙ্গল অশ্বারোহীরা নিঃসীম নিরাশার মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিল। কেউ কেউ আবার পদাতিক দলের মাঝখানের ফাঁকা স্থান দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। মূল বাহিনীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে সিরিয়ার সৈন্যরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। এমনি ভীতিজনক পরিস্থিতির মধ্যে চলল হত্যালীলা। অবশেষে মোঙ্গল বাহিনী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হল। তারা ছুটে পালাল রুদ্ধশ্বাসে।

এখানেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল না। জালুতের এই ঘোরতর যুদ্ধে বেবারস এবং বাহরি মামলুকেরা অংশ নিতে পারেনি। সর্বাধিনায়কের নির্দেশ মুতাবিক তাদেরকে অধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এবার বাঁধন ছিঁড়ে গেল। সদলবলে পলায়নপর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অশ্বারোহণের ব্যাপারে বেবারস ছিল খুবই

দুর্ধর্ষ। সে ঘোড়া ছুটাতে পারত তীরবেগে। শত্রুকে আক্রমণ করত অত্যন্ত শক্ত হাতে। যুদ্ধের ময়দানে সে ছিল নির্দয় ও নিষ্ঠুর। সারাটা জীবন তার শ্বাপদ শংকুলতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু সে কখনো কারো কাছে অনুকম্পা প্রত্যাশা করেনি। অথবা কাউকে সে হাতছাড়া করেনি। এমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল বেবারসের ব্যক্তিত্ব। বায়সানের জলাশয়ের সন্নিকটে যেসব মোঙ্গলরা আশ্রয় নিয়েছিল, বেবারস প্রথমে তাদের পাকড়াও করে। ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে হাজার হাজার মোঙ্গল আশ্রয় নিয়েছিল। বেবারস তাদের পুড়িয়ে মারে এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। জর্দান নদীর দিকে পলায়নপর অসংখ্য সৈন্য ধরা পড়ল। নির্মূল হল তার চেয়ে বেশী সংখ্যক সৈন্য।

এতদূর এসেও বেবারসের স্থিরতা এল না। এতটুকুতে তৃপ্ত হওয়া বা থেমে যাওয়া যেন বেবারসের ধাঁচে সইছিল না। জর্দান উপত্যকা থেকে সে মোঙ্গলদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল আরও ৩০০ মাইল। আধুনিক ইতিহাসে এটাই ছিল দীর্ঘতম এবং প্রচণ্ডতম পশ্চাদ্ধাবন। এ ধরনের পশ্চাদ্ধাবনের দ্বিতীয় আর কোন নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অবিশ্রান্তভাবে সে সর্বত্র তাদের অনুসন্ধান করল। গ্রামে-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে গর্তের মধ্যে যেখানে মোঙ্গলকে পাওয়া গেল তাকেই হত্যা করল। যারা ইউফ্রেটিস নদীর দিকে ছুটে গিয়েছিল, নদী পার হয়ে গিয়েছিল বায়ু ভর্তি চামড়ার সাহায্যে, কেবল তারাই বেবারসের নিষ্ঠুর ছোবল থেকে অব্যাহতি পেল। তাই বলা যেতে পারে যে, বেবারস ছিল যুদ্ধের আতংক। শত্রুর জন্য নিষ্ঠুরতার প্রতীক। এই বেবারস আল বন্দুকদারী পরবর্তী সময়ে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে মিশরের সবচেয়ে সাহসী এবং খ্যাতিমান মামলুক রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মোঙ্গলদের সর্বাধিনায়ক কিতবুগা যুদ্ধের ময়দানে ধরা পড়ল। তাকে হত্যা করা হল তলোয়ারের আঘাতে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে হালাগু খান যখনই জানতে পারবে আয়েনে জালুতের করুণ পরিণতির সংবাদ, তখনই সে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে ছুটে আসবে এখানে। ইউফ্রেটিস থেকে শুরু করে নীল নদ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম অঞ্চল থর থর করে কেঁপে উঠবে লক্ষ ঘোড়ার পদাঘাতে। ঘোড়ার পিঠের জিনের মধ্যে ভর্তি করে নিয়ে যাবে মিশরের মাটি।

কিন্তু মোঙ্গলদের পক্ষে আর কখনও পশ্চিমের পথে পা বাড়ানো সম্ভব হয়নি। মনৃগকার মৃত্যুর পর ক্ষমতা নিয়ে হালাগু খানের ভ্রাতা কুবলাই খান এবং আরিকবেগার মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। হালাগু খান অধীর আগ্রহে কারাকোরামের সন্নিকটে অবস্থান করতে থাকে। ক্ষমতা দখল নিয়ে বিবাদের ফাঁকে অবস্থা বুঝে সুবিধা অর্জন করাই ছিল তার লক্ষ্য। ইতিমধ্যে ট্রান্সঅক্সিয়ানার মোঙ্গল অধিপতি মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। অপরদিকে দক্ষিণ রাশিয়ার মোঙ্গলেরা ধীরে

ধীরে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুসলমানদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি দেখাতে শুরু করে। হালাগু খানের সাম্রাজ্যের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে। এমতাবস্থায় হালাগু খানের পক্ষে উত্তর সীমান্ত অরক্ষিত রেখে মিশরে প্রতিশোধমূলক অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।

আয়েনে জালুতের যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বলা যেতে পারে যে, এটি ছিল একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছে। মধ্যযুগে মোঙ্গলদের এই আঘাত ছিল সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ এবং মারাত্মক। মামলুকদের অবিস্মরণীয় বিজয়ের মধ্য দিয়ে মোঙ্গলদের সেই আক্রমণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু আয়েনে জালুতের এই যুদ্ধে মামলূকেরা যদি পরাভূত হত, মিশরের মাটিতে মোঙ্গলদের অনুপ্রবেশ ঘটত, তাহলে সুদূর মরক্কোর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে শক্তিশালী কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকত না। তাছাড়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব এবং দক্ষিণ উপকূলে মেঙ্গলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে খ্রিস্টানদের দ্বারা আরও বেশী প্রভাবিত হত। খ্রিস্টান সেনাপতি কিতবুগা এবং খ্রিস্টান রাজকুমারীদের অনুকরণে মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সম্ভবত খ্রিস্ট ধর্মের আরও ব্যাপক প্রসার ঘটত।

সামরিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আয়েনে জালুতের যুদ্ধে মামলুকদের বিজয় ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নতুনের সাড়া জাগে। মামলুকেরা প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, পশ্চিম ইরাক এবং দক্ষিণ আনাতোলিয়া দখল করে নেয়। মোঙ্গলরা দীর্ঘ দিন যাবত ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মের বিভেদ রেখার উপর অবস্থান করে। অবশেষে মুসলমানদের জয় হল। মোঙ্গলরা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এবং কালক্রমে মুসলমান শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়। এক সময় যারা ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল, মুসলমানদের নিপাত করার জন্য খড়্গহস্ত ছিল, পরবর্তী সময়ে তাদের সন্তানেরাই ইসলামের বীর মুজাহিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

নিকপোলিসের যুদ্ধ

(সেপ্টেম্বর, ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ)

১০৭১ খ্রিস্টাব্দের মানজিকার্টের যুদ্ধে বিজয় হওয়ার পর আলপ আরসালান মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে মোটামুটি আশ্বস্ত হলেন যে, কনস্টানটিনোপল দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি সহজ শর্তে বন্দী সম্রাট রোমেনাসকে মুক্তি দিলেন। অতঃপর তিনি সিরিয়ায় ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্থানীয় সরদারেরা ছিল দুঃসাহসী যোদ্ধা। সে তুলনায় রোম সীমান্তের স্থানীয় বেরনরা ছিল খুব দুর্বল। তাদের পক্ষে স্থানীয় সরদারদের মুকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। আমীরেরা রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে কিছু কিছু এলাকা দখল করে নেয়। স্থানীয় অধিবাসী এবং তুর্কী গোত্রগুলোকে তাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করে।

এ সময়ে তুর্কী সীমান্তের আমীরদেরকে গাজী উপাধি দেয়া হত। যারা খ্যাতিমান যোদ্ধা, রাজ্য জয়ের ব্যাপারে যাদের কৃতিত্ব বেশী, তারাই এই উপাধি পেত। এ সমস্ত গাজীকে সম্মানসূচক আরও কতগুলো খেতাব দেয়া হত। বস্তুতপক্ষে গাজীকে 'ফুতুয়া' অর্থাৎ নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত কতগুলো গূঢ় ও অতিন্দ্রীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হত।

নিয়মতান্ত্রিক সরকারের বা শাসন ব্যবস্থার প্রতি গাজীদের কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। নিজস্ব অঞ্চলকে তারা যেভাবে চালাত, নতুন অধিকৃত রাজ্যকেও তারা ঠিক সেভাবে শাসন করত। পররাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে যে সম্পদরাশি পাওয়া যেত, তা দিয়েই শাসনব্যয় নির্বাহ করা হত। বিজিত অঞ্চলের জনগণের ভাল-মন্দের ব্যাপারে তারা সামান্যই মাথা ঘামাত। এমনকি অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের উপর যাতে অন্য কেউ নিপীড়ন না চালায়, অথবা লুটতরাজ করে না নেয় তাদের সম্পদ- তেমন নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারেও গাজীরা উদাসীন ছিল।

গাজী আমীরদের সঙ্গে সেলজুক সুলতানদের একটা বিরোধ প্রায় লেগেই থাকত। গাজী আমীরেরা সুলতানদের অধীনতাকে উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর দিকে সুলতানেরা সব সময় গাজী আমীরদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন। গাজী আমীরদের মধ্যে দানিশমনদের গাজীরাই ছিল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। আনুগত্যের প্রশ্নে রোমের সুলতানের সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল। আবার রোমান সম্রাটের সঙ্গেও ছিল তাদের অহি-নকুল সম্পর্ক। দানিশমন্দের গাজীদেরকে এই দুই শক্তির মুকাবিলা করেই টিকে থাকতে হচ্ছিল। গাজীরা যখন

ইসলাম ধর্ম প্রসারের পথ প্রশস্ত করতেন, বিস্তার করতেন মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা, সুলতানেরা তখন অধিকৃত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করার চেষ্টা করতেন। শাসক হিসেবে সুলতানরা ছিলেন শান্তিপ্রিয়। কোলিয়া ছিল তাদের রাজধানী। শান্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেই তারা তৃপ্ত থাকতেন। তারা যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার করেন। শিক্ষা-সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেন। তাদের শাসনামলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি বৃদ্ধি পায়।

মোঙ্গলেরা রোম সালতানাতকে পঙ্গু করে দেয়। ফলে রাজধানী কোলিয়ার সুলতানদের দীর্ঘ দিনের নিয়ন্ত্রণ থেকে গাজীরা অব্যাহতি পেল। মোঙ্গলদের অধিকৃত অঞ্চল থেকে অসংখ্য লোক এসে গাজীদের সঙ্গে যোগ দিল। সেলজুকদের শাসনাধীন শহরগুলোর কর্মকর্তারা, কর ভারাক্রান্ত অধিবাসী, ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের জনসাধারণ এবং ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ছিল তাদের দলে। তাছাড়া শেখ এবং দরবেশদের অনেকেই ছিলেন অদ্ভুত রকমের তেজস্বী। তাদের অন্তরে জিহাদের প্রেরণা ছিল খুব প্রবল। এই সকল দরবেশ সীমান্তের গাজীদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন অনুরূপ অনুপ্রেরণা। ফলে তাঁরাও চলে আসেন গাজীদের সঙ্গে। নতুন তেজে গাজীরা আবার রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান চালান। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে দুই-একটা বিচ্ছিন্ন শহর ছাড়া এশিয়া মহাদেশের বিথেনিয়ান এবং মর্মর সাগরের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি, বসফরাস থেকে উদগত হয়ে সানগারিয়াসের মধ্যবর্তী উপদ্বীপ এলাকা এবং কৃষ্ণসাগর থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে প্রায় ১০০ মাইলের একটি সংকীর্ণ অঞ্চল রোমানদের দখলে থাকে।

আনাতোলিয়ার মধ্য-পশ্চিমে ছিল কারমান এবং মধ্য-পূর্বে জার্মিয়ান রাষ্ট্র। তারা সব সময় গাজীদেরকে নিয়ন্ত্রণে এবং দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করত। তারা তাদের এই প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছিল । একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা দিল এজিয়ান উপকূল এবং রোমান সীমান্তবর্তী একটি আমীরাতকে নিয়ে। তারা জার্মিয়ান রাজাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সঙ্গে দেখত। কিন্তু কখনো তাদের আধিপত্য বা বশ্যতাকে স্বীকার করে নেয়নি।

ব্যতিক্রমধর্মী এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিথেনিয়ান আলিমপাস থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত সীমান্ত অঞ্চলে এটা অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এই অঞ্চলটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইরতুগরাল ছিলেন এই আমীরাতের প্রতিষ্ঠাতা। ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে ইরতুগরালের ইন্তেকালের পর তারই ছেলে উসমান এর শাসনভার গ্রহণ করেন। বস্তুতপক্ষে এই সুবিধাটুকু অবলম্বন করেই তারা পরবর্তী সময়ে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, একজন গাজী আমীরকে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য অবিরাম যুদ্ধ করতে হত। অভিযান চালাতে হত পুতুলপূজারী অথবা অমুসলিমদের রাজ্যে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রায় সমস্ত গাজী আমীর এশিয়া মাইনরের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে। সামনের দিকে অভিযান চালানোর জন্য প্রয়োজন

ছিল নৌশক্তির। কিন্তু গাজী আমীরদের কারও কোন নৌবহর ছিল না। এদিক থেকে একমাত্র ওসমান সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোম সাম্রাজ্যের সীমানা ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল ওসমানের রাজ্য। অর্থাৎ ওসমানের রাজ্যের অপর প্রান্তেই ছিল খ্রিস্টান শাসিত এলাকা এবং সে কারণেই তুর্কীদের মধ্যে যারা তেজস্বী, যারা নির্ভীক, যাদের মধ্যে রয়েছে অদম্য উদ্দীপনা তারা এসে ওসমানের চারপাশে ভিড় করে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন, তার চারপাশে এত বিপুল সংখ্যক জনশক্তি সমবেত হয়েছে যে, সে তুলানায় তার আমীরাত খুবই ছোট। ওসমান যদি যথেষ্ট পরিমাণে বিচক্ষণ এবং প্রতিভাবান না হতেন, যদি তিনি সময়োচিত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হতেন তা হলে হয়ত তিনি নিজেই যুদ্ধংদেহী প্রবাসীদের দ্বারা চিরতরের জন্য উৎখাত হয়ে যেতেন। ওসমান সকলকে গাজী জীবন গ্রহণ করে নেয়ার জন্য আহবান জানালেন। যে কেউ তার নেতৃত্ব মেনে নিতে সম্মত হল, তাকেই তিনি সঙ্গে নিলেন। অমিততেজা সৈন্যদের নিয়ে তিনি বীর-বিক্রমে রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান চালালেন। দুর্বল স্থানীয় রোমান সরদারেরা ওসমানের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার আমীরাতের বিস্তার ঘটল। এদিকে অন্য গাজী আমীরেরা খুবই দুর্যোগের মধ্যে নিপতিত হল। স্থলপথে রাজ্য বিস্তারের সুযোগ অনেক পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। নৌপথে অভিযান চালানোর মত সামর্থ্য তাদের ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হল।

আর একদিক থেকে ওসমান খুবই ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর উত্তরসুরিদের মধ্যে পর পর যে দশ জন ক্ষমতায় আসেন, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন মস্তবড় যোদ্ধা এবং দক্ষ প্রশাসক। ওসমানের পুত্র ওরখান (১৩২৬ থেকে ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন) এশিয়ার যে অঞ্চলটুকু রোমানরা শাসন করছিল, তা দখল করে নেন। দারদানেলেস অতিক্রম করে অনায়াসেই তিনি পশ্চিম থেরেস হস্তগত করেন। তাছাড়া পশ্চিম আনাতোলিয়ার সারাখান এবং কারাছি গাজী আমীরাত দুটিও চলে আসে তাঁর দখলে।

কেবলমাত্র রাজ্য বিস্তারের মধ্যেই ওরখান নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখেননি। শুধুমাত্র বিরাট অঞ্চল জয় করেছিলেন বলেই তিনি খ্যাতিমান শাসক ছিলেন না। তিনি রাজ্যের সংগঠন এবং প্রশাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের গাজী বৈশিষ্ট্যকে অপরিবর্তিত রাখেন। ফলে সকলের মধ্যে পূর্বের উদ্যম এবং তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তিনি নগর উন্নয়নকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে গিয়ে তিনি ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের মধ্যে যারা 'ফতুয়া' মেনে চলত তাদেরকে এবং 'আখিছ'দের বিশেষভাবে কাজে লাগান। ইতিমধ্যে দরবেশগণের কার্যকলাপে সমাজে খানিকটা ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের মুকাবিলায় তিনি উলামা সমাজের সহযোগিতা নেন। এই উলামাগণই ছিলেন ধর্ম

সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতির তত্ত্বাবধায়ক। তারা জনগণকে এমনভাবে শিক্ষা দিলেন যে, ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টান অধিবাসীদের যথাযথভাবে পরিচালনা করা সহজতর হল।

ওরখান তার সেনাবাহিনীকেও সুসংগঠিত করলেন। তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করলেন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। প্রত্যেক দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পোশাকের ব্যবস্থা করলেন। সেনাবাহিনী ছিল খুবই বড় এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এত দক্ষতার সাথে তিনি তাদের পরিচালনার ব্যবস্থা করেছিলেন যে, স্বল্প সময়ের নোটিশে তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে পারত। পুত্র প্রথম মুরাদের জন্য ওরখান একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র এবং শক্তিশালী বাহিনী রেখে যান।

মুরাদের মাতা নিলুফার ছিলেন একজন আরকিতাই সরদারের মেয়ে। দীর্ঘ ৩০ বছরের (১৩৫৯-৮৯) শাসনামলে মুরাদ তার বাহিনীকে চমৎকারভাবে কাজে লাগান। মুরাদের শাসনামলেই পোপ পঞ্চম আরবান ধর্মযুদ্ধের আহবান জানায়। তার প্ররোচনা এবং প্রচেষ্টার ফলেই হাঙ্গেরী এবং সার্বিয়ার রাজা এবং বসনিয়া ও ওয়ালচিয়ার রাজকুমাররা একটি শক্তিশালী জোট গঠন করে। 'মারটিছার' নিকটে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনী তুর্কী বাহিনীর মুখোমুখি হয়। তুর্কী বাহিনী ছিল খুবই ছোট। কিন্তু ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে তারা সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করে। সম্মিলিত বাহিনীর এই বিপর্যয় বুলগেরিয়াকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুরাদ তার ইউরোপীয় অঞ্চলের রাজধানী আদরিয়ানোপলে স্থানান্তর করেন। এখান থেকে ইউরোপীয় অঞ্চলে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং অভিযানসমূহ পরিচালনা করা অধিকতর সহজ ছিল। ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীরা দক্ষিণ সার্বিয়ার রাজার বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালায়। সারনোমেন-এর যুদ্ধে ভুকাশিনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে এবং তাঁকে শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে দেয়। এ সময়ে তুর্কী বাহিনী বুলগেরিয়ার একটি বৃহদাংশকে হস্তগত করে। বুলগেরিয়ার রাজা জন শিশেম্যান বাধ্য হয়ে মুরাদের অধীনতা স্বীকার করে। এবং কন্যা তামারকে মুরাদের নিকট বিয়ে দেয়। উত্তর সার্বিয়ার রাজকুমার লাজারও তুর্কী সালতানাতের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এশীয় অঞ্চলেও সুলতান মুরাদ তার ক্ষমতাকে সুসংহত করে নিচ্ছিলেন। জার্মিয়ান আমীরাতকে পরাস্ত করে তাকে রাইতের মর্যাদা প্রদান করেন। ১৩৮১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান যখন কারমান আমীরাতের দখল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সার্বিয়া সুলতানের অধীনতাকে অস্বীকার করে। সংবাদ পেয়ে মুরাদ অবিলম্বে ছুটে গেলেন ইউরোপে। বুলগেরিয়ার নিকট দিয়ে যাত্রাকালে তিনি তিরনোভার রাজা জন শিশেম্যান এবং ভিদিনের রাজা জন রাসিমির নামক দু'জন স্থানীয় রাজাকে পরাস্ত করেন। অনায়াসেই দখল করে নিলেন তাদের রাজ্য। অতঃপর তিনি পৌঁছে গেলেন

সার্বিয়ায়। কসোভোর উন্মুক্ত প্রান্তরে সার্বিয়ায় বিদ্রোহী রাজা লাজারের বাহিনীর সঙ্গে সুলতানের বাহিনী মুখোমুখি হয়।

১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন। সাঝ-সকালে সুলতান প্রথম মুরাদ যুদ্ধসাজে তৈরী হচ্ছিলেন। ঠিক তখনই একজন লোক সারবিয়ান পলাতক হিসেবে তার তাঁবুতে এসে হাযির হল। খ্রিস্টানদের অবস্থান এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করল। এক সময় সে সুলতানের কাছাকাছি এগিয়ে গেল। হঠাৎ করেই সে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। মনে হল, হয়ত সে সুলতানের হস্ত চুম্বন করবে। ঠিক তখনই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সে একটি ধারাল ছোরা মুরাদের হৃদপিণ্ডে বসিয়ে দেয়। সুলতান ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। হত্যাকারীও রেহাই পেল না। সে ধরা পড়ল। জীবন দিল নিরাপত্তা প্রহরীদের হাতে।

সুলতানের দুই ছেলে সারবিয়া অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। সুলতানের মৃত্যুর পর বড় ছেলে বায়াজিদ মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তিনি গোপন করে গেলেন সুলতানের মৃত্যুসংবাদ। তুর্কী বাহিনীতে পূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় থাকল। তারা যুদ্ধ করল অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলমানদের বিজয় হল। বন্দী হল বিদ্রোহী রাজা লাজার। মুরাদ যে তাঁবুতে থাকতেন লাজারকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাকে সেখানেই হত্যা করা হল। বায়াজিদ এবার নিজেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের সুলতান বলে ঘোষণা দিলেন। কিন্তু তিনি তার ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তুর্কী শিবিরে এ ধরনের একটা রেওয়াজ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সুলতানের মৃত্যুর পর তার রাজ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু বায়াজিদ তুর্কী সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বকে অখণ্ড রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর সে পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে অতি নির্মম পথে এগুলেন। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করলেন আপন ভাইকে।

নিয়ম-শৃঙ্খলার ছোট-খাট ব্যাপারেও মুরাদ ছিলেন খুবই কঠোর ও যত্নবান। তিনি কাজ করতেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা এবং সততার সঙ্গে। উত্তরাধিকারসূত্রেই পিতার নিকট থেকে শক্তিশালী একটি বাহিনী এবং দৃঢ় সংগঠন কাঠামো লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে গাজী আমীরাতকে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের অনন্য সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। তাছাড়া তিনি কৌশলগত কারণে তুর্কীদেরকে স্বদেশ ছেড়ে বলকান অঞ্চলে গিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

বায়াজিদের মাতা ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভূত একজন মহিলা। তুর্কীদের নিকট তার পরিচয় ছিল 'গুলচিচেক' (গোলাপ ফুল) হিসেবে। বায়াজিদেরও একটি ডাকনাম-ছিল। যে কোন ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন খুব দ্রুত। এই কারণে অথবা সম্ভবত উগ্র মেজাজের কারণেই লোকে তাকে বলত ইয়েলদিরিম। পিতার মত

অতটা প্রতিভাবান সেনানায়ক না হলেও তিনি ছিলেন একজ নিপুণ যোদ্ধা।

অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্য দিয়েই মুরাদের রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে। কাসাভোর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে বলকান অঞ্চলের উপর তার নিরংকুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা উপদ্বীপটি তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনকি গ্রীস ও আলবেনিয়ার মত অঞ্চল, যেখানে তখনও মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, তাও চলে আসবে মুরাদের দখলে। কাসাভোর যুদ্ধের পরে সারবিয়াকে সামন্ত রাজ্যের মর্যাদা দেয়া হল। লাজার পুত্র স্টিফেনকে বসান হল সিংহাসনে। এবং মুরাদ তার বোন মারিয়াকে বিয়ে করেন। ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়া থেকে তিরনোভোর শাসনের অবসান ঘটে। মাত্র এক বছর পর ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের একটি বাহিনী পেলোপোনীজ অবরোধ করে। তিনি স্থানীয় রাজকুমারকে বাধ্য করেন তুর্কী শাসনের বশ্যতা স্বীকার করতে। বায়াজিদ এবার কনস্টানটিনোপল দখলের পরিকল্পনা করেন। ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে বায়াজিদ কনস্টানটিনোপল দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যখন শহরের প্রতিরক্ষা দেয়ালের কাছাকাছি আসেন ঠিক তখনই শুনতে পেলেন ক্রুসেডারদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। তিনি জানতে পারলেন যে, ইউরোপ এবং আনাতোলিয়া থেকে তুর্কীদের উৎখাত করার প্রস্তুতি নিয়ে তারা ঢুকে পড়েছে বলকান অঞ্চলে।

বুলগেরিয়া এবং সার্বিয়ার অধিবাসীরা ছিল গোঁড়া খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। তারা তুর্কীদের বশ্যতাকে যতখানি না ভয় করত, তার চেয়ে বেশী ভয় করত হাঙ্গেরীর রোমান ক্যাথলিকদের অধীনতাকে। তারা বিশ্বাস করত যে, ক্যাথলিকদের চেয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানরা অধিকতর সহনশীল এবং উদার। খ্রিস্টান হয়েও তারা ক্যাথলিকদের আয়োজিত ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল। ফলে হাঙ্গেরীর রাজা 'সিগিসমান্দ' স্থানীয় খ্রিস্টান অধিবাসীদের সহযোগিতায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে ব্যর্থ হল। এদিকে হাঙ্গেরীর অভিজাতেরাও সিগিসমানদের এই ব্যর্থতাকে সুনজরে দেখল না। তারা রাজাকে চিহ্নিত করল অন্যায় রূপে পররাজ্য অপহরণকারী হিসেবে। এদিকে শক্তিশালী তুর্কী বাহিনী দ্বারা হাঙ্গেরী আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে এবার সে নিজের অস্তিত্ব নিয়েই শংকিত হয়ে পড়ল। উপায়ান্তর না দেখে রাজা সিগিসমান্দে পোপ নবম 'বেনিফেস'কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দেয়ার জন্য আবেদন জানান।

ইতিপূর্বে খ্রিস্টানরা বহুবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা অঞ্চলে। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে যুদ্ধগুলোর সমাপ্তি ঘটে। দীর্ঘ তিনশত বছরব্যাপী যুদ্ধ চালিয়েও খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নিকট থেকে পবিত্র ভূমি জেরুযালেম উদ্ধার করতে পারেনি। বরং খ্রিস্টানদের অধিকৃত সমগ্র আনাতোলিয়া এবং থেরেস অঞ্চল মুসলমানদের দখলে

চলে যায়। তুর্কী মুসলমানেরা এবার দানিয়ূব নদী অতিক্রম করে ক্যাথলিক-প্রধান হাঙ্গেরী দখলের প্রস্তুতি নেয়। এমনি একটি পরিস্থিতিতে পোপ ধর্মযুদ্ধ আহ্বানের উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন।

এ সময় ক্রুসেডের জন্য আহ্বান জানানোর আরও একটা কারণ ছিল। পশ্চিম ইউরোপে তখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল। দেশের বাইরে অথবা ভেতরে কোথাও কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। নাইটদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। প্রকৃতিগতভাবে তারা যুদ্ধপ্রিয় হলেও এ সময়টা তারা অবসরের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত করছিল। ফলে যুদ্ধের জন্য তারা ভীষণভাবে অস্থির ছিল। অবশেষে ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে শক্তিশালী একটি খ্রিস্টান বাহিনী হাঙ্গেরীতে সমবেত হল। ক্রুসেডের ইতিহাসে খ্রিস্টানদের পক্ষে সম্ভবত এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাহিনী। লি রাওলেক্স এবং কিস-এর বিবরণ অনুসারে খ্রিস্টান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

হাঙ্গেরী	৬২,০০০
ওয়ালেশ	১০,০০০
ট্রান্সসিলভানিয়া	১৬,০০০
ফরাসী	১৪,০০০
জার্মানী	১০,০০০
বোহেমিয়ান ও পোলস্	৮,০০০
মোট	১,২০,০০০

তাছাড়া ইংরেজ, স্পেনীয়, ইটালী এবং হসপিটালারদের মধ্য থেকেও প্রায় ৩০০০ ক্রুসেডার এই অভিযানে অংশ নেয়। কিন্তু উপরোক্ত হিসেবের মধ্যে তাদের ধরা হয়নি।[১]

তুর্কী বাহিনীতে মোটামুটি তিন শ্রেণীর সৈন্য থাকত। এদের মধ্যে ছিল-ক. সিপাহী ও জানিসারীজ, খ. তোপরাকলি, এবং গ. স্বেচ্ছাসেবী আকিলজি ও আজেব।

সিপাহী ও জানিসারীজ ঃ অশ্বারোহী সিপাহী এবং পদাতিক সৈন্যদের জানিসারীজ বলা হত। প্রত্যেক বাহিনীতে ১০ হাজার অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক থাকত। বস্তুতপক্ষে মধ্য এবং আধুনিক ইউরোপে এরা ছিল সরকারের নিয়মিত বাহিনী। জায়গীরদারেরা অশ্বারোহী ফৌজের যোগান দিত। অবশ্য কোন জায়গীরদার কত সৈন্য সরবরাহ করবে, তা নির্ধারণ করা হত জায়গীরের আকার এবং আয়ের পরিমাণের উপর।

তোপরাকালি ঃ এরা মূলত সরকারের নিয়মিত মিলিশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যেও ছিল দু'টি দল-পদাতিক এবং অশ্বারোহী। পদাতিক সৈন্যদের বলা হত

'পিয়াদে' অথবা 'ইয়াইয়া'। অনুগত ভূস্বামীরা ছিল এদের প্রধান যোগানদার। প্রধানত শহর অবরোধ করার কাজে তারা ব্যবহৃত হত।

স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ঃ এরা ছিল অনিয়মিত সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত। সরকার বা সুলতানের কোষাগার থেকে এরা কোন নিয়মিত ভাতা পেত না। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদে এদের পূর্ণ হিস্যা থাকত। স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ছিল দু'টি দল-অশ্বারোহী বা আক্রিজি এবং পদাতিক বা আজেব। যে কোন যুদ্ধে এরা ছিল অগ্রবর্তী বাহিনী। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রধানত শত্রুপক্ষের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হত। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুসৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত এবং তুর্কীদের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য অতি কৌশলে তাদের বাধ্য করত।

বায়াজিদের অনেক পরে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ কনস্টানটিনোপল জয়ের একটা উদ্যোগ নেন। এই অভিযান পরিচালনার পূর্বে তিনি দীর্ঘ দিনব্যাপী ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ৮০ হাজার নিয়মিত এবং ২০ হাজার অনিয়মিত বা স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বায়াজিদকে স্বল্প সময়ের নোটিশে তার বাহিনী সাজাতে হয়েছিল। তাকে ছুটে যেতে হয়েছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্তে। ফলে সৈন্য সংগ্রহের তেমন কোন সুযোগ পাননি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে, বায়াজিদের বাহিনী সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের বাহিনী অপেক্ষা ছোট ছিল। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে বায়াজিদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

নিয়মিত		
সিপাহী অশ্বারোহী		১০,০০০
জানিসারি পদাতিক		১,০০০
তোপরাকলি অশ্বারোহী	৪০,০০০	
তোপরাকলি পদাতিক	১০,০০০	
মোট	৬১,০০০	

স্বেচ্ছাসেবী	
অকিনজী অশ্বারোহী	১০,০০০
আজেব পদাতিক	৫,০০০
মোট	১৫,০০০

তাছাড়া সার্ব অঞ্চল থেকে পাঁচ কি ছয় হাজারের একটি অশ্বারোহী দল বায়াজিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এ নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮১,০০০।

তুর্কীদের তুলনায় খ্রিস্টান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। কিন্তু তুর্কীদের এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ছিল যেগুলো খ্রিস্টানদের ছিল না। যেমন তুর্কীরা একক নেতৃত্বের অধীনে থেকে যুদ্ধ করত। সেনাপতি বায়াজিদ ছিলেন তাদের অধিনায়ক। ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে আংকারায় বায়াজিদকে যে চরম বিপর্যয় বরণ করতে হয়েছিল, সে জন্য তাকে অনেকখানি খাট করে দেখা হয়। কিন্তু নিঃসংকোচে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ প্রশাসক এবং বিচক্ষণ সেনাপতি। কিন্তু ক্রুসেডারদের নেতৃত্ব বহুধা বিভক্ত ছিল। রাজা 'সিগিসমান্দ' ছিল দুর্বল প্রকৃতির। আবার নাইটেরা ছিল ভীষণ রকমের উগ্র মেজাজের এবং একগুঁয়ে। বুরগান্ডির ডিউকের ছেলে 'কোতে ডি নেভারস' ছিল নাইটদের অধিপতি। সে ছিল অল্প বয়সী একজন যুবক, তেমন একটা যুদ্ধ অভিজ্ঞতাও ছিল না। ফলে সে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের উপেক্ষা করল। পরিচালিত হল উগ্র স্বভাবের অনভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের দ্বারা। ফলে খ্রিস্টান বাহিনীর নেতৃত্বে কোন একতা ছিল না ।

ক্রুসেডাররা নিজেদের ধর্মযোদ্ধা বলে দাবী করলেও তাদের শিবিরগুলো ছিল অমিতাচার এবং অন্যায়-অনাচারে ভরা। বলা যেতে পারে যে, এই শিবিরগুলো ছিল দুশ্চরিত্র এবং লম্পটদের একটি আড্ডাখানা। রাজা সিগিসমান্দ এবং নাইটেরা যুদ্ধ শিবিরে থেকেও জুয়া খেলত। সারাক্ষণ মদ ও মেয়ে নিয়ে পড়ে থাকত। সে তুলনায় মুসলমানদের জীবন ধারণ ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন। সর্বাধিনায়ক বায়াজিদ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর এবং যত্নবান। যারা তার সঙ্গে থাকত, অথবা তাঁর অধীনে কাজ করত, তাদের উপর তিনি দুটো শর্ত আরোপ করেছিলেন। প্রথমত, কেউ কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। দ্বিতীয়ত, শিবিরে অবস্থানকালীন সময়ে কেউ ভোগবাদী বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ হতে পারবে না।

মুসলিম শিবিরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভেনেটিয়ার লেখক 'ত্রেভিসানো' মন্তব্য করেছেন যে, তুর্কী সৈন্যরা তিনটি জিনিস থেকে দূরে ছিল। তারা জুয়া খেলত না। শিবিরের কোথাও মদ বা নারী ছিল না। তারা কখনো আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ করত না। ওয়াক্ত মত নামায আদায় করতে কখনো ভুল করত না।

একজন জেনোসি লেখক তুর্কীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, তুর্কীদের শক্তির মূল উৎস ছিল কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা। নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি তাদের ছিল পূর্ণ আনুগত্য এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। অথচ খ্রিস্টান শিবিরে নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন গুরুত্ব ছিল না। যেটুকু ছিল তাও নামেমাত্র।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত ক্রুসেডগুলোর ন্যায় নিকোপোলিসের যুদ্ধের প্রধান উপকরণগুলো ছিল অশ্ব এবং তীর ও ধনুক। নাইটদের অশ্বগুলো ছিল খুবই জাঁকালো। যুদ্ধের সময় তারা ভারী অস্ত্র ব্যবহার করত। প্রচণ্ড বেগে আক্রমণের জন্য তাদের এই আয়োজন ছিল ভারী চমৎকার। কিন্তু চলমান যুদ্ধে এ ধরনের আয়োজন তেমন একটা কাজে আসত না। তুর্কীদের অশ্বগুলোর অবস্থা ছিল এর ঠিক উল্টো। ঝটিকা আক্রমণ বা তীব্রগতিতে চলাচলের জন্য তাদের বড় একটা বেগ পেতে হত না। দীর্ঘ সময় ধরে খণ্ড যুদ্ধ চালাতে পারত। তাদের অশ্বগুলো পরিচালনা করা বা আয়ত্তের মধ্যে রাখাটাও ছিল অধিকতর সহজ। তাছাড়া ক্রুসেডারদের তুলনায় তুর্কীরা ছিল দক্ষ তীরন্দাজ।

পশ্চিম ইউরোপের ক্রুসেডাররা হাঙ্গেরী চলে এল। রাজা সিগিসমান্দ প্রস্তাব দিল যে, খ্রিস্টান সেনারা দানিয়ূব নদীর উত্তর সীমান্তে শিবির স্থাপন করবে। হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরভাগ থেকেই তারা মুকাবিলা করবে মুসলিম বাহিনীর। কিন্তু ক্রুসেডাররা রাজা সিগিসমান্দের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তারা দানিয়ূব নদী অতিক্রম করে আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আধুনিককালের খ্রিস্টান লেখকগণ ক্রুসেডারদের এই আচরণকে সুনজরে দেখতে পারেননি। রাজার পরামর্শকে উপেক্ষা করার কারণে তারা ক্রুসেডারদের দোষারোপ করে থাকেন। আসলে ক্রুসেডারদের এ ভাবে সমালোচনা বা দোষারোপ করাটা যথার্থ নয়। কারণ, ক. মুসলিম বাহিনীর পরিচালনায় ছিলেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনানায়ক। তিনি ক্রুসেডারদের অদম্য উৎসাহ এবং শক্তি সম্পর্কে জানতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি যে শত্রুরাজ্যের গভীরে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবেন-এমনটি কোনভাবেই আশা করা যায় না। খ. খ্রিস্টান নাইটেরা এসেছিল আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়ে। তাদের অন্তরে ছিল বলকান, আনাতোলিয়া, পুণ্য ভূমি জেরুযালেম এবং মিশর দখলের উদগ্র বাসনা। এমতাবস্থায় হাঙ্গেরীর প্রতিরক্ষার জন্য দানিয়ূব নদীর সীমান্তে অপেক্ষা করা অর্থহীন হত। গ. তাছাড়া মুসলমানদের চেয়ে তারা যেখানে বেশী শক্তিসম্পন্ন, সেখানে তাদের পক্ষে দানিয়ূবের তীরে অলসভাবে অবস্থান করার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং যথার্থভাবেই তারা তুর্কী অঞ্চলে এসে মুমলিম বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মোটামুটি হৃদ্যতাপূর্ণ এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্য দিয়েই ক্রুসেডাররা অরসোভা পর্যন্ত তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে। অবশ্য তাদের এই যাত্রাপথে অত্যাচার, ব্যভিচার এবং বিশৃঙ্খলা ছিল নিত্যসঙ্গী। বিশেষ করে তুর্কী অধিকৃত গোঁড়া মতাবলম্বী খ্রিস্টান অঞ্চলে অনুপ্রবেশের পর তাদের অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলার মাত্রা বেড়ে যায়। সর্বপ্রথম 'ভিডিন' শহর ক্রুসেডারদের আক্রমণের

শিকার হয়। একজন বুলগেরীয় রাজকুমার তখন ভিডিন শাসন করছিল। কোন রকম প্রতিরোধ বা সংঘর্ষ ছাড়াই রাজকুমার ক্রুসেডারদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। পূর্ব থেকেই সামান্য সংখ্যক তুর্কী সৈন্যকে এখানে মোতায়েন করা হয়েছিল। ক্রুসেডাররা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করল। 'রোহোভা' দখল করতে গিয়ে ক্রুসেডাররা প্রথম বাধার সম্মুখীন হল। তুর্কী সেনাদের ছোট্ট একটি বাহিনী ক্রুসেডারদের মুকাবিলায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। কিন্তু ক্রুসেডারদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কাছে তাদের প্রতিরোধ ধসে পড়ল। হাজারখানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তারা জিম্মি হিসেবে আটক করল এবং বড় অংকের মুক্তিপণ দাবী করল। এবার শুরু হল তাদের হত্যালীলা। শহরের সাধারণ বাসিন্দাদের তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করল। এবং নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করল।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহজ বিজয়ের আনন্দে ক্রুসেডাররা যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বিপুল বিক্রমে তারা এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তারা নিকোপোলিসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হল। 'ডোগান' ছিলেন নিকোপোলিসের গভর্নর এবং সেনাবিভাগের অধিনায়ক। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সেনানায়ক। কিন্তু তার সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম। তবু তিনি সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়েই শহর প্রতিরক্ষার সংকল্প নিলেন। ক্রুসেডাররা বিপুল বিক্রমে আক্রমণ চালাল। কিন্তু প্রতিবারেই তাদের সে আক্রমণ বিফলে গেল। তারা ব্যর্থ হল প্রতিরক্ষা দেয়াল চূর্ণ করে শহরে প্রবেশ করতে। অগত্যা তারা শহরটি অবরোধের সিদ্ধান্ত নিল।

অভিযানের শুরুতে ক্রুসেডাররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটা বিজয় অর্জন করল। অথচ বায়াজিদের সৈন্য সমাবেশ অথবা যুদ্ধ মহড়ার কোন খবর তারা পেল না। এতে করে ক্রুসেডারদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে, তাদের অগ্রযাত্রা নিশ্চয়ই সুলতানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ক্রুসেডারদের মুকাবিলা করার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে। তারা স্থির করল যে নিকোপোলিসের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা এখানেই অবকাশ যাপন করবে। এই অবসরে তারা মদ্যপান, জুয়া খেলা, খানা-পিনা এবং অমিতাচার ও ব্যভিচারের মধ্যে ডুবে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, তারা নিজেদের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা পর্যন্ত বেমালুম ভুলে গেল। বায়াজিদ যে নিকোপোলিসের দিকে আসতে পারে, ইতিমধ্যে যাত্রা শুরু করেছে-এ ধরনের কোন কথাকে তারা বিশ্বাস করতে চাইল না। এমন কি ফরাসী নাইট মার্শাল বোসিকান্ট ঘোষণা দিলেন-যারা এ ধরনের কথা বলে বুঝতে হবে যে, তারা অহেতুক গুজব রটাচ্ছে। তারা মিথ্যাবাদী। তিনি তাদের কান

নিকপোলিসের যুদ্ধ
১৩৯৬

সংকেত ঃ
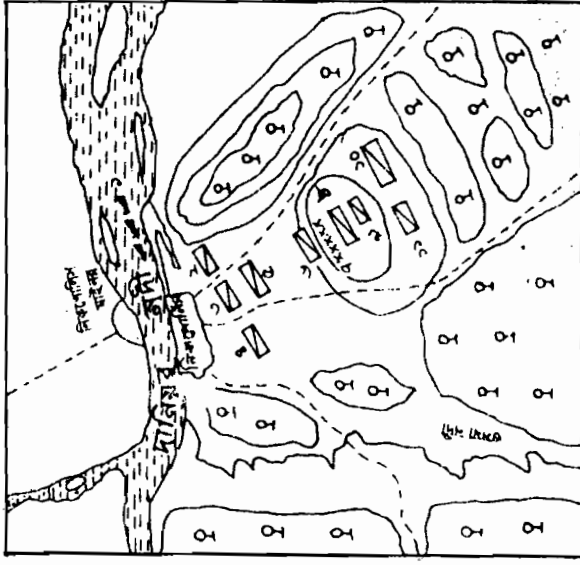
১. হসপিটালারদের জাহাজ
২. ওয়ালাচিয়াঙ্ক
৩. হাঙ্গেরীয়, বোহেমীয়, পোলিস ও অন্যান্যরা
৪. ট্রানসিলভানীয়রা
৫. ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ, ইতালীয় এবং হসপিটালার
৬. আকিনজী অশ্বারোহীঃ প্রথম দল
৭. খুঁটি
৮. তুর্কী পদাতিক বাহিনী
৯. আকিনজী অশ্বারোহীঃ দ্বিতীয় দল
১০. তুর্কী অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান দল
১১ সার্বিয় বাহিনী

নিক পোলিসের যুদ্ধ (১৩৯৬) ৩১৯

কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

ক্রুসেডারদের খামখেয়ালীপনা বায়াজিদকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হল। তাঁর গতিবিধি সম্বর্কে ক্রুসেডাররা সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে রয়ে গেল। এদিকে ক্রুসেডারদের আগমন সংবাদ পেয়ে সুলতান তৎক্ষণাৎ কনস্টানটিনোপল অবরোধের প্রস্তুতির কাজ পরিত্যাগ করলেন। সংক্ষিপ্ত পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে গেলেন নিকোপোলিসের পথে। চলার পথে সারবিয়ার সামন্ত রাজা স্টিফেন লাজারোবিচকে সঙ্গে নিলেন। সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে তিনি পৌঁছে গেলেন গন্তব্যস্থানে। নিকোপোলিসের চার মাইলের মধ্যে তিনি শিবির স্থাপন করলেন এবং ক্রুসেডারদের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিলেন।

এতক্ষণে ক্রুসেডারদের টনক নড়ল। আসন্ন যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে আলোচনার জন্য অবিলম্বে তারা সভায় বসল। রাজা সিগিসমান্দ পরামর্শ দিল যে, যুদ্ধের ময়দানে ক্রুসেডারদের দুটো সারিতে দাঁড়াবে। প্রথম সারিতে থাকবে হাঙ্গেরীর সৈন্যরা। পেছনের সারিতে দাঁড়াবে অন্য সৈন্যরা। সে যুক্তি দিল যে, ইতিপূর্বে হাঙ্গেরীয়রা বহুবার তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তুর্কীদের যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে তাদের ভালভাবে জানা আছে। যুদ্ধের শুরুতে দীর্ঘ দিনের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। এবং তারাই পারবে সাফল্যের সঙ্গে তুর্কীদের মুকাবিলা করতে। সম্ভবত এ ধরনের যুদ্ধ পরিকল্পনা দেয়ার পশ্চাতে সিগিসমান্দের মধ্যে আরেকটি অনুমান কাজ করছিল। সে ভেবেছিল যে হাঙ্গেরীয়দের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর প্রশ্ন উঠলেই হয়ত অবাধ্য বেরনরা যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়বে।

রাজা সিগিসমান্দের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ফরাসীরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আসলে ইতিমধ্যে ক্রুসেডারদের সহজ বিজয়গুলো ফরাসীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। তারা ভাবল, রাজা সিগিসমানদের এই প্রস্তাবের পেছনে রয়েছে মস্ত বড় ছল-চাতুরী। অন্যান্যকে বঞ্চিত করে সে নিজেই তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিজয়ের কৃতিত্ব নিতে চায়। ফরাসীরা বলল, কতকগুলো শর্তের ভিত্তিতেই তারা ক্রুসেডে অংশ নিয়েছে। তন্মধ্যে একটি শর্ত এই যে, অগ্রবর্তী বাহিনীতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাদেরও পূর্ণ হিস্যা থাকবে। সুতরাং যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখের সারিতে ফরাসীদেরও দাঁড়াতে দিতে হবে। ফরাসীরা তাদের এই শর্তের ব্যাপারে অটল থাকল। অবশেষে সিগিসমান্দও তাদের এই অধিকারকে মেনে নিলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে ক্রুসেডাররা অত্যন্ত শান্ত মাথায় রোহোভার তুর্কী বন্দীদের নির্মমভাবে হত্যা করল।

দানিয়ূব নদীর তীরেই রয়েছে খাড়া উঁচু একটি পর্বতশ্রেণী। এর বিস্তৃতি প্রায় দু'মাইল। পর্বতের উপরেই নিকোপোলিস অবস্থিত। পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণেই রয়েছে

নিকপোলিসের সমতল ভূমি। এর উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণের সীমানা অপেক্ষাকৃত অনেকগুলো পর্বত। দক্ষিণ সীমান্তের পাহাড়ের যে ঢালটি উত্তরের দিকে চলে গেছে তা বেশ উন্নত এবং খাঁড়া। সেই তুলনায় দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের ঢালটি ততটা খাড়া নয়। এর উপরেই রয়েছে বড় আকারের একটি মালভূমি। বায়াজিদ ইতিপূর্বে দু'বার এই অঞ্চলটি অবরোধ করেছিলেন। সুতরাং এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন।

বায়াজিদ পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করলেন। বায়াজিদের রণ-সজ্জা ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ 'দক্ষিণ হিলের' উত্তরের ঢালে আকিনজি অশ্বারোহীদের মোতায়েন করলেন। এদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। শত্রুসেনাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছিল এদের প্রধান কাজ। মালভূমির সীমান্ত বরাবর প্রায় ৪০০ গজ এলাকা জুড়ে তিনি কতকগুলো খুঁটি পুঁতে দিলেন। খুঁটিগুলো ঘোড়ার বুক সমান উঁচু ছিল। ক্রুসেডারদের অশ্বারোহী ফৌজের আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যেই তিনি এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ১৬ হাজার তুর্কী অশ্বারোহী খুঁটিগুলোর পেছনে দৃঢ়ভাবে এবং নিরাপদে অবস্থান নিল। তীর এবং ধনুক ছিল তাদের প্রধান হাতিয়ার। তোপরাকলি সিপাহী এবং সার্বের অশ্বারোহীদের দক্ষিণের ঢালে মোতায়েন করা হল। এরাই ছিল তুর্কী বাহিনীর মূল শক্তি। পদাতিক সেনাদের সঙ্গে এদের দূরত্ব ছিল প্রায় এক মাইল। ৪০ হাজার তোপরাকলি, ১০ হাজার সিপাহী এবং ৫ হাজার সার্ব অশ্বারোহী ছিল এই দলে। সুলতান বায়াজিদ এবং স্টিফেন লাজারোভিচ এই দলের সঙ্গে ছিলেন।

ক্রুসেডারদের যুদ্ধকৌশল ছিল খুবই সাধারণ। তারা দুই সারিতে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিল। হাঙ্গেরীর সেনাদের নিয়ে রাজা সিগিসমান্দ দাঁড়াল পেছনের লাইনে। লাইনের মধ্যভাগে ছিল ৭০ হাজার হাঙ্গেরীয়, বোহেমীয় এবং 'পোলস্'- এর সৈন্য। সিগিসমান্দের বাম দিকে ছিল ১০ হাজার ওয়ালেশ সৈন্য এবং ডান প্রান্তে ১৬ হাজার ট্রানসিলভানীয়। প্রথম সারিতে দাঁড়াল ফরাসী, জার্মানী, ইংরেজ, স্পেন এবং ইটালীয় ক্রুসেডাররা। হসপিটালের নাইটেরাও ছিল এই দলে। এদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিল ২৮ হাজার।

আকিনজি দলভুক্ত অশ্বারোহী তীরন্দাজরা প্রথম যুদ্ধ শুরু করল। সুকৌশলে শত্রুপক্ষকে মুসলিম পদাতিক সেনাদের আক্রমণ সীমানার মধ্যে নিয়ে আসাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রথম পক্ষ বার বার আক্রমণ চালিয়ে দ্বিতীয় পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এমন এক সময় আসে যখন দ্বিতীয় পক্ষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং প্রথম পক্ষের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। কিন্তু অহংকারী ক্রুসেডারদের বেলায় আকিনজিদের খুব বেগ পেতে হল না। অল্পতেই তারা

উত্তেজিত হল এবং আকিনজি অশ্বারোহী তীরন্দাজদের উপর প্রতি-আক্রমণ চালাল। শুরু হল বহমান যুদ্ধ। এ এমন এক যুদ্ধ, যেখানে বিবদমান পক্ষ নির্দিষ্ট কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে না। বরং যতটুকু যুদ্ধ করে তার চেয়ে ছুটাছুটি যেন বেশী করে। বহমান এই যুদ্ধে খ্রিস্টানদের ভারী অশ্বারোহী দলের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হল। সে তুলনায় আকিনজিদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। তারা একবার মুসলমান পদাতিক সেনাদের কাছাকাছি চলে আসে। ইতিপূর্বে খ্রিস্টান সেনারা মালভূমির দিকে এগিয়ে আসতেই আকিনজিরা এত চমৎকার নৈপুণ্য দেখাল যা কেবল একটি সুশৃঙ্খল, অভিজ্ঞ এবং অপরাজিত বাহিনীর পক্ষে সম্ভব। তারা পদাতিক দলের ডান ও বাম প্রান্ত দিয়ে সরে পড়ল। চলে গেল পদাতিক দলের প্রায় ৫০০ গজ পেছনে। এখানেই তারা নতুনভাবে অবস্থান নিল।

এদিকে আকিনজির সৈন্যদের পশ্চাদপদ হতে দেখে ক্রুসেডাররা ভীষণভাবে উৎফুল্ল হল। তারা ভাবল নিকোপোলিসের ময়দানে তাদের আরও একটি সহজ বিজয় অর্জিত হল। পাহাড়ের উপরিভাগে তুর্কী পদাতিক সেনাদের যে দলটি অবস্থান করছিল, নাইটেরা অমিততেজে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুদূর যেতেই মাটিতে পুঁতে রাখা খুঁটিগুলো দ্বারা তারা বাধাপ্রাপ্ত হল। হঠাৎ করেই রুদ্ধ হল তাদের অগ্রযাত্রা। নিসাড় দাঁড়িয়ে গেল অগ্রবর্তী অশ্বারোহীরা। অস্থিরতা এবং সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে কেটে গেল বেশ কিছু সময়।

ইতিমধ্যে মুসলিম পদাতিক সেনারা সচল হয়ে উঠে। নাইটদের লক্ষ্য করে অবিরাম তীর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে। ফরাসী নাইট মার্শাল 'বোসিকাল্ট ছিল ভীষণ রকমের জেদী এবং তেজস্বী। সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করে খুঁটিগুলোর মধ্য দিয়ে সে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অন্য নাইটেরাও তাকে অনুসরণ করে। খুঁটির খোঁচায় ঘোড়াগুলোর বুক-পেট ও পীঠ ক্ষত-বিক্ষত হল। অসহ্য যন্ত্রণায় তারা পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে গেল। অশ্বারোহীরা ঘোড়ার পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়াল। নাইটেরা এবার অশ্বারোহণের পরিবর্তে পায়ে হেঁটে আক্রমণ চালাল। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপারে তাদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা ছিল না।

এ দিকে লাগামহীনভাবেই ঘোড়াগুলোকে যুদ্ধের ময়দানে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ঘোড়াগুলো পাহারা দেয়া বা পরিচালানার জন্য কেউ ছিল না। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘোড়াগুলো পেছনের দিকে ছুটল। আরোহী ছাড়াই অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেল খ্রিস্টান শিবিরে। রাজা সিগিসমানদ ধরে নিলেন যে, পাশ্চাত্যের নাইটেরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। তিনি তাদের সহায়তায় এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু

বেরন, ওয়ালশিয়া এবং ট্রানসিলভিনিয়ানরা বাধা হয়ে দাঁড়াল। তারা বলল-দুর্যোগময় স্থানে পৌঁছার পূর্বেই মুসলিম সেনারা নাইটদের কব্জায় নিয়ে নেবে। ফলে সম্পূর্ণরূপে বিফলে যাবে তাদের উদ্ধার অভিযান। উল্টো তারাই তখন দুর্ধর্ষ তুর্কী অশ্বারোহীদের আক্রমণের শিকার হবে। হয়ত তাদের উপরও তখন নেমে আসবে অনুরূপ দুর্যোগ। এমনি সংকটময় মুহূর্তে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে মূল্যবান বেশ কিছু সময় নষ্ট হল। অবশেষে রাজা সিগিসমান্‌দ নাইটদের উদ্ধারের জন্য তার বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পাশ্চাত্যের নাইটেরা আক্রমণ অব্যাহত রাখল। খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলে এগিয়ে চলল তুর্কী পদাতিক সৈন্যদের দিকে। কিন্তু তাদের এই অগ্রযাত্রায় অন্য কোন দলের সমর্থন ছিল না। অপরদিকে তুর্কী তীরন্দাজরাও অবিরাম তীর বর্ষণ করে চলছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে তীরগুলো তাদের উপর পড়ছিল। তীরের আঘাতে নাইটদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হল। কিন্তু বর্ম পরিহিত থাকার কারণে নির্মূল হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু নাইটদের পরিহিত ভারী বর্মগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ছিল মারাত্মক। খুঁটি পুঁতে রাখা অংশটুকু যখন অতিক্রম করল, তখন তারা ভীষণভাবে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। তবু তারা তুর্কী পদাতিক দলের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তৈরি হল।

কিন্তু তুর্কীদের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। তারা হাতাহাতি যুদ্ধকে এড়িয়ে গেল। সুকৌশলে চলে গেল আকিনজি অশ্বারোহী দলের পশ্চাতে। মালভূমির উপরে দাঁড়িয়ে তারা আরেকটি জিনিস আবিষ্কার করল। নিথর, নিস্তব্ধ হয়ে এল তাদের হাত-পা ও চিন্তাশক্তি। তারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল যে, আকিনজিদের পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে তুর্কী অশ্বারোহীরা এবং এরাই ছিল তুর্কী বাহিনীর মূল শক্তি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। তারা আটকা পড়ে গেছে বায়াজিদের ফাঁদে।

নাইটদের পক্ষে পশ্চাদপসরণ করা অথবা মূল বাহিনীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তারা এবার নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। অনন্যোপায় হয়ে তারা আকিনজিদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হল। এদিকে বায়াজিদও স্থল বাহিনীসহ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তিনি আক্রমণ চালালেন পশ্চাৎ-এর প্রান্তভাগ দিয়ে। নাইটদের অমিততেজ এবং আপ্রাণ চেষ্টা নিরর্থক হল। মুসলমানদের হাতে অসংখ্য নাইট আহত হল। নিহত হল অনেকে। অবশিষ্টরা বন্দী হল।

বায়াজিদ এবার রাজা সিগিসমান্‌দের পরিচালনাধীন হাঙ্গেরীয়দের দিকে এগিয়ে গেলেন। তুর্কী অশ্বারোহীদের বিজয়ীর বেশে অগ্রসর হতে দেখে ক্রুসেডারদের হৃদকম্প শুরু হল। এই দুঃসময়ে ওয়ালাশিয়া এবং ট্রানসিলভিনিয়ার সৈন্যরা রাজা

সিগিসমান্‌দকে পরিত্যাগ করল। তারা চলে গেল যুদ্ধ ময়দান ছেড়ে। অবশিষ্ট হাঙ্গেরীয় সৈন্যদেরকে তুর্কী সেনারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অসংখ্য খ্রিস্টান সৈন্য মুসলমানদের হাতে মারা পড়ল। রাজা সিগিসমান্‌দ পালিয়ে গেলেন রণাঙ্গন থেকে। হসপিটালারদের যে জাহাজগুলো নিকোপোলিস অবরোধ করেছিল, রাজা গিয়ে আশ্রয় নিলেন সেই জাহাজে। হাজার হাজার নাইট সাঁতার কেটে দানিয়ূব পার হতে গিয়ে মাঝনদীতে ডুবে মরল। এভাবেই বিশাল খ্রিস্টান বাহিনীর বিপর্যয় চূড়ান্ত রূপ নিল। নিকপোলিসের রণাঙ্গনে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল তাদের দীর্ঘদিনের আয়োজন, আস্‌ফালন।

ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিকপোলিসের রণাঙ্গনে ক্রুসেডারদের চরম দুর্যোগ এবং অবসানের বিষয়টি যথাযথভাবে বিধৃত হয়নি। পাশ্চাত্যের বর্ণনাকারী, এমনকি আধুনিক ঐতিহাসিকগণও প্রকৃত সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। একথা সত্য যে, বরাবরের মত নিকোপোলিসের যুদ্ধেও খ্রিস্টানেরা নেতৃত্বে নৈপুণ্য এবং বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় চরম বিশৃঙ্খলা। তাছাড়া যুদ্ধের বুদ্ধিবৃত্তিক কলাকৌশলগুলোকে তারা সযত্নে পরিহার করে চলে। এ সমস্ত ত্রুটি খ্রিস্টানদের বিপর্যয়ের পথকে প্রসারিত করেছিল। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুলতান বায়াজিদের উন্নত নেতৃত্বশৈলী এবং তুর্কী মুসলমানদের অভিজ্ঞতা ও গাজী চেতনার মধ্যে খ্রিস্টানদের চরম বিপর্যয়ের কারণ নিহত রয়েছে।

নিকপোলিসের যুদ্ধ সম্পর্কে খ্রিস্টান লেখকগণ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং যুদ্ধের সাধারণ নিয়মনীতির সঙ্গে তাদের এই বর্ণনার কোন সঙ্গতি নেই। ক্রুসেডাররা দাবী করেছে যে, যুদ্ধের শুরুতে তারা আকিনজিদের চরম ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করেছে। তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিয়েছে যুদ্ধের ময়দান থেকে। তাদের এ দাবীটি একান্তই অযৌক্তিক। কারণ, রণনীতির সাধারণ নিয়ম অনুসারে একটি অশ্বারোহী দল এমনভাবে বিপর্যস্ত হলে তারা এত দ্রুত পুনরায় সংঘবদ্ধ হতে পারে না। বিশেষ করে বিজয়ী বাহিনীর মুকাবিলায় নতুনভাবে পূর্ব নির্ধারিত প্রতিরক্ষা স্থানে অবস্থান নেয়া অসম্ভব। অথচ পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারিত স্থানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকিনজি অশ্বারোহীরা পদাতিক সৈন্যদের পেছনে সরে গিয়েছিল।

নাইটদের অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে তারা উল্লেখ করেছেন যে, অবস্থার প্রেক্ষিতে নাইটেরা ঘোড়ার পরিবর্তে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছিল। শত্রুপক্ষের তীব্র তীর বর্ষণের মধ্য দিয়ে খুঁটি পোঁতা অঞ্চল অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিল। উপরন্তু সেদিন মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়েছিল।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই নাইটেরা ভীষণভাবে অবসন্ন এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাদের সাফল্য বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। তাঁরা দাবী করেন যে, পাহাড়ের চুড়ায় আরোহণ করেই তারা শক্তিশালী তুর্কী পদাতিক দলের উপর চরম আঘাত হানে। হাজার হাজার পদাতিক সেনাকে হত্যা করে। এমন কি তুর্কীদের অশ্বারোহী আকিনজি দলকেও অনুরূপ বিপর্যয় বরণ করতে বাধ্য করে। অথচ পূর্বের বর্ণনার সঙ্গে পরবর্তী বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী।

কিছু সংখ্যক লেখক অবশ্য নিকপোলিসের যুদ্ধের সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে পরিশ্রান্ত নাইটেরা পাহাড়ের চুড়ায় উঠতেই আকিনজিদের পশ্চাতে তুর্কীদের মূল বাহিনীকে দেখতে পায়। তাদের কাছে এটা ছিল একান্তই অপ্রত্যাশিত। আচমকা তাদের মধ্যে দেখা দেয় ভয়-বিহ্বলতা; শুরু হয় হৃদকম্প। নাইটদের মধ্যকার সিংহের গর্জন এবার খরগোশের ভীরুতায় পরিণত হয়। সিপাহীদের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শুনতেই তারা পেছন ফিরে। পালিয়ে যায় যুদ্ধের ময়দান থেকে। বায়াজিদের স্থলবাহিনী ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠে। আকিনজিদের হাতে যে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছিল, স্থলবাহিনীর হাতে তার সমাপ্তি ঘটে। তারাই চরমভাবে পর্যুদস্ত করে দেয় খ্রিস্টান বাহিনীকে।

হাঙ্গেরীয়দের সম্পর্কে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানেও পরস্পর বিরোধী দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে তারা উল্লেখ করেছেন যে, বেরনরা রাজা সিগিসমান্দের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। বলতে গেলে তারা বিদ্রোহের পর্যায়ে চলে যায়। ঠিক তার পরক্ষণেই তারা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন যে, রাজার অনুগত হাঙ্গেরীয় বাহিনী মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধ করে অসম সাহসিকতার সঙ্গে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সারবের সৈন্যরা বায়াজিদের সহায়তায় এগিয়ে না এলে মুসলিম বাহিনী তখনই নির্মূল হয়ে যেত। চরমভাবে পরাজিত হত বিশাল এবং শক্তিশালী তুর্কী বাহিনী।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিতে গিয়েও খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে, নিকোপোলিসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে খ্রিস্টানদের চেয়ে ৬ থেকে ১০ গুণ বেশী তুর্কী মারা যায়। কিন্তু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এই তথ্যটি একটি নির্জলা মিথ্যা। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে যদি একটি ছোট্ট বাহিনীকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে আবদ্ধ করা না যায়, বাধ্য করা না হয় যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত আমরণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে, তা হলে যে পক্ষ যুদ্ধে পরাজিত হবে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে বেশী। এবং তুলনামূলকভাবে আক্রমণকারী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে কম। নিকপোলিসের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিনটি দল একক

পরিকল্পনার আওতায় যুদ্ধ করেছে। তারা যুদ্ধ করেছে পূর্ব প্রস্তুতি অনুসারে এবং সমন্বিতভাবে। অপরদিকে খ্রিস্টান সেনারা ভিন্ন ভিন্ন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছে। দুটি দলের মধ্যে সমন্বয় ছিল না। এবং তারা যুদ্ধে পরাস্ত হয় পৃথক পৃথকভাবে। এমতাবস্থায় ক্রুসেডারদের তুলনায় বেশী সংখ্যক তুর্কী সৈন্যের হতাহতের প্রশ্ন উঠে না। বস্তুতপক্ষে তুর্কী অশ্বারোহীদের ব্যাপারে খ্রিস্টান সেনারা যে আতংকিত ছিল, সুস্থ মস্তিষ্কে রহোভার বন্দীদের নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

নিকপোলিসের যুদ্ধে বিজয়লাভের অনতিকাল পরেই তুর্কীরা ওয়ালাশিয়া পুনঃ দখল করে। তাদের মধ্যে জেগে উঠে প্রতিশোধ স্পৃহা। দানিয়ুব অঞ্চল এবং 'স্টাইরিয়ান' এবং 'সিরমিয়ান' রাজ্যে তাদের প্রতিহিংসার স্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। এদিকে হাঙ্গেরীর অবারিত দ্বার তখন সুলতানের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে রাজাও নেই, কোন সৈন্য-সামন্তও নেই। অনায়াসেই তিনি দখল করে নিতে পারেন গোটা অঞ্চল। কিন্তু বিজয়ী সুলতান সেদিকে পা বাড়ালেন না। সম্ভবত, এর পেছনে তিনটি কারণ ছিল ঃ

প্রথমত, হঠাৎ করে সুলতান গেটে বাতে আক্রান্ত হন। ফলে শারীরিকভাবেই তাঁর পক্ষে বড় রকমের কোন অভিযানে অংশ নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যে তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার বিশাল অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলেন। রাজ্যের সীমানার আর বিস্তার না করে তিনি অধিকৃত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, কৌশলগত দিক থেকে কনস্টানটিনোপল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখান থেকে ক্রুসেডারদের বড় রকমের অভিযানে বের হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া কনস্টানটিনোপলের পতনের উপর নির্ভর করছিল বলকান অঞ্চলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা। সে কারণেই তিনি আবার কনস্টানটিনোপল দখলের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

সুলতান বায়াজিদ তাঁর বাহিনীকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেন। একটি বাহিনীর উপর গ্রীক দখলের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। অপর দলটি কনস্টানটিনোপল দখলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজে মন দিল। বসফরাস থেকে এবং কৃষ্ণসাগরের পথে কনস্টানটিনোপলে সাহায্য-সহযোগিতা আসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি বসফরাসের এশীয় সীমান্তে একটি দুর্গ নির্মাণ করলেন। এই দুর্গটিকে বলা হত 'আনাদোল হিসার।' এভাবেই দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করলেন কনস্টানটিনোপল দখলের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজগুলো। তখন শুধু শহরটি অবরোধ করা বাকী। ঠিক তখনই উসমানের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশে দেখা দেয় চরম দুর্যোগ। লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় বায়াজিদের সমস্ত আয়োজন। যাকে কেন্দ্র করে ঘটনাপ্রবাহ নতুন মোড় নিল, ওলট-পালট হয়ে

গেল সমস্ত কিছু, তিনিও একজন তুর্কী সন্তান। নাম তাইমুর।

তাইমুর ছিলেন একজন খ্যাতিমান সেনাপতি এবং বিখ্যাত দ্বিগ্বিজয়ী। নৃশংসতা এবং বর্বরতায়ও তিনি ছিলেন সবার সেরা। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তার পরিচয় 'ভগবানের চাবুক' হিসেবে। জীবনের শুরুতে তিনি মধ্য এশিয়ায় একটি ছোট অঞ্চল সমরখন্দ শাসন করতেন। পরবর্তীতে শক্ত হাতে অনেকগুলো রাজ্য দখল করেন। রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন চীন থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগর এবং দিল্লী থেকে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক অনুর্বর অঞ্চল পর্যন্ত। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধার্মিক হলেও তাঁর জীবনাচরণে গাজী চেতনার বিন্দুমাত্র নামগন্ধ ছিল না। অথচ এটাই ছিল উসমান রাজবংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুতপক্ষে, এ দিক থেকে তুর্কীদের মধ্যে তাইমুর ছিলেন ব্যতিক্রম। দীর্ঘ দিনের বিজয় অভিযানে তিনি হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। অসংখ্য শহর-বন্দর ভেঙে-চুরে তছনছ করে দেন। অথচ, নিহতদের অনেকেই ছিলেন মুসলমান। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর-বন্দরগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ছিল মুসলমানদের অধিকৃত।

তাইমুর পর পর দু'বার আনাতোলিয়ায় অভিযান চালান। কিন্তু অভিযান সম্পন্ন করার পূর্বেই তাঁকে জরুরীভিত্তিতে ফিরে আসতে হয় সিরিয়া এবং ইরাকে। এদিকে রাজ্যের সীমান্তে তুরস্কের মত একটি বৃহৎ শক্তির উপস্থিতিকে তিনি কোনভাবেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাতে করে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলো যে কোন সময় হুমকির সম্মুখীন হতে পারত। সেখানে দেখা দিতে পারত অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। সে কারণেই তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ তুরস্ক সালতানাতকে ধ্বংস করে দেয়ার পরিকল্পনা আঁটছিলেন। এবার তিনি সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে রওয়ানা হলেন। সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করলেন তুরস্ক সাম্রাজ্য। তুরস্কের সুলতান বায়াজিদ তখন কনস্টানটিনোপল দখল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ছুটে গেলেন রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে। আংকারার নিকটে তাইমুরের আক্রমণকারী বাহিনীর মুখোমুখি হলেন।

তাইমুরের এ ধরনের আচরণে বায়াজিদ ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলেন। ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তিনি এমন একটি স্থানকে যুদ্ধের জন্য বেছে নিলেন, যা কৌশলগত দিক থেকে মোটেও উপযোগী ছিল না। অপর দিকে বায়েজিদের বাহিনীর একটি বিরাট অংশ বংশগত সূত্রে তাইমুর রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। যুদ্ধের ময়দানে তারা সুলতান বায়াজিদকে পরিত্যাগ করে। ফলে সুলতানের শক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। তাছাড়া সেনাপতি হিসেবেও বায়াজিদের চেয়ে তাইমুর ছিলেন অধিকতর দক্ষ এবং প্রতিভাবান। একটি হস্তিদলসহ তার বাহিনী ছিল অনেক বড়।

১৪০২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই উভয় বাহিনী সম্মুখসমরে লিপ্ত হল। কিন্তু এই যুদ্ধে

বায়াজিদ সুবিধা করতে পারলেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলেন। এক পুত্রসহ বন্দী হলেন তাইমুরের হাতে। তাইমুর বন্দী বায়াজিদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখালেন। তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সৌজন্যের সঙ্গে। এভাবেই কাটতে লাগল তাঁর বন্দী জীবন। অবশেষে ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বন্দী অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর পর তাইমুর তার বন্দী ছেলেকে মুক্তি দেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে মাটি দেয়ার জন্য বায়াজিদের মৃতদেহসহ তাকে পাঠিয়ে দেন রুরুসায়।

সে বছরই তাইমুর আনাতোলিয়া থেকে ফিরে আসেন সমরখন্দে। এবার তিনি চীনের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। প্রস্তুতি চলতে লাগল তদনুসারে। কিন্তু তাইমুরের ভাগ্যে চীনে অভিযান চালান সম্ভব হয়নি। ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে সমরখন্দ তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর।

এ দিকে বায়াজিদের অনুপস্থিতিতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে গৃহযুদ্ধ বাঁধে। একাধারে ১১ বছর চলতে থাকে এই গৃহযুদ্ধ। অবশেষে বায়াজীদের পুত্র মাহমেত জয়ী হল। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে সে পুনরায় সুসংহত করল। উসমানের প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক সাম্রাজ্য টিকে গেল আরও ৫০০ বছর। কিন্তু দুর্যোগ দেখা দিল তাইমুরের রাজ্যে। তাঁর রাজ্যটি ছিল খুবই বড়। শক্তি এবং প্রাচুর্যও ছিল অপরিমেয়। কিন্তু তাইমুরের মৃত্যুর পর বিশাল এই সাম্রাজ্যটিও বিলীন হয়ে গেল।

ক্রুসেডের নামে বড় বড় যে কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে নিকপোলিসের যুদ্ধ ছিল বড় আকারের। শেষ যুদ্ধে অবশ্য নিকোপোলিসের চরম বিপর্যয়ের পরেও খ্রিস্টান জগৎ থেকে ক্রুসেডের জন্য সোচ্চার আহ্বান জানানো হয়। সংঘটিত হয় বেশ কতকগুলো ক্রুসেডের যুদ্ধ। তবে এগুলোর ভয়াবহতা এবং গুরুত্ব ছিল অনেক কম। ইতিপূর্বে ক্রুসেডের নামে খ্রিস্টানদের অন্তরে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হত, তাদের মধ্যে দেখা দিত যুদ্ধংদেহী মনোবৃত্তি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই সেই উন্মত্ততা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ক্রুসেডের আহবান হারিয়ে ফেলে তাঁর সেই পূর্বের আবেদন। এ ধরনের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টির পশ্চাতে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক এবং মানবিক কারণগুলোই প্রধান।

ক. ধর্মযাজকগণ ইতিমধ্যে ক্রুসেডের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে ফেলেছিলেন। তাঁরা ক্রুসেডকে ব্যবহার করছিলেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। যে সমস্ত রাজ-বাদশাহ যাজক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ইচ্ছার কাছে মাথা নত করেনি, মেনে নেয়নি তাদের কথাগুলোকে তারা সে সমস্ত রাজা-বাদশাহর বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দিলেন। এমনিভাবেই ইউরোপের রাজাগণ তাদের আক্রমণের শিকার হলেন। এমনকি চতুর্থ ক্রুসেড পরিচালিত হল কনস্টানটিনোপলের সম্রাটের বিরুদ্ধে। অথচ ধর্মগতভাবে

তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিকে ভিত্তি করে যে ক্রুসেডের উদ্ভব, এমনিভাবেই সে ক্রুসেডের ধর্মীয় চেতনা নষ্ট হয়ে গেল।

খ. শতাব্দীর ব্যবধানে খ্রিস্টান জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চেতনার নামে উন্মাদনার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি ইউরোপের মাটিতেই ক্রুসেডের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ এবং সোচ্চার আওয়াজ শোনা যায়।

গ. খ্রিস্টান জগতে বহুজাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রেরণা এবং যাজকগোষ্ঠী ছিল প্রধান মাধ্যম। কিন্তু এই উভয়বিধ মাধ্যমের গুরুত্ব লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত চেতনা প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। তারপর থেকে জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতেই ভাল-মন্দ সব কিছুই বিচার-বিবেচনা শুরু হয় এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতির প্রশ্নটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ঘ. ইতিমধ্যে তুর্কী সালতানাত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আত্মপ্রকাশ করে ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে। খ্রিস্টানরা ভালভাবেই অনুধাবন করতে শুরু করে যে, তুর্কীদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক রাখার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আবার বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক রাখার আপদও কম নয়। বিশেষ করে জাতিগত সমস্যার আন্তর্জাতিক সমাধানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। গোড়ার দিকে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ঘৃণার চোখে দেখত। বস্তুতপক্ষে মুসলমানদের ঘৃণা করাটা তাদের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজন্ম শত্রুকে তারা অত্যন্ত ধৈর্য এবং নমনীয়ভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

ঙ. খ্রিস্টানেরা দেখতে পেল যে, তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা খুবই ব্যয়বহুল। এতে আপদ-বিপদ প্রচুর। বরং তাদের সঙ্গে ব্যবসা করাটা অধিকতর সুবিধাজনক। এখানে ক্ষয়ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। বরং নগদ এবং নিশ্চিত মুনাফা অর্জন করা যায়।

চ. নিকপোলিসের এই যুদ্ধে ইউরোপের বিশেষ করে ফ্রান্সের খানদানী পরিবারের যোদ্ধারা যোগ দেয়। ইতিপূর্বেও অভিজাত পরিবারের সন্তানেরাই ছিল খ্রিস্টান বাহিনীর শক্তির মূল উৎস। নিকপোলিসের যুদ্ধে তাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য হয় মারা যায়, নয়ত বন্দী হয়। ইউরোপবাসীরা দীর্ঘ দিন যাবত তাদের এই বিয়োগ-বেদনাকে ভুলতে পারছিল না। এতে করে দিনে দিনে ইউরোপবাসীদের মধ্যে ব্যক্তিগত এবং মানবিক কারণেই ক্রুসেড-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে মুসলিম শিবির থেকে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান বন্দী ছাড়া পায়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে তাদেরকে খুবই জাঁকালোভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়। দেখে মনে হয় এরাই বুঝি যুদ্ধের বিজয়ী বীর। আপামর খ্রিস্টানেরা এটাকে গ্রহণ করল উপহাস হিসেবে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। অপর

দিকে ক্রুসেডের যুদ্ধগুলো ছিল ব্যয়বহুল। নিরর্থক অর্থের অপচয় হয় প্রচুর পরিমাণে। ফলে জনগণ ছিল অতিমাত্রায় কর-ভারাক্রান্ত। ক্রুসেডের ভয়াবহ ফলাফল এবং লজ্জাকর পরিণতির কথা ভেবে তারা শিউরে উঠল। ক্রুসেডের নামে তাদের অন্তর ভরে গেল বিতৃষ্ণা, বিরক্তি এবং ঘৃণায়। তবু পোপদের বিবেক জাগ্রত হল না। তারা ক্রুসেডের পক্ষে প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখল। কিন্তু খ্রিস্টানদের অন্তরে তাদের উদাত্ত আহবান সাড়া জাগাতে পারল না। নিকোপোলিসের যুদ্ধের পর তারা ক্রুসেড পরিত্যাগ করল একটি ঘৃণ্য উদ্যোগ, ব্যয়বহুল এবং অর্থহীন প্রয়াস হিসেবে।

কনস্টানটিনোপল বিজয়

(২৯ মে, ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ)

১৪০২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই আংকারার যুদ্ধে তাইমুরের হাতে বায়াজিদ পরাস্ত হলেন। মৃত্যুবরণ করলেন বন্দী অবস্থায়। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল তুর্কী শক্তির বিকাশের পথে মস্তবড় একটি আঘাত। এর পরেই তুর্কী সাম্রাজ্যে দেখা দেয় বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা। ছড়িয়ে পড়ে গৃহযুদ্ধ। এমনি অরাজক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কেটে যায় দীর্ঘ ১১টি বছর। অবশেষে ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে বায়াজিদের ছেলে প্রথম মাহমেত তুর্কীর মসনদে আরোহণ করেন। একজন কৌশুলী সমরনায়ক হলেও স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। সমসাময়িককালের লোকেরা তাকে বলত 'চেলেবি' বা 'ভদ্র মানুষ'। তার শাসনামলে স্থানীয়ভাবে কতকগুলো বিদ্রোহ দেখা যায়। সুযোগ পেয়ে হাঙ্গেরীয় এবং ভেনেটিয়ানরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মাহমেত বিদ্রোহীদের দমন করে সকলকে আবার অধীনতা পাশে আবদ্ধ করেন।

কিন্তু মাহমেতের মনোযোগ ছিল অন্যত্র। একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের দূরদৃষ্টি নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। সাম্রাজ্যের সীমান্ত বরাবর দুর্গ নির্মাণের কাজে তিনি অধিক সময় ব্যয় করেন। মনোযোগ দিলেন সামরিক এবং বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার প্রতি। রাজ্যের শহর-বন্দরগুলো সাজালেন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। বুরুসার 'গ্রীন মসজিদ' সুলতান মাহমেতের এমনি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সুলতান যে কতখানি সংস্কৃতিমনা এবং উদার ছিলেন এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তার স্পষ্ট স্বাক্ষর মেলে।

১৪২১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম মাহমেত-এর ইন্তেকালের পর তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড চলে আসে পুত্র দ্বিতীয় মুরাদের হাতে। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ রাজবংশের একজন খ্যাতিমান সুলতান। তাঁর শাসনকাল মূলত বীরকেশরী সালাহউদ্দীনের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দু'জনের জীবনধারায় অদ্ভুত রকমের একটা সংহতি লক্ষ্য করা যায়। বাল্য বয়সে সালাহউদ্দীন ধর্ম বিষয়ে একজন পণ্ডিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। অপরদিকে সেই ছোট বেলা থেকেই সূফী জীবনধারার প্রতি মুরাদের ছিল তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু বাস্তবতা তাদের দু'জনকেই দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। ইতিহাসের পাতায় তাদের পরিচিত করে তুলল খ্যাতিমান যোদ্ধা এবং ন্যায়বান ও ধর্মভীরু শাসক হিসেবে।

এককালে যে রোমান সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না, পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেই রোমান সাম্রাজ্য খুবই ছোট হয়ে যায়। কৃষ্ণসাগর এবং এজিয়ান সাগরের সামান্য অঞ্চলসহ রাজধানীর মধ্যেই রোমান সম্রাটের শাসন ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। মোস্তফা নামে মুরাদের একজন ভাই ছিল। সেও তুর্কী সাম্রাজ্যের মসনদে আরোহণের আশা পোষণ করছিল। এই সুযোগে রোমান সম্রাট মোস্তফার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তাকে নানাভাবে মদদ দিতে থাকে।

মুরাদের পিতা বায়াজিদের সঙ্গে অবশ্য রোমান রাজার সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মুরাদ সেই সম্পর্ককে অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা নিলেন। এবং রোমান সম্রাটকে স্বদেশে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু রোমান সম্রাট এই আমন্ত্রণকে খোলামনে গ্রহণ করল না। সে শর্ত আরোপ করল এবং বলল যে, মুরাদের দুই ভাইকে জামিন হিসেবে কনস্টানটিনোপল পাঠালে সে তুর্কী আসতে পারে। মুরাদের কাছে এ ধরনের দাবী খুবই অপমানজনক মনে হল। তিনি সরাসরিভাবে সম্রাটের দাবী প্রত্যাখ্যান করে ১৪২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে রোমান সম্রাটের রাজধানী কনস্টানটিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু আনাতোলিয়ায় বড় রকমের একটা বিদ্রোহ দেখা দিলে মুরাদ অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হলেন।

মোটামুটি শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মুরাদের সময়গুলো কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৪২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আবার শুরু হয় তাঁর যুদ্ধ জীবন। এ সময়ে হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ডের রাজা সম্মিলিতভাবে দানিয়ূব নদীর অপর প্রান্ত থেকে তুর্কী সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালায়। কিন্তু শক্ত হাতে মুরাদ তাদের তাড়িয়ে দিলেন। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে মুরাদের বাহিনী 'জানিনা' এবং 'থেসালোনিকা' দখল করে। অতঃপর সারবিয়ার রাজা জর্জ ব্রানকোভিচকে বাধ্য করা হলো তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হতে। সুলতান মুরাদ তার বোন সারাকে বিয়ে করলেন। ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে মুরাদ বেলগ্রেড অবরোধ করেন। ঠিক তখনই আনাতোলিয়ার কারামানের আমীর তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে তাঁকে অবরোধ প্রত্যাহার করে চলে আসতে হয় আনাতোলিয়ায়।

দীর্ঘদিন যাবত পোপ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এতদিনে তাঁর সে প্রত্যাশা নাগালের মধ্যে এসে গেল। তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি ক্রুসেডের ডাক দেন। সংগঠিত করেন খ্রিস্টান শক্তিকে। হাঙ্গেরীর রাজা, সারবিয়ার সরকার, আলবেনিয়ার সরদার জর্জ কাসটরিওটা যোগ দিল তার সঙ্গে। পোপের বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন কার্ডিনাল জুলিয়ান সিজারিনি। ট্রানসিলভানিয়ার ভাইসরয় জন হুনাইদিকে নিয়োগ করা হল সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে। সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী অনায়াসেই দানিয়ূব নদী অতিক্রম করে সারবিয়ায় চলে আসে। এবং সেখানকার তুর্কীদের জোর করে ধরে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সুলতান মুরাদ তুর্কী এশিয়া অঞ্চল থেকে ছুটে আসেন দানিয়ুবের প্রান্তরে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে জয়-পরাজয়ের ঝুঁকি

নেয়ার জন্য মুরাদ অথবা রাজা লাডিসলাস কারোই তেমন আগ্রহ ছিল না। দু'জনে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন। মুরাদ কুরআন হাতে এবং লাডিসলাস গসপেল হাতে শপথ করলেন যে, আগামী দশ বছরের জন্য তারা নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলবেন। দানিয়ূব হবে তাদের মধ্যকার সীমানা। এ সময়ের মধ্যে তারা কেউ দানিয়ূব নদী অতিক্রম করবেন না।

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে মুরাদ এবার খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। স্থির করলেন যে, এবার তিনি কোন ধর্মশালায় ফিরে যাবেন। প্রত্যাবর্তন করবেন দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত সূফী জীবনধারায়। শাসনকার্য থেকে অব্যাহতি নেয়ার বিষয়টি সকলকে জানিয়ে দিলেন। ঘোষণা দিলেন তার পরিকল্পনা সম্পর্কে। কিন্তু তার কপালের লিখন ছিল অন্য রকম। সীমান্ত অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার অনতিকাল পরেই হাঙ্গেরীর রাজা পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। কার্ডিনাল সিজারিনি ছিল পোপের বিশেষ প্রতিনিধি বা পরামর্শদাতা। বাইবেল হাতে রাজা যে শপথ নিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করার জন্য সে রাজাকে প্রলুব্ধ করল। ঘোষণা দিল যে–যে নাস্তিক, যে আমাদের ধর্মমতের অনুসারী নয়, তার সঙ্গে ওয়াদা করা অর্থহীন। এই ওয়াদাকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করা যায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাডিসলাস আবার তলোয়ার কোষমুক্ত করল। দানিয়ূব নদী অতিক্রম করে বিশাল বাহিনী নিয়ে চলে এল বুলগেরিয়ায়।

খ্রিস্টান রাজার এ ধরনের আচরণে ধর্মপরায়ণ সুলতান মুরাদ খুবই বিস্মিত হলেন। এমনকি সার্বিয়ার খ্রিস্টান অধিপতিও বিষয়টিকে সুদৃষ্টিতে দেখল না। সে ছিল গ্রীক চার্চের অনুসারী। কিন্তু হাঙ্গেরীর রাজা ছিল রোমান ক্যাথলিকদের দলভুক্ত। এবং সে কারণেই সারবিয়ার অধিপতি ক্রুসেডে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকল।

খ্রিস্টান বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে মুরাদ আনাতোলিয়া থেকে ছুটে এলেন। ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর 'ভারনা' নামক স্থানে উভয় বাহিনী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। রাজা লাডিসলাস এবং উপদেষ্টা কারডিনাল যুদ্ধের ময়দানে মারা গেল। অগণিত খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হল। হুনায়দি এবং তার বাহিনী কোন রকমে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। বেঁচে যায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ভারনায় সফল অভিযানের পর তিনি শাসনভার বার বছরের পুত্র মাহমেতের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি আবার ফিরে যান পশ্চিম আনাতোলিয়ার মনিসার ধর্মশালায়।

যুবক মাহমেতের শাসনকার্য পরিচালনা করার মত পরিপক্কতা ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণ রকমের অহংকারী এবং একগুঁয়ে। সব সময় নিজের চিন্তা এবং মতে অটল থাকতেন। এদিকে তুরস্কের পূর্ব সীমান্তে আবার গোলযোগ দেখা দেয়। তুর্কী বাহিনী, বিশেষ করে জানিসারিদের মত দুর্ধর্ষ দলের মধ্যে স্থবিরতা এবং বিশৃঙ্খলার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে বেশি দিন সুলতানের পক্ষে সূফী জীবনধারার

একাগ্র সাধনায় লিপ্ত থাকা সম্ভব হল না। দু'বছরের মধ্যে তিনি আদ্রিয়ানোপলে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে হুনায়দি হাঙ্গেরীর অভিভাকত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঁয়তারা শুরু করে। ওয়ালাশিয়া, বোহেমিয়া এবং বেতনভুক্ত জার্মান সৈন্যদের নিয়ে গড়ে তোলে বিশাল একটি বাহিনী। অতর্কিতে সে তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায়। ইতিমধ্যে সে আলবেনিয়ার রাজা সিকান্দার বেগকেও যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য প্রলুব্ধ করে। এবং কসোভোর প্রান্তরে আলবেনীয় বাহিনীর সঙ্গে হাঙ্গেরী বাহিনীর মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু হুনায়দির প্রয়াস ব্যর্থ হল। আলবেনীয় বাহিনীর আগমনের পূর্বেই মুরাদ হাঙ্গেরীয় বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালান। যুদ্ধে হুনায়দি আবারো পরাজিত হল। নির্মূল হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে। দু'টি যুদ্ধেই খ্রিস্টানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হল। এভাবে পূর্ব ইউরোপে খ্রিস্টান শাসকদের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেল। এবং পরবর্তী এক পুরুষের মধ্যে তারা আর সংঘবদ্ধ হওয়ার অবকাশ পেল না। অবস্থা এমন হল যে, পাঁচ বছর পরে মুসলিম বাহিনী যখন কনস্টানটিনোপলে অভিযান চালায় তখন বলকান অঞ্চলে এমন কোন খ্রিস্টান বাহিনী ছিল না, যারা মুসলমানদের বাধা দিতে পারে, অথবা যাদের কারণে মুসলিম বাহিনীকে বিন্দুমাত্র আতংকগ্রস্ত হতে হয়।

ইউরোপীয় সীমান্তের ন্যায় আনাতোলিয়া অঞ্চলেও মুরাদ চমৎকার সাফল্যের পরিচয় দেন। আইদিন এবং জার্মিয়ান আমীরাতকে তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁর ভয়ে কারামানিয়ানরা ছিল ভীষণ রকমের আতংকগ্রস্ত। অন্য স্বায়ত্তশাসিত যুবরাজেরা, যেমন সিনোপে এবং আটালিয়ার আমীরগণ তুরস্কের শ্রেষ্ঠত্বকে অকপটে স্বীকার করে নেয়। কনস্টানটিনোপলের সম্রাটের ন্যায় ত্রিবিজোন্দ-এর সম্রাটের তেমন কোন ক্ষমতা বা শক্তি ছিল না এবং তুর্কী সুলতানের প্রতি তিনি ছিলেন অতিশয় বিনয়ী এবং নম্র।

মুরাদের শাসনাধীনে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সর্বত্র পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। দেশটি ছিল উন্নত এবং সমৃদ্ধ। মুরাদের সামরিক সংস্কারমূলক কার্যাবলীর মধ্যে 'জানিসারি' বাহিনীর পুনর্গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তারকৃত লোকজনদের মধ্যে যারা অল্প বয়সী বালক, তাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল 'জানিসারি' বাহিনী। সুলতান মুরাদ এই নিয়মের খানিকটা পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি নিয়ম করে দিন যে, খ্রিস্টান পিতামাতারা কর হিসেবে পুত্র সন্তানদেরকে মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে। হস্তান্তরকৃত এই সন্তানদেরকেই সৈনিক হিসাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হত এবং পরবর্তীতে 'জানিসারি' দলে সৈন্য ভর্তির ক্ষেত্রে এটাই নিয়মিত পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়।[২] কিন্তু সুলতান মুরাদ এবং পুত্রের শাসনামল পর্যন্ত দুর্ধর্ষ জানিসারিদর এই দলটি খুব বেশী একটা বিশালতা লাভ করতে পারেনি।

সুলতান মুরাদ ছিলেন খুবই ন্যায়বান এবং নীতিপরায়ণ। তাঁর অন্তকরণ ছিল সূফী দরবেশদের মত। প্রজাসাধারণ তাঁকে যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসত তেমনিভাবে আজন্ম শত্রুরাও তাকে শ্রদ্ধা করত অন্তর থেকে। সারবিয়ান স্ত্রী সারার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। দীর্ঘ ২১ বছর শাসনকার্য পরিচালনার পর ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৭ বছর বয়স্ক দ্বিতীয় মাহমেত তুর্কী শাসনের গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত হন।

মাহমেত বাল্য বয়সে শাইখ আহমদ আল-কোরানি নামক একজন খ্যাতনামা কুর্দী শিক্ষকের নিকট পড়াশোনা করেন। শায়খ আহমদও ছাত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে মাহমেত বিজ্ঞান, দর্শন এবং গ্রীক ও ইসলামী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মাতৃভাষা (তুর্কী) ছাড়াও গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্সী এবং হিব্রু ভাষার উপর তাঁর প্রগাঢ় দখল ছিল। বাল্য বয়স থেকেই জ্ঞান অর্জনের প্রতি মাহমেতের যে অধীর আগ্রহ ছিল, সুলতান হওয়ার পরও তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকাজে তিনি এতটা ব্যাপৃত থাকতেন যে, বিদ্যা চর্চার বড় একটা সুযোগ পেতেন না। এ সময়ে তিনি দুজন খ্যাতনামা পণ্ডিতকে রাজদরবারে নিয়োগ করেন। তারা বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্পকির্ত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলীর সারসংক্ষেপ সুলতানকে পড়ে শোনাতেন। অপরদিকে সরকার এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার কলাকৌশলগুলো ছিল তাঁর নখদর্পণে। পিতা মুরাদও অতি সযত্নে এ বিষয়ে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

মাহমেতের জীবনের শুরুতেই রয়েছে ব্যর্থতার ইতিহাস। তাই দেখে আশে-পাশের রাজা-বাদশাহগণ মাহমেতেকে একজন অনভিজ্ঞ যুবক হিসেবে জানতেন। তাঁরা ভাবতেন, রাজ্য শাসনপ্রণালী সম্পর্কে মাহমেতের বিন্দুমাত্র ধ্যান-ধারণা নেই। কিন্তু যারা মাহমেতকে চিনত, তুরস্কের দরবার সম্পর্কে যাদের জানাশোনা ছিল- তাদের ধারণা ছিল অন্যরকম। বিশেষ করে মাহমেতের তুরস্কের সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকেই রোমান সম্রাট বড় রকমের একটা বিপদের আশংকা করছিলেন। সুঠাম-সবল দেহের অধিকারী মাহমেত ছিলেন খুবই সুদর্শন পুরুষ। লাল টুকটুকে ওষ্ঠের উপর উঁচু খাড়া নাসিকা এবং ধনুকের মত বাঁকা ও চিকন একজোড়া ভ্রুর নীচে তীক্ষ্ম দুটি চোখ তার মুখমণ্ডলকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। মাহমেতের আচার-আচরণ ছিল খুবই মহৎ এবং আন্তরিক। কিন্তু তার মধ্য দিয়েই সব সময় একটি গাম্ভীর্য এবং সংযত ভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠত। তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকগণের সাহচর্যকে পছন্দ করতেন। বিশেষভাবে যাদের পাণ্ডিত্যকে তিনি পছন্দ করতেন, তাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই উদার এবং আন্তরিক। জনসমক্ষে নিজেকে তুলে ধরার অথবা জনপ্রিয়তা অর্জনের কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও অদম্য উৎসাহ এবং দৃঢ়তার কারণে তিনি ছিলেন সবার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর মনোবল

এত দৃঢ় ছিল যে কখনো কোন কাজ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলে তা তিনি সম্পন্ন করে ছাড়তেন। যারা তাকে চিনত, তারা কখনো এর ব্যতিক্রম আশা করতো না। করলেও তা হত একটি দুঃসাহস বা দুরাশা মাত্র। মাহমেতের মস্তবড় একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মনের ভাবকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গোপন রাখতে পারতেন। তাঁকে দেখে তাঁর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে কখনো কিছু আন্দাজ করা যেত না।

১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুরাদ যখন সর্বপ্রথম রাজ্যের শাসনভার পুত্রের উপর অর্পণ করেন, তিনি চলে যান নির্জনবাসে, তখন মাহমেতের বয়স মাত্র ১২ বছর। তিনি আশা করেছিলেন যে, বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ উজির খলিল পাশার তত্ত্বাবধানে তিনি শাসনকার্য চালিয়ে যাবেন। কিন্তু মাহমেত এতটা স্বাধীনচেতা ছিলেন যে, দু'জনের মধ্যে বড় একটা মনের মিল হল না। খলিল মুরাদকে নির্জনবাস থেকে পুনরায় শাসনকাজে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন এবং সে কারণেই মাহমেত খলিলকে তেমন একটা পছন্দ করতেন না। তবু তিনি কিছুদিনের জন্য খলিলকে প্রধান উজিরের পদে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় উজির ইসহাক পাশা ছিলেন খলিলের অন্যতম বন্ধু এবং সহযোগী। মাহমেত তাকে আনাতোলিয়ার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং সরিয়ে দিলেন রাজধানী থেকে। অপরদিকে সরুজা পাশা এবং 'জাগানোছ পাশা' মুরাদের প্রতি অনুরক্ত হলেও প্রধান উজির খলিলের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। মাহমেত প্রধান খোজা শিহাবুদ্দীনসহ তাদেরকে নিয়োগ করলেন সহকারী উজির হিসেবে। এ ভাবেই তিনি নিজের প্রভাব এবং ক্ষমতাকে সুসংহত করলেন।

মাহমেতের একজন বৈমাত্রেয় নাবালক ভাই ছিল। সে-ই হতে পারত সিংহাসনের একমাত্র সম্ভাব্য দাবীদার। মাহমেত তার সিংহাসনকে বিপদমুক্ত করার জন্য নাবালক ভাইকে হত্যা করার ব্যবস্থা করলেন। পূর্ণ মর্যাদা-সহকারে সৎ-মা সরাকে পাঠিয়ে দিলেন তার পিতৃরাজ্য সারবিয়ায়। পরবর্তী সময়ে অবশ্য রোমান সম্রাট কনস্টেনটাইন সারাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ধর্মশালায় দিন যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। মাহমেত সৌহার্দ্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তিনি ভেনেটিয়ান, হাঙ্গেরী, ওয়ালাশিয়া, সারবিয়া এবং রোডস-এর সঙ্গে পুনরায় বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করেন। সম্রাট কনস্টেনটাইন-এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ওরখান নামে সোলায়মানের একটি ছেলে এবং সুলতান বায়াজিদের দৌহিত্র ছিল। সম্রাট কনস্টেনটানের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে তাকে পাঠিয়ে দিলেন কনস্টানটিনোপলে। সেখানকার কারাগারে সম্মানজনকভাবে তাকে কারারুদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। এবং এ কাজ বাবদ সম্রাট কনস্টেনটাইনকে বছরে ৩০০০ মুদ্রা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পাশ্চাত্যের রাজাদের ন্যায় কারমানের আমীর মাহমেতকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। সে বিশ্বাস করত যে, মাহমেতের সুলতান হওয়ার মত

কোন যোগ্যতা নেই। এ পদের জন্য সে একান্তই অনুপযুক্ত। এমন একটা ভিত্তিহীন ধারণা নিয়েই সে আইদিন, জার্মিয়ান এবং মেনটেশের-এ আমীরদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। সবাই মিলে একসঙ্গে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খবর পেয়ে মাহমেত অবিলম্বে আনাতোলিয়ায় ছুটে আসেন। অনায়াসেই নির্মূল করে দেন বিদ্রোহের বহ্নিশিখা।

আমীরদের বিদ্রোহ দমন করার পর তিনি রাজধানী আদ্রিয়ানোপলের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। শান্তিপ্রিয় উজির খলিলও ছিল তার সঙ্গে। ক্রুসিয়ায় আসার পরই রোমান সম্রাট কনস্টেনটানের দূতের সঙ্গে সুলতানের দেখা । দূত জানিয়ে দিল যে, তুর্কী যুবরাজ ওরখানের থাকা-খাওয়া এবং নিরাপদে রাখার জন্য দেয় ভাতার পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। তারা আভাসে-ইঙ্গিতে স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিল যে, ওরখান তুর্কী সালতানাতের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী এবং সম্রাটের এই দাবী মেনে না নিলে কিছু একটা বিপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। শান্তিপ্রিয় উজির খলিল সুলতানকে ভালভাবেই চিনত। সে জানত যে, এ ধরনের ধৃষ্টতা এবং বাড়াবাড়িকে সুলতান কোনক্রমেই সহজভাবে নেবেন না। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে খলিল খুবই বিব্রত বোধ বরল। সম্রাট কনস্টেনটাইনের প্রতি ক্রুদ্ধ হল ভীষণভাবে। মাহমেত অবশ্য মনের ভাব গোপন রাখলেন। দূতদের শান্তভাবে বলে দিলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা নেবেন। অতঃপর তিনি আদ্রিয়ানোপলের পথে রওয়ানা হলেন। সাধারণত দারদানেলেস ছিল বুরুসা থেকে আদ্রিয়ানোপলের যাতায়াত পথ। মাহমেত এ পথের পরিবর্তে বসফরাসের পথ ধরে অগ্রসর হলেন।

ইতিপূর্বে সুলতান বায়াজিদ বসফরাসের এশীয় উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এই দুর্গটিকে বলত আনাদুল হিসার। সুলতান বসফরাসের ইউরোপীয় উপকূলে এবং আনাদুল হিসারের অপর প্রান্তে আরেকটি পর্যবেক্ষণ দুর্গ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। শুরুতে এই দুর্গটির নাম দিয়েছিলেন "বঘাজকেসেন'। এর অর্থ কণ্ঠনালী অথবা প্রণালী রুদ্ধকারী। অবশ্য পরবর্তী সময়ে দুর্গটি 'রুমেলী হিসার' নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি এক হাজার দক্ষ কারিগর এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিকের তালিকা প্রণয়ন করলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে বসন্তের শুরুতে সুলতানের নির্বাচিত স্থানে নতুন একটা দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিলেন বসফরাসে।

সম্রাট কনস্টেনটাইনের কাছেও পৌঁছে গেল এই দুর্গ নির্মাণের সংবাদ। দুর্গ নির্মাণের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে সুলতানের নিকট দূত পাঠালেন। মাহমেত তাদেরকে রাজদরবার থেকে ফিরিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না। সম্রাট সহজেই সুলতান মাহমেতের মনোভাব আঁচ করতে পারলেন। তিনি অনুমান করলেন যে, সুলতানের বিরুদ্ধে ওরখানকে ব্যবহার করার যে হুমকি দিয়েছিলেন এই

আয়োজন তারই ফলমাত্র। নিশ্চয়ই পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সুলতান এই দুর্গ নির্মাণ করছেন এবং অচিরেই হয়ত তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

রোমান সম্রাটের সমস্ত প্রতিবাদ ও আপত্তি উপেক্ষা করে ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখে রুমেলী হিসার-এর নির্মাণ কাজ শুরু হল। কনস্টেনটাইন পাল্টা ব্যবস্থা নিলেন। বন্দী করলেন কনস্টানটিনোপলে বসবাসকারী সমস্ত তুর্কীকে। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। বরং নির্মাণ কাজ যেন আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তুর্কীদের বন্দী করা অর্থহীন এবং এভাবে সুলতানকে ঠেকানো যাবে না। তিনি সমস্ত বন্দীকে পুনরায় ছেড়ে দিলেন। এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন। প্রচুর উপঢৌকনসহ দূত পাঠলেন সুলতানের দরবারে। রুমেলী হিসার নির্মাণ করা হলেও বসফরাসের তীরবর্তী গ্রীসের গ্রামগুলোর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সুলতান তার পরিকল্পনার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্রাটের আপোস প্রস্তাবের প্রতি কোন রকম আমল দিলেন না। জুন মাসে সম্রাট কনস্টেনটাইন শেষবারের মত সুলতানের দরবারে আবারও দূত পাঠালেন। দুর্গ নির্মাণের পরে সুলতান যাতে কনস্টানটিনোপল আক্রমণের উদ্যোগ না নেন-সে ব্যাপারে সুলতান মাহমেতের তরফ থেকে নিশ্চয়তা লাভ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সম্রাটের সেই উদ্যোগ বিফলে গেল। সুলতান তাদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। বরং তাদেরকে নিক্ষেপ করলেন তুরস্কের কারাগারে। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল রোমান সম্রাট এবং তুর্কী সুলতানের মধ্যকার আসন্ন যুদ্ধের পূর্বাভাস মাত্র।

১৪৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট দুর্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল। ভিত্তিপ্রস্তর থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে সময় লাগল সর্বমোট ১৩১ দিন। সুলতান মাহমেত রুমেলী হিসার থেকে কনস্টানটিনোপলের প্রতিরক্ষা দেয়াল পর্যন্ত অভিযান চালালেন। তিন দিন ধরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলেন। অবশেষে তিনি ফিরে এলেন আদ্রিয়ানোপলে। তিনি নির্দেশ করলেন যে বসফরাস প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজকে দুর্গের কাছে থামতে হবে এবং তুর্কী সৈন্যরা জাহাজগুলো তল্লাশি করে দেখবে। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে, রুমেলী হিসারে নোঙ্গর না করে, সেই জাহাজগুলো পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হবে।

সুলতান মাহমেত কেবল বিধান জারি করেই ক্ষান্ত হলেন না। এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা নিলেন। বসফরাসের নিকটবর্তী জলসীমানার সন্নিকটস্থ একটি টাওয়ারে তিনটি কামান স্থাপন করলেন। নভেম্বরের প্রথম দিকে দুটি ভেনেটিয়ান জাহাজ সুলতানের নির্দেশ উপেক্ষা করে বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করছিল। সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে তুর্কী কামান গর্জে উঠে। কিন্তু তাদের

আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। কোনরকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই জাহাজগুলো অবরুদ্ধ স্থান পার হয়ে গেল। পক্ষকাল পরে আরেকটি ভেনেটিয়ান জাহাজ অনুরূপভাবে বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করছিল। তুর্কী কামানগুলো এবার যথাযথভাবেই আঘাত হানল। ডুবিয়ে দিল জাহাজটি। হত্যা করা হল জাহাজের সমস্ত নাবিককে। একক সিদ্ধান্তেই সুলতান এ সমস্ত পদক্ষেপ এবং কাঠোর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রকৃত মতলব সম্পর্কে কেউ কিছুই জানত না। এমনকি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও এ ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অবশ্য তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত এবং লক্ষ্যের ব্যাপারে যে দৃঢ় এবং অটল–এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রোমানরা ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান জগতের উপর্যুপরি আক্রমণের প্রধান উদ্যোক্তা। এরপর থেকেই অপ্রতিরোধ্য রোমান শক্তিতে বিপর্যয়ের ধস নামে। পূর্ব দিক থেকে সেলজুক তুর্কীরা এবং পশ্চিম দিক থেকে নরম্যানরা রোমান শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। রোমান সম্রাট নরম্যানদের আক্রমণ প্রতিহত করলেও ইটালী তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা মানজিকার্টের যুদ্ধে রোমানদের বিরুদ্ধে মস্তবড় একটা বিজয় অর্জন করে। সেলজুকেরাও আনাতোলিয়ার একটা বৃহৎ অংশ রোমানদের কাছ থেকে দখল করে নেয়। রোমান এবং মুসলমানরা দীর্ঘ দিনব্যাপী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও কখনো কখনো তাদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়েছে। দিনে দিনে খ্রিস্টানরা যুদ্ধংদেহী মনোভাব পরিহার করে মুসলমানদের প্রতি সহনশীল হয়ে উঠেছিল।

ধর্মযুদ্ধের নামে পরিচালিত ক্রুসেডগুলো রোমানদের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ দ্বিধা দ্বন্দ্বের উদ্রেক করে। তাদের দৃষ্টিতে এই ধর্মযুদ্ধগুলো ছিল অবাস্তব, ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস। অপরদিকে মহামান্য পোপ এবং ক্যাথলিকের অনুসারীরা অর্থোডক্স খ্রিস্টানদেরকে গির্জার মধ্যে ফেতনা এবং বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করত। তাদের দৃষ্টিতে এরা ছিল বলতে গেলে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে উভয় দলের বাদ-বিসংবাদ মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। ক্যাথলিক খ্রিস্টানেরা একটি অভিযান চালিয়ে অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের রাজধানী কনস্টানটিনোপল দখল করে নেয়। এমনকি লুটতরাজের বীভৎসতা থেকে শহরবাসীরা রক্ষা পেল না। অতঃপর তারা সেখানে একটি ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এমতাবস্থায় রোমান সাম্রাজ্য আনাতোলিয়ার নিসাইয়া-য় স্থানান্তরিত হয়। অবশ্য ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা কনস্টানটিনোপল পুনঃ দখল করে। কিন্তু এতদিনে রোমান সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অঞ্চলের প্রায় সবটুকু অংশই সারবিয়ার সম্রাট দখল করে নেয়। ফলে রোমান সাম্রাজ্যের বিশালতা অনেকখানি কমে যায়।

১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ওরখানের পুত্র সুলায়মান দারদানেলেস অতিক্রম করে এবং ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম থেরেস দখল করে নেয়। সাধারণ তুর্কীবাসীরাও

বিজয়ী বাহিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করে এবং থেরেস অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। অতঃপর প্রথম মুরাদ ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে আদ্রিয়ানোপলে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এভাবেই অনতিকালের মধ্যে তুর্কীরা দানিয়ুব থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এশিয়া এবং ইউরোপ অঞ্চলে তুর্কীদের বিশাল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের তুলনায় রোমান সাম্রাজ্য একটি ছোট্ট দ্বীপের মতই বিরাজ করছিল। বস্তুতপক্ষে ছোট্ট শহর কনস্টানটিনোপল, মোরিয়া এবং মর্মর সাগর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলভাগের ক্ষুদ্র কতগুলো টাউন নিয়েই গড়ে উঠেছিল রোমান সাম্রাজ্য। রোমান সাম্রাজ্যের এই ভগ্নদশা বিরাজ করছিল প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী।

সেই গোড়া থেকেই রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের মধ্যে বিরোধ এবং মতপার্থক্য বিরাজ করছিল। খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তু ছাড়াও গির্জা সম্পর্কিত আচার-আচরণ এবং বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও এই বিভেদ ব্যাপ্তি লাভ করে।

রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা পোপকে শর্তহীনভাবে গির্জার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে দাবী করে। তারা পোপকে গ্রহণ করে খ্রিস্টান জগতের ন্যায়সঙ্গত প্রধান হিসেবে। তারা মনে করত যে, প্রভুর বিধানকে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের অধিকার একমাত্র পোপের। রাজা বা সম্রাটদের দায়িত্ব হল পোপের দেয়া পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে কার্যকর করা। দীর্ঘ দিনব্যাপী পাশ্চাত্যের সম্রাটদের সঙ্গে পোপদের ক্ষমতার তীব্র যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ক্ষমতার লড়াইয়ে পোপদের জয় হল। পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হল পোপের আধিপত্য। কিন্তু গ্রীককেন্দ্রিক গির্জাগুলোর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানে যাজকগণের কোন ক্ষমতা ছিল না। যাঁরা রাজ্য চালাতেন, তাঁরাই পছন্দসই লোককে গির্জার পুরোহিতের আসনে বসাতেন। আবার ইচ্ছামত তাদের বরখাস্ত করতেন। রোমান ক্যাথলিকরা দাবী করত যে, গির্জার প্রশাসন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে পোপগণের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্বীকার করে নিলেই খ্রিস্টান জগতের মধ্যে ঐক্য আসতে পারে। কিন্তু গ্রীককেন্দ্রিক খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল এর উল্টো। প্রশাসনিক এবং আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে যাজকগণের দায়িত্ব গ্রহণ না করার ব্যাপারে তারা ছিল স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তাদের মতে, প্রশাসন পরিচালনা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে যাজক অবশ্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। কিন্তু তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যকে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য ধর্মের খাতিরে তারা ছোটখাট মতপার্থক্য এবং বিরোধগুলোকে উপেক্ষা করে গির্জার প্রতি খানিকটা নমনীয় ভাব দেখাত এবং যাজকগণকে অধিকতর ক্ষমতা দেয়ার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানগণ ছিলেন আপোস রফার ঘোর-বিরোধী। তারা গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রোমের অধীনতা স্বীকার করে নেয়ার দাবী জানায় এবং এটা ছিল যাজকগণের একটি নিম্নতম শর্ত।

কনস্টানটিনোপলের সম্রাটগণ গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উপর্যুপরি প্রচেষ্টা চালান। প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই তারা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বলকান অঞ্চল থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করা এবং কনস্টানটিনোপলকে বিপদমুক্ত করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে লেয়নসে ধর্মযাজকগণের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে সম্রাট মাইকেল পেলেইলোগাস খ্রিস্টান জগতের বিরোধকে ভুলে গিয়ে রোমান এবং গ্রীকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেন। কেন্তু সাধারণ খ্রিস্টানরা পুনর্মিলনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং পরবর্তীতে তারই ছেলে তৃতীয় এনড্রনিকাশ পুনর্মিলনের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন।

এমনিভাবে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সম্রাট পঞ্চম জন ব্যক্তিগতভাবে পোপের নিকট নতি স্বীকার করেন। কিন্তু এবারেও তার ঐক্যের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা সম্রাটকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকল। অস্বীকার করল রোমান পোপের আনুগত্য মেনে নিতে। ১৩৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েল পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপ সাহায্যের প্রত্যাশায় ইটালী, ফরাসী এবং ইংল্যান্ড সফর করেন। কিন্তু এবারেও পাশ্চাত্য জগতের সহযোগিতার পূর্বশর্ত হিসাবে রোমান পোপের নিকট গ্রীককেন্দ্রিক চার্চের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী জানায়। ফলে দ্বিতীয় ম্যানুয়েলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় পাশ্চাত্যের সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানান। কিন্তু তার বছর চারেক পূর্বে ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে নিকোপোলিসের যুদ্ধে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরা মুসলমানদের হাতে ভীষণ রকমের মার খায়। তাদের নিজেদের অবস্থা তখন দারুণ সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। ফলে তাদের পক্ষে সম্রাটের আবেদন বিবেচনা করা সম্ভব হল না।

সম্রাট ম্যানুয়েলের ছেলের নাম ছিল অষ্টম জন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই হলেন সম্রাট। ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার দ্বিধাবিভক্ত খ্রিস্টান শক্তির ঐক্যের প্রস্তাব দেন। মুসলমানদের মুকাবিলায় পোপ ও পশ্চিমা খ্রিস্টান জগতের সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা সম্রাটের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করল। ব্যর্থ করে দিল তার ঐক্যের প্রয়াস। সুলতান মুরাদের উপর্যুপরি বিজয় সম্রাটকে অসুবিধায় ফেলে দেয়। তিনি পোপ চতুর্থ ইউজেনিকাসের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। ১৪৩৮-৩১ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুনরায় সম্মতি দেন। কিন্তু অর্থোডক্স যাজক এবং গ্রীকবাসীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সম্রাটের এই ব্যর্থতাকে পোপ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি

ঘোষণা দিলেন যে, সম্রাট ষষ্ঠ জনের ঔদাসীন্য এবং অনাগ্রহ এজন্য দায়ী। তিনি কনস্টানটিনোপলের সম্রাটকে কোনরকম সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলেন। এই ঘটনার পর থেকেই সম্রাটের সঙ্গে অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছে। অপরদিকে রোমান ক্যাথলিক এবং গ্রীক অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের মধ্যকার মতপার্থক্য এবং বিবাদ আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমেতের তুর্কী মসনদে আরোহণের পর অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে এবং কনস্টানটিনোপলের পতন অত্যাসন্ন হয়ে উঠে। সম্রাট একাদশ কনস্টেনটাইন এবং প্রথম সারির অনেক রাজনীতিবিদ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে যে, পশ্চিম ইউরোপ থেকে অবিলম্বে এবং বিপুল পরিমাণ সামরিক সাহায্য না পেলে আসন্ন দুর্যোগের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। তারা স্পষ্টভাবে অনুভব করলেন যে, সময়ের চাহিদা অনুসারে ব্যবস্থা নেয়ার মত সামর্থ্য একমাত্র পোপেরই আছে। এমতাবস্থায় তারা খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে পোপের দাবী, তা যত ব্যয়সাধ্য এবং স্বার্থের পরিপন্থীই হোক না কেন, মেনে নেয়াকে শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের সাধারণ খ্রিস্টানরা বরাবরের মত এবারেও তাদের বিপক্ষে চলে গেল। যাজক সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ সম্রাটের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করল। পার্থিব সুবিধাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারলৌকিক মুক্তিকে বিসর্জন দিতে অস্বীকৃতি জানাল।

ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের ভিন্ন মত পোষণ করার ব্যাপারেও কতকগুলো কারণ ছিল। এই কারণগুলোকেও কোন ক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না। তারা যুক্তি দিল যে

ক. একাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে মুসলমান সাম্রাজ্য ছোট ছোট কতকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তারা সব সময় পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকত। মুসলমানদের এমন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খ্রিস্টান জগত ক্রুসেডের ডাক দিয়েও তেমন একটা সুবিধা করতে পারেনি। সে তুলনায় তুর্কী সাম্রাজ্য এখন অনেকখানি দৃঢ় এবং সুসংগঠিত। তাদের সামরিক শক্তি এবং প্রশাসনিক কাঠামো অনেক মজবুত এবং সুবিন্যস্ত। এমতাবস্থায় পোপ তথা খ্রিস্টান জগত থেকে সর্বাত্মক অভিযান চালিয়েও মুসলমানদের কাবু করার কোন সম্ভাবনা নেই।

খ. অপর দিকে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদে লিপ্ত রয়েছে। রোমান ক্যাথলিকরা শতাব্দীর পর শতাব্দী গ্রীকদেরকে পাপিষ্ঠ এবং নীতিজ্ঞানশূন্য বলে দোষারোপ করেছে। তারা গ্রীকদেরকে চিহ্নিত করেছে খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধবাদী হিসেবে। এমতাবস্থায় কনস্টানটিনোপল রক্ষার জন্য পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো যে কতটুকু একতাবদ্ধ হতে পারে, অথবা পোপের আহ্বানে ক্রুসেডে ঝাঁপিয়ে পড়বে– তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছিল না।

গ. বিগত আট শতাব্দী ব্যাপী গ্রীকরা মুসলমানদের পরিবর্তনশীল শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিল। তারা জানত যে, কিছু কাল পর পর মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল হয়। এক এক সময় এক একটি বংশ শাসন ক্ষমতায় আসে। স্বাভাবিক নিয়মেই তারা আশংকা করছিল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ত তুর্কী সালতানাতের পতন ঘটবে। ভিন্ন মতাবলম্বী গ্রীক রাজনীতিবিদ এবং যাজকগণ তেমনি একটি ক্রান্তিকালের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

ঘ. এ সময় গ্রীক চার্চের অনুসারীরা সর্বমোট ৬৭টি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক এলাকায় ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তন্মধ্যে ১২ জন ধর্মযাজক ছিলেন কনস্টানটিনোপলের সম্রাটের সাম্রাজ্যভুক্ত। অবশিষ্ট ৫২টি অঞ্চলে তুর্কী মুসলমানগণ নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা গ্রীক চার্চের অনুসারীদের সঙ্গে বড় একটা ভাল ব্যবহার করত না। যখন তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতেন, সে তুলনায় তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত খ্রিস্টানদের সঙ্গে সুলতানগণের আচরণ ছিল অধিকতর সহনশীল এবং নমনীয়। এমতাবস্থায় সম্রাট অথবা ধর্মযাজকগণ নিঃশর্ত রোমান পোপের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিলেও তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত খ্রিস্টানেরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিত কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

ঙ. অপরদিকে পোল্যান্ড এবং স্ক্যানডিনিভিয়ার গির্জাগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার একটি বৈরী সম্পর্ক ছিল। রাশিয়া এদেরকে শত্রুপক্ষ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। অনুরূপভাবে রোমান ক্যাথলিকদেরকেও তারা সুনজরে দেখত না। এমতাবস্থায় গ্রীক চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে পুনর্মিলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তা কোনক্রমেই সুখবর হত না। তাতে করে চিরদিনের জন্য গ্রীক চার্চ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেত।

এতসব বিবেচনা করে ভিন্ন মতাবলম্বীরা সিদ্ধান্ত নিল যে, যে করেই হোক গ্রীক অখণ্ডতাকে অটুট রাখতে হবে। কনস্টানটিনোপল মুসলমানদের পদানত হওয়ার বিনিময়ে হলেও এই অখণ্ডতাকে বিনষ্ট হতে দেয়া যাবে না। তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত যে, কালের ধারায় তুর্কী সাম্রাজ্যে যখন ভাঙ্গন দেখা দিবে, লয় পাবে তাদের দুর্জয় শক্তি– তখন গ্রীক চার্চের ছত্রছায়ায় হয়ত রোমানরা আবার জেগে উঠবে। ফিরে পাবে তাদের অতীত গৌরব এবং সাম্রাজ্য। বাইজানটাইনের মন্ত্রী লোকাস নোটারাস-এর মন্তব্য থেকেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন যে, মহামান্য পোপের মুকুট এবং তুর্কী সুলতানের পাগড়ীর মধ্যে দ্বিতীয়টি রোমানদের জন্য অধিকতর শ্রেয়।

মহামান্য পোপ দীর্ঘদিন যাবত রোমান সাম্রাজ্যকে নিজের আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণে আনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য বিভিন্ন সময়ে কতকগুলো পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রীক চার্চের প্রতিনিধিগণও ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য তৈরি ছিলেন। কিন্তু বলকান অঞ্চলে

সাম্প্রতিককালে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে যায় যা উভয় চার্চের মধ্যকার পুর্নমিলন সম্ভাবনাকে সুদূরপরাহত করে তোলে। প্রথমত, মহামান্য পোপ হাঙ্গেরীর রাজা লাডিলাসকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে এবং তার নেতৃত্বে ক্রুসেডের আহবান জানায়। অথচ ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লাডিলাস গসপেল হাতে শপথ করেছিল যে, আগামী দশ বছরের জন্য সে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলবে। লাডিলাস শপথ ভঙ্গ করল। কিন্তু তার সে প্রয়াস বিফলে গেল। ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভারনার যুদ্ধে সুলতান মুরাদ ক্রুসেডকে ব্যর্থ করে দিল। ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি যুদ্ধে লাডিলাসের হাঙ্গেরী বাহিনী এবং তার সহযোগীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল। পোপের নির্দেশক্রমে লাডিলাসের এই ওয়াদা ভঙ্গের বিষয়টিকে কনস্টানটিনোপলবাসীরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ক্রুসেডের যুদ্ধে লাডিলাসকে আশানুরূপ সাহায্য প্রদান না করার কারণে পোপের প্রতি কনস্টানটিনোপল-বাসীদের অবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং ক্যাথলিকদের সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত, ১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেনসের অধিবেশনে কনস্টানটিনোপলের সম্রাট পোপের নিকট নতি স্বীকার করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১০টি বছর গড়িয়ে গেছে এবং তখনকার তুলনায় ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সুলতান স্পষ্টতই অনেক বেশী শক্তি অর্জন করেছেন। এ সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের অভিযান সফল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

তৃতীয়ত, পোপের আধিপত্য মেনে নেয়ার পরও সম্রাট ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের নিকট থেকে প্রত্যাশিত সামরিক সাহায্য পাননি। স্বাভাবিকভাবেই এটা কনস্টানটিনোপলবাসীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাদের মনে এ ধরনের একটি বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, পুনর্মিলনের খাতিরে তারা ক্যাথলিক পোপের নিকট অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু তদনুসারে তারা কিছু পায়নি। বরং বঞ্চিত হয়েছে পুরোমাত্রায়।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা ধরে নেয় যে, ক্যাথলিকগণের সঙ্গে গ্রীক চার্চের পুনর্মিলনের চেষ্টা একটা অপপ্রয়াস মাত্র। এটা মূলত একটি গর্হিত এবং পাপকাজের নামান্তর। অবশেষে তারা গির্জাকে পরিত্যাগ না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল।

এদিকে খ্রিস্টান জগতের সামগ্রিক পরিবেশও তখন খুবই টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। এবং তাদের পক্ষে গ্রীককেন্দ্রিক অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের সাহায্য করা সম্ভব ছিল না।

প্রথমত, ক্যাথলিক এবং অর্থোডক্স চার্চের এই পুনর্মিলন প্রয়াসকে রাশিয়া সুনজরে দেখেনি। বরং গোড়া থেকেই সে ছিল এ ব্যাপারে প্রতিবাদমুখর। এমনকি ফ্লোরেনসের অধিবেশনে পুনর্মিলনের ব্যাপারে সম্মত হওয়ায় 'কিয়েব'-এর যাজক

ইসিডোরকে বহিষ্কার করে। অবশ্য মহামান্য পোপ ইসিডোরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেন। তাকে কার্ডিনালের মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাকে নিয়োগ করে কনস্টানটিনোপলে তার প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু মস্কোবাসীরা এতে পরিতৃপ্ত হল না।

দ্বিতীয়ত, মস্কোর সীমান্তেই ছিল মোলডাভিয়া। সেখানকার দুজন রাজাও তখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছিল। ফলে মস্কোর রাজাও দারুণ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।

তৃতীয়ত, ওয়ালাশিয়ার রাজা পূর্বেই তুর্কী সুলতানের অধীনতাকে মেনে নিয়েছিলেন। হাঙ্গেরীর সহযোগিতা ব্যতীত তার পক্ষে তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'ভারনা' এবং 'কসোভো'র যুদ্ধে মুরাদের হাতে হাঙ্গেরীর রাজা এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, তখনও তারা দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

চতুর্থত, হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও পরিস্থিতিও ছিল দুর্যোগপূর্ণ। অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা পঞ্চম লাডিলাসের প্রতিনিধি হিসেবে হুনায়াদি রাজ্য শাসন করছিলেন। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে মাহমেতের সঙ্গে হাঙ্গেরীর তিন বছরের জন্য একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এদিকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজা পঞ্চম লাডিলাস হুনায়দির অভিভাবকত্ব অস্বীকার করে। ফলে হুনায়দির পক্ষে তিন বছর মেয়াদী এই চুক্তি ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না।

পঞ্চমত, আলবেনিয়ার সেকান্দার বেগের পক্ষেও বহির্বিশ্বের প্রতি মনোযোগ দেয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, ভেনেটিয়ানদের সঙ্গে তখন তার বিবাদ চলছিল। তাছাড়া সুলতান মুরাদ এবং মাহমেত আলবেনিয়ার বিদ্রোহী গোত্র-প্রধানদের উস্কানি দিচ্ছিলেন। তাদের সাহায্য করছিলেন সিকান্দার বেগের বিরুদ্ধে।

ষষ্ঠত, সম্রাটের ভাইয়েরা তখন মোরিয়া শাসন করছিলেন। আসলে তাঁরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। মাহমেত তুরহানের নেতৃত্বে ছোট্ট একটি বাহিনী করিন্থ পাঠিয়ে দেন। মোরিয়ার শাসকদের উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এদিকে জর্জিয়ার রাজা এবং ত্রিবেজোনদের সম্রাটও অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তারা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের রাজ্যের সীমান্তের প্রতিরক্ষা নিয়ে। ফলে তাদের নিকট থেকে কনস্টানটিনোপলের সম্রাটের সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল অতি ক্ষীণ।

সপ্তমত, আনাতোলিয়ার বিদ্রোহী আমীরগণও এতদিনে সুলতান মাহমেতের শক্তির পরিচয় পায়। সহসা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুঃসাহস তারা হারিয়ে ফেলে।

খ্রিস্টান জগতের এমনি একটি দুর্বিষহ পরিস্থিতি মাহমেতের মনোবল ও সাহসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন যে, গোটা পরিস্থিতি চলে গেছে কনস্টানটিনোপলের প্রতিকূলে। কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং বিহ্বলতা ছাড়াই অভিযান চালাতে পারেন কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে।

সম্রাট অষ্টম জনের ভাইয়ের নাম ছিল একাদশ কনস্টেনটাইন। ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দের

অক্টোবর মাসে জনের মৃত্যুর পর কনস্টেনটাইনকে বসান হল কনস্টাটিনোপলের সিংহাসনে। সিংহাসনে আরোহণের পর পরই তিনি তুর্কী সুলতানদের গতিবিধি দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে হেমন্তে তিনি ইটালীতে দূত প্রেরণ করেন। এবং মুসলমাদের মুকাবিলায় খ্রিস্টান জগতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পোপ পঞ্চম নিকোলাসের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কনস্টানটাইনের আবেদনে তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বলতে গেলে পাশ্চাত্য জগতের সকল খ্রিস্টান রাজা বা শাসকগণ নীরব থাকলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল ভেনিস এবং জেনোয়ার ক্ষেত্রে। কনস্টানটিনোপলের এই সহানুভূতিসুলভ আচরণের পশ্চাতে স্বার্থ ছিল। দুটো দেশই সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। কনস্টানটিনোপল এবং কৃষ্ণসাগরের সমুদ্র বন্দরগুলো ছিল তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যক্ষেত্রে ভেনিস এবং জেনোয়া থেকে কনস্টেনটাইন খুব বেশী একটা সাহায্য পেলেন না। এখানেও নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। দুটো দেশই পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখত। তারা পোপের শাসনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছিল। সে কারণেই তারা পোপের শাসনের প্রতি আস্থা রাখতে পারছিল না। ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে ভারনায় অনুষ্ঠিত ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় মহামান্য রোমান পোপ ভেনেটিয়ার কতগুলো জাহাজ ভাড়া করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে পোপ সে ভাড়া পরিশোধ করেননি। ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে আবার যখন তিনি জাহাজের জন্য আবেদন করেন, তখন ভেনেটীয়রা বিগড়ে যায়। তাদের মধ্যে জেগে উঠে ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তি। এবং নতুন করে জাহাজ ভাড়া নেয়ার পূর্বে অপরিশোধিত ভাড়াগুলো পরিশোধ করে দেয়ার জন্য তারা অনুরোধ জানায়।

এদিকে জেনোয়ার অবস্থাও ভিন্নতর কিছু ছিল না। গোল্ডেন হর্নের অপর প্রান্তেই ছিল পেরা বা গেলাটা নামের একটি শহর। আসলে এটি ছিল জেনোয়ার একটি উপনিবেশ। জেনোয়ার রাজা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মাহমেতের বিরুদ্ধে সক্রিয় কোন ভূমিকা নিতে গেলেই বিপদে পড়বে। তুর্কীরা অনায়াসে দখল করে নেবে পেরা নামের উপনিবেশটি। তা ছাড়া তুরস্কের বন্দরগুলো দিয়েই তাদের সমুদ্রপথের ব্যবসা চলত। এতসব কারণেই ভেনিস অথবা জেনোয়ার রাজ্য সহজে তুর্কী সুলতানের কোপানলে পড়তে সম্মত হল না। প্রকারান্তরে এভাবেই কনস্টানটিনোপল রক্ষা দুষ্কর হয়ে পড়ল। ব্যর্থ হল ইটালীর সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়ার প্রয়াস।

অবশ্য কনস্টানটিনোপলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং দৃঢ়। ইতিপূর্বে যতবারই তারা শত্রুসেনাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে প্রতিবারেই তারা শত্রুর মুকাবিলায় অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এবারেও যদি অনুরূপ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, মাহমেতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাহলে

হয়ত পরিস্থিতি অন্যরকম হত। মহামান্য পোপ এবং ভেনেটিয়ানদের তরফ থেকে প্রচুর সাহায্য পেত।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, এককালের বিশাল রোমান সাম্রাজ্য খণ্ড - বিখণ্ড হতে হতে খুবই ছোট হয়ে পড়েছিল। বলতে গেলে শহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল রাজ্যের সীমানা। দিনে দিনে কনস্টানটিনোপলের শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কনস্টানটিনোপলের কারণে তুর্কী সুলতানের ভীত-চকিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবু তুর্কী সুলতানগণ গোড়া থেকেই কনস্টানটিনোপল দখল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। আসলে তুরস্কের অধিকৃত অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ ইউরোপের উপর নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। কারণ-

ক. লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, কনস্টানটিনোপল হল তুর্কী সালতানাতের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। আনাতোলিয়ার তুর্কী আমীর এবং তুর্কী সিংহাসনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের তারা আশ্রয় দিত। সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করত। প্রয়োজনের সময় আবার সাধ্যমত সাহায্য দিত।

খ. কনস্টানটিনোপলকে বলা হত দ্বিতীয় রোম। এখান থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সেকারণেই কনস্টানটিনোপলের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের অন্তরে একটি স্বভাবজাত দুর্বলতা ছিল। যে কোন সময়ে এই দুর্বলতা থেকে বড় রকমের ক্রুসেডের উদ্ভব হতে পারত।

গ. তুর্কী সুলতানগণ গোড়া থেকেই উপলব্ধি করছিলেন যে, কনস্টানটিনোপল দখল করা ব্যতীত থেরেস এবং পশ্চিমাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সে কারণেই বারবার তারা কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। বস্তুতপক্ষে তাইমুরের আবির্ভাব না ঘটলে হয়ত আরও ৫০ বছর পূর্বেই কনস্টানটিনোপল চলে আসত মুসলমানদের দখলে। অবশেষে সুলতান মাহমেত অসমাপ্ত বিজয়কে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সুলতান মাহমেতের মধ্যে যৌবনের তেজ থাকলেও কোন রকম উগ্রতা বা চপলতা ছিল না। তিনি পূর্বপুরুষগণের কনস্টানটিনোপল অবরোধের ব্যর্থতার কারণগুলো খুটিয়ে দেখেন। যত্নের সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন কনস্টানটিনোপল অভিযানের সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলোকে। তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, প্রধানত দু'টি বিষয়ের উপর কনস্টানটিনোপল অভিযানের সফলতা নির্ভর করছে। প্রথমত, অভিযান চলাকালীন সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের শাসক এবং আনাতোলিয়ার আমীরগণের আক্রমণ সম্ভাবনা থেকে তুর্কী সালতানাতকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, অবরোধকে এত দ্রুত সফলতার দিকে নিয়ে যেতে হবে

যাতে ইটালী অথবা খ্রিস্টান জগত থেকে কোন রকম সাহায্য কনস্টানটিনোপলে এসে পৌঁছাতে না পারে।

পিতা মুরাদ এবং নিজের শাসন ব্যবস্থার বদৌলতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের শাসকবৃন্দ এবং আনাতোলিয়ার প্রধানগণ তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এসেছিল। তাদের পক্ষে সহসা সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা সম্ভব ছিল না। আসলে সমস্যা ছিল দ্বিতীয় শর্ত নিয়ে। সে আমলে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বড় ধরনের কোন সামরিক অভিযান চালাতে গেলে প্রচুর সময় লেগে যেত। এক্ষেত্রেও সুলতান মাহমেতকে বড় একটা বেগ পেতে হল না। তার শারীরিক এবং মানসিক জোর ছিল খুবই প্রবল। তিনি ছিলেন সে আমলের সবচেয়ে সুসংগঠিত একটি রাষ্ট্রের সুলতান। রাজ্যের সমস্ত শাসনক্ষমতা ছিল তার হাতের মুঠোয়। ফলে অন্যান্যের চেয়ে অধিকতর দ্রুতগতিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল।

সমরকুশলী মাহমেতের বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং প্রখর। কনস্টানটিনোপল অবরোধের পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য তিনি দু'টি কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রথমত, ভেনিস এবং জেনোয়ার নৌবহরের উস্কানিমূলক কাজগুলোকে তিনি সযত্নে পরিহার করে গেলেন। সুলতান জানতেন যে, তাদের নৌবহর বেশ শক্তিশালী। ইচ্ছা করলে তারা অত্যন্ত দ্রুত কনস্টানটিনোপলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। অপরদিকে তুর্কীদের সঙ্গে তাদের লাভজনক ব্যবসাকেও জেনোয়া এবং ভেনিসের রাজন্যবর্গ খাটো করে দেখতে পারছিলেন না। এভাবেই তিনি কনস্টানটিনোপলের সঙ্গে তাঁর বিরোধের ক্ষেত্রে দুটি দেশকেই নিরপেক্ষ রাখার কৌশল গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন যাবত তিনি কনস্টানটিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনার কথা গোপন রাখলেন। এদিকে রুমেলি হিসারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল। এজিয়ান এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলভাগের বন্দরগুলোতে জাহাজ নির্মাণের কাজ চলতে থাকল পুরোদমে। মারিটসা নদী এবং আদ্রিয়ানোপলের নিকটেই ছিল একটি দ্বীপ। শত্রুপক্ষের চোখে ধূলো দেয়ার কৌশল হিসেবে তিনি দ্বীপটি ভালভাবেই জরিপ করলেন। এখানে নতুন করে একটি প্রাসাদ নির্মাণের হুকুম দিলেন। একজন গ্রীক স্থপতির সহায়তায় অতি যত্নের সঙ্গে গোটা পরিকল্পনাটি তৈরী করলেন। সুলতানের গতিবিধি দেখে সকলেই নিশ্চিত হল যে, সুলতান মাহমেত আদৌ কোন যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে থাকলে তা অবশ্যই পশ্চিমের দিকে পরিচালিত হবে। অন্তত এ মুহূর্তে মুসলমানদের দ্বারা কনস্টানটিনোপল আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

ইতিপূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের আহবান জানিয়েও যুদ্ধপ্রস্তুতি নিতে পোপের দীর্ঘ ৪ বছর সময় লেগেছিল। সুলতান নিশ্চিত ছিলেন যে, কনস্টানটিনোপলের সাহায্যার্থে পোপ উদ্যোগ নিলেও সহসা তার পক্ষে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি এবং ব্যাপক

আয়োজন। সুযোগ বুঝে সুলতান ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কনস্টানটিনোপল অবরোধের কথা ঘোষণা করেন এবং মাত্র একশ' দিনেরও কম সময়ের মধ্যে বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি কনস্টানটিনোপল অবরোধ করেন। শক্তিশালী একটি নৌবহরও ছিল তাদের সঙ্গে।

তিনদিকে জলপথ এবং একদিকে স্থলপথ দ্বারা বেষ্টিত কনস্টানটিনোপলের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির উত্তরে ছিল গোল্ডেন হর্ন, পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে বসফরাস প্রণালী এবং মর্মর সাগর। ফলে শক্তিশালী নৌশক্তি কনস্টানটিনোপল অবরোধ করলে তা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। কারণ, সমুদ্রপথে তারা নিয়মিত রসদ-সামগ্রী এবং সৈন্য সংগ্রহ করতে পারত। দ্বিতীয়ত, কেবল পশ্চিম দিকে স্থলপথে আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের সহজে কাবু করা যেত না। সেক্ষেত্রে সম্রাটও তার গোটা বাহিনীকে পশ্চিম সীমান্তে নিয়োগ করত। প্রতিহত করতে পারত শত্রুপক্ষের দুর্বার আক্রমণকে।

সুলতান মাহমেত কনস্টানটিনোপল অবরোধের এই কৌশলগত দিকটি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সংগোপনে এবং সুচিন্তিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলেন। ১৪৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দের শীত মৌসুম অতিবাহিত করলেন জাহাজ নির্মাণের কাজে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের শেষের দিকে নির্মাণকাজ শেষ হল। সবগুলো জাহাজ এসে নোঙ্গর করল মর্মর সাগরে। তুর্কীদের এই বিশাল নৌবহরে ছিল ৬টি তিন সারি দাঁড়বিশিষ্ট জাহাজ, ১০টি দুই সারি দাঁড়বিশিষ্ট জাহাজ, পাল তুলে এবং দাঁড় দিয়ে চালানোর উপযোগী ১৫টি জাহাজ, ৭৫টি সাধারণ জাহাজ এবং ২০টি পরিবহনযোগ্য জাহাজ। তাছাড়া অনেকগুলো এক মাস্তুলবিশিষ্ট জাহাজ ছিল এই বহরে। প্রধানত সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে এই জাহাজগুলো ব্যবহৃত হত। মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টানরা মুসলমানদের এই বিশাল নৌবহর এবং বিপুল নৌশক্তি সম্পর্কে কোন রকম আন্দাজও করতে পারেনি। জন্মগতভাবে বুলগেরিয়ার অধিবাসী সোলায়মান বলতাঘলু ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। তিনি ছিলেন গেলিপেলির গভর্নর। সুলতান মাহমেত তাকে নিয়োগ করলেন এই বিশাল নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে।

বিগত এক শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন সময়ে কনস্টানটিনোপল অবরোধ করেছে। কিন্তু কনস্টানটিনোপলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং শক্তিশালী। বিশেষ করে তাদের স্থলপথের দুর্গগুলো ছিল বলতে গেলে দুর্ভেদ্য। খুব কম সংখ্যক অবরোধকারীই খ্রিস্টানদের দুর্গগুলো বিধ্বস্ত করতে পেরেছিল। বিচক্ষণ সুলতান খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় বিশাল নৌবহর গঠন করলেও স্থল বাহিনী হল তুর্কীদের মূল শক্তি। কনস্টানটিনোপল দখল করতে হলে স্থল বাহিনীকে অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন

অবরোধমূলক যুদ্ধে তুর্কীরা এতদিন যে যুদ্ধ-ইঞ্জিন ব্যবহার করেছে, এগুলো দিয়ে কনস্টানটিনোপলের প্রতিরক্ষা দেয়াল ঘায়েল করা সম্ভব নয়।

তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সুলতান মাহমেতের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, কেবল শক্তিশালী এবং উন্নতমানের কামান দিয়েই দুর্ভেদ্য এই প্রতিরক্ষা দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা যেতে পারে। কামান ছোঁড়ার ব্যাপারেও সুলতান মাহমেত ছিলেন খুবই দক্ষ এবং সিদ্ধহস্ত। খ্রিস্টানদের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার জন্য যে কি ধরনের এবং কত শক্তিশালী কামান প্রয়োজন-তিনি তা জানতেন। জাহাজ নির্মাণের পাশাপাশি তিনি কামান তৈরির একটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

সময়টা ছিল ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। আরবান নামের একজন হাঙ্গেরীয় বন্দুক নির্মাতাকে সুলতানের দরবারে হাযির করা হল। আরবান দাবী করল যে, কামান তৈরীর ব্যাপারে তার রয়েছে দীর্ঘদিনের পারদর্শিতা। মহামান্য সুলতানের জন্য সে এমন একটি কামান তৈরী করবে, যা নাকি ব্যাবিলনের দেয়ালকে অনায়াসে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে। আরবানের মেধা এবং নৈপুণ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে মাহমেত তার সঙ্গে কথা বললেন। কামান নির্মাণের কলা-কৌশল সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করলেন। আরবানের যোগ্যতার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে তাকে নিয়োগ করলেন কামান নির্মাণের কাজে। লোকবল এবং রসদ-সামগ্রী সরবরাহ করলেন তার চাহিদা অনুসারে। কামান তৈরী বাবদ আরবান যে পারিশ্রমিক দাবী করল, মাহমেত তার চার গুণ পারিশ্রমিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মাস তিনেকের মধ্যে আরবান বিরাট একটি কামান তৈরি করে ফেলল। কামানটি স্থাপন করা হল রুমেলি হিসারের দুর্গের উপর। এই কামান দিয়েই ভেনিসের যুদ্ধ জাহাজকে সাগরের বুকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। সে আমলের কামানগুলোর মধ্যে তুর্কীদের এই কামানটি ছিল খুবই বড় এবং শক্তিশালী। বিজ্ঞ সুলতান এত বড় কামান নির্মাণ করেও তৃপ্ত হতে পারলেন না। তিনি আরবানকে এর চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন আরেকটি কামান নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। আরবানও যেন তৈরী ছিল। সে সুলতানের নির্দেশ অনুসারে আরেকটি কামান তৈরী করল। বৃহদাকারের এই কামানটি লম্বায় ছিল ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি। আট ইঞ্চি পুরু নলের প্রান্তভাগের পরিধি ছিল ৬ ফুট। সুলতান মাহমেতের উপস্থিতিতে কামানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হল। সাধারণ গোলকের চেয়ে ১২ শত গুণ ওজনের একটি গোলক নিক্ষেপ করা হল। বাতাসের উপর ভর করে গোলকটি ছুটে গেল মাইল খানেক পথ। গোলকের গতি এত তীব্র ছিল যে গোলকটি ৬ ফুট মাটির নিচে ঢুকে গেল।

কামানটি অবরোধ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। নিরাপদে কামানটি পরিবহনের জন্য

প্রয়োজন ছিল সমতল রাস্তা এবং মজবুত পুল। সুলতান ২০০ শক্ত-সামর্থ্য লোককে নিয়োগ করলেন রাস্তা-ঘাট সংস্কারের কাজে। মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ হল। এবার শুরু হল ঐতিহাসিক যাত্রা। ৬০ টি শক্তিশালী ষাঁড় বৃহদাকারের কামানটি কনস্টানটিনোপলের দিকে টেনে চলল। কামানের দুই পাশে ছিল ২০০ লোক। কামান এবং কামান পরিবহনকারী গাড়ীটি যথাযথভাবে ধরে রাখাই ছিল তাদের কাজ। ইতিমধ্যে সরকারী কারখানায় আরও কতগুলো কামান তৈরী করা হল। তুলনামূলকভাবে এই কামানগুলো ছিল অনেক ছোট। এগুলোকেও সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করা হল।

দিন কয়েকের মধ্যে প্রয়োজনীয় রসদ-সম্ভার নিয়ে তুর্কী বাহিনী কনস্টানটিনোপলের দ্বারপ্রান্তে এসে হাযির হল। সবার শেষে এলেন সুলতান মাহমেত। সে দিনটি ছিল ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল। এভাবেই ৬ এপ্রিল তুর্কী বাহিনী পূর্ব নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিল। শুরু হল তুর্কী মুসলমানদের দীর্ঘকালের প্রত্যাশিত কনস্টানটিনোপল অবরোধ প্রক্রিয়া।

ভূ-আকৃতির দিক থেকে বিচার করতে গেলে তিন কোণবিশিষ্ট একটি উপদ্বীপ জুড়ে গড়ে উঠেছিল কনস্টানটিনোপল। উত্তরে গোল্ডেন হর্নের সন্নিকটস্থ বেলাচারনে থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে মর্মর সাগরের তীরবর্তী স্টুডিয়ন জুড়ে ছিল এর স্থলভাগ। লম্বায় এই অঞ্চলটি প্রায় ৪ মাইল। বসফরাসের উত্তর উপকূল ঘেঁষে কনস্টানটিনোপলের এক প্রান্তে ছিল স্টুডিয়ন এবং অপর প্রান্তে আরকোলিস। এই স্থানটির আধুনিক নামকরণ হয়েছে 'সেরাগলিও পয়েন্ট' হিসেবে। এই স্থানটুকুর বিস্তৃতি মোটামুটি সাড়ে পাঁচ মাইল। অপরদিকে গোল্ডেন হর্নের উপকূল বরাবর এই শহরটি প্রায় সাড়ে তিন মাইল লম্বা। কনস্টানটিনোপলের চতুর্দিকে ছিল প্রতিরক্ষা প্রাচীর। অবশ্য জল সীমানা বরাবর প্রাচীরের সংখ্যা ছিল একটি। শহরের উত্তর দিকের প্রাচীরটি মর্মর সাগরের তীর ঘেঁষে নির্মাণ করা হয়েছিল। পাশেই ছিল বিস্তীর্ণ মগ্নচড়া এবং শৈলশ্রেণী। ফলে শত্রুপক্ষের নৌবহরগুলো সহজে প্রাচীরের নিকট আসতে পারত না।

প্রকারান্তরে এগুলো শহরের প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে বিরাজ করছিল। অপরদিকে গোল্ডেন হর্ন এলাকায়ও বেশ খানিকটা অগভীর এলাকা ছিল। ভাটার সময় এই অঞ্চলটি শুকিয়ে যেত। খ্রিস্টানরা পূর্ব থেকেই এখানে কতগুলো জেটি স্থাপন করেছিল। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় ফরাসী এবং ভেনিসের সৈন্যরা এই পথ দিয়েই শহরের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু যার-তার পক্ষে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। জল সীমানা এবং পোতাশ্রয়ের উপর যাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, একমাত্র তাদের পক্ষে এ ধরনের একটি ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব।

বেলাচারনেকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সম্রাটের রাজপ্রাসাদ। ফলে গোল্ডেন

হর্ন বরাবর যে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল, তা দিয়ে বেলাচারনে ঘেরা ছিল। ঐতিহাসিক থিওডোসিয়ান প্রাচীরটি রাজপ্রাসাদের প্রান্তদেশ থেকে শুরু করে স্থলভাগের মধ্য দিয়ে মর্মর সাগর পর্যন্ত চলে গেছে। বেলাচারনের নিকটস্থ প্রাচীর এবং থিওডোসিয়ান দেয়ালের সংযোগস্থলে একটি ছোট গুপ্তদ্বার রয়েছে। এই দ্বারটিকে বলা হয় কেরকাপোরটা। ইতিপূর্বে এই দ্বারটি রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টান সেনাদের হঠাৎ বহির্গমন এবং অবরোধকারী মুসলমান বাহিনীর মুকাবিলা করার সুবিধার্থে ঐ দ্বারটি খুলে দেয়া হয়।

বিরোধী শক্তি যুগ যুগ ধরে স্থলপথ দিয়েই কনস্টানটিনোপলের উপর অভিযান চালিয়েছে। সে কারণে খ্রিস্টানরা স্থলভাগের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ছিল খুবই সচেতন। তিনটি দেয়ালের সমন্বয়ে গড়ে তুলেছিল থিওডোসিয়ানের প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে ছিল ৬০ ফুট চওড়া একটি গভীর পরিখা। পরিখার অভ্যন্তরভাগে রয়েছে প্রায় ৫০ ফুট লম্বা ও বুক সমান উঁচু একটি রাস্তা। রাস্তাটি বেলাচারনে থেকে শুরু করে স্টুডিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। রাস্তার পাশেই রয়েছে প্রায় ২৫ ফুট উঁচু আরেকটি দেয়াল। সাধারণভাবে এই দেয়ালটিকে বহির্দেয়াল বলা হত। দেয়ালের মাঝে মাঝে নির্মাণ করা হয়েছিল অনেকগুলো টাওয়ার বা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। এগুলোর উচ্চতা ছিল প্রায় ২৫ ফুট। একটি টাওয়ার থেকে আরেকটি টাওয়ারের দূরত্ব মোটামুটি ৫০ থেকে ১০০ গজ। বহির্দেয়ালের ৪০ থেকে ৬০ ফুটের মধ্যে রয়েছে আরেকটি দেয়াল। এই দেয়ালের টাওয়ারগুলোর উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। বহির্দেয়ালের দু'টি টাওয়ারের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানের নিরাপত্তার জন্যই এই টাওয়ারগুলো উঁচুতে নির্মাণ করা হয়েছিল।

কনস্টানটিনোপলের ভূ-প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে, মর্মর সাগর থেকে উৎপন্ন হয়ে স্থলভাগটি টিলার ন্যায় ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। চতুর্থ মিলিটারী গেটের কাছাকাছি এসে এটা ক্রমশ ঢালের দিকে ১০০ ফুট নিচে নেমে গেছে। মিশে গেছে লাইকাস নদীর উপত্যকার সঙ্গে। নদীটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রতিরক্ষা দেয়ালের নিচ দিয়ে প্রবাহিত। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় এটা যেন একটা পয়ঃপ্রণালী। প্রতিরক্ষা দেয়ালের যে স্থান দিয়ে নদীটি প্রবাহিত, সেখান থেকে উত্তরে পঞ্চম সামরিক গেটের দূরত্ব মাত্র ২০০ গজ। সাধারণের কাছে এই গেটটি সেন্ট রোমেনাসের সামরিক গেট হিসেবে সমধিক পরিচিত। এখান থেকে স্থলভাগের উচ্চতা পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত আবার বাড়তে থাকে। চারিসিয়ান গেটটি এখানেই অবস্থিত। আধুনিক কালে এটিকে বলা হয় আরিদ্রিয়ানোপলের গেট। প্রতিরক্ষা প্রাচীরের যে অংশটুকু লাইকাস নদীর উপত্যকায় অবস্থিত, সে অংশটুকুর ঐতিহাসিক নাম মেছোটেচিয়ন। সমগ্র প্রতিরক্ষা প্রাচীরের এই অংশটুকু ছিল সম্ভাব্য আক্রমণ স্থান।

নৌ-সেনাদের বাদ দিয়ে খ্রিস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র নয় হাজার। তন্মধ্যে ছয় হাজার ছিল গ্রীক। বাকিরা সবাই বিদেশী। এরা এসেছিল ভেনিস, জেনোয়া, ক্যান্টালান এবং ক্রেটা থেকে। ১৪ মাইল লম্বা প্রাচীর রক্ষার জন্য এই সৈন্য সংখ্যা ছিল একান্তই অপর্যাপ্ত। কিন্তু জল সীমানা নিয়ে তাদের বড় একটা চিন্তা ছিল না। প্রধানত, স্থলভাগের ৪ মাইল লম্বা প্রাচীর রক্ষার প্রতি তারা বেশী জোর দেয়। এদিক থেকে বিচার করলে তাদের অবস্থা খুব বেশী হতাশাব্যঞ্জক বলা যায় না।

খ্রিস্টান সেনারা ছিল সুসজ্জিত এবং তাদের গায়ে ছিল উন্নতমানের বর্ম। তীর-ধনুক এবং বর্শা ছিল খ্রিস্টান বাহিনীর প্রধান অস্ত্র। তাছাড়া তাদের সঙ্গে ছিল দূরপাল্লার কতগুলো বন্দুক এবং কামান। কিন্তু এ কামানগুলো তাদের বড় একটা কাজে আসেনি। শহরের চারপাশে উঁচু দেয়াল থাকার কারণে ভূমিতে রেখে কামান থেকে গুলি ছোঁড়া যেত না। মুসলিম বাহিনীর উপর আঘাত হানতে হলে কামানগুলোকে প্রতিরক্ষা দেয়াল অথবা টাওয়ারের উপর স্থাপনপূর্বক গুলি ছুঁড়তে হত। কিন্তু তাতে করে প্রতিরক্ষা দেয়াল বা টাওয়ারের ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশংকা দেখা দেয়।

১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল। খ্রিস্টান সেনারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হল। কনস্টানটিনোপলকে রক্ষার জন্য যথাযথভাবে অবস্থান নিল। যুদ্ধ পোশাকে সম্রাট রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি অবস্থান নিলেন মেছোটিয়নে। সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত একটি গ্রীক সৈন্যদলকে সঙ্গে রাখলেন তিনি। প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি গিয়াসটিনিয়ানিও ছিল তার সঙ্গে। স্থলভাগের প্রহরার জন্য বেশির ভাগ সৈন্য মোতায়েন করা হল। সামান্য সংখ্যক সৈন্যকে নিয়োগ করা হল উপকূলভাগের প্রাচীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে। সেনাপতি নিসেফোরাস পেলাওলোগাস এবং লুকাস নোটারাস-এর নেতৃত্বে দু'টি সৈন্য দলকে রেখে দেয়া হল রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে।

তুর্কী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। তন্মধ্যে ৬০ হাজার ছিল নিয়মিত সৈন্য। সম্ভবত, এর মধ্যে ১০ হাজার ছিল জানিসারিস সৈন্য। অবশিষ্ট ২০ হাজার ছিল বাসিবাজৌকের অনিয়মিত সৈন্য। বলতাঘলুর নেতৃত্বাধীন মুসলিম নৌবহর বসফরাসের প্রবেশপথে নোঙ্গর ফেলল। বর্তমানে এই স্থানটিকে বলা হয় 'ডলামা বাকে'। সমুদ্রপথে এবং জেনোমী এর কলোনী পেরা থেকে কনস্টাটিনোপলে সাহায্য আসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এতদঞ্চলের উপর দৃষ্টি রাখার সুবিধার্থে জাগানোস পাশা গোল্ডেন হর্নের উত্তর দিকের উঁচু অঞ্চলকে দখল করে নিলেন। রোমেনাসের মিলিটারী গেট থেকে মাত্র ৪৫০ গজ দূরে সুলতান মাহমেত তার লোহিত এবং সোনালী রঙের তাঁবু স্থাপন করলেন। তাঁর সামনেই ছিল জানিসারিসের সৈন্যরা। আনাতোলিয়ার গভর্নর ইসহাক পাশা ডান দিকে এবং রুমেলির গভর্নর কারাদজা

পাশা বাম দিকে অবস্থান নিল। বাসিবাজৌকের অনিয়মিত সৈন্যরা দাঁড়াল নিয়মিত বাহিনীর ঠিক পেছনে। আরবানের তৈরী দৈত্যের মত বৃহদাকারের কামানটি স্থাপন করা হল সেন্ট রোমানাস গেটের কাছে। গোল্ডেন হর্নের জলাময় স্থান দিয়ে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হল। স্থল বাহিনীর সঙ্গে জাগানোসের দ্রুত যোগাযোগের জন্য এই পথটি নির্মাণ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

দিনটি ছিল এপ্রিল মাসের ৬ তারিখ। সুলতান মাহমেত সকাল বেলা সম্রাটের নিকট দূত পাঠালেন। আহব্বান করলেন আত্মসমর্পণের জন্য। বলে দিলেন যে, আত্মসমর্পণ করলে তাদের জানমাল ও বিষয়-সম্পদের হেফাযত করা হবে । এমনকি গির্জাগুলোও অক্ষত অবস্থায় থাকবে। সম্রাট কনস্টানটাইন অবজ্ঞাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মুসলিম বাহিনী তৎপর হয়ে উঠল। শুরু হল কামানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ। মুসলমানদের আক্রমণ সফল হল। সন্ধ্যা নাগাদ চারিসিয়ান গেটের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হল। কনস্টানটিনোপল দখলের জন্য সুলতান কামানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেই কল্পনাকে কার্যকর হতে দেখে সুলতান খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। চারিসিয়ান গেটের অংশবিশেষ ভেঙ্গে গেলেও সুলতান তাঁর বাহিনীকে অগ্রসর হতে বারণ করলেন। তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে, এই ছিদ্রপথে খুব সামান্য সংখ্যক সৈন্য চলাচল করতে পারবে। তাদের পক্ষে সংঘবদ্ধ খ্রিস্টান সেনাদের মুকাবিলা করা অসম্ভব ।

সুলতান মাহমেত যুদ্ধ পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন। মেসোটিচিয়ান এলাকায় আরও কামান মোতায়েন করার হুকুম দিলেন। নির্দেশ জারি করলেন যে, সুবিধা বুঝে প্রতিরক্ষা প্রাচীরের উপর আরও গোলাবর্ষণ করতে হবে। জলপথে খ্রিস্টান সেনাদের আরেকটি যুদ্ধ কৌশল ছিল খুবই অদ্ভুত ধরনের। তারা জলপথে লৌহশিকল, কখনো আবার লৌহদণ্ড স্থাপন করত। এগুলো নৌবহরের যাতায়াতের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। গোল্ডেন হর্নের প্রবেশপথেও তারা এ ধরনের শিকল স্থাপন করেছিল। তুর্কী নৌবহরকে প্রতিরোধ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। লৌহশিকলের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব পড়ল বলতাঘলুর উপর।

ইতিমধ্যে সুলতান ছোট-খাট দু'টি অভিযান চালান। বসফরাসের নিকটে 'স্টুডিয়াস' নামে গ্রীকদের ছোট একটি দুর্গ ছিল। ঘন্টা কয়েকের মধ্যে তিনি দুর্গটিকে নির্মূল করে দেন। অপরদিকে মর্মর সাগরের উপকূলবর্তী থেরাপিয়া নামের দুর্গটিরও অশেষ ক্ষতি সাধন করলেন। মর্মর সাগরের কতকগুলো দ্বীপের মালিক ছিল খ্রিস্টান যুবরাজেরা। সুলতানের নির্দেশক্রমে বড় রকমের কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই বলতাঘলু দ্বীপগুলো দখল করে নেয়। আসলে খ্রিস্টান সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়াই ছিল এই অভিযানগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে বলতাঘলু লৌহশিকলগুলোর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা

গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রয়াস বিফলে গেল। খ্রিস্টান বাহিনীর নৌ-চালনা বিদ্যার কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁর আয়োজন। তবে তার ব্যর্থতার পশ্চাতে কৌশলগত কারণগুলোই ছিল প্রধান। শত্রুপক্ষের জাহাজগুলো একটি উঁচু স্থানে অবস্থান করছিল। অতি চমৎকারভাবে তারা মুসলমানদের উপর মিসাইল নিক্ষেপ করত। কিন্তু নিম্নভাগ থেকে তুর্কী সেনাদের পক্ষে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর তাক করা, গোলা নিক্ষেপ করা ছিল খুবই দুষ্কর। তুর্কীদের কামানগুলো ছিল ছোট আকারের। এগুলো দিয়ে খুব বেশি একটা উঁচুতে গোলা নিক্ষেপ করা যেত না। ফলে শত্রুসেনাদের জাহাজগুলো ঘায়েল করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। বলতাঘলুর নৌ-অভিযান পরিচালনার সময় সুলতান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুলতান মাহমেত পাল্টা ব্যবস্থা নিলেন। কর্মকারকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপযোগ্য আরও শক্তিশালী কামান তৈরীর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সুলতান ফিরে আসেন মেসোটিচিয়নে নিজের সদর দফতরে।

এপ্রিল মাসের বর্ষার শুরুতে রণাঙ্গন পিচ্ছিল এবং কর্দমাক্ত হয়ে গেল। বন্দুক রাখার স্থানগুলো ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ল। বৃহদাকারের কামানগুলো বারবার পিছলে যাচ্ছিল এবং দিনে গড়ে ৭টির বেশী গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব হল না। এতে করে আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পেলেও মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদের উপর চাপ অব্যাহত রাখল। উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষা দেয়ালের বেশ খানিকটা অংশ ভেঙ্গে গেল। সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে খ্রিস্টান সেনারা ভাঙ্গা স্থানগুলোতে মোটা মোটা মজবুত কতগুলো খুঁটি পুঁতে দিল। প্রাচীরের যে অংশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, অতি দ্রুত সে স্থানগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা নিল।

১৮ এপ্রিল মুসলিম সেনারা একটি নতুন উদ্যোগ নিল। তারা খুঁটি দিয়ে ঘেরা স্থানে বরাবর অভিযান চালায়। কিন্তু এই অভিযানে তুর্কীরা খুব বেশী সুবিধা করতে পারল না। তারা এত সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল যে, অস্ত্রগুলো পর্যন্ত যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। তারা অগ্রসর হচ্ছিল সংঘবদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু কারো কাছেই তেমন কোন যুদ্ধ পোশাক ছিল না। ফলে খ্রিস্টান সেনাদের জেভেলিন এবং তীর-ধনুকের আক্রমণে তাদের অশেষ ক্ষতি সাধিত হল। সে তুলনায় খ্রিস্টান বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। এমনিভাবে খ্রিস্টান সেনাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ৪ ঘন্টা যুদ্ধ চালানোর পর সুলতান মাহমেত সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নিলেন।

২০ এপ্রিল সমুদ্রবক্ষে জেনোয়াদের তিনটি যুদ্ধজাহাজ এবং গ্রীকদের একটি পরিবহন জাহাজ দৃষ্টিগোচর হল। যুদ্ধ জাহাজগুলো প্রচুর যুদ্ধ সামগ্রী এবং পরিবহন জাহাজে খাদ্যসম্ভারসহ কনস্টানটিনোপলের দিকে এগিয়ে আসছিল। মহামান্য পোপের তত্ত্বাবধানে জাহাজগুলো ভাড়া করা হয়েছিল। সুলতান মাহমেত এডমিরাল

বলতাঘলুকে নির্দেশ দিলেন যে, যে করেই হোক জাহাজগুলো দখল কর। অন্যথায় ডুবিয়ে দাও সাগরবক্ষে। কিন্তু তুর্কীদের হাতে আড়াআড়িভাবে ঊর্ধ্বে গোলা নিক্ষেপণযোগ্য শক্তিশালী কোন কামান ছিল না। ১২ তারিখে এ ধরনের কামান নির্মাণ করার জন্য কর্মকারদের নির্দেশ দেয়া হলেও কামান নির্মাণের কাজ তখনও সম্পন্ন হয়নি। বলতাঘলু তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। তুর্কী নৌবহরের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে নষ্ট করে দিলেন শত্রুপক্ষের চারটি জাহাজ। কিন্তু বলতাঘলুর এই সাফল্যে সুলতান তৃপ্ত হতে পারলেন না। তিনি ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হলেন। বলতাঘলুকে বরখাস্ত করে তদস্থলে হামজা বে-কে নিয়োগ করলেন নৌবহরের প্রধান হিসেবে।

২১ এপ্রিল চমৎকার একটি সম্ভাবনা মুসলমানদের হাতের মুঠোয় এসে গেল। কামানের গোলা বর্ষণের ফলে লাইকাস উপত্যকার নিকটবর্তী একটি টাওয়ার ভেঙ্গে গেল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বহির্দেয়ালের একটি বিরাট অংশ। অবরোধকারী মুসলিম সেনাদের জন্য এটা ছিল একটা মস্তবড় সুযোগ। কিন্তু সর্বাধিনায়ক মাহমেত তখন ডোমলা বাচে অবস্থান করছিলেন। ফলে মুসলিম সেনারা এই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হল।

স্বভাবগতভাবেই সুলতান মাহমেত ছিলেন মস্তবড় একজন কর্মবীর। তাঁর মনের জোর ছিল অত্যন্ত দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। বলতাঘলুকে শাস্তি দিয়ে তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। বলতাঘলুর ব্যর্থতাকে পুষিয়ে নেয়ার জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি স্থির করলেন যে, গোল্ডেন হর্নে শত্রুসেনাদের অবাধ কর্তৃত্বকে রুদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া খ্রিস্টান সেনারা প্রধানত স্থলভাগের প্রাচীর রক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। উপকূলভাগের দেয়ালগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে অরক্ষিত অবস্থায় রয়ে গেছে। খ্রিস্টান বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিতে হলে উপকূলভাগের প্রতিরক্ষা দেয়ালকে আক্রমণ সীমানার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। সুলতান মাহমেত বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই উদ্দেশ্য দুটি অর্জন করতে হলে তুর্কী নৌবহরকে অবশ্যই গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু গোল্ডেন হর্নের প্রবেশপথে খ্রিস্টানদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল খুবই মজবুত। এখানে তারা যে লৌহ শিকল-স্থাপন করেছিল, বলতাঘলুর পক্ষে তা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। এতসব বিষয় বিবেচনা করেই সুলতান ভিন্ন পথে মুসলিম নৌবহরকে গোল্ডেন হর্নে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

গোল্ডেন হর্নের উত্তর উপকূলের একটি স্থানেরা নাম কাশিম পাশা। সুলতান মাহমেত সেখানে বেশ কতগুলো কামান মোতায়েন করলেন। পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে সৈন্যরা গাছ কাটল। করাত চালিয়ে প্রয়োজনমত কাঠ তৈরী করল। একটির পর একটি কাঠ সাজিয়ে ডোলমা বাচে থেকে কাশিম পাশা পর্যন্ত তৈরী করল একটি কাঠের রাস্তা। প্রচুর চর্বি দিয়ে রাস্তাটি পিচ্ছিল করে দিল। এই রাস্তাটিকে বলা যেতে পারে জাহাজের একাট দোলনা। তুর্কী সেনারা সুকৌশলে জাহাজগুলো সমুদ্রবক্ষ

থেকে তুলে এনে বসিয়ে দিল দোলনা সদৃশ কাঠের রাস্তার উপর। জেনোসীদের গোল্ডেন হর্নে অনুপ্রবেশের মাত্র ৩৬ ঘন্টা পরে বিপদ সংকেত বেজে উঠল। ড্রাম পিটিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে সজাগ করে দিল কনস্টানটিনোপল এবং পেরার জনসাধারণকে। তারা বিস্ময়ের সঙ্গে অদ্ভুত একটি শোভা-যাত্রা দেখতে পেল। তারা দেখল যে প্রায় ৭০টির মত তুর্কী জাহাজ দুই শত ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, পেরাকে পশ্চাতে ফেলে নেমে আসছে গোল্ডেন হর্নে। জাহাজগুলোর প্রহরায় রয়েছে কাশিম পাশার কামানগুলো।

সুলতান মাহমেতের পরিকল্পনা সফল হল। গোল্ডেন হর্নে তুর্কী জাহাজগুলোর উপস্থিতি খ্রিস্টানদের ভীষণ রকমের উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দেয়। তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, অচিরেই তুর্কীরা উপকূলভাগ দিয়ে কনস্টানটিনোপলের উপর আক্রমণ চালাবে। ২৮ এপ্রিলের গভীর রাতে খ্রিস্টান সেনারা জীবনকে বাজি রেখে তুর্কী নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাল। চেষ্টা করল নৌবহরকে নির্মূল করে দেয়ার। কিন্তু ঘটনাচক্রে একজন জেনোসী গুপ্তচর পূর্বাহ্নেই এই আক্রমণ সম্পর্কে তুর্কীদের সজাগ করে দিয়েছিল। সময়মত তুর্কী কামানগুলো গর্জন করে উঠে। ব্যর্থ করে দেয় খ্রিস্টানদের আক্রমণ। শত্রুপক্ষের শ'খানেক নৌসেনা নিহত হল। একটি রণতরী এবং ছোট ছোট আরও কতগুলো জাহাজ সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেল। তুর্কী সেনারা নৈপুণ্যের সঙ্গে কাশিম পাশার ঘাঁটি থেকে স্বল্প মাত্রার কতকগুলো কামানের গোলা নিক্ষেপ করল। গোলাগুলো পড়ল পেরা এবং গোল্ডেন হর্নের সীমান্তে। ফলে পেরার সঙ্গে কনস্টানটিনোপলের নিবিড় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর সুলতান ফিরে আসেন নিজের শিবিরে। ফিরতি পথে পেরার প্রতিরক্ষা দেয়ালের কাছে এসে যাত্রায় বিরতি দিলেন। দূত মারফত পেরার শাসক পোডেস্টাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে সাবধান করে দিলেন শত্রুতামূলক কাজের ভয়াবহ এবং করুণ পরিণতি সম্পর্কে।

তুর্কীরা বেলাচারনের নিকট গোল্ডেন হর্নের উপর একটি ভাসমান সেতু নির্মাণ করল। সেতুটি এত প্রশস্ত ছিল যে, ৫ জন লোকের পাশাপাশি হাঁটতে কষ্ট হত না। এমনকি মালপত্র বোঝাই গাড়ীগুলো অনায়াসেই সেতুর উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারত। ভাসমান সেতুর উপর কামান স্থাপন করা হল। মাহমেতের নির্দেশে তুর্কী সেনারা কামান দাগাল। সরাসরি গোলাবর্ষণ করল বেলাচারনের প্রতিরক্ষা দেয়ালের উপর। কিন্তু হালকা কামানগুলো প্রতিরক্ষা দেয়ালের কোন ক্ষতি করতে পারল না। সে কারণেই কামানগুলো মেসোটিচিয়নে স্থানান্তর করলেন। এদিকে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রেখে সম্রাট কনস্টানটাইন সুলতানের সঙ্গে আপোস রফার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু সুলতান আপোস রফার পরিবর্তে আত্মসমর্পণের দাবী জানালেন। সম্রাট সরাসরি তার দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন।

৭ মে সুলতান বড় রকমের একটি অভিযান চালালেন। লাইকাস উপত্যকার বড়

খুঁটি দিয়ে ঘেরা স্থানকে বেছে নিলেন আক্রমণ স্থান হিসাবে। কিন্তু তাদের আক্রমণ চরম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল। তিনি নির্দেশ জারি করলেন যে, পরিখার যে অংশগুলো এখনো ভরাট করা হয়নি, সেগুলো অবিলম্বে ভরাটের ব্যবস্থা নিতে হবে। সুলতান মাহমেত এবার বিশেষ কতগুলো পদক্ষেপ নিলেন। প্রথমত তার নির্দেশে গোল্ডেন হর্নের জাহাজগুলো হঠাৎ করেই ছোটাছুটি শুরু করল। নৌ-সেনারা তৎপর হয়ে উঠল। কামানগুলো কনস্টানটিনোপলের দিকে তাক করল। অবস্থা দেখে মনে হল, এখনই হয়ত তুর্কী সেনারা উপকূলভাগ দিয়ে প্রতিরক্ষা দেয়ালের উপর আক্রমণ চালাবে। আসলে এটা ছিল সুলতানের একটি কৌশল মাত্র। খ্রিস্টান সেনাদের হয়রানি করাই ছিল এতসব আয়োজনের মূল লক্ষ্য। সুলতানের উদ্দেশ্য সফল হল। গোল্ডেন হর্নের প্রবেশপথেই ছিল ভেনেটিয়ানদের বেশ কতগুলো যুদ্ধজাহাজ। জনা- কয়েক নাবিকের উপর জাহাজের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে নৌ-সেনারা চলে এল কনস্টানটিনোপলে। তারা দেয়াল প্রতিরক্ষার কাজে লেগে গেল। জলভাগ দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় পশ্চিম দেয়ালের প্রহরায় নিয়োজিত সৈন্যদের সরিয়ে আনা হল গোল্ডেন হর্নের দিকে। খ্রিস্টান বাহিনীর স্থান পরিবর্তনের ঘটনাটি ঘটেছিল ৯ মে তারিখে।

দ্বিতীয়ত, শুরু থেকেই জাগানোস পাশা পেরার নিকটেই অবস্থান নিয়েছিল। ইতিপূর্বে তার নিকট বেশ কতকগুলো কামান অর্পণ করা হয়েছিল। সুলতান কামানগুলোকে পেরা থেকে মেসোটিচিয়নে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিলেন।

তৃতীয়ত, হামজা বে নৌবহর নিয়ে ডোলমা বাচে-এর নিকট অবস্থান করছিল। সুলতানের নির্দেশক্রমে ১৬, ১৭ এবং ২১ মে হামজা মর্মর সাগরের উপকূলভাগে নৌ-মহড়া শুরু করল। উপকূলভাগ দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় খ্রিস্টান সেনারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এবারেও তারা স্থলভাগের দেয়াল প্রহরায় বেশ কিছু সৈন্যকে পাঠিয়ে দিল উপকূল অঞ্চলে।

এভাবেই সুলতান মাহমেত স্থলভাগে তার শক্তিকে আরও দৃঢ় করলেন। অপরদিকে সুকৌশলে খ্রিস্টান সেনাদের সরিয়ে দিলেন উপকূলভাগের দেয়ালের দিকে। দুর্বল করে দিলেন তাদের কেন্দ্রীভূত শক্তিকে। সুলতান মাহমেত তার প্রচেষ্টায় সফল হলেও এটি ছিল তার মূল পরিকল্পনার অংশ মাত্র। শুরু থেকে এ পর্যন্ত সুলতান মাহমেত খুব সামান্য সফলতাই অর্জন করেছেন। কিন্তু তাই বলে তার উদ্যোগ-আয়োজনে কোন কমতি ছিল না।

ছয় সপ্তাহের বেশি হল মুসলিম বাহিনী কনস্টানটিনোপল অবরোধ করেছে। এই সময়ের মধ্যে তারা বহুবার আক্রমণ চালিয়েছে। অবলম্বন করেছে নানান কলা-কৌশল। কিন্তু প্রত্যাশিত সাফল্য তখনো রয়ে গেছে তাদের নাগালের বাইরে। বিশাল নৌবহর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বৃহদাকারের কামানগুলো ছিল তাদের

প্রধান ভরসা। কিন্তু সেগুলো থেকেও তারা আশানুরূপ ফল পায়নি। অবশ্য এ কথা সত্য যে, কনস্টানটিনোপল ছিল দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য। এ ধরনের একটি শহরকে অবরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে কাবু করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবু কনস্টানটিনোপল বিজয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর জন্য সময় সীমার প্রসঙ্গটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও মাহমেত খুব বেশি একটা নিরাশ হননি। কিন্তু তাঁর বেশ কিছু অধিনায়ককে হতাশায় পেয়ে বসে। তারা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করল যে, অবরোধের শুরুতে খ্রিস্টান সেনারা যেমন অটল ও অনড় ছিল, এখনও তেমনি আছে। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও রয়ে গেছে পূর্বের মত দুর্ভেদ্য।

হঠাৎ করেই এ ধরনের একটি কথা ছড়িয়ে পড়ল যে ইটালী কনস্টানটিনোপল রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে তারা বিশাল একটি নৌবহর তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে। ক্যাথলিক পোপ এবং সম্রাট বিশ্বাস করতেন যে, কনস্টানটিনোপলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই মজবুত। তারা অনায়াসেই অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীকে দীর্ঘদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। ততক্ষণে তাদের নৌবহর চলে আসবে কনস্টানটিনোপলের দ্বারপ্রান্তে। বস্তুতপক্ষে ইতালীয় বাহিনীর অনুপ্রবেশের পূর্বে তুর্কী বাহিনী কনস্টানটিনোপল দখল করতে পারবে কি-না, তার উপর নির্ভর করছিল মাহমেতের সাফল্য। এমনকি একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে সময়টাই মুসলমানদের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দেয়। অথচ সামগ্রিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, মুসলিম বাহিনীর সহসা তেমন কোন বিজয়ের সম্ভাবনা নেই।

ইতিমধ্যে আরো একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মুখে মুখে একথা ঘুরে বেড়াল যে, খ্রিস্টান বাহিনী কনস্টানটিনোপলের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে। তারা পৌঁছে গেছে এজিয়ান সাগরে।[৩] এই সংবাদের পর তুর্কী বাহিনীর হতাশাগ্রস্ত অধিনায়কগণের হতাশা আরও বেড়ে যায়। মাহমেতের নেতৃত্বের প্রতি সকলের নির্ভেজাল আনুগত্য থাকলেও কনস্টানটিনোপল আক্রমণের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, সুলতান মাহমেত তখন একুশ বছরের যুবক মাত্র। অনেকের মনে এ প্রশ্ন অত্যন্ত প্রশস্তভাবে দেখা দেয় যে, সুলতান মাহমেত তখন যৌবনের তেজে বেগবান এবং উচ্ছল। কিন্তু অসাবধানী আচরণ তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে ম্লান করে দেবে না তো?

মে মাসের শেষের দিকে সুলতান মাহমেত কনস্টানটিনোপলের সম্রাটের নিকট শেষবারের মত শান্তি প্রস্তাব পাঠালেন। তাঁর এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল দু'টি। প্রথমত, শেষ মুহূর্তে হলেও তিনি অহেতুক রক্তপাতকে পরিহার করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, হতাশাগ্রস্ত এবং বিরূপ মনোভাবাপন্ন লোকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি অযৌক্তিকভাবে কিছু করছেন না। বরং পরিস্থিতি তাদেরকে এ ধরনের ব্যবস্থা

নিতে বাধ্য করছে। সম্রাটকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহবান জানান হল। সম্রাট তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২৫ মে মাহমেত একটি অধিবেশন ডাকলেন। মন্ত্রীবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন অধিনায়কগণ এই অধিবেশনে যোগ দেন। বৃদ্ধ উযীর খলিলও সেখানে ছিলেন। অবশ্য গোড়া থেকেই তিনি ছিলেন অভিযানের বিপক্ষে। তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়ার পরামর্শ দিলেন। আত্মসমর্পণের পরিবর্তে সম্রাটের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়-এমন কতগুলো শর্তের ভিত্তিতে তার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু উযীরের এই পরামর্শের ব্যাপারে জাগানোস পাশা দ্বিমত পোষণ করলেন। তিনি বললেন যে, ভেনিস এবং জেনোয়ার তরফ থেকে এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। প্রধান উযীরের এ ধরনের আশংকা একান্তই অমূলক এবং বাস্তব অবস্থার বিরোধী। খ্রিস্টান জগতে এখন অনৈক্য বিরাজ করছে। তারা এখন নিজেদের মধ্যে তীব্র কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এ মুহূর্তে তাদের পক্ষে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। এরপরেও যদি ভেনিটিয়ান নৌবহর এসে যায়, তাতেও তুর্কী বাহিনীর আশংকার কোন কারণ নেই। খ্রিস্টানদের চেয়ে তাদের জনশক্তি অনেক বেশি। সুতরাং তুর্কী বাহিনীর অবরোধ চালিয়ে যাওয়া উচিত। অধিনায়কগণের মধ্যে যারা নবীন ও তরুণ, তারা জাগানোস পাশাকে সমর্থন করল। বাসিকাজৌকের অধিনায়কও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করল।

অবশেষে সুলতান মাহমেত জাগানোস পাশার অভিমতকেই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করলেন। যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং আয়োজন সম্পন্ন করে সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। কনস্টানটিনোপলের খ্রিস্টান সেনারাও জেনে গেল সুলতান মাহমেতের এই সিদ্ধান্তের খবর।

চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য তুর্কী বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতির কাজে লেগে গেল। ২৫ ও ২৬ মে ছিল তাদের জন্য ব্যস্ততম দিন। মেসোটিচিয়ান এলাকার পরিখা ভরাট করার কাজ শুরু হল। কামান ও বন্দুক স্থাপনের জন্য কতগুলো প্লাটফরম তৈরী করল। সেখানে নিয়ে এলো আরো কতকগুলো কামান। প্রস্তুতিমূলক কাজের পাশাপাশি তুর্কী সেনারা প্রতিরক্ষা দেয়ালের উপর অবিরাম গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। খ্রিস্টান সেনারা তুর্কীদের ব্যস্ততা এবং প্রস্তুতির সংবাদ জানত। কিন্তু সহসা অবরুদ্ধ স্থান থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করার মত সামর্থ্য তাদের ছিল না। রোববার মধ্যরাতে তুর্কী বাহিনীর আয়োজন শেষ হল। বন্ধ হল তাদের সমস্ত তৎপরতা। এমনকি বন্দুকের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা গেল না।

২৯ মে মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে চূড়ান্ত আক্রমণ। সোমবার তাদের বিশ্রামের দিন। এই দিনে সুলতান নিজে সমস্ত আয়োজন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন। সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাদের বলীয়ান করে তুললেন

নতুন চেতনা ও উত্তেজনায়। খুবই দক্ষতা এবং যত্নের সঙ্গে সুলতান আক্রমণ পরিকল্পনা রচনা করলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ক. হামজা বে-র নৌবহর মর্মর সাগরের সমগ্র উপকূল বরাবর অবস্থান নেবে। নৌসেনারা প্রতিরক্ষা দেয়াল প্রহরায় নিয়োজিত খ্রিস্টান বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। সম্ভব হলে মই দিয়ে অতিক্রম করবে প্রতিরক্ষা দেয়াল। খ. গোল্ডেন হর্নে অবস্থানরত নৌবহরকেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হল। গ. মেসোটিচিয়ান এলাকায় নিয়োজিত বাহিনীর দায়িত্ব সুলতান নিজে গ্রহণ করলেন, উযীর খলিল এবং সারজা পাশা থাকলেন তাঁর সঙ্গে। ঘ. আনাতোলিয়ার বাহিনী নিয়ে ইসহাক পাশা ডান প্রান্তে এবং কারাদজা পাশা বাম প্রান্তে অবস্থান নেবেন। ঙ. জাগানোস পাশা তাঁর অধীনস্থ বাহিনীর একটি অংশকে গোল্ডেন হর্নের নৌ সেনাপতির নিকট অর্পণ করবে। অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে সে ভাসমান সেতু পার হয়ে বেলাচারনের নিকটে এবং কারদাজা পাশার বাম প্রান্তে ছাউনি ফেলবে। দায়িত্ব বন্টন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের পর সুলতান ফিরে এলেন নিজের শিবিরে।

২৮ মে সোমবার সারাদিন তারা বিশ্রাম করে কাটিয়ে দিল। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী শিবিরে কর্ম উদ্দীপনা শুরু হল। হাজার হাজার সৈন্য পরিখা ভরাট করার কাজে লেগে গেল। অন্যরা কামান ও যুদ্ধ ইঞ্জিনগুলো যথাস্থানে বসাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে কনস্টানটিনোপলের আকাশ ঘন কাল মেঘে ছেয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হল। তবু তাদের কর্মতৎপরতায় কোন ছেদ পড়ল না। প্রতিরক্ষা দেয়ালের ওপার থেকে খ্রিস্টান সেনারা সব কিছুই দেখল। কিন্তু তারা তুর্কী বাহিনীর কর্মতৎপরতা রুদ্ধ করতে পারল না। পারল না কোন রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে। ২৯ মে মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতির কাজ শেষ হল। শেষবারের মত সুলতান সামগ্রিক আয়োজন যাচাই করে দেখলেন এবং কনস্টানটিনোপলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

তুর্কী বাহিনীর কর্মতৎপরতা দেখে খ্রিস্টান সেনারা যথার্থই অনুমান করেছিল যে, মেসোটিচিয়ান হবে তাদের প্রধান আক্রমণ স্থল। আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও তারা মেসোটিচিয়ান এলাকায় শক্তি বৃদ্ধি করতে পারল না। আসলে নৌবহরের কর্মতৎপরতা দেখে তারা অতি মাত্রায় শংকিত হয়ে পড়েছিল, তারা এই ভেবে সন্ত্রস্ত ছিল যে, তুর্কী সেনারা যে কোন সময় দেয়াল টপকে শহরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুতপক্ষে সে কারণেই অন্যান্য স্থান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব হল না।

বাসিবাজৌকের অনিয়মিত সৈন্যরা প্রথমে আক্রমণ চালাল। কিন্তু রণাঙ্গনের সংকীর্ণতার কারণে গোটা বাহিনীকে আশানুরূপভাবে যুদ্ধে নিয়োগ করা গেল না। অপরদিকে তাদের গায়ে কোন যুদ্ধ পোশাক ছিল না। তবু তারা জীবনকে বাজি রেখে

যুদ্ধ করল। অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং গোলা বারুদের তীব্র আওয়াজের মধ্য দিয়ে কেটে গেল ঘন্টাকয়েক সময়। কিন্তু যুদ্ধে তারা তেমন সুবিধা করতে পারল না। অবশেষে সুলতান যুদ্ধ ময়দান থেকে অনিয়মিত বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিলেন।

যুদ্ধবিরতির ফাঁকে খ্রিস্টান সেনারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিরক্ষা দেয়ালের মেরামতের কাজে লেগে গেল। এদিকে ইসহাক পাশা আনাতোলিয়ার দুর্ধর্ষ বাহিনীসহ উত্তর দিকে সরে এল। ডানে ঘুরে এসে সে দাঁড়াল মেসোটিচিয়ানের খুঁটি দিয়ে ঘেরা প্রতিরক্ষা দেয়ালের সামনে। খ্রিস্টান বাহিনী সংস্কারের কাজ শেষ করার পূর্বেই ইসহাক পাশার কামান গর্জন করে উঠল। শুরু হল অবিরাম গোলাবর্ষণ। আরবানের তৈরী বৃহদাকার কামানের একটি গোলা। প্রতিরক্ষা দেয়ালের উপর পড়তেই বেশ খানিকটা অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে সহসা ৩০০ আনাতোলীয় সৈন্য প্রতিরক্ষা বাঁধের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু সম্রাটের নেতৃত্বাধীন খ্রিস্টান বাহিনী সহসা তাদের ঘিরে ফেফল। অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করল। অন্যদের বাধ্য করল পশ্চাদপসরণ করতে। ঘন্টা দুয়েক পর সুলতান আনাতোলীয় বাহিনীকে যুদ্ধ ময়দান থেকে প্রত্যাহার করে নিলেন।

আনাতোলিয়ার বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে দেখে খ্রিস্টান সেনারা উৎফুল্ল হল। বিজয়ের আনন্দে গলাফাটা চীৎকার শুরু করে দিল। আবার তারা ব্যাপৃত হল ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিরক্ষা দেয়ালের কাজে।

বাসিবাজৌক বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ হল। আনাতোলিয়ার দুর্ধর্ষ বাহিনীও তেমন একটা সুবিধা করতে পারল না। সর্বাধিনায়ক মাহমেত তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত বা হতাশ হলেন না। আসলে বাসিবাজৌক বা আনাতোলিয়ার সৈন্যরা প্রতিরক্ষা দেয়াল গুড়িয়ে দিবে, অমিততেজে প্রবেশ করবে কনস্টানটিনোপলের অভ্যন্তরে সুলতানের এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না। তিনি কেবলমাত্র খ্রিস্টানদের কেন্দ্রীভূত শক্তিকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে এবং শত্রুসৈন্যদেরকে শারীরিকভাবে ক্লান্ত করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বাসিবাজৌক এবং ইসহাক পাশার আক্রমণের মধ্য দিয়ে মাহমেত এই দুটি উদ্দেশ্য যথার্থভাবেই অর্জন করেছিলেন।

খ্রিস্টান সেনারা শ্রান্তি লাঘবের অবসর পেল না। সুযোগ পেল না ধ্বংস হয়ে যাওয়া খুঁটির বেড়া মেরামত করার। এর মধ্যে তুর্কী সৈন্যরা আবার আক্রমণ চালাল। মুষলধারায় তীর, বর্শা এবং পাথর ছুঁড়তে লাগল। কামান বন্দুকগুলো ক্ষণে ক্ষণে বিকট শব্দে গর্জন করে উঠল। এই ফাঁকে জানিসারিসের সৈন্যরা এগিয়ে গেল সামানের দিকে। তাদের গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। কিন্তু তাদের মধ্যে বাসিবাজৌক বা আনাতোলীয় বাহিনীর উন্মত্ততা ছিল না। তাদের মধ্যে দেখা গেল না কোন রকম অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা বা অব্যবস্থা। জানিসারিসের এই বাহিনী ছিল সুলতান ওরখান, বায়াজিদ এবং মুরাদের অনবদ্য সৃষ্টি। এরাই ছিল তুর্কী বাহিনীর মূল শক্তি।

বস্তুতপক্ষে জানিসারিস বাহিনীর উপর নির্ভর করছিল কন্‌স্টানটিনোপলের অদৃষ্ট। যদি তাঁরা খুঁটি দিয়ে ঘেরা প্রতিরক্ষা ব্যূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে না পারে, যদি তারা ব্যর্থ হয় অভ্যন্তরভাগের দেয়ালকে গুড়িয়ে দিতে তাহলে সুলতান মাহমেতের অবরোধ তুলে নেয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

পরিখা পর্যন্ত সুলতান জানিসারি বাহিনীর আক্রমণের নেতৃত্ব দিলেন। সৈন্যদের সাহস এবং উৎসাহ দেয়ার জন্য তিনি পরিখার নিকট দাঁড়ালেন। অমিততেজ এবং অদম্য উদ্দীপনা সহকারে জানিসারিস বাহিনী খুঁটির বেড়ার দিকে এগিয়ে গেল। যে মাটির উপর ভর করে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেই মাটিকে বিদীর্ণ করবে, উপড়ে ফেলবে শক্ত মজবুত গাছগুলোকে। খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে কড়ি কাঠগুলোকে। যে কাঠগুলোকে নির্মূল করতে ব্যর্থ হবে, সেখানে তারা মই স্থাপন করবে। এই মই দিয়েই অতিক্রম করে যাবে খ্রিস্টান বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য ব্যূহকে। এমনি দৃঢ়তা এবং আস্থা নিয়ে প্রতিটি দল পরবর্তী দলের জন্য পথ তৈরী করে দিল। ভাবলেশহীনভাবে তারা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

মেসোটিচিয়ান এলাকায় খ্রিস্টানদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ছিল দুর্ভেদ্য। গ্রীক এবং জেনোয়ার বাছা বাছা সৈন্যদের এখানে মোতায়েন করা হয়েছিল। সম্রাট নিজে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সেনাপতি গিয়াসটিনিয়ানীও ছিল তার সঙ্গে। জন্মগতভাবে সে ছিল জেনোয়ার অধিবাসী। কিন্তু সে ছিল দুর্দান্ত যোদ্ধা এবং অসীম সাহসী বীর সেনানী। বিশেষ করে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত শহরের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সে ছিল খুবই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। সে কারণেই তুর্কীদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের এই যুদ্ধে গিয়াসটিনিয়ানী ছিল প্রকৃত সর্বাধিনায়ক

খ্রিস্টান বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে জানিসারি বাহিনী তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। জীবনকে বাজি রেখে উভয় বাহিনী এক ঘন্টা-ব্যাপী হাতে হাতে যুদ্ধ করল। জানিসারি বাহিনীতে হাসান নামে একজন দুর্ঘর্ষ এবং অসম সাহসী অধিনায়ক ছিল। বলা যেতে পারে যে, অসুরের শক্তি ছিল তার গায়ে। হঠাৎ করেই সে জানিসারিদের ছোট একটি দল নিয়ে কাঠের বেড়ার ভেতর ঢুকে পড়ে। খ্রিস্টান সৈন্যরা ভালভাবেই জানত যে, জানিসারিসেরা একবার ঠাই করে নিতে পারলে আর রক্ষা নেই। কনস্টানটিনোপল হাতছাড়া হয়ে যাবে। শহরটির তখনই পতন ঘটবে। সে কারণেই তারা মরিয়া হয়ে লড়াই করল। যুদ্ধ করল শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। জানিসারিসের ছোট দলটিকে তারা ঘিরে ফেলল। অর্ধেকের মত মুসলমান সৈন্য লড়াইয়ে নিহত হল। পরাক্রমশালী হাসানও ছিল মৃতের দলে। অবশিষ্ট জানিসারিসেরা তখনও বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন রণাঙ্গনে একটি দৈব ঘটনা ঘটে যায়। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তমূলক এই যুদ্ধ একটি নাটকীয় মোড় নেয়।

ঘটনাটি ঘটল বেলা উঠার ঠিক পূর্বক্ষণে। খুবই নিকট থেকে ছোঁড়া কামানের একটি গোলা এসে লাগল সেনাপতি গিয়াসটিনিয়ানীর গায়ে। গোলাটি তার বক্ষদেশ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। অসহ্য ব্যথা-বেদনায় সে কুঁকড়ে উঠল। রক্ত ঝরল প্রচুর পরিমাণে। নিঃসাড় হয়ে এল তার দেহ ও মন। রণাঙ্গন থেকে তাকে সরিয়ে নেয়ার জন্য সে জেনোয়ার এক সৈনিককে অনুরোধ করল।

ঘটনাটি ঘটে দু'টি প্রতিরক্ষা দেয়ালের মাঝখানে। অভ্যন্তরভাগের দেয়ালের গেটের চাবি ছিল সম্রাটের কাছে। জেনোয়ার সৈনিক ছুটে গেল সম্রাটের নিকট। সংবাদ পেয়ে সম্রাট নিজেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এমনি সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে না যাওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় সহকারে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু দুর্বিসহ যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়েছিল। চিন্তাশক্তিও যেন ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। সম্রাটের অনুনয়-বিনয়কে উপেক্ষা করে রণাঙ্গন থেকে তাকে সরিয়ে নেয়ার জন্য বার বার অনুরোধ জানাল। অবশেষে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সম্রাট অভ্যন্তরভাগের দেয়ালের চাবি হস্তান্তর করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই সম্রাট লক্ষ্য করলেন যে, কোরকা পোরকা গেইটের নিকটস্থ টাওয়ারের উপর তুর্কী পতাকা পত পত করে উড়ছে। ক্ষণিকের জন্য সম্রাটকে বিহ্বলতায় পেয়ে বসল। পরক্ষণেই তিনি ছুটে গেলেন বেলাচারনে এলাকার কোরকা পোরটা গেইটের কাছে।

বেলচারনের ঘটনাটি ছিল এরকম-কোরকা পোরটার গুপ্ত পথ দিয়ে খ্রিস্টান সেনারা হঠাৎ করে বেরিয়ে আসত। যুদ্ধ করত অবরোধকারী বাহিনীর সঙ্গে। একবার এ ধরনের একটি দল গুপ্ত পথ দিয়ে রণাঙ্গন থেকে চলে গেলেও গেইট বন্ধ করতে ভুলে গেল। বিষয়টি নজরে পড়তেই ছোট একটি তুর্কী বাহিনী সেখানে ছুটে যায়। অবরুদ্ধ এলাকায় তুর্কীদের দেখে খ্রিস্টান সেনারা একেবারে তাজ্জব বনে যায়। বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্য সহসা একটি দল সেখানে ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার, তা হয়ে গেছে।

শুরু হল হাতাহাতি যুদ্ধ। অবরোধকারী তুর্কী বাহিনী এবং দুর্গরক্ষী খ্রিস্টান সৈন্যরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সাধ্যমত লড়াই করল। হঠাৎ করেই কয়েকজন তুর্কী সেনা দেয়ালের দিকে ছুটে যায়। টাওয়ারের উপর থেকে কনস্টানটিনোপলের পতাকাটি নামিয়ে ফেলে। সেখানে উড়িয়ে দেয় তুর্কীদের বিজয় পতাকা। আপ্রাণ চেষ্টা করেও দুর্গরক্ষীরা তুর্কীদের তাড়িয়ে দিতে অথবা কাবু করতে পারল না। তারা পারল না গুপ্ত পথটি বন্ধ করে দিতে। ইতিমধ্যে সেখানে আরও তুর্কীসেনা আসতে শুরু করে। এমনি একটি সংকটময় মুহূর্তে সম্রাট সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সংকটের মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বৃদ্ধির পূর্বেই তিনি শুনতে পেলেন আরেকটি দুঃসংবাদ। বার্তাবাহক খবর দিল যে, জানিসারিসেরা মেসোটিচিয়ান

এলাকায় খ্রিস্টান সেনাদের পরাভূত করেছে। ভেঙ্গে ফেলেছে প্রতিরক্ষা দেয়াল। অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সম্রাট ছুটে গেলেন মেসোটিচিয়ানে।

সেনাপতি গিয়াসটিনিয়ানীকে রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে নেয়ার সময় জেনোয়ার সৈন্যদের মনে একটি অদ্ভুত চিন্তার উদয় হল। তারা ভাবল-খ্রিস্টানদের জন্য এটা বড় দুঃসময়। এই যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনীর পরাজয় অবধারিত এবং সে কারণেই গিয়াসটিনিয়ানী যুদ্ধ ময়দান ছেড়ে গেছে। জেনোসী সৈন্যরাও রণাঙ্গন পরিত্যাগ করল। অভ্যন্তরভাগের দেয়ালের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে তারাও সটকে পড়ল। কোরকা পোটরা গেট থেকে ফিরে এসে সম্রাট দেখলেন মেসোটিচিয়ান এলাকায় কোন জেনোসী সৈন্য নেই। কেবল গ্রীক সৈন্যরা মরিয়া হয়ে লড়াই করছে। প্রতিরক্ষা দেয়াল সংস্কারের জন্য তারা অভ্যন্তরভাগে দেয়ালের মাটি খুঁড়ছে। সেখানে অনেকগুলো গহ্বরের মত তৈরী হয়েছে। কিন্তু জানিসারিদের তুলনায় গ্রীক সৈন্যদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল খুবই নগণ্য। তুর্কী সেনারা তাদেরকে গহ্বরের দিকে সরে যেতে বাধ্য করল। সেখানেই তাদের গুলি করে হত্যা করল।

সম্রাটের বুঝতে বাকি রইল না যে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে। জয় পতাকা চলে গেছে মুসলমানদের হাতে। পারিষদবর্গ সম্রাটকে অবিলম্বে কনস্টানটিনোপল থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তারা বলল-তুর্কীরা এখনই শহরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। তছনছ করে দেবে সব কিছু। তার চেয়ে বরং অন্য কোথাও আশ্রয় নেয়া ভাল। সেখান থেকেই কনস্টানটিনোপলের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রাজোচিত। তিনি পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। ঘোষণা দিলেন যে, দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেবেন,তবু রণাঙ্গন ত্যাগ করবেন না। ক্ষোভে-দুঃখে তিনি রাজকীয় পরিচয় চিহ্ন ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ভীম গতিতে জানিসারী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এমন তীব্র তেজে কে এগিয়ে আসছে, কি তার পরিচয় জানিসারীসেরা তার কিছুই জানতে পারল না। অন্য সৈনিকদের ন্যায় সম্রাট কনস্টেনটাইনকে তারা দ্বিখণ্ডিত করল। সকলের অগোচরে সম্রাটের দেহ ধূলার ধরনীতে গড়াগড়ি খেল। এমনিভাবেই নিঃশেষ হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী সিজার পরিবারের শেষ চিহ্ন।

খুঁটির বেড়ার ফাঁকা পথ দিয়ে তুর্কী সেনারা দলে দলে প্রতিরক্ষা দেয়াল অতিক্রম করে গেল। তারা দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুক্ত করে দিল দেয়ালের গুপ্ত অর্গলগুলো। ইতিমধ্যে কোন রকম বাধা প্রতিকূলতা ছাড়াই জানিসারীসের সৈন্যরা অভ্যন্তরভাগের দেয়াল টপকে শহরে প্রবেশ করে। ইতিপূর্বে বেলাচারনের দুর্গরক্ষীরা কোরকাপোরটার টাওয়ার-এ তুর্কী পতাকা উড়তে দেখেছিল। এবার তাদের কাছে

মেসোটিচিয়ানের দুর্যোগের খবর এসে পৌঁছে। ভীত-চকিত হয়ে তারা প্রতিরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। বিদেশী সৈন্যরা সমুদ্র-উপকূলে নোঙ্গর করা জাহাজগুলোর দিকে ছুটে যায়। গ্রীকরা ছুটে যায় তাদের মাতৃভূমির দিক। কোরকাপোরটার নিকট দিয়ে তুর্কী সেনারা শহরের দিকে অগ্রসর হয়। এদিকে দুর্গরক্ষীদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তুর্কী সেনারা গোল্ডেন হর্নের সন্নিকটস্থ প্রতিরক্ষা দেয়াল মই দিয়ে অতিক্রম করে।

হামজা বে-এর নৌ-সেনারাও জেনে গেল কনস্টানটিনোপলের পতনের সংবাদ। লুটতরাজের ক্ষেত্রে তারা অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে না পড়ে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। তারা জাহাজ ছেড়ে চলে গেল উপকূল বরাবর। এই সুযোগে খ্রিস্টান সৈন্যরা কোন রকম প্রতিবন্ধকতা এবং ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই তাদের জাহাজগুলো নিয়ে সাগরের বুকে পাড়ি জমাল।

রাজকীয় নৌবহরের চার-পাঁচটি জাহাজসহ জেনোয়া এবং ভেনিসের প্রায় সবগুলো জাহাজ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গেল। হামজা-বে-এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে যে জাহাজগুলো ছিল সেই জাহাজের নাবিকেরা লুটতরাজে অংশ নেয়নি। আটক করলেন ৫টি রাজকীয় এবং ৩টি জেনোসী যুদ্ধ জাহাজ। বন্দী করলেন ভেনিসের সকল নিরস্ত্র ব্যবসায়ীকে। অতঃপর তারা চিহ্নিত হল আশ্রিত মানুষ হিসেবে। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি তাদের সাধ্যের বাইরে।

এবার শুরু হল সম্পদ সংগ্রহ এবং লুটতরাজের পালা। এ ব্যাপারেও ছিল সুলতানের কতগুলো স্পষ্ট বিধি-নির্দেশ। যারা শহর আক্রমণের প্রথম ঝুঁকি নিয়েছিল তাদের বাদ দিয়ে অন্য সকল সৈন্য দলবদ্ধভাবে শহরে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক দল বা রেজিমেন্টের সঙ্গে সামরিক পুলিশ থাকবে। তারা রেজিমেন্টের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। কনস্টানটিনোপলের পতনের পরও গ্রামগুলোকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দিলেন। বলে দিলেন যে, যে সমস্ত গ্রাম কোনরকম বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সুলতানের অধীনতা মেনে নেবে, তাদের বিষয়-সম্পদ লুটতরাজ করা যাবে না।[8]

কনস্টাটিনোপলের কতকগুলো দালান-কোঠাকে বিশেষ কাজের জন্য আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তুর্কী সেনারা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রহরার ব্যবস্থা করলেন। উদাহরণ হিসাবে 'হলি এপোস্টেলস' এবং 'সেন্ট সোফিয়া' নামক দু'টি গির্জার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেন্ট সোফিয়া ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গির্জা এবং কনস্টানটিনোপলের প্রধান ধর্মযাজকের দপ্তর। হলি এপোস্টেলস ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম গির্জা। তিনি সেন্ট সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরিত করার এবং এপোস্টেলকে আগামী দিনের প্রধান ধর্মযাজকের দপ্তরে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে লুটতরাজ চলবে। কিন্তু লুটতরাজের ব্যাপকতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তিনি একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিলেন। মধ্য সকাল থেকে লুটতরাজ শুরু হল। ঐদিন সন্ধ্যার সময় সুলতানের নির্দেশে তা বন্ধ হল। যারা কৌশলগত স্থানগুলো প্রহরার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য আর কাউকে কনস্টানটিনোপলে রাত্রি যাপনের সুযোগ দেয়া হল না। তাদের ফিরে যেতে হল শহরের প্রতিরক্ষা দেয়ালের বাইরে সেনা শিবিরে।

খ্রিস্টান জগতের রাজনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ আগাগোড়া সব সময় তুর্কীদের বাঁকা চোখে দেখেছে। মুসলমানদের তারা চিহ্নিত করেছে ভয়ানক রকমের গোঁয়ার, ধর্ম-উন্মাদ এবং রক্তপিপাসু হিসেবে। কনস্টাটিনোপল দখল করার সময় স্বাভাবিকভাবেই শহরটির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল, বিষয়-সম্পদের লুটতরাজ হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু নাশকতামূলক কাজ এবং হত্যাকোণ্ডের পরিমাণ ছিল খুবই কম। গ্রীকদের বর্ণনানুসারে তিপ্পান্ন দিনের অবরোধ যুদ্ধ, চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন এবং দখল পরবর্তী সময়ে সর্বমোট ৪০০ খ্রিস্টান নিহত হয়। অবশ্য এই বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জন আছে বলে অনেকের ধারণা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় ফরাসী এবং ভেনেটিয়ানরা মুসলমানদের হাত থেকে কনস্টানটিনোপল দখল করে নেয়। তখন তারা দীর্ঘদিন যাবত ধ্বংসলীলা এবং লুটতরাজ অব্যাহত রাখে। নির্দয়ভাবে হত্যা করে হাজার হাজার কনস্টানটিনোপলবাসীকে।

বিকেলের দিকে মিলিটারী পুলিশ শহরের মধ্যে বেশ খানিকটা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। স্তিমিত হয়ে আসে লুট-পাটের তাণ্ডবতা। সুলতান মাহমেত তখন বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করেন। তিনি সরাসরি চলে যান সেন্ট সোফিয়ায়। সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। দেশের বৃহত্তম গির্জাকে পরিণত করেন মসজিদে। সেন্ট সোফিয়ার সমস্ত ধর্মযাজক এবং যারা এখানে আত্মগোপন করেছিল তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। অব্যাহতি দিলেন সমস্ত অভিযোগ থেকে। অতঃপর তিনি সগৌরবে এগিয়ে যান রাজপ্রাসাদের দিকে। যখন তিনি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সুশোভিত এবং প্রকাণ্ড হল এবং গ্যালারীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তিনি খুবই আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন। তার মধ্যে জেগে উঠে কবিত্ব ভাব। মহাকবি ফেরদৌসী রচিত কবিতার দুটি চরণ উচ্চারণ করেন। চরণ দুটির সারমর্ম হল- মাকড়শা সিজারের রাজপ্রাসাদের মধ্যে জাল বোনে, পেচকেরা সজাগ করে দেয় আরফাসিয়ারের টাওয়ারের প্রহরীকে। শহরের অভ্যন্তরে সুলতানের পদচারণার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। পথ-ঘাটের বিশৃঙ্খলা কমে যায়। সর্বত্র বিরাজ করতে থাকে পূর্ণ স্থিতিশীলতা। অতঃপর বিজয়ী সর্বাধিনায়ক ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসেন নিজের তাঁবুতে।

মাত্র তিন দিন হল কনস্টানটিনোপলে মুসলমানদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। ইতিমধ্যে মাহমেত কনস্টানটিনোপল শাসনের রূপ কাঠামো তৈরি করে ফেললেন। এই কাঠামোর প্রধান বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপঃ

ক. তুর্কী সালতানাতের অধীনে থেকেই তারা একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করবে। জনসাধারণ যাকে ধর্মগুরু বলে মান্য করে, তিনি অর্থাৎ যাজক হবেন দেশের প্রধান। রাজ্যের ভাল-মন্দ কাজের জন্য তিনি সুলতানের নিকট দায়ী থাকবেন।

খ. দেশের যিনি প্রধান তাকে বিশেষ কতগুলো সুবিধা দেয়া হল। তাকে কর প্রদান করতে হবে না। অপসারণ করা হবে না ক্ষমতা থেকে। তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবেন। তার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে যার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হবে, তিনিও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করবেন।

গ. গির্জার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের বেলায়ও এই সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রযোজ্য হবে। অধঃস্তন পাদরীগণকেও কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হল।

ঘ. গির্জাগুলোকে খ্রিস্টান সমাজের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিষয়গুলো পরিচালননার অধিকার দেয়া হল। এমনকি অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের দেওয়ানী মামলাগুলো ফয়সালা করার দায়িত্ব গির্জার উপর ন্যস্ত করা হল। কেবল ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলো তুর্কী আদালতে পাঠাতে হবে। তাছাড়া দেওয়ানী মামলার সঙ্গে কোন মুসলমান জড়িত থাকলে গির্জার কিছুই করণীয় থাকবে না। সেগুলোর শুনানী হবে তুর্কী আদালতে।

বস্তুতপক্ষে মুসলমানদের বিজিত অঞ্চল শাসনের ব্যাপারে এগুলো ছিল একটা সাধারণ নীতিমালা। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিজয়ী মুসলমানগণ অধীনস্থ খ্রিস্টান প্রজাদের এই সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রদান করতেন। ঐতিহ্যগতভাবে মাহমেত কনস্টাটিনোপলবাসীদের বেলায় এই নিয়মনীতি গুলো অব্যাহত রাখলেন।

একটা দৃষ্টান্ত থেকেই খ্রিস্টানদের প্রতি মুসলমানদের সহনশীলতার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের একজন যাজকের নাম গ্রেগরী মামাস। তিনি ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে অর্থোডক্স চার্চের সম্মিলনের একজন প্রথম কাতারের প্রবক্তা। পরবর্তীতে গ্রীককেন্দ্রিক খ্রিস্টানরা তাকে বয়কট করে। অনন্যোপায় হয়ে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বদেশ ছেড়ে রোম চলে যান। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যিনি যাজকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, পরিচয় চিহ্ন হিসেবে বুকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য তাকে একটি ক্রুশ দেয়া হয়। গ্রেগরী মামাসেরও একটি ক্রুশ ছিল। কিন্তু রোমে চলে যাওয়ার সময় তিনি তা ফেরত দেননি। এদিকে কনস্টানটিনোপল বিজয়ের পর খ্রিস্টানেরা সম্মিলিতভাবে জেনাডিয়াসকে যাজক হিসেবে নির্বাচন করে। সুলতান মাহমেতও তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন যাজক হিসেবে মনোনয়ন দেন। জেনাডিয়াস ছিলেন দুই চার্চের মধ্যকার পুনর্মিলন বিরোধী শিবিরের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা।

তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং দার্শনিক। মাহমেত নিজে জেনাডিয়াসকে যাজকের পরিচয় চিহ্ন হিসেবে অত্যন্ত সুন্দর একটি ক্রুশ প্রদান করেন।

বছরের পর বছর ধরে বিশাল রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তুর্কীদের অবরোধ করার বহু পূর্বেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশ। সুলতান মাহমেত প্রথম যখন ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এই শহরে প্রবেশ করেন তখন শহরটির জনশূন্য অবস্থা এবং ভগ্নদশা দেখে রীতিমত শিউরে উঠেন। তবু তিনি আগামী দিনে এখানেই রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তদনুসারে অতি যত্নের সঙ্গে প্রণয়ন করলেন একটি বিরাট পরিকল্পনা। মনোনিবেশ করলেন কনস্টানটিনোপলের পুনর্গঠন এবং সাজ-সজ্জার কাজে।

সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে বিশেষ করে রাজমিস্ত্রী এবং কারিগরদের এখানে বসতি গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানালেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তুর্কী, গ্রীক এবং আরমেনীয়রা কনস্টানটিনোপলে এসে সমবেত হল। দালান-কোঠা নির্মাণ এবং বাড়ি-ঘরের সংস্কারের জন্য সকলকে সরকারের তরফ থেকে ভর্তুকি দেয়া হল। এমনকি সুলতান নিজের জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী করেন। অবশ্য আয়তনের দিক থেকে এটি ছিল বেশ ছোট। বর্তমানে এই প্রাসাদটি ইস্তামবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে বিরাজ করছে। পরবর্তীতে তিনি প্রাচীন আরকোপোলিসে একটি বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তিনি রোমান সম্রাটগণের রাজধানী ধ্বংস করে দেন। তদস্থলে নির্মাণ করেন একটি সাজানো-গোছানো মনোমুগ্ধকর রাজধানী। শহরটি এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, অনতিকাল পরেই এখানকার জনসংখ্যা বারো গুণ বেড়ে যায়। বস্তুতপক্ষে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বেই তিনি মনের মাধুরী দিয়ে শহরটিকে নতুন সাজে সাজিয়েছিলেন। তখন শহরটির নতুন নামকরণ হল ইস্তামবুল। তিনি আন্তরিকভাবে আশা করেছিলেন যে, সকল শ্রেণীর সকল বর্ণের ও ধর্মের লোকেরা এখানে বসবাস করবে। তাদের মধ্যে বিরাজ করবে শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি এবং শান্তি।

বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে প্রাচ্যের খ্রিস্টানদের বড় একটা সময় লাগল না। অচিরেই তারা বিজয়ী সুলতানের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান জগৎ নিয়ে। কনস্টানটিনোপলের পতনের পর থেকেই তারা ভয়ঙ্কর রকমের আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে দেখা দেয় অনুশোচনার অনুভূতি। অথচ এই খ্রিস্টানরাই তুর্কীদের মুকাবিলায় কনস্টানটিনোপলকে নামমাত্র সাহায্য করেছিল।

পোপ এবং রাজা-সম্রাটগণের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়ে ক্রুসেডের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানায়। বার বার তারা গোলটেবিলে আলোচনায় বসে। কিন্তু তাদের পক্ষে সমন্বিত কোন উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হল না। খ্রিস্টান জগতের এই ব্যর্থতার জন্য তুর্কী

কূটনীতিবিদদের ভূমিকাই প্রধান। তারা পশ্চিমা খ্রিস্টান শাসকগণের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগাল এবং অসম্ভব করে তুলল তাদের সম্মিলনের প্রচেষ্টাকে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলে একই পতাকাতলে সমবেত হতে ব্যর্থ হলেও তারা চুপচাপ বসে থাকল না। কখনো এককভাবে, কখনো আবার কয়েকজনে একত্রে জোট বেঁধে সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। কিন্তু খ্রিস্টান শাসকদের তুলনায় মাহমেতের শক্তি-সামর্থ্য ছিল অনেক বেশী। তাদের সকল প্রচেষ্টা তিনি অনায়াসেই ধূলিসাৎ করে দেন। বস্তুতপক্ষে খ্রিস্টানদের এ ধরনের প্রয়াসগুলো মুসলমানদের জন্য সুফল বয়ে আনল।-বিস্তৃত হল সাম্রাজ্যের সীমানা। ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে এথেন্স মুসলমানদের দখলে চলে আসে। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে সার্বিয়া এবং বসনিয়ার স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হল। দেশ দু'টি অন্তর্ভুক্ত হল তুর্কী সাম্রাজ্যের সঙ্গে। পরের বছর মোরিয়া চলে এল মুসলমানদের অধিকারে।

পূর্ব আনাতোলিয়ার তুর্কোম্যান বংশের একটি গোত্রের নাম হোয়াইট শীপ। এই গোত্রের সর্দারের নাম উজুন হাসান। ত্রিবিজোনদের সম্রাটের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলে। সিনোপ এবং কারামানের আমীরেরাও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। সম্মিলিতভাবে তারা একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল সম্রাট মাহমেতের জন্য মস্তবড় একটা চ্যালেঞ্জ। সুলতান দৃঢ়তার সাথে এই মিলিত বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য তৈরী হলেন। স্থির করে নিলেন যুদ্ধ পরিকল্পনা। তিনি এত দ্রুততার সাথে পদাতিক এবং নৌসেনাদের নিয়ে অগ্রসর হলেন যে, সিনোপে এবং কারামানের আমীরেরা একেবারেই হকচকিয়ে যায়। তারা প্রত্যাহার করে নেয় মৈত্রীর বন্ধন। সুলতানের অগ্রসরমান বাহিনীর মুকাবিলায় উজুন হাসান পশ্চাদপসরণ করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে মাতা সারাহ খাতুনকে পাঠিয়ে দেয় সুলতানের দরবারে।

উজুন হাসানের মাতামহী ছিলেন ত্রিবিজোনদের একজন রাজকুমারী। সারাহ খাতুন ছিলেন সিরিয়ার একটি খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে। অপরদিকে হাসান বিয়ে করে- ছিলেন ত্রিবিজোনদের সম্রাট জনের মেয়েকে। আলোচনার শুরুতে সারাহ খাতুন ছেলের রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি ত্রিবিজোনদের রক্ষার ব্যাপারে অনুনয়-বিনয় শুরু করেন। তিনি সুলতানকে বললেন ত্রিবিজোনদের মত সাধারণ রাজ্যের প্রতি কেন তোমার দৃষ্টি পড়ল। এর চেয়ে ভাল কোন অঞ্চলের জন্য কেন শরীর নিপাত করছ না। এ প্রশ্নের জবাবে মাহমেতের জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি বললেন-ইসলামের তলোয়ার রয়েছে আমার হাতে। ধর্মের জন্য কাজ না করলে আল্লাহ্‌র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

যাই হোক, সেবারের মত বিষয়টি নিষ্পত্তি হলেও সম্রাট ডেভিডের আমলে আবার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। ডেভিডের পূর্বসূরী এবং তার ভ্রাতা সম্রাট

জন সুলতান মাহমেতকে কর হিসেবে বেশ কিছু অর্থ প্রদান করেছিল। ক্ষমতায় আসার পরে ডেভিড সেই অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য দাবী জানায়। এভাবেই প্রজ্বলিত করে দেয় যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গকে। সুলতান এবার বিহিত ব্যবস্থা নিলেন। জলভাগ এবং স্থলভাগ দিয়ে ত্রিবিজোনদ আক্রমণ চালালেন। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট সুলতান মাহমেত সসৈন্যে শহরে প্রবেশ করেন। এভাবেই ত্রিবিজোনদ সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। নিঃশেষ হয়ে গেল গ্রীকদের স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন।

সিকান্দার বেগের মৃত্যুর পর তুর্কীরা আলবেনিয়া দখল করে নেয়। তবে কনস্টানটিনোপল দখলের পর মাহমেতের অন্যান্য বিজয়ের মধ্যে ক্রিমিয়া বিজয় ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিমিয়ার অভিযান চালানোর তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে-গোড়া থেকেই জেনোয়ার সঙ্গে সুলতানদের বৈরীভাব ছিল। ক্রিমিয়ার তাতারদের রাজা, রাজা খানের বিরুদ্ধে তার ভাইয়েরা বিদ্রোহ করে এবং খান ক্ষমতাচ্যুত হয়। বিদ্রোহী ভাইদের বিরুদ্ধে সে সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই প্রেক্ষাপটেই সুলতান ক্রিমিয়ায় অভিযান চালান। ক্রিমিয়া অভিযানে তুর্কী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আহমেদ নামে একজন তুর্কী সেনাপতি। লোকে তাকে ডাকত কাদুক বলে। জন্মগতভাবে সে ছিল খ্রিস্টান। পরে অবশ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে কারামানিয়া, উজুন হাসান এবং ত্রিবিজোনদে অভিযান চালিয়ে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অবশেষে ১৪৭৩ থেকে ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাহমেতের প্রধান উযীরের দায়িত্ব পালন করে। তুর্কীদের বিশাল নৌবহর এবং চল্লিশ হাজার সৈন্য ক্রিমিয়া অভিযানে অংশ নেয়। মাত্র চার দিনের মধ্যে ক্রিমিয়ার পতন ঘটে এবং পরবর্তী তিন শতাব্দীর জন্য ক্রিমিয়ার খানেরা তুর্কী সালানাতের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়।

সুলতান মাহমেত ১৪৫১ থেকে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা ৩১ বছর রাজ্য শাসন করেন। ইতিহাসের পাতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিা করেন একজন বিজয়ী বীর হিসেবে। এই দীর্ঘদিনের বিজয় ইতিহাসে তুর্কীরা মাত্র দু'বার বাধার সম্মুখীন হয়।১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত শহর বেলগ্রেড অবরোধ করেন। তখনকার দিনে বেলগ্রেডকে বলা হত হাঙ্গেরীয় প্রবেশদ্বার অথবা চাবি। হাঙ্গেরীর একটি শক্তিশালী বাহিনী বেলগ্রেডের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। হোনিয়াদি ছিলেন তাদের সেনাপতি। ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে ছিলেন পোপ দ্বিতীয় কালিকাটাস। তিনি খ্যাতনামা ধর্মপ্রচারক সেন্ট জন কেপিসটেরালের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠান। ২১ জুন তারিখে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে জানিসারিসেরা গভীর পরিখা অতিক্রম করে। তারা সাফল্যের সঙ্গে শহরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করে। এর পরই তাদের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হল। ব্যর্থ হল শহরে প্রবেশ করতে। শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে চরম মার খেল। এই যুদ্ধে তুর্কী বাহিনীর

রসদ সম্ভারের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হল। অনেক জীবন নাশ হল। অবশেষে সুলতান অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হলেন। পরিহার করলেন বেলগ্রেড দখলের স্বপ্নকে।

মাহমেত দ্বিতীয় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন জীবনের ক্রান্তিলগ্নে। টেমপালারের নাইটেরা ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে রোড্‌সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় থেকেই তারা মুসলমানদের বিরোধিতা করতে শুরু করে। কখনো লুটতরাজ, কখনো আবার বর্বরতা এবং ধর্ম উন্মাদনার ছদ্মাবরণে মুসলমানদের অবিরাম উত্ত্যক্ত করতে থাকে। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মাহমেত রোড্‌সে একটি অভিযান চালান। ধর্মান্তরিত মেসিহ্ পাশাকে নিয়োগ করলেন সেনাপতি হিসেবে। ১৬৩টি যুদ্ধজাহাজ, শক্তিশালী একটি বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে তিনি রোড্‌স অবরোধ করেন। শুরু হয় আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ। অবশেষে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই তুর্কী বাহিনী চূড়ান্ত আক্রমণ চালায়। গোলন্দাজেরা প্রতিরক্ষা দেয়ালের বেশ খানিকটা অংশ বিচূর্ণ করে দেয়। আক্রমণকারী বাহিনী সাহসিকতার সাথে এই পথ দিয়ে প্রতিরক্ষা বাঁধ অতিক্রম করে।

চূড়ান্ত বিজয় যখন হাতের মুঠোয়, ঠিক তখনই মেসিহ পাশা একটি নির্দেশ জারি করলেন যে, রোড্‌সে কেউ লুটতরাজ করতে পারবে না। সম্পদ সংগ্রহ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। এর পরই সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তুর্কী বাহিনীতে দেখা দেয় চরম উত্তেজনা, বিরক্ত এবং অনাগ্রহ। যারা প্রতিরক্ষা দেয়ালের বাইরে অবস্থান করছিল তারা আক্রমণকারী বাহিনীর সহযোগিতায় অস্ত্র ধরতে অস্বীকার করল। আক্রমণকারী যে দলটি শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল, সংখ্যা স্বল্পতার কারণে তারা বেশীক্ষণ নাইটদের মুকাবিলা করতে পারল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। অনন্যোপায় হয়ে মেসিহ্ পাশা অবরোধ তুলে নিলেন। এভাবেই রোড্‌স অর্ধ শতাব্দীর জন্য পরাধীনতার হাত থেকে অব্যাহতি পেল। মুসলমানদের মুকাবিলায় নাইটেরা চমৎকার নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিল। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেনাপতি মেসিহ পাশা যদি এতখানি কঠোর না হতেন, অথবা তুর্কী সেনারা যদি এতখানি ধনলিপ্সু না হত, তাহলে রোড্‌সের পতন ছিল অবধারিত।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেদিন রোড্‌স অভিযানে মুসলিম সেনারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, ঠিক সেদিনই তুর্কীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে আরেকটি অনবদ্য ঘটনার সংযোগ ঘটে। এই ঘটনার নায়ক ছিলেন ক্রিমিয়া বিজয়ী আহমদ কাদুক। এই দিনেই তুর্কী বাহিনী সর্বপ্রথম ইটালীর দক্ষিণ উপকূলে পদার্পণ করে। সদলবলে তিনি আপুলিয়ানের তীরে অবতরণ করেন এবং ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট অটরেনটো শহরটি দখল করে নেন। বলা বাহুল্য, এই শহরটিকেই বলা হত ইটালীর প্রবেশপথ।

অটরেনটো দখল করার মধ্য দিয়ে মাহমেত শক্তিশালী একটি শহর এবং পোতাশ্রয়ের কর্তৃত্ব লাভ করলেন। এবার তার বাহিনীর ইটালীতে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হল।

১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের বসন্তের শুরুতে বসফরাসের এশীয় উপকূল ধরে আরেকটি অভিযান চালানোর আয়োজন শুরু হল। সুলতান মাহমেত বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধের ফলাফল প্রধানত পরিকল্পনার গোপনীয়তা এবং নিখুঁত বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। এই নীতিটি তিনি মেনে চলতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। ফল এই দাঁড়াল যে, এই অভিযান কার বিরুদ্ধে কোথায় পরিচালিত হবে-তা কেউ জানত না। অভিযানের শুরুতে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযানের লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে মাহমেত বলেছিলেন যে-আমার একটি দাড়িও যদি এ বিষয়ে জানত, তাহলে আমি তাকে তুলে ফেলতাম। তাকে নিক্ষেপ করতাম জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। এমনিভাবেই গোটা ব্যাপারটা সকলের কাছে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত রয়ে গেল। তবু সুলতানের নির্দেশমত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলল। কিন্তু আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সুলতান মাহমেতের জীবনের শেষ ক্ষণটি ঘনিয়ে এল। হঠাৎ করেই তাঁর জীবনের প্রাণপ্রদীপ নিভে গেল। এ সময়ে তিনি তাঁর বাহিনীর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এই দিনটি ছিল ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ৩ তারিখ।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমেত ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সেনানায়ক, বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক এবং দক্ষ প্রশাসক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানেরা যে কনস্টাটিনোপল দখলের স্বপ্ন দেখতেন মাহমেতের নেতৃত্বের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। কনস্টানটিনোপল বিজয় ছাড়াও দুটি ব্যাপারে তাঁর চমৎকার সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। প্রথমত, দ্বিতীয় রোম হিসেবে খ্যাত এই শহরটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় খ্রিস্টানদের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সে ব্যাপারেও সুলতান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সময়ে পূর্ব ইউরোপ থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের ব্যাপারে খ্রিস্টানরা উপর্যুপরি উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সুলতানের বিচক্ষণতা এবং নৈপুণ্যের কাছে তাদের সমস্ত আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে যায়।

তিনি তুর্কী সালতানাতকে এত মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন যে, মাহমেতের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কীদের বিজয় অভিযান রুদ্ধ হয়ে পড়েনি। বরং পরবর্তী দুই শতাব্দীব্যাপী তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। মাহমেতের উত্তরসুরি সুলতান সোলায়মানের আমলে তুর্কী সালতানাত গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। সে আমলের খ্যাতিমান শাসকগণের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সবার উপরে। তিনি ১৫২০ থেকে ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা এবং দৃঢ়তার সাথে রাজ্য শাসন করেন। রোড্সে অভিযান চালিয়ে মুসলমানরা যে ব্যর্থতার গ্লানি মাথা পেতে নিয়েছিল, মহান সুলতান সোলায়মানের বদৌলতে তা দূরীভূত হয়। বেলগ্রেড এবং রোড্সে যথাক্রমে ১৫২১ এবং ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে চলে আসে ইসলামের পতাকাতলে।

শেষ কথা

এই পুস্তকে ১৪টি ঐতিহাসিক যুদ্ধের বিবরণ স্থান পেয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধই ইসলামের ইতিহাসের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে ৬২৫ থেকে শুরু করে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে। দিল্লী থেকে শুরু করে প্যারিস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন রণাঙ্গনে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ সম্পর্কিত এই বিবরণগুলো একজন নিষ্ঠাবান পাঠকের দৃষ্টিকে কেবলমাত্র সামরিক বিষয়াবলীর মধ্যে শৃঙ্খলিত না করে আরও সুদূরপ্রসারী এবং ব্যাপকতর করে তুলবে।

যুদ্ধ হল বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার শক্তির পরীক্ষা। এবং বড় রকমের যে কোন যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে তলোয়ারের সিদ্ধান্তের উপর। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে খুবই তীব্র এবং ভয়ংকর রকমের নিরপেক্ষ। অনুরূপভাবে যুদ্ধের ফলাফলগুলো যত নির্মম এবং অপ্রিয় হোক না কেন, এটাই বাস্তব এবং ন্যায়সংগত। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী এককভাবেই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র নয়।

এই পুস্তকে গুরুত্বপূর্ণ যেসব যুদ্ধ আলোচিত হয়েছে, সেগুলোতে তদানীন্তন আমলের বড় বড় এবং শক্তিমান প্রায় সবগুলো জাতি সম্পৃক্ত ছিল। বিবদমান দলের এক পক্ষে ছিল মুসলমান এবং অন্যপক্ষে ছিল অন্যান্য জনগোষ্ঠী। মুসলমানদের মধ্যে ছিল আরববাসী, বারবার, তুর্কী, কুর্দী এবং আফগানেরা। বিপক্ষে ছিল রোমান, পারসিক, ভিসিগোথ, ফরাসী, ক্রুসেডার, মোঙ্গল এবং রাজপুতেরা। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, যে পক্ষ বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে, প্রমাণ করতে পেরেছে তাদের উপযুক্ততা, বিজয় পতাকা তাদের দিকে চলে গেছে। এবং প্রতিটি যুদ্ধের জন্যই এ কথা সত্য।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা ছিল মরুভূমির সন্তান। পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সাম্যের ব্যাপারে তাদর সহজাত অনুভূতি ছিল খুবই প্রবল। ইসলাম তাদের সেই সহজাত অনুভূতির তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এতদসঙ্গে সংযোগ করে ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতি। মুসলমানরা যে সমস্ত জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক দিকে ছিল সুবিধাভোগীরা, অপরদিকে নির্যাতিতেরা । সুবিধাভোগীদের দলে ছিল সামন্ত প্রভু এবং গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। অপদিকে ভূমিদাস, ধর্ম এবং ঐক্যবদ্ধ আরব মুসলমানেরা যখন

বিজয়ের বেশে অবতীর্ণ হয় তখন নির্যাতিত ও বঞ্চিতেরা তাদের গ্রহণ করে বীর পুরুষ হিসেবে। মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়েই যেন তাদের মুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বিরোধী পক্ষের এই অনৈক্যকে মুসলমানরা খুব ভালভাবে কাজে লাগায়। সহজেই বিপর্যস্ত করে দেয় শত্রুপক্ষকে।

যুদ্ধগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মুসলমানরা যখন যে অঞ্চলে গেছে, সেখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদেরকে মুক্তির দিশারী হিসেবে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তারা ধরে নিয়েছে যে. মুসলমানরাই তাদেরকে সামন্ত প্রভু এবং যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ ও উৎপীড়ন, অজ্ঞতা এবং অসহিষ্ণুতার কঠোর শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। বস্তুতপক্ষে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর এই অনুভূতি ছিল বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের ক্ষেত্রে মস্তবড় একটি সহায়ক শক্তি।

কিন্তু কালের বিবর্তনে গোটা পরিস্থিতি ভিন্নরূপ ধারণ করল। মুসলমানরা যে কেবলমাত্র অপরের বন্ধন-শৃঙ্খলকে উন্মোচন করতে ব্যর্থ হল তাই নয়, তারা নিজেরাই উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। শৃঙ্খলিত করল স্বজাতির লোকদের।

সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এককালের ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতির মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদের সৃষ্টি হল। তারা বিভক্ত হয়ে গেল উত্তর আরব, দক্ষিণ আরব, বারবার প্রভৃতি দল-উপদলে। ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলমান জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হল। কালক্রমে জাতির মান-মর্যাদা এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণে তাদের আত্মত্যাগের মনোভাব তিরোহিত হল।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয়ের পেছনে এমন কোন ধর্মীয় ফর্মুলা ছিল না, যা আবৃত্তি করায় ম্যাজিকের মত ফল পাওয়া গেছে। বরং তখনকার মুসলমানগণের অন্তরে জিহাদের প্রেরণা ছিল খুবই প্রবল। এই জিহাদী প্রেরণাই তাদেরকে উন্নতমানের যোদ্ধায় পরিণত করেছিল।

সেই আরব যোদ্ধারাই পরবর্তী সময়ে জিহাদের মূল প্রেরণা থেকে সরে আসে। শুরু হয় তাদের বিপর্যয়। যে নিয়ম-পদ্ধতি বা ফর্মুলার বদৌলতে তারা সকলের শীর্ষে পৌঁছেছিল, সেই সূত্রগুলো তখন তাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারল না। জিহাদের প্রেরণা পরিত্যাগ করার ফলেই এককালের শাসকরা নেমে এল প্রজাদের স্তরে। স্পেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং ট্রান্স অক্সিয়ানা সকল অঞ্চলের জন্য একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

বস্তুতপক্ষে এটাই ইতিহাসের শিক্ষা এবং যুগ যুগ ধরে মানবেতিহাসে এই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মানব জাতিকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যারা সবচেয়ে বেশী যোগ্য, তুলনামূলকভাবে যাদের উপযুক্ততা বেশী, আল্লাহ্ পাক তাদের উপরই পৃথিবীর শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। যতদিন তারা এই যোগ্যতা ধরে রাখতে পারবে, কেবলমাত্র ততদিন এই সুযোগ পাবে।

পাদটিকা
ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিবদমান পক্ষ

পরিশিষ্ট

বিবদমান পক্ষের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীগণ, মধ্যযুগে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিবদমান পক্ষের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তাদের সে বিবরণ অনায়াসেই সবাইকে হতবাক করে দেয়। কারণ, সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তাদের বর্ণনার মধ্যে যেমন অতিরঞ্জন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরস্পর বিরোধিতা। এ ধরনের অতিরঞ্জন এবং পরস্পর বিরোধিতায় পশ্চাতে অবশ্য অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমত, সেনানায়কগণ যুদ্ধে লিপ্ত সৈন্যদের সঠিক সংখ্যা নিরুপণের ব্যাপারে বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। দ্বিতীয়ত, কয়েক দশক বা শতাব্দীর পর যে সব ঐতিহাসিক যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করতেন, তাদের নিকট বিবদমান পক্ষের সৈন্য বা শক্তির হিসাব সহজলভ্য ছিল না। নিজেদের বিচার-বিবেচনা এবং হিসেবমত তারা বিবদমান পক্ষের শক্তি সম্পর্কে বিবরণ দিতেন। ফলে তাদের বর্ণনার যথার্থতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যায়।[১]

বস্তুতপক্ষে যে কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে লিপ্ত একটি বাহিনীর শক্তি নিরুপণ করা খুবই দুষ্কর এবং জটিল ব্যাপার। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণের সামনে রয়েছে দু'ট প্রধান সীমাবদ্ধতা। প্রথমত, দেশের প্রতি ভালবাসা এবং ধর্মীয় অনুভূতির কারণে তারা সব সময় শত্রুপক্ষের শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে থাকে। অপরদিকে নিজেদের শক্তিকে উপস্থাপন করে খুবই সীমিত পরিসরে। নিজেদের বিজয়কে অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল করা এবং ন্যায়ের পথে আছে বলেই আল্লাহ্‌র সাহায্য তারা পেয়েছে–এ ধরনের একটি ধারণা সৃষ্টি করাই তাদের মূল লক্ষ্য। অপরদিকে, এভাবেই তারা পরাজয়ের গ্লানিকে নিষ্প্রভ করার চেষ্টা করে। এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে, বৃহৎ শক্তির মুকাবিলায় এ ধরনের বিপর্যয় অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়।

দ্বিতীয়ত, পুরাকালের ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্পর্কে বড় একটা অবহিত ছিলেন না। তাঁরা বিভিন্ন জাতির দুর্বার গতি এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তি দেখেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো বিবেচনা করে দেখেননি যে, একটি বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর তীব্রতা ও গতি। এবং সে কারণেই তারা বাহিনীর বিশালতা দিয়ে শক্তির ব্যাখ্যা করেছে। উপেক্ষা করেছে তাদের দ্রুতগতি এবং উন্নততর সমরকুশলতাকে। বস্তুতপক্ষে এই

দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এ ধরনের একটি অলীক ধারণার উদ্ভব হয়েছে যে, অশিক্ষিত যাযাবরেরা কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের কারণেই রোমানদের সুশৃংখল, সুসংগঠিত এবং সুশিক্ষিত বাহিনীকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে কতকগুলো বিষয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। যেমন, একটি বিশাল বাহিনী এবং তাদের শিবির অনুসারীদের দূরের পথ অতিক্রমে সমস্যা, ওয়াকুসার মত (সেখানে ইয়ারকুমের লড়াই সংঘটিত হয়) নির্জন প্রান্তরে একটি বিশাল বাহিনীর দীর্ঘদিন অবস্থান, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদার নিশ্চয়তা বিধান, প্রভৃতি বিষয় কখনো তাদের চিন্তার জগতকে আলোড়িত করেনি।

রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা

ইয়ারমুকের ময়দানে রোমান বাহিনীর বিপর্যয় সম্পর্কে রোমান ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ নীরব। ঐতিহাসিক গীবনের ভাষ্য অনুসারে রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০,০০০। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় অবশ্য যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। ইবনে ইসহাক তাদের সৈন্য সংখ্যা ১,০০,০০০ বলে উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১২ হাজার আরমেনীয় এবং ১২ হাজার খ্রিস্টান আরব। অপরদিকে ঐতিহাসিক ওয়াকিদির বর্ণনা অনুসারে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৪০,০০০।

জাস্টিনিয়ানের শাসনামলে (৫২৭-৬৫) বেলিসারিয়াস এবং নার্সেস-এর নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইতালী, সিসিলি, দক্ষিণ স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকা চলে আসে রোমানদের দখলে। কিন্তু পশ্চিমে তাদের দীর্ঘদিনের অভিযান এবং পারসিকদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ রোমানদের দুর্যোগের কারণ হয়ে দেখা দেয়। রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হলেও রাষ্ট্রের অর্থনীতি একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। ৫৬৫ থেকে ৬১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট চারজন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন থেকেই দুর্যোগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্পেন, ইতালী এবং বলকান অঞ্চলের বৃহদাংশ রোমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। বিশেষ করে সম্রাট ফোকাসের (৬০২-৬১০) আমলে অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ সময়ে শ্লাভ এবং আভারসরা বলকান অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। পারসিকরাও রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একনাগাড়ে ২৬ বছর এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

হেরাক্লিয়াস-এর শাসনামলের (৬১০-৪১) প্রথম ১২ বছর ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ। এভারসরা কনস্টানটিনোপলের খুব কাছাকাছি এসে ব্যাপক আক্রমণ চালায়। অপরদিকে পারসিকরাও ইচ্ছামত সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং আনাতোলিয়া অঞ্চলে আক্রমণ করে। সমাপ্তিতে অবশ্য হেরাক্লিয়াস বিজয় লাভ করেন। নিদারুণভাবে পরাস্ত করেন পারসিকদের। ব্যাপক অভিযান (৬২২-৬২৮) চালিয়ে হেরাক্লিয়াস পুনরুদ্ধার করেন এশীয় অঞ্চল। কিন্তু দীর্ঘদিনের যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ভেঙ্গে যায়।

ইতিমধ্যে বলকান অঞ্চল আবার অশান্ত হয়ে উঠে। রোমানদের প্রতিরোধের মুখে আরবীয়দের চাপ অব্যাহত থাকে। অবশেষে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল চূড়ান্ত আক্রমণ। বিজয়ীর বেশে আরবীয়রা ছুটে বেড়াল জর্দান, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের বিশাল অংশে। ফলে হেরাক্লিয়াসের জনশক্তি বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেল। ভৌগোলিক অর্থে বিচার করতে গেলে জাস্টিনিয়ানের আমলে রোমানদের যে জনশক্তি ছিল, হেরাক্লিয়াসের আমলে তা অর্ধেকের চেয়েও কমে গেল।

বলা হয়ে থাকে যে, জাস্টিনিয়ানের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০।[২] তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছিল পেশাদার যাযাবর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে রোমান সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০ হাজারের মত। উপরন্তু ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি এবং ইতালী থেকে কোন সৈন্য যোগ দেয়নি। সুতরাং এই যুদ্ধে রোমান সৈন্য সংখ্যা ছিল বড় জোর ৫০ হাজার। কিছু সংখ্যক পেশাদার যাযাবর অবশ্য এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ১০ হাজারের বেশী নয়। কারণ, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে রোমান সম্রাটের পক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধের সময় লুটতরাজের মাধ্যমে সম্পদ আহরণের আশায় যাযাবরেরা অনেক সময় যুদ্ধে অংশ নিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের (মুসলমানদের) আর্থিক অসচ্ছলতার কথা সবাই জানত। ফলে ইয়ারমুকের যুদ্ধের ব্যাপারে যাযাবরদের অন্তরে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

সম্ভবত পারসিকদের সঙ্গে রোমানদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর রোমান সাম্রাজ্য সুসংগঠিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যকে পরিকল্পিতভাবে কতগুলো সামরিক জেলায় বিভক্ত করা হয়। একটি জেলাকে বলা হয় থেমেস। প্রত্যেক থেমেসে নির্মাণ করা হয়েছিল এক একটি সেনানিবাসে। সেনানিবাসের অধিনায়কই মূলত থেমেসের আওতাধীন অঞ্চল শাসন করত। বলকান অঞ্চলে এ ধরনের তিনটি এবং এশিয়া মাইনরে ৭টি থেমেস ছিল। তুলনামূলকভাবে বলকান অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল নিরীহ প্রকৃতির। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে তাদের তেমন একটি আসক্তি ছিল না। উপরন্তু এভারস্ এবং শ্লাভরা (পূর্ব ইউরোপের অধিবাসীরা) অবিরত বলকান অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালাত। ফলে স্বদেশের নিরাপত্তার কারণেই এতদঞ্চলের সৈন্যরা সর্বশক্তি নিয়ে ইয়ারমুক প্রান্তরে হাযির হতে পারেনি।

সামরিক জেলা পর্যায়ের একটা সেনানিবাসে ৮ থেকে ১২ হাজার সৈন্য থাকত। সেনানিবাসের নিরাপত্তা এবং প্রহরার জন্য সব সময় কিছু সংখ্যক সৈন্য মজুদ রাখতে হত। দেখা গেছে যে, একটি সেনানিবাস থেকে সাধারণত ৫ থেকে ৯ হাজার সৈন্য কোন যুদ্ধ অভিযানে অংশ নিতে পারত। অর্থাৎ সবগুলো সেনানিবাস থেকে সৈন্য সংগ্রহ করলেও রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াত ৪৫ থেকে ৫০ হাজার। অবশ্য কনস্টানটিনোপল, এন্টিয়ক এবং প্যালেস্টাইনেও কতগুলো সামরিক ঘাঁটি ছিল। রোমান সম্রাটের পক্ষে এসব অঞ্চল থেকে প্রায় ১০/১২ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল।

ঐতিহাসিক ওমানের মতে রোমান বাহিনীর ভারী অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। ওমানের এই বর্ণনাকে যথার্থ বলে ধরে নিলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রোমান পদাতিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫০ হাজার। তন্মধ্যে ভারী পদাতিক সৈন্য ছিল ১৮ থেকে ২০ হাজারের মত। এই যুদ্ধে রোমানদের হাল্কা অশ্বারোহী দল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ কোন মন্তব্য করেননি। তবে একথা সত্য যে আরব বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে অংশ নেয়। এবং এরা ছিল হাল্কা অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত।

আরব বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান বাহিনী

ঐতিহাসিকগণের মতে প্রায় ৬০ হাজার খ্রিস্টান আরব রোমানদের পক্ষে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নেয়। অবশ্য ইবনে ইসহাক খ্রিস্টান আরবীয়দের সংখ্যা মাত্র ১২,০০০ বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তাঁর এই বিবরণ অধিকতর বাস্তবধর্মী এবং যুক্তিসঙ্গত। প্রধানত, ৪টি কারণে এই সংখ্যাকে সত্য বলে ধরে নেয়া যায়।

প্রথমত, সিরিয়ায় বসবাসকারী আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। তাদের পক্ষে বিপুল সংখ্যায় যুদ্ধে অংশ নেয়া অসম্ভব ছিল।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় খ্রিস্টানরা ছিল নেসটোরিয়ান এবং মানোফিসাইট দলের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের মতে এরা ছিল বিপথগামী। এই অজুহাতে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রিস্টান আরবদের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছে। খ্রিস্টান আরবরা বিশ্বাস করত যে, মুসলমানরা বিজয়ী হলে তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং তারা মুক্তি পাবে। অবশ্য বীর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের একটা অভিযোগ ছিল। তারা বলত যে এককালে যারা অত্যাচার, নির্যাতনের ব্যাপারে ছিল সিদ্ধহস্ত তাদেরকে পরাজিত করার পরও মুসলমানরা তাদের সঙ্গে অতি সদয় এবং সহনশীলতার সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে।

তৃতীয়ত, ইয়ারমুকের যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানরা খ্রিস্টান আরব অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় এতদঞ্চল থেকে মুসলমান সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সকল প্রকার কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অথচ রোমানরা তখনো মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া অঞ্চল পুনঃদখল করতে পারেনি। ফলে খ্রিস্টান আরবরা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহ বোধ করেনি।

চতুর্থত, পালেস্টাইন এবং এন্টিয়কে শক্তিশালী কোন সামরিক বাহিনী ছিল না। সেখানকার দুর্গগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য বাদ দিলে খুব সামান্য সংখ্যক সৈন্যকেই যুদ্ধের ময়দানে পাঠান যেত।

এসব বিষয় সামনে রেখে বিবেচনা করলে ইবনে ইসহাকের বিবরণ সত্য বলেই ধারণা করা যায়। বলা যেতে পারে যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে খ্রিস্টান আরবদের সংখ্যা ১২,০০০ মত ছিল। এতদসঙ্গে একথাও বলা যেতে পারে যে, এই ১২০০০-এর

মধ্যে ঘাষানিদ আরবের সংখ্যা ছিল ৫ থেকে ৬ হাজার। এরা ছিল হাল্কা অশ্বারোহী। অবশিষ্টরা ছিল পদাতিক সৈন্য।

মুসলমানদের সামরিক শক্তি

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানদের চেয়ে মুসলিম বাহিনী ছিল খুবই দুর্বল। অবশ্য প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে এই সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যোগদানকারী ৬,০০০ সৈন্যের অতিরিক্ত বাহিনীসহ মুসলমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬,০০০। ওয়াকিদির মতে সর্বমোট ৪০,০০০ মুজাহিদ বিশাল রোমান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে। ইবনে ইসহাকের মতে ২৪,০০০ বীর মুজাহিদ এই যুদ্ধে অংশ নেয়। ঐতিহাসিক ডেভিসের মতে খুবই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনী বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের মত একটি বিশাল এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য দখল করে নেয়।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর শক্তি নিরুপণের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয় বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। প্রথমত, গোড়ার দিকে নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে অনেক স্বেচ্ছাসেবী মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিত। বলতে গেলে এটা ছিল একটা নিয়মিত ব্যাপার। স্বেচ্ছাসেবীদের বিশেষ কোন দলে যোগ দেয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। এটা নির্ভর করত তাদের ইচ্ছার উপর। লক্ষ্য করা গেছে যে, যুদ্ধে সাফল্য লাভের ব্যাপারে যে অধিনায়কের সুনাম-সুখ্যাতি সবচেয়ে বেশি, অথবা যে দলে স্বেচ্ছাসেবীদের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যরা সাধারণত সেই দলে যোগ দিত।

দ্বিতীয়ত, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে মুসলমান সৈন্যদের মোট পাঁচটি দল ছিল। পাঁচটি দলের পাঁচজন অধিনায়কের মধ্যে ছিলেন মহাবীর খালিদ, আবূ উবায়দা, আমর বিন আল আস, সুরাহ্ বিল এবং ইয়াজিদ বিন আবূ সুফিয়ান। ইয়ারমুকের যুদ্ধে অশ্বারোহী রিজার্ভ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ। এই দলের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪,০০০। সে হিসেবে পাঁচটি দলের মোট অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বেশীর ভাগই ছিল অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য সংখ্যা সর্বসাকুল্যে সম্ভবত, ১০ থেকে ১২ হাজার ।

তৃতীয়ত, এটা জানা কথা যে, রিদ্দা যুদ্ধের বিপথগামীদের ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা) কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইরাক অথবা সিরিয়ার কোন অভিযানে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ তিনি দেননি। ফলে সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির তেমন কোন সুযোগ ছিল না। অবশ্য পরবর্তী সময়ে খলিফা ওমর এই নীতির সংশোধন করেন এবং রিদ্দা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মুসলিম বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন দেন। তিনি এই নিয়ম প্রবর্তন করেন কাদিসিয়া (৬৩৭) যুদ্ধের অল্প কিছুকাল পূর্বে।

চতুর্থত, ইয়ারমুকের ময়দানে মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই উভয় বাহিনী পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রায় মাসখানিক এই সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে সংঘর্ষের শুরুতে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৪,০০০। অবশ্য সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার প্রায় ৪ সপ্তাহ পরে এবং মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আরও ৬,০০০ বীর মুজাহিদ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। তখন তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০। সেই হিসেবে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে যথার্থ এবং সংগত বলে ধরে নেয়া যায়।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর গঠনপ্রণালী সম্পর্কে খুব বেশি একটা জানা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রধানত, অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠে। সম্ভবত, ৩০,০০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ১০,০০০ ছিল পদাতিক। অবশিষ্ট ২০ হাজারের সকলেই ছিল অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম বাহিনী এবং এর রেজিমেন্ট ব্যবস্থা

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী কতকগুলো রেজিমেন্টে বিভক্ত ছিল। বাহিনীর মধ্যভাগটি গড়ে উঠেছিল এ ধরনের মোট ২০ টি ইউনিটের সমন্বয়ে। ডান এবং বাম প্রান্তের প্রতিটিতে ছিল ১০টি ইউনিট। ঐতিহাসিকগণের এই বক্তব্যকে সত্য বলে ধরে নিলেও বলা যেতে পারে যে, হয়ত একমাত্র খালিদের পক্ষেই তাঁর দলকে এভাবে সাজানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু গোটা মুসলিম বাহিনীকে এভাবে সংগঠিত করা সম্ভব ছিল না। এরও কতগুলো কারণ রয়েছে, স্বেচ্ছাসেবী মুসলমানরা সাধারণত গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে দল গঠন করত। ফলে কোন দল ছোট হত, কোনটি বা বড়। এভাবেই তারা অবতীর্ণ হত যুদ্ধের ময়দানে। দ্বিতীয়ত নিয়মিত সৈন্যরা ছিল ভীষণ রকমের দুর্ধর্ষ এবং স্বাধীনচেতা। রেজিমেন্টের মাধ্যমে সংগঠিত করলে তাদের গোত্রীয় বন্ধন ব্যাহত হত। স্বাধীনচেতা সৈন্যরা এ ধরনের পরিবর্তন মেনে নিত কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তৃতীয়ত, ইতিপূর্বে মুসায়লামার বিরুদ্ধে রিদ্দা যুদ্ধের সময় খালিদ তাঁর বাহিনীকে রেজিমেন্টের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে বিফলে যায়। অবস্থার ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি পুনরায় মুসলিম বাহিনীকে গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে সংগঠিত করেন। ফলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি অনুরূপ পদক্ষেপ নেবেন এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সংগঠন এবং কৌশল

মুসলিম বাহিনীর প্রান্তভাগের উপর ভারি অশ্বারোহী রোমান বাহিনীর তীব্র আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণ বুঝতে হলে মূল বাহিনীর সংগঠনপ্রণালী এবং কৌশল সম্পর্কে বুঝতে হবে। ব্যাটেলিয়ন ছিল রোমান বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোর মৌলিক ইউনিট। প্রতি ব্যাটেলিয়নে সৈন্য থাকত প্রায় ৫০০। তিনটি ব্যাটেলিয়নের সমন্বয়ে গড়ে উঠত একটা ব্রিগেড। আবার যুদ্ধের ময়দানে দুই থেকে

চারটি ব্যাটেলিয়ন নিয়ে গঠিত হত একটি ডিভিশন। প্রত্যেক ডিভিশনের একটি পতাকা থাকত। কেবল পতাকা বা ব্যানার হিসাব করে যাতে সৈন্য সংখ্যা নিরুপণ করা না যায় সে জন্য পরিকল্পিতভাবেই তারা ডিভিশনের অধীন ব্রিগেডের সংখ্যা কখনো কম, কখনো বেশি রাখত। তবে বিরাট আকারের কোন যুদ্ধে ডিভিশন বা কলামের ব্যাপারটি ছিল একেবারেই গৌণ। সেখানে রণকৌশলের মূল ভিত্তি ছিল ব্রিগেড।

একটি রোমান ব্রিগেডে দুটো ভাগ ছিল। একটি ভাগ দাঁড়াত সামনে, আরেকটি ঠিক তারই পশ্চাৎভাগে। অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্যভেদে প্রতি ভাগের সৈন্য সংখ্যাও এক এক রকম হত। যেমন অশ্বারোহীর বেলায় প্রতি ভাগে ১৩টি সারি ছিল। আবার পদাতিক সৈন্যের বেলায় সারির সংখ্যা ছিল ৮ থেকে ১৬। এটা নির্ভর করত সৈন্যসংখ্যা এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহের দৈর্ঘের উপর। পদাতিক সৈন্যদের ব্রিগেডের সম্মুখভাগের সৈন্যরা যেখানে দাঁড়াত পশ্চাৎভাগের সৈন্যরা দাঁড়াত তার ঠিক ৩০০ গজ দূরে। অবশ্য অশ্বারোহীদের বেলায় এই দূরত্ব আরও বেশি হত। ভারী অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল রোমানদের রিজার্ভ ফোর্স। প্রান্তভাগের সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য উভয় প্রান্তেই একটি কি দু'টি অশ্বারোহী ব্যাটেলিয়ন নিয়োগ করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল রোমানদের যুদ্ধের নিজস্ব ধারা। বিরুদ্ধ পক্ষ যুদ্ধের ময়দানে কতখানি স্থান দখল করে অবস্থান নিল, তাদের যুদ্ধের সারি কতখানি লম্বা, এসব বিষয় নিয়ে তারা বড় একটা মাথা ঘামাত না।

ইয়ারমুকের ময়দানে মুসলমান বাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নেয়। অবশ্য তারা সংঘবদ্ধ ছিল বংশ এবং গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে ছোট ছোট দলে। এই দলগুলো আবার ৪টি রেজিমেন্ট বা কলামে বিভক্ত ছিল। ইয়ারমুকের ময়দানে সবগুলো রেজিমেন্ট একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে যুদ্ধ করলেও সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। সেখানে প্রত্যেকটি দল স্বাধীনভাবে অভিযান চালিয়েছিল। রেজিমেন্টের অধীনস্থ অশ্বারোহী অবস্থা নিয়েছিল পদাতিক সৈন্যদের ঠিক পশ্চাৎভাগে।

প্রধানত, দুটি কারণে রোমান অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রথমত, রোমানদের অগ্রসরমান অশ্বারোহী বাহিনীর তীব্র আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর পদাতিক সেনারা বিপর্যস্ত হলেও রোমানদের উপরও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শ্লথ হয়ে পড়ল রোমানদের আক্রমণের তীব্রতা। ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎভাগের অশ্বারোহীরা সচল হয়ে উঠে। দুর্বার আক্রমণ চালিয়ে ক্লান্ত এবং শ্লথ গতিসম্পন্ন রোমানদের অসুবিধায় ফেলে দেয়। দ্বিতীয়, মুসলিম বাহিনীর প্রান্তভাগের অশ্বারোহী সৈন্যরাও নিশ্চুপ থাকল না। তারাও পশ্চাৎভাগের অশ্বারোহীদের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। এমনিভাবে প্রান্তভাগ এবং পশ্চাৎভাগের রোমান সেনাদের তারা বিপর্যস্ত করে তোলে। খালিদের রিজার্ভ বাহিনী রোমানদের অধিকতর নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়। অতি চমৎকারভাবে ছিনিয়ে নেয় বিজয় পতাকা।

পাদটীকা

জিহাদের আইন

১. যারা কোন না কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে রয়েছে ইহুদী, খ্রিস্টান এবং জোরেস্ট্রীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা।

২. ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা অন্য কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী লোকেরা যদি দার-উল ইসলামে বসবাস করে এবং ধর্মবিশ্বাসের অবাধ স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করে তখন তাদের বলে জিম্মি। সাধারণত, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অমুসলিমরা এই সুযোগ লাভ করে। কখনো আবার কোন দেশ দখল করার সময় মুসলমানগণ একতরফাভাবে এই নিরাপত্তা প্রদান করে থাকেন।

৩. পোপ বা খ্রিস্টান ধর্মযাকজগণের শাসন আবার অন্যরকম। তাদের মতে একজন খ্রিস্টান কোন মুসলমানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তা মেনে চলা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যে কোন মুহূর্তে সে এই চুক্তি ভাঙ্গতে পারে এবং চুক্তির শর্ত থেকে অব্যাহতি লাভের অধিকার রাখে। কারণ অখ্রিস্টানকে দেয়া অঙ্গীকার মেনে চলার ব্যাপারে একজন খ্রিস্টানের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

৪. পবিত্র নগরী জেরুযালেম একবার মুসলমান বাহিনীর দখলে আসে, আরেক বার খ্রিস্টান বাহিনীর অধিকারে চলে যায়। বিজয় লাভের পর মুসলমান এবং খ্রিস্টানগণ জেরুযালেমবাসীদের প্রতি যে আচরণ করে তা থেকেই যুদ্ধ সম্পর্কে উভয় জাতির স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ৬৩৬ সালে জেরুযালেম আরবদের দখলে আসে। কিন্তু পরে দেশটি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১১৮৬ সালে সালাহউদ্দীন দেশটিকে পুনরায় দখল করেন। প্রতিবারেই স্থানীয় খ্রিস্টানরা জান-মাল ও ধর্মের ব্যাপারে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু ১০৯৯ সালে তথাকথিত ধর্ম যুদ্ধের সময় খ্রিস্টানরা যখন জেরুযালেম দখল করে তখন অবস্থা দাঁড়ায় এর ঠিক উল্টো। তারা স্থানীয় ইহুদী ও মুসলমানদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। এমনকি যারা প্রাণের ভয়ে পবিত্র উপাসনালয়ে আশ্রয় নেয়, তারাও খ্রিস্টানদের ক্ষুরধার তলোয়ার থেকে নিস্তার পায়নি।

৫. আধুনিক যুদ্ধ আইনে এ ধরনের কোন নোটিশ অথব আলটিমেটাম দেয়ার বিধান নেই। অবশ্য শত্রু শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে যুদ্ধ সম্পর্কে ঘোষণা দেয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু এই ঘোষণা দেয়ার কত দিন বা কত সময় পরে শত্রুর উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে, সে সম্পর্কে কোন নিয়ম-নীতি নেই।

অনেকাংশে দেখা যায় যে, যুদ্ধ সম্পর্কে যখন ঘোষণা দেয়া হয় তার পূর্বেই শত্রু ছাউনি অবরোধ করে রাখা হয়েছে। আসলে এই ঘোষণাপত্রের মূল লক্ষ্যই হল যুদ্ধের ব্যাপারে একটি নিয়ম পালন করা, হানাহানি বা রক্তপাত বন্ধ করা নয়।

৬. ১৯৪৮ সালে ইসরাইলীরা বেসামরিক আরববাসীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা হিরোশিমায় বোমা ফেলে। চোখের পলকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে হাজার হাজার নিরীহ লোক। ইসলামের চোখে এসব কাজ অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দিত। জিহাদের আইন অনুসারে এরা সবাই যুদ্ধ অপরাধী।

৭. জিহাদের আইন অনুসারে শত্রুপক্ষের পূর্ণ বয়স্ক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ সকল পুরুষই যোদ্ধা বলে চিহ্নিত। এর বাইরে যারা আছে তারা সবাই যুদ্ধের অভিযোগ থেকে মুক্ত। যারা যাজক, যারা সন্ন্যাসী তারাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এবং বেসামরিক লোকেরা যে সুযোগ-সুবিধা, মান-মর্যাদা, নিরাপত্তা পেয়ে থাকে এরা সবাই তাই পাবে। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নিলে, কোন প্রকার গুপ্তচর অথবা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকলে অবশ্যই তাদের শত্রুপক্ষের সামরিক বিভাগের লোক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

৮. রাসূল (সা) বলেছেন, শেষ বিচারের দিনে অবশ্যই আমি সে ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করব না– যে চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে, যে স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে এবং যে শ্রমিককে তার পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করা থেকে বিরত থাকে।

ওহুদের যুদ্ধ

১. বর্তমানে যে অঞ্চলটিকে কনস্টানটিনোপল বলা হয়, পূর্বে সে অঞ্চলটিকে বলা হত বাইজেনটিয়াম। এই বাইজেনটিয়াম ছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। রাজধানীর নাম অনুসারে এই সাম্রাজ্যকে বলা হত বাইজেনটাইন।

২. মুরুওয়ার কোন একক প্রতিশব্দ নেই। সাধারণভাবে যুদ্ধের ময়দানে অসীম সাহসিকতা, দুর্বিপাকের মুকাবিলায় অপূর্ব ধৈর্য, প্রতিঘাতের জন্য নিরলস অধ্যবসায়, দুর্বলের নিরাপত্তা বিধান এবং অনাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের মত গুণাবলী প্রকাশের জন্য 'মুরুওয়াহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, যে সব ধনবান বণিক যুদ্ধে অংশ নেয় তারা সাধারণত ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির কারণে এ সমস্ত গুণ রপ্ত করতে পারে না।

৩. অর্থ এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আবূ লাহাবের একান্ত মজ্জাগত। সম্পর্কের দিক থেকে সে ছিল রাসূল (সা)-এর চাচা। সে বিয়ে করেছিল আবদ শামস গোত্রপতি আবূ সুফিয়ানের ভগ্নিকে। বৈবাহিক সূত্রেই সে আবদ শামস গোত্রের ব্যবসার অংশদারিত্ব লাভ করে। রাসূল (সা)-এর শত্রুদের মধ্যে আবূ লাহাব ছিল অন্যতম। আবূ তালিবের ইন্তেকালের পর বনু হাশিমেরা আবূ লাহাবকে গ্রহণ করলো তাদের

গোত্রপতি হিসেবে। তার দুই ছেলে রাসূলে পাকের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে গোত্রপ্রধান হওয়ার পর রাসূলের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য ছেলেদের বাধ্য করে এবং কন্যাদ্বয়কে নবীজীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এ সময়ে সে আরও একটি কাজ করল। আবূ তালিবের আমলে বনু হাশিম গোত্রের তরফ থেকে রাসূল (সা)-কে যে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল, আবূ লাহাব তা প্রত্যাহার করে নেয়।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

১. ঐতিহাসিক ওমানের ভাষায় সপ্তম শতাব্দীতে খালিদ এবং আমরের নেতৃত্বে আরবেরা সিরিয়া এবং মিশর দখল করেছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সংখ্যাধিক্য এবং অস্ত্রসম্ভার অথবা মজবুদ সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য এই বিজয় অর্জিত হয়নি। বরং ধর্মীয় আনুগত্য এবং দুর্জয় সাহসের বলেই অদৃষ্টবাদী মুসলমানরা সাফল্যের সঙ্গে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এব্যং উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর মুকাবিলা করতে পেরেছিল।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ

১. বিবদমান পক্ষের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতপার্থক্য এত ব্যাপক যে, মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৬০০০ থেকে ৩৮০০০ এবং পারস্য বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৩০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িক কালের আরমেনীয় সূত্র মতে সিরীয় সৈন্য সহ মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫,০০০ এবং পারস্যের পক্ষে ৮০,০০০। তবে এ ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি একমত যে, পারস্য সম্রাটের পক্ষে ১,২০,০০০ এবং মুসলমানদের বাহিনীতে মোট ৩০,০০০ সৈন্য এই যুদ্ধে অংশ নেয়।

২. এমনি একটি অবস্থায় একজন মুসলমান অধিনায়ক ব্যক্তিগতভাবে হাতীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার পরিস্থিতিকে ফিরিয়ে আনবেন নিজের অনুকূলে এটাই প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক। সেনাপতি মরহুম মুসান্না সব সময় এমনটি করতেন। অবস্থার ভয়াবহতা সালমাকে এতটা শংকিত করে তোলে যে, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলেন যে, 'আহ্' আজ যদি সেদিনের মুসান্না বেঁচে থাকত!

এমনিতেই সেনাপতি সাদের মন-মেজাজ ভাল ছিল না। অসুস্থতার কারণে তিনি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি। সাধারণ সৈনিকেরা তবু সাদের তীব্র সমালোচনা করছিল। উপরন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা তাকে অতিমাত্রায় চঞ্চল এবং অস্থির করে তুলেছিল। এমনি মুহূর্তে সালমার এ ধরনের আচরণে তিনি ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ক্রোধের বশে সালমাকে চপেটাঘাত করেন। কিন্তু সালমা

ছিলেন খুবই প্রাণবন্ত এবং উচ্ছল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ও! তাহলে কাপুরুষেরও সম্মানবোধ আছে!"

সৈন্যদের অনেকেই নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার পথ খুঁজছিল। অবশেষে সেনাপতি সাদকেই গ্রহণ করল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে। সাদকে নিয়ে তারা শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করল। মুসলিম শিবিরে সকলের মুখে মুখে কবিতাগুলো উচ্চারিত হল। তারা অভিযোগ উত্থাপন করল যে, "আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ সাদ কাদিসিয়ার প্রান্তরে নীরব থাকলেন। বিকাল নাগাদ হাজার হাজার মহিলা বিধবা হল। কিন্তু তাদের মধ্যে সাদের কোন বিধবা পত্নী ছিলেন না। "

অবশেষে সাদ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতাকে সৈন্যদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। সৈন্যরা তখন প্রকৃত রহস্যটি অনুধাবন করতে পারল এবং আজে-বাজে কথা থেকে বিরত থাকল।

আরব এবং কনস্টানটিনোপল

১. ইস্তামবুলে গোল্ডেন হর্নে তার কবরটি রয়েছে। তুরস্কের সমস্ত মাজার, কবরস্থানের মধ্যে এই কবরটি সবচেয়ে বেশি পূত-পবিত্র।

২. গ্রীক ফায়ার হল বিটুমিন এবং পেট্রোলিয়ামের মিশ্রণে তৈরী এক ধরনের দাহ্য পদার্থ। পানি দিয়ে এই দাহ্য পদার্থকে নির্বাপিত করা যায় না।

ওয়াদি বাক্কাহ

১. রডারিকের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধরনের হিসেবে দিয়েছেন। বেশিরভাগ মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে তার সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০। আধুনিক ইতিহাসের জনক ইবনে খালদুনের বর্ণনামতে এই সংখ্যা ছিল ৯০,০০০। খ্যাতনামা স্পেনীয় ঐতিহাসিক কনডে অবশ্য ইবনে খালদুনকে সমর্থন করেছেন।

২. স্পেনের যাজকগণের বর্ণনামতে রডারিক রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যান। পর্তুগালের একটি অজ্ঞাত আশ্রমে ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। অন্য একটি বর্ণনামতে বারবেট নদীতে রডারিক ডুবে মারা যান। নদীর তীরে তার চপ্পল এবং কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়া যায়। হাজার হাজার মৃতদেহর সঙ্গে রডারিকের মৃতদেহ বারবেট নদীর স্রোতের টানে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। আরব ঐতিহাসিকগণ অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তাঁদের বর্ণনামতে ওয়াদি বাক্কাহ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ঐতিহাসিক বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে রডারিকের কর্তিত মস্তক দামেশকে খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এমনিতেই সেনাপতি সাদের মেজাজ বিগড়ে ছিল।

বালাত আশ শুহাদা

১. আরব শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তীর্ণ। আরব বলতে শুধু আরবে বসবাসকারীদের বোঝায় না। আরবদেশের বাইরে যারা বসবাস করে, কিন্তু আরবী ভাষা এবং সংস্কৃতিকে একান্ত নিজেদের বলে গ্রহণ করেছে -তারাও আরবের অন্তর্ভুক্ত।

২. ডেভিস মন্তব্য করেছেন যে, 'মুসলমানদের যদি দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাসের সুযোগ দেয়া হত, তাহলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, ফরাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতখানি বিকাশ ঘটাতে পেরেছে, মুসলমানদের হাতে তা আরও দ্রুত এবং ব্যাপকতর হত।" এ ব্যাপারে ফরাসী পণ্ডিত আনাতোলে-এর অভিমত আরও স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, টুরসের যুদ্ধের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাটি তখনই সংঘটিত হয় যখন আরবদের বিজ্ঞান, কলা, এবং সভ্যতা ফরাসীদের বর্বরতার পদতলে পিষ্ট হয়।

জালাকাহ

১. এ ধরনের কুড়িখানেক রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছিল সেভেলী, গ্রানাডা, বাদাজোজ, মালাগা, আলমেরিয়া, ভেলেনসিয়া, বারসেলোনা, আরাগন, আলমেটাগার, আলগারবে, মারসিয়া, সারাগোসা, করডোভা এবং কারমোনা।

২. জালাকাহ-এর যুদ্ধ ময়দান সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণগুলো মোটামুটি একই ধরনের । শুধু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সঠিক স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে। অনেকের মতে এই স্থানটি বাদাজোজের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। আবার কারও মতে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

৩. কনডে-এর দেয়া বিবরণ অনুসারে ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ১০,০০০ পদাতিক এবং ৩০,০০০ আরব বেতনভোগী সৈন্যর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল মুসলিম বাহিনী। এই পরিসংখ্যানটি মুরদের বিবরণ থেকে নেয়া হয়েছে। সম্ভবত, পদাতিক সৈন্যরা ছিল শিবির অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধে আরব বেতনভোগীদের ভূমিকা কি ছিল, কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল, মুসলমান অথবা খ্রিস্টানদের কোন বর্ণনায় এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। মুসলিম বাহিনী ছিল খ্রিস্টানদের দশ ভাগের এক ভাগ। অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে খ্রিস্টানদের চাইতে মুসলমানদের জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। মুরদের মধ্যে যুদ্ধ-স্পৃহা যে কত হ্রাস পেয়েছিল তা এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

হাত্তিনের যুদ্ধ

১. সুলতান সালাহ উদ্দীন মিশরকে ১১৭১ সালে সুন্নী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করলেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সর্বশেষ ফাতেমীয় খলিফা তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। অবশ্য সালাহ উদ্দীন এই পরিবর্তনের খবর তার নিকট থেকে গোপন রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, খলিফা সুস্থ হয়ে উঠার পরই এ বিষয় জানতে পারবেন। আর যদি তিনি ইন্তেকাল করেন, তাহলে শান্তির সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেয়া শ্রেয়।

তারৌরীর যুদ্ধ

১. ঘোরী রাজবংশটি এসেছিল সূরী গোত্র থেকে। কিন্তু এই রাজবংশের পূর্বপুরুষেরা তুর্কী, আফগান অথবা পারস্যের কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, জাতিগতভাবে তারা তুর্কীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যুগ যুগ ধরে আফগানিস্তানে বসবাস করার ফলে আফগান হিসেবেই তারা সমধিক পরিচিতি লাভ করে।

মানসুরার যুদ্ধ

১. পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগেই গড়ে উঠেছিল ক্রুসেডারদের সাম্রাজ্য। জেরুযালেম তখনও তাদের শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবু সেখানকার রাজারা নিজেদের জেরুযালেমের রাজা বলেই পরিচয় দিত।

নিকপোলিসের যুদ্ধ

১. বিশাল বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা নিরূপণ করা এমনিতে দুষ্কর। প্রাথমিক যুগের বর্ণনাকারীগণ বিষয়টিকে আরও দুর্বোধ্য করে তুলেছেন। সাধারণভাবে তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অতিরঞ্জিত করেছেন। বিজয়কে সমুজ্জ্বল এবং কৃতিত্বপূর্ণ করে তোলা, আবার পরাস্ত হলে শত্রু পক্ষের বিশাল বাহিনীর মুকাবিলায় এমনটি স্বাভাবিক-এ রকম একটি ধারণা দেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ১৬,০০০, অনেকে আবার ২,০০,০০০ কথা বলেছেন। তাদের মতানুসারে তুর্কী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল নিম্নে ১,৩৪,০০০ এবং উর্ধ্বে ৪,০০,০০০। তুর্কী লেখকগণ অবশ্য নিজেদের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কোন হিসাব দেননি। তাঁরা

শুধু এটুকু বলেছেন যে, সুলতান বায়াজিদ নিয়মিত বাহিনীর ১০,০০০ সিপাহী নিয়ে নিকোপোলিসের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের মতে ক্রুসেডারদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১,৩০,০০০।

কনস্টানটিনোপল বিজয়

১. একমাত্র রাসূলে আকরাম (সা)-এর বেলায় তুর্কীরা মুহাম্মদ (সা) শব্দটি ব্যবহার করত। এভাবেই তারা লিখত এবং উচ্চারণ করত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নামানুসারে কারো নাম রাখা হলে, তখন এই শব্দটির বানান এবং উচ্চারণ অন্যরকম করত। লেখায় এবং বলায় মুহাম্মদ শব্দটি হয়ে যেত মাহমেত।

২. এই ছেলেগুলোকে বিশেষ ধরনের স্কুলে রেখে উন্নতমানের শিক্ষা এবং কঠোর শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। মজার ব্যাপার এই যে, এখানে কাউকে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করা হত না। কিন্তু কালক্রমে প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম কবুল করত। ছেলেদের মধ্যে যারা বিশেষভাবে বুদ্ধিদীপ্ত এবং আদর্শবান, তাদেরকে বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগ করা হত। অবশিষ্টরা থেকে যেত সেনাবাহিনীতে। এই পদাতিক বাহিনীর সদস্যরা ছিল সে আমলের সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং নিষ্ঠাবান যোদ্ধা। অনেক সময় খ্রিস্টান অভিভাবকগণও কর প্রদানের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় ছোট ছেলেদের মুসলমানদের হাতে তুলে দিত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন বাধ্যবাধকতা অথবা বাড়তি সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয় মাহমেত যখন কনস্টানটিনোপল অবরোধ করেন, তখন জানিসারিস বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২,০০০। যারা বাজপাখী অথবা কুকুর পোষত, তারাও ছিল এই দলে এবং তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না।

৩. মুসলমানদের চাপের মুখে খ্রিস্টান সেনারা এমনিতেই দারুণ উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগের মধ্যে ছিল। তারাও পাশ্চাত্য জগত থেকে খ্রিস্টান নৌবহরের আগমন সংবাদ জানতে পারে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সম্রাট একটি দলকে সাহায্যকারী নৌবহরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এবং যথাশীঘ্র সম্ভব কনস্টানটিনোপল আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। শহরটি পতনের কয়েকদিন পূর্বে অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে ভেনেটিয়ান নাবিকেরা ফিরে আসে। এজিয়ান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তারা কোন সাহায্যকারী জাহাজের সন্ধান পেল না। আসলে পশ্চিমা জগৎ থেকে বিশাল নৌবহর প্রেরণের বিষয়টি তখনও পরিকল্পনার পর্যায়ে ছিল।

৪. অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে কনস্টানটিনোপল গড়ে উঠেছিল। সবগুলো গ্রামই ছিল প্রতিরক্ষা দেয়ালের অভ্যন্তরভাগে। অবশ্য প্রত্যেকটি গ্রামেরই আবার ছোট

আকারের প্রতিরক্ষা দেয়াল ছিল। কোনরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অনেকগুলো গ্রাম মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং লুটতরাজের হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

ইমারমুকের যুদ্ধের বিবদমান পক্ষ

১. ওমান মন্তব্য করেছেন যে, "অধিক সংখ্যক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।" প্রায় সকলের মধ্যে এ ধরনের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ কোন যুদ্ধের কথা বলা হলেই তারা ধরে নিয়েছেন যে, যুদ্ধে অবশ্যই বিপুল সংখ্যক সৈন্য অংশ নিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে হেস্টিংস (১০৬৬)-এর যুদ্ধে বিজয়ী বীর উইলিয়ামের সৈন্য সংখ্যাকে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকগণের মতে এই যুদ্ধে উইলিয়ামের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০। অথচ ঐতিহাসিক ওমান এই সংখ্যাকে কমিয়ে ১১০০০ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক ডেলব্রুক-এর মতে এই সংখ্যা ছিল বড়জোর ৪ থেকে ৭ হাজারের মধ্যে।

২. দুর্গ এবং শহর রক্ষাকারী সৈন্যরাও ছিল এই বিশাল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল সাম্রাজ্যের সর্বত্র। বেলসাটিস এবং নার্সেস-এর নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণকারী সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক কম।

সময়ানুক্রমিক বিবরণী

৫৩০	দক্ষিণ আরবে আবিসিনীয়দের উপস্থিতি
৫৭০	রাসূল (সা)-এর জন্ম
৬২২	রাসূল (সা) পাকের মদীনা গমন, হিজরী সালের সূচনা।
৬২৪	বদরের প্রান্তরে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে রাসূল (সা)-এর বিজয়
৬২৫	ওহুদের যুদ্ধ
৬২৯	মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমান বাহিনীর বিজয়
৬৩০	মক্কা বিজয়
৬৩২	বিদায় হজ্জ্ব, ৮ই জুন রাসূল (সা)-এর ওফাত
৬৩২-৪	খলিফা আবূ বকর (রা), আরবে বিদ্রোহ দমন
৬৩৩	খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া বিজয়
৬৩৪	প্যালেস্টাইনে রোমানদের বিরুদ্ধে আজনাদাইনের যুদ্ধ
৬৩৪-৪৪	খলিফা ওমর (রা)
৬৩৫	দামেশক এবং উত্তর সিরিয়া বিজয়
৬৩৬	ইয়ারমুকের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর পরাজয়
৬৩৭	কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর পরাজয়
৬৩৯	মিশর বিজয়
৬৪০	পারস্য বিজয়
৬৪৪-৫৬	খলিফা উসমান (রা)
৬৪৭	ত্রিপলিতানিয়া বিজয়
৬৪৯	মু'আবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ সাইপ্রাস দখল
৬৫৬-৬১	খলিফা আলী (রা)
৬৬১	খলিফা ইমাম হাসান (রা)
৬৬১-৭৫০	উমাইয়া বংশ
৬৭০	উকবাহ বিন নাফির উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা বিজয়
৬৭২-৮	কনস্টানটিনোপল অবরোধ
৭১১	ওয়াদি বাক্কাহ-এর যুদ্ধ, মুরদের স্পেন দখল
৭১১-২	সিন্ধু এবং ট্রান্স অক্সিয়ান বিজয়

৭১৫-৭ খলিফা সোলায়মানের রাজত্বকাল, আরবদের কনস্টানটিনোপল অবরোধ

৭৩২ মধ্যফ্রান্সে বালাত আশ-শুহাদার যুদ্ধ

৭৫০-১২৫৮ আব্বাসীয় খিলাফতের যুগ

৮৩১ আরবদের পালেরমো অবরোধ

৯১০ উবাইদুল্লাহ কর্তৃক আল-মাহদিয়ার নিকট ফাতিমীয় খিলাফত স্থাপন

৯৫১-৬১ গজনীতে তুর্ক আলেপটাগিনের শাসন

৯৬৯ জওহারের নেতৃত্বে ফাতেমীয়দের মিশর দখল, কায়রোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

৯৭৬-৯৭ গজনীতে সবুক্তগীনের শাসন

৯৯৬-১০২১ মিশরে ফাতেমীয় খলিফা আল হাকিমের শাসনকাল

৯৯৮-১০৩০ গজনীর শাসক সুলতান মাহমুদের রাজত্বকাল

১০৩১ কর্ডোভা থেকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বিলোপ

১০৩৭ তুঘরিল বেগ এবং দাউদের খুরাসান অবরোধ

১০৫৫ তুঘরিল বেগের দায়িত্ব গ্রহণ

১০৬২ আলমোরাভিদ ইউসুফ বিন তাশিফিনের মরক্কো বিজয়

১০৬৩-৭২ তুঘরিল বেগের উত্তরাধিকারী আল-আরসালানের শাসনকাল, মানজিকার্টের যুদ্ধে রোমানদের পরাজয়

১০৮৩ ক্যাসাইল-এর রাজা ষষ্ঠ আলফনসো কর্তৃক সেভিলীর মুতামিদ পরাস্ত।

১০৮৬ জালাকাহ-এর যুদ্ধে স্পেনীয় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ইউসুফ কর্তৃক স্বেচ্ছাচার শাসকদের অপসারণ

১০৯০ স্পেনে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনাকালে ইউসুফ বিন তাশিফিনের বিজয়

১০৯৯ ক্রুসেডারদের জেরুযালেম দখল

১১৪০ 'আটসিজ' কর্তৃক খাওয়ারিজমশাহ বংশের প্রতিষ্ঠা

১১৫৪ নূরুদ্দীনের (১১৪৬-৭৩) দামেশক বিজয়

১১৭১ সালাহ উদ্দীন কর্তৃক মিশর থেকে ফাতেমীয়দের উৎখাত

১১৭৪ সালাহ উদ্দীনের দামেশক এবং সিরিযা বিজয়

১১৮৭ হাত্তিনের যুদ্ধে ফরাসীদের বিপর্যয় এবং সালাহ উদ্দীন কর্তৃক জেরুযালেম দখল

১১৯১-২ তারৌরীর যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ এবং ভারতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রার সূত্রপাত

১১৯৩ সালাহ উদ্দীনের ইন্তেকাল

১১৯৫ আলমনসুরের হাতে আলাবকস-এর যুদ্ধে ক্যাসিলিয়ানদের বিপর্যয়

১১৯৯-১২২০ খাওয়ারিজম শাহ মোহাম্মদের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ
১২০৩ তেমুচিন-চেঙ্গিস খান কর্তৃক মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
১২২০ মোঙ্গল কর্তৃক খাওয়ারিজম, বুখারা এবং সমরখন্দ দখল
১২২৫ আল মোহাদ-এর স্পেন পরিত্যাগে, ফেজে মারিনিড্, লেমসেনে জিজানিদ্স, তিউনিসে হাবসী এবং স্পেনে ইবনে হুদের বিদ্রোহ
১২২৭ চেঙ্গিস খানের মৃত্যু
১২৪৮ মানসুরার যুদ্ধ
১২৫৮ হালাগু খানের বাগদাদ দখল, আব্বাসীয় খিলাফতের সমাপ্তি
১২৬০ আইনে জালুতের যুদ্ধে মামলুকদের হাতে মোঙ্গলদের পরাজয়
১২৭৭ মামলূক বেবারস (১২৬৬-৭৭)-এর হাতে আলবিসতানের যুদ্ধে পরাজয়
১৩২৬ ওসমানলির গোত্রপ্রধান ওরখানের বুরুসা বিজয়
১৩৫৭ যুবরাজ সোলায়মানের গ্যালিলোপি বিজয়
১৩৬২ প্রথম মুরাদের আন্দ্রিয়ানোপল বিজয়
১৩৬৯ তাইমুরের খোরাসান এবং ট্রান্স অক্সিয়ানা বিজয়
১৩৭১ মারিটজার যুদ্ধে সারবদের পরাজয়, তুর্কীদের মেসিডোনিয়া দখল
১৩৮৫-৮৬ 'নিশা' এবং ' সোফিয়ায়' তুর্কীদের উপস্থিতি
১৩৮৯ কসোভোর যুদ্ধ
১৩৮৯-১৪০২ সুলতান বায়াজীদ ইয়েলদিরিম-এর শাসনকাল
১৩৯১-৩ 'ওসমানলিদের' নিকট সেলজুক আমীরগণের আত্মসমর্পণ
১৩৯৩ ওসমানলিদের নিকট বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পণ
১৩৯৯ নিকপোলিসের যুদ্ধে বায়াজীদের হাতে ক্রুসেডারদের বিপর্যয়
১৪০০ 'সিভাসে' তাইমুরের উপস্থিতি
১৪০২ আংকারার যুদ্ধে তাইমুরের হাতে বায়াজীদের বিপর্যয় এবং সেলজুকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
১৪০৩-২১ সুলতান প্রথম মাহমেতের শাসনকাল
১৪০৫ তাইমুরের ইন্তেকাল
১৪২১-৫১ সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের শাসনকাল
১৪৩০ তুর্কীদের সালোনিকা বিজয়
১৪৪৪ ভার্নার নিকটে মুরাদের হাতে ক্রুসেডারদের পরাজয়
১৪৪৮ কসোভোর প্রান্তরে মুরাদের হাতে ক্রুসেডারদের বিপর্যয়
১৪৫১-৮১ বিজয়ী বীর সুলতান দ্বিতীয় মাহমেতের শাসনকাল
১৪৫৩ কনস্টানটিনোপল

এম, হামিদুল্লাহ ঃ মুসলিম কনডাক্ট অব স্টেট
গিবন ঃ ডিকালাইন এন্ড ফল অব দ্য রোমান ইমপায়ার
মজ্জিদ খাদ্দুরী ঃ ওয়ার এন্ড পীস ইন দ্য ল অব ইসলাম
পি, কে, হিত্তি ঃ হিস্টরী অব দ্য আরবস ঃ অরিজিন অব ইসলামিক স্টেট
জে, জে, সন্ডার্স ঃ হিস্টরী অব মেডিয়েভাল ইসলাম
আর, এইচ, সি, ডেভিস ঃ হিস্টরী অব মেডিয়েভাল ইউরোপ কেমব্রিজ মেডিয়েভাল হিস্টরী
কার্ল ব্রোজেকলম্যান ঃ হিস্টরী অব ইসলামিক পিপলস
ডব্লিউ, মুইর ঃ দ্য খালিফেইট-ইটস রাইজ, ডিকলাইন এন্ড ফল
জে, ওয়েলহাউসেন ঃ দ্য এরাব কিংডম এণ্ড ইটস্ ফল
ডব্লিউ ঃ মনোটেগোমারী ওয়াট। মুহাম্মদ এট মক্কা মুহাম্মদ এট মদীনা
ডব্লিউ, ডুরান্ট ঃ দ্য এইজ অব ফেইস
এস, পি, স্কট ঃ হিস্টরী অব দ্য মুরিস ইমপায়ার ইন ইউরোপ
আর ডোজি ঃ স্পানিশ ইসলাম
বি. লেইন পুল ঃ দ্য মুরস ইন স্পেন
আর, আলটামিরা ঃ হিস্টরী অব স্পেন
টি ডব্লিউ, আরনল্ড ঃ দ্য খালিফেট প্রিচিং অব ইসলাম
এবং গুইলোমী ঃ দ্য লিগোসী অব ইসলাম
এডওয়ার্ড ঃ ফিফটীন ডিসাইসিভ ব্যাটেলস অব দ্য ওয়ার্লড
ওমান ঃ দ্য আর্ট অব ওয়ার ইন দ্য মিডিল এজেজ
এইচ, ট্রেভোর-রোপার ঃ রাইজ অব ক্রিশ্চিয়ান ইউরোপ
জর্জ ফিবলে ঃ হিস্টরী অব বাইজান্টাইন এমপায়ার
এ, আর, লুইস ঃ নেভাল পাওয়ার এন্ড ট্রেড ইন দ্য মেডেটিরিয়ান
এ, এস, ট্রিটন ঃ দ্য খালিফস এন্ড দেয়ার নন-মুসলিম সাবজেক্টস্
কর্নেল স্পলডিং এ্যাট আল ঃ ওয়ার ফোয়ার-এ স্টাডি অব মিলিটারী মেথডস ফ্রম দ্য আরলিয়েস্ট টাইমস
এ, এস, আতিয়া ঃ ক্রসেড অব নিকপোলিস
জে, বি, গ্লাব ঃ স্টরী অব আরব লেজিয়ন
এলয়েস মুসিল ঃ দ্য মিডল ইউফ্রেটিস
এস, রানসিম্যান ঃ হিস্টরী অব দ্য ক্রুসেডস্
এইচ, জি, ওয়েলস ঃ এন আউটলাইন হিস্টরী অব দ্য ওয়ার্লড্
সার্ভে অব প্যালেস্টাইন, পুরাতত্ত্ব বিভাগ ঃ প্যালেস্টাইন অব দ্য ক্রুসেডস্
পাঞ্জাব গেজেটিয়ার ঃ প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (কারনাল জেলা)
বৃটিশ ওয়ার অফিস ঃ দ্য ল' অব ওয়ার অন ল্যান্ড (ম্যানুয়েল অব মিলিটারী ল' তৃতীয় অংশ)

নির্ঘন্ট

চ

জ

ড

ত

থ

দ

ইফাবা—— ২০০২- ২০০৩ — প্র/৬৯৫৩(উ) — ৩২৫০